সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—পঞ্চম বর্ষ—

কার্ত্তিক ১৩২৩ হইতে আশ্বিন ১৩২৪।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য— দুই টাকা।

PUBLISHED FORM
RESEARCH HOUSD—MYMENSINGH.

বিষয় সূচী।

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৩। { প্রথম সংখ্যা।

বাঙ্গলা সাধুভাষা।

(যশোহর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।)

আজকাল বহু কৃতবিদ্য বাঙ্গালী বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন। ইহাতে আমাদের স্বদেশ প্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়; কেননা বাঙ্গলা ভাষাটা আমাদের দেশেরই বস্তু এবং দেশের সর্ব্ববিষয়ের উন্নতির ইচ্ছা এবং চেষ্টার নামই স্বদেশ প্রীতি।

কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কিরূপে হইবে তদ্বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত মত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুরাতন দলের সংক্ষিপ্ত মত এই যে যাহাকে আমরা সাধুভাষা বলি এবং সাধারণতঃ সাহিত্যে যাহা প্রচলিত আছে তাহাই সাহিত্যিক ভাষা হওয়া উচিত। পরিপন্থী দল বলেন যে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভাষা বিষয়ে এইরূপ মতভেদ সাহিত্যিক সমাজেরই আলোচ্য বিষয় সুতরাং আমি এই উভয় মতের পোষকতায় এবং খণ্ডনপক্ষে যে সকল যুক্তি আমার মনে উদিত হইয়াছে তাহা এই সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলাম।

পূর্ব্বে যাঁহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন তাঁহারা কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত হইবে, না প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহৃত হইবে, ইহাই বিচার করিতেন—আমরা পুষ্করিণী লিখিব কি পুকুর লিখিব, বদরী লিখিব কি কুল লিখিব, চালতা লিখিব কি চারিত্র বা ভব্য লিখিব ইহাই তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয় ছিল। কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাদেশিক শব্দ কেন, সম্পূর্ণ বিদেশী শব্দও ভাষায় প্রবেশ করিলে সাহিত্যিক ভাষার কোন অনিষ্ট হয় না। কত দ্রাবিড় শব্দ, গ্রীক শব্দ, আরবী শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে—যথা—ঘট, কুঠার, কেন্দ্র, জামিত্র, হোরা, বণিক্, ত্রেকাণ প্রভৃতি। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলায় হিসাব, বিছানা, বালিশ, আলমারি, বাক্স, কৈফিয়ৎ, লণ্ঠন, তক্তপোষ, চেহারা, খারাপ প্রভৃতি কত শত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহাতেও বাঙ্গলার অনিষ্ট হয় নাই। কেননা কোন ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রবেশ করিলে সেই ভাষার বিশেষত্ব নষ্ট হয় না। আমরা যেমন হ্যাট কোট পরিলেও বাঙ্গালীই থাকি তেমনই আমাদের কথাবার্ত্তায় বহু বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হইলেও আমাদের ভাষা বাঙ্গলাই থাকে। হ্যাট কোট পরিহিত বাঙ্গালীকে সাহেব বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু হ্যাট কোট খুলিলেই বাঙ্গালীত্ব বাহির হইয়া পড়ে। সেইরূপে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলায় কথা কহিবার সময়ে যথাসাধ্য ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিলেও তাঁহাদের কথায় এমন কতকগুলি বাঙ্গলা শব্দ অবশিষ্ট থাকে, যাহা পরিবর্ত্তনসহ নহে। কেননা সেই শব্দ কয়েকটারও ইংরেজী করিলে তাঁহাদের কথাকে আর বাঙ্গলা বলা যায় না। কয়েকটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার অর্থটা স্পষ্টীকৃত হইবে। "তোমার uncle যদি এখানে আসিতেন তাহা হইলে এখানকার climate এবং natural scenery দেখিয়া delighted হইতেন আর তাঁহার old friend এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইত।" "এই মকদ্দমায় appeal এর কোন

ground নাই।" এই দুইটী বাক্যের পারসী শব্দটীর এবং ইংরেজী শব্দগুলির পরিবর্ত্তে সংস্কৃত, লাটিন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি যে কোন ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। এইগুলি সাধারণত নাম ও বিশেষণ। নাম যাহাই হউক না কেন বস্তুটা তাহাই থাকে। "গোলাপ যে নামে ডাক সুবাস বিতরে।" কত লোকের অর্থশূন্য নাম আছে যথা পাঁচকড়ি, নকড়ি, বেনোআরি, কুঞ্জলাল, ছাতুলাল ইত্যাদি। আবার বিদেশী নামও আছে যথা মাইকেল দত্ত, গুডিব চক্রবর্ত্তী, বেঞ্জমিন বড়ুআ, দীল-মহম্মদ গাঙ্গুলী ইত্যাদি। অথচ তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব যায় নাই। কিন্তু কোন ভাষায় সর্ব্বনাম, ক্রিয়া-পদ, প্রত্যয়, যোজক (Conjunction) প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া তত্তৎ স্থলে অন্য ভাষার শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহা একেবারে অন্য ভাষা হইয়া পড়ে। উপরে যে দুইটী বাক্য উদাহরণ স্বরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহার বাঙ্গলা শব্দগুলির পরিবর্ত্তে অন্য কোন ভাষার শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। এইগুলি প্রধানত সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ। ইহাদিগকে লইয়াই ব্যাকরণ এবং ইহারাই ভাষার অস্থি, মজ্জা, কঙ্কাল ও শরীর। এইগুলির প্রচলিত অবয়ব সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবে অথবা সাধুভাষার অবয়ব সাহিত্যে প্রচলিত হইবে ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। এই উভয় শ্রেণীর শব্দগুলিরই বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সর্ব্বনামগুলির যে সকল শব্দ কলিকাতায় এবং পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত। আছে তাহার পাঁচ সাতটী ব্যতীত আর সকলগুলিই সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা লইয়া কোন বিবাদ নাই। যত বিবাদ তাহা ক্রিয়াপদ লইয়া। সাধু ভাষায় "খাইলাম" লিখিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের কোন স্থানের লোকেই কথা কহিবার সময়ে 'খাইলাম" বলে না। কোন স্থানে খেলুম খেলাম, কোন কোন জেলায় খালাম, কোন কোন জেলায় খালু বলে। সাধু ভাষায় খাইতেছি, কোথাও খাচ্চি, কোথাও খেতেছি, কোথাও খাতেছি, কোথাও খাতে আছি, কোথাও খাই আছো। এইরূপে প্রত্যেক ক্রিয়াপদের নানারূপ প্রাদেশিক আকার আছে। অথচ সাধু ভাষার আকার কোন স্থানেই প্রচলিত কথায় নাই। একদল সাহিত্যিক বলেন যে যাহা কোন স্থানেই প্রচলিত নাই তাহার পরিবর্ত্তে প্রচলিত কোন একটা ক্রিয়াপদই সাধু ভাষায় গৃহীত হওয়া উচিত। ইহা সুযুক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি শুনা গিয়াছে। এক স্থানের প্রাদেশিক ক্রিয়াপদ সাহিত্যিক ভাষায় গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইলে অন্য প্রদেশের লোকে অবশ্যই বলিবেন "আমাদের দেশের ক্রিয়াপদ গৃহীত হইবে না কেন ?" তাঁহাদের এ আপত্তি অসঙ্গত নহে। কেহ বলেন যে কলিকাতার প্রাদেশিক ক্রিয়াপদই সাহিত্যে গ্রহণ করা উচিত যেহেতু কলিকাতা আমাদের রাজধানী। কিন্তু রাজধানী হইলেই যে তথাকার ভাষা পূর্ব্ব হইতেই উৎকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহা মানিতে পারা যায় না। রাজধানীতে নানাস্থান হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া বহুদিন বাস করিলে একটা আইডিয়াল ভাষা পড়িয়া উঠে। কলি-কাতায়ও কালে তাহাই হইবে। কিন্তু এখনও হয় নাই। আর একটা কথা এই যে রাজধানীত এখন আমাদের দুইটা—একটা কলিকাতা আর একটা ঢাকা। তাহা হইলে কি আমাদের দুইটা সাহিত্যিক ভাষা হওয়া উচিত ? দুইটী সাহিত্যিক ভাষা হইলে আবার নূতন প্রকারে বঙ্গ বিভাগ হইবে। অথবা, মধ্যে মধ্যে যেরূপ জনরব শুনা যায়, যদি সত্য সত্য ঢাকাই ভবিষ্যতে বঙ্গ-দেশের একমাত্র রাজধানী হয়, তাহা হইলে কি ঢাকার প্রাদেশিক ভাষাই সাহিত্যিক ভাষা হইবে ?

তৃতীয় আপত্তি এই যে কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব। কোন কোন ক্রিয়াপদের অর্থ পূর্ব্ববঙ্গে এক, কলিকাতায় আর। যেমন "করছি" শব্দের অর্থ কলিকাতায় "করি-তেছি" কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে "করিয়াছি।' সুতরাং কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যে প্রচলিত হইলে কলিকাতা-বাসী ভিন্ন আর সকলকেই তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য আয়াস করিতে হইবে। কিন্তু যে সাধু ভাষা বহুকাল হইতে সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত আছে তাহার জন্য সকলকেই সমান চেষ্টা করিতে হয়।

দুইএকশত বৎসর একই স্থানে সকল প্রদেশ হইতে

বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও প্রাকৃত জনের সমাগম ও বাস হইলে সেই স্থানে একটা আইডিয়াল ভাষা প্রস্তুত হইয়া উঠে। কলিকাতা বা ঢাকায়ও হয়ত সেইরূপ হইবে। কিন্তু আমাদিগের সে অপেক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমার বিবেচনায় আমাদের যে সাধুভাষা আছে তাহাই আমাদের আইডিয়াল ভাষা। আমি পুনঃপুন আইডিয়াল শব্দটা ব্যবহার করিতেছি, তাহার কারণ এই যে আইডিয়াল শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ আমি অবগত নহি। বাঙ্গলায় প্রায়ই দেখিতে পাই যে আইডিয়াল স্থলে আদর্শ শব্দ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু "আদর্শ" আইডিয়ালের প্রতিশব্দ বলিয়া বোধ হয় না। যাহা-দেখিয়া অনুকরণ করা হয় তাহাই আদর্শ। ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ model. আইডিয়াল শব্দের অর্থ মনঃকল্পিতসর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন। ইহা গ্রীক আইডিয়া বা ইডিয়া শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্লেটো এবং শোপেনহর বলেন যে পদার্থমাত্রই প্রকৃত বস্তুর ছায়াস্বরূপ—প্রকৃতি যেন সমস্ত পদার্থকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু কোন পদার্থকেই সিদ্ধিতে বা সম্পূর্ণতায় পঁহুছাইতে পারে নাই। প্রত্যেক বস্তুরই একটা প্রাণ বা আত্মা (Vital principle) আছে তাহা তত্ত্বদর্শীগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই প্রাণই আইডিয়া। একজন তত্ত্বদর্শী শিল্পী একজন সাধারণ লোকের প্রতিকৃতি এমন ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন যে সেই প্রতিকৃতি দেখিলেই সেই লোকটা বলিয়া চিনিতে পারা যায় অথচ সেই লোকটীতে যে সকল সৌন্দর্য্য মোটেই ছিল না প্রতিকৃতিতে সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য আছে। এই প্রতিকৃতিই সেই লোকটীর আইডিয়াল মূর্ত্তি। বাঙ্গলা ভাষায় যতরূপ উপবিভাগ আছে সকলগুলি দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়াই যেন আমাদের জাতীয় প্রতিভা আমাদের সাধুভাষা রূপ আইডিয়াল ভাষা প্রস্তুত করিয়াছে। প্লেটো বলেন স্বর্গে একটা ত্রিভুজ আছে যাহা সমবাহুও নহে, সমদ্বিবাহুও নহে, অসমবাহুও নহে, যাহা সমকোণও নহে, অসমকোণও নহে। আমাদের সাধুভাষাও সেই-রূপ—বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান মেদিনীপুরেরও নহে, কলিকাতা, হুগলি, বারাসতেরও নহে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালিরও নহে, নদীয়া, খুলনা, যশোহর, রাজশাহী, মালদহেরও নহে। যে জেলাগুলির নাম করিলাম সেই-গুলিতে এবং বঙ্গের অন্যান্য জেলায় পৃথক পৃথক প্রাদেশিক ভাষা। এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা এতই বিভিন্ন যে কলিকাতার লোক কুচবিহার রঙ্গপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের লোকের একটা কথাও বুঝিতে পারে না। অথচ প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষা হইতে সাধু-ভাষার বিভিন্নতা অতি অল্প। সুতরাং সমস্ত বঙ্গে কোন এক ভাষা প্রচলন করিতে হইলে সাধুভাষারই প্রচলন হওয়া উচিত। যে দেশে যত প্রাদেশিক ভাষা বা উপ-ভাষা প্রচলিত সে দেশে সেই অনুপাতে একতার অভাব। সুতরাং এই অভাব দূরীকরণ জন্যও দেশ মধ্যে যতদূর সম্ভব এক ভাষা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করা উচিত। এই চেষ্টার ফলে প্রাদেশিক উপভাষাগুলি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে। উপভাষার উচ্ছেদ করা সুশিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মার্জ্জিত ভাষাই সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পূত ও বিভূষিত করে। আমাদের সাধুভাষাই আমাদের মার্জ্জিত ভাষা। সৌন্দর্য্যে, লালিত্যে, গাম্ভীর্য্যে, এবং সুগমতায় বঙ্গের কোন প্রাদেশিক ভাষাই সাধু ভাষার সমকক্ষ নহে।

তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে "সাধুভাষাটা যখন কোন প্রদেশেরই প্রচলিত ভাষা নহে তখন উহা একটা অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বস্তু। কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক কিছুই কল্যাণদায়ক ও স্থায়ী হয় না।" এই কথাটা হঠাৎ শুনিতে বড়ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে অভিজ্ঞতা উহা সমর্থন করে না। এক দিক দিয়া দেখিলে জগতে কিছুই অস্বাভাবিক নাই। আমরা স্বভাব হইতেই জন্মলাভ করিয়াছি, স্বভাবই আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছে। সুতরাং স্বভাব প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা আমরা যাহা কিছু করি তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের বুদ্ধিদ্বারা যাহা করা হয় তাহাকেই অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বলে। বাবুই এবং অন্যান্য পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করে; বীবর, শূকর, মধুমক্ষিকা প্রভৃতিও কত কৌশলে ভিন্ন ভিন্নরূপ আবাস প্রস্তুত করে; কিন্তু সেই সকল আবাস কে কেহ

অস্বাভাবিক বলে না। অথচ মানুষের বাড়ীই একটা অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বস্তু। কিন্তু মানুষকে যদি কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর করিতে হইত, মানুষ যদি বুদ্ধি প্রয়োগ না করিত তাহা হইলে এ ধরা হইতে বহুদিন তাহার অস্তিত্বের লোপ হইত। সে তাহা হইলে অগ্নিও প্রজ্বলিত করিতে পারিত না, রন্ধনও করিতে পারিত না। বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শীতাতপ ও লজ্জা হইতে আপনাকে রক্ষাও করিতে পারিত না, ঔষধ প্রস্তুত ও সেবন করিয়া আপনাকে পীড়া হইতে উদ্ধারও করিতে পারিত না; ঘর বাড়ী, শিক্ষা, সমাজ, কৃষি, অস্ত্র শস্ত্র তাহার কিছুই হইত না। এ সমস্তই কৃত্রিম। বাস্তবিক সভ্যতার নামান্তরই কৃত্রিমতা। কৃত্রিমতাই সমস্ত বস্তুকে স্বাভাবিক বিনাশ হইতে রক্ষা করে। যে বস্তুতে যত অধিক কৃত্রিমতা তাহাই তত অধিক দিন স্থায়ী। তাজমহলে বহু পরিমাণে কৃত্রিমতা আছে বলিয়াই তাহার এত আদর এবং তাহা এতকাল স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার যে এত গৌরব এবং তাহা যে এতকাল স্থায়ী হইয়া আছে তাহারও কারণ কৃত্রিমতা। আমরা কৃত্রিম পরিচ্ছদ পরিয়া কৃত্রিম সভায় যাই, কৃত্রিম গৃহে বাস করি, কৃত্রিম বস্তু আহার করি, অথচ আমাদের ভাষাতে কিছুই কৃত্রিমতা থাকিবে না ইহা হইতেই পারে না। সকল সভ্য জাতিই বিশিষ্ট বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের সময়ে সাধুভাষা ব্যবহার করেন। বাঙ্গলা দেশেও তাহাই হইত। নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাশয়েরা বিচারের সময়ে সাধুভাষায় কথা কহিতেন। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর পিতা শুনিয়াছি সাধুভাষায় বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু এখন এক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ভিন্ন আর কেহই সাধুভাষায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিতে পারেন না। কেহ কেহ আরম্ভটা সাধুভাষায় করেন কিন্তু শেষ রাখিতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সাহিত্যক সভায়ও সকলেই প্রাকৃত বা প্রচলিত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ করা যে তাঁহারাও উচিত মনে করেন না তাহা তাঁহাদের বক্তৃতার আরম্ভের সাধু ভাষাতেই বুঝা যায়।

উপসংহারে আমি পুনরায় এই কথা বলিতেছি যে যাঁহারা এই সাধুভাষার পরিবর্ত্তে কোন স্থানীয় উপভাষা সাহিত্যে প্রচলিত হওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন তাঁহারা নূতনরূপে বঙ্গবিভাগের সূত্রপাত করিয়া কেবল কলহ ও কোলাহলের অবতারণা করিবেন্। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখা এবং বক্তৃতা করা এক কথা কিন্তু প্রাদেশিক ভাষাই সাহিত্যিক ভাষা হওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করা আর এক কথা। প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত পুস্তক লোকের ইচ্ছা হইলে পড়িবে, ইচ্ছা না হইলে পড়িবে না; কিন্তু কোন প্রাদেশিক ভাষাকে সাধুভাষার আসনে স্থাপন করিবার প্রস্তাব শুনিলে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

দুর্জ্জয়কালের প্রভাবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে আমাদের সমাজে অনেক ভাঙ্গাগড়া হইতেছে। আমাদের প্রাচীন একান্নবর্ত্তী পরিবারও সেই কারণে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এখন তাহা কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটা খতিয়ান করা বোধ হয় মন্দ নয়। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহার পরমায়ু আর কত দিন, এবং তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কোন আশা আছে কি না।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মোটামুটী এই তিন প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

(১) একটী পরিবারে তিন ভাই, তাঁহাদের নাম দুর্গাশঙ্কর, কালীশঙ্কর ও হরিশঙ্কর। তাঁহাদের বাপ নাই, মা আছেন। তিন ভাই-ই বিবাহ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ২।৩টী করিয়া ছেলে মেয়ে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ দুর্গাশঙ্কর বাড়ীতে থাকেন, কালীশঙ্কর ও হরিশঙ্কর বিদেশে চাকুরি করেন। তাঁহারা যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা নিজেদের খরচ বাদে সমস্তই দুর্গাশঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দেন। অবশ্য তাঁহাদের নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানগণ সঙ্গেই থাকে। পূজার সময়ে

সকলে বাড়াতে আসিয়া একত্র মিলিত হন। বৃদ্ধা মাতাই সংসারের কর্ত্রী। বধূগণ তাঁহারই অধীন হইয়া চলেন। সংসারের সকল প্রকার খরচ পত্র জ্যেষ্ঠ দুর্গাশঙ্কর সর্ব্বদা মায়ের উপদেশ লইয়া নির্ব্বাহ করেন। সেই সাধারণ তহবিল হইতে পূজাপার্ব্বণ, লৌকিকতা, কন্যার বিবাহ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার খরচই নির্ব্বাহিত হয়। এমন কি বধূদিগকে যে গহনা কাপড় দেওয়া হয় তাহাও দুর্গাশঙ্কর দেন। সকল বিষয়েই দাদা দুর্গাশঙ্করের উপর ভাইদের সম্পূর্ণ নির্ভর। দাদাও তাঁহাদিগকে নিজের প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। যেমন দাদা তেমন তাঁহার গৃহিনী। তিনিও নিজের কন্যার বিবাহ আগে না দিয়া হরিশঙ্করের কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্য বেশী ব্যস্ত। বলা বাহুল্য শাশুড়ীর অভাবে তিনিই সংসারের কর্ত্রী হইবেন এবং তিনি উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা কর্ত্রী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। কালীশঙ্করের একটী পুত্রের মৃত্যু হইলে, জ্যেষ্ঠ দুর্গাশঙ্কর শোকে যতটা অধীর হইয়াছিলেন কালীশঙ্কর ততটা হন নাই, কারণ সেই বালকটী তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় জ্যেষ্ঠতাতের নিকটে ছিল। আবার দুর্গাশঙ্করের কন্যা পটলী তাহার ছোট কাকীমার যত বাধ্য, আর কাহারও তত বাধ্য নহে।

এই চিত্রটী কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। এক সময়ে প্রায় অধিকাংশ গ্রামে এইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার দেখা যাইত। তখনও আমাদের জীবনে স্বার্থপরতারূপ ঘুণ ধরে নাই। নিজে ভাল খাইব, নিজে ভাল পড়িব, নিজের স্ত্রীকে ভাল গহনা কাপড় দিব। নিজের ছেলে দুধ খাইবে, তুমি ভাই তোমার পথ দেখ ও তোমার স্ত্রী পুত্রের সহিত আমার সম্পর্ক কি — ইত্যাদি ভাব তখনও সমাজে প্রবেশ করে নাই। এখনও এইরূপ পরিবার যে সমাজে না আছে তাহা নয়, তবে তাহাদের সংখ্যা খুব কম, এবং ক্রমেই কমিতেছে।

(২) এই সঙ্গে আর একটী চিত্রের কল্পনা করুন। মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, হরেন্দ্র তিন ভাই। মহেন্দ্র বড় উকীল, দেবেন্দ্র ডাক্তার ও হরেন্দ্র ৩০৲ টাকা মাহিনার কেরাণী। তিন ভাই এক বাড়ীতেই স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাস করেন। সকলের আহারাদি এক সঙ্গে হয়, কিন্তু তিন ভাইয়ের তহবিল পৃথক পৃথক। তবে ভ্রাতাদের মধ্যে কোন অসদভাব নাই, বরং বিলক্ষণ ভালবাসা আছে। হরেন্দ্রের রোজগার কম বলিয়া আর দুই ভাই সাংসারিক খরচ বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন না, বরং তাঁহার একটী কন্যার বিবাহের সময় অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার একটী পুত্রকে কলিকাতার মেসে রাখিয়া পড়ার সাহায্য করিয়া থাকেন। এই তিন ভাইয়ের স্ত্রীরা নিতান্ত আদর্শ গৃহিণী না হইলেও কোন রকমে মিলিয়া মিশিয়া আছেন। মধ্যম ভ্রাতা দেবেন্দ্রের স্ত্রী ললিতা কিছু মুখরা, নিজে বেশী কাজ কর্ম্ম করিতে চান না। হরেন্দ্রের স্ত্রী কমলাকেই বেশী করিয়া খাটাইয়া লইতে তিনি মজবুত। কিন্তু কমলা স্বামীর অস্বচ্ছলতা মনে করিয়া সে সব নীরবে সহ্য করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রের স্ত্রী সৌদামিনীর একটী ছেলে মারা যাওয়ার পর হইতে তিনি সংসারের বড় ধার ধারেন না। মোট কথা এ সংসারে ঘুণ প্রবেশ করিয়াছে, ইহার ভাঙ্গিবার বেশী বিলম্ব নাই।

(৩) আর একটী সংসারে অমল, কমল ও বিমল তিন ভাই। তিনটীই ইংরেজী শিক্ষিত যুবক। অমল স্কুলে মাষ্টারি করেন, কমল রেল আফিসের কেরাণী, বিমল পুলিসের দারগা। তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতা এখন সংসারের কর্ত্রী, কিন্তু তিনি কমলকে বেশী ভালবাসেন মনে করিয়া অন্য দুই ভাই তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন। ভাইদের প্রত্যেকের তহবিল পৃথক পৃথক। তবে সংসার খরচের জন্য মায়ের হাতে সকলে কিছু কিছু টাকা দেন, তাহা ছাড়া খোরাকী খরচ কোন প্রকারে চলিয়া যায়। বিমল পুলিসের দারগা বলিয়া তাঁহার স্ত্রী চপলার গায় গহনা ধরে না। কমলেরও দুই পয়সা উপরি পাওয়ানা আছে, সেজন্য স্ত্রীকে মোটামুটী দুই চারিখানি গহনা দিয়াছেন। কিন্তু অমল্ বেচারি স্কুল মাষ্টারি করে, মাত্র ৪০৲টী টাকা মাহীনা, তাহার স্ত্রীর গায় বেশী গহনা কোথা হইতে আসিবে? তাহার উপরে আবার অমলের তিনটী কন্যা, তাহার একটীকে এই বৎসরের মধ্যে পার না করিলে চলিবে না। এই সব কারণে অমলের স্ত্রী সুরবালা

সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ। পূজা আসিয়াছে, তিন ভাই নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র কন্যাদের জন্য নিজ নিজ অবস্থানুসারে কাপড় জামা কিনিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধা জননী কাহারও ভাগে পড়েন নাই বলিয়া তাঁহার ভাগ্যে একখানাও নূতন বস্ত্র জুটিল না। অমল ও বিমল তাঁহাকে নূতন কাপড় দিবেন কেন—তিনি যে কমলকে বেশী ভালবাসেন। কমল মনে করিলেন যদি তিনি মাকে নূতন কাপড় কিনিয়া দেন তবে অন্য দুই ভাই মনে করিবে তিনি মাকে ঘুস দিতেছেন। আবার তাঁহার স্ত্রী সুরমাও এখানে অপব্যয়ের পক্ষপাতিনী নহেন। আজ পূজার ষষ্ঠী। ছোট ভাই বিমলের মেয়ে সরলা সিল্কের জ্যাকেট্ পরিয়া বেড়াইতেছে; বড় ভাই অমলের ছোট মেয়ে তারীর গায়ে একটা সাধারণ সাদা জামা। সে সরলার সিল্কের জ্যাকেট্ দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের আঁচল ধরিল। তাহার মা অমনি তাহার পৃষ্ঠে এক চপটাঘাত করিলেন। সে গিয়া তাহার ঠাকুরমার কাছে নালিশ করিল, তিনি তখন ছোট বৌ চপলার আক্কেলের নিন্দা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কেন তিনি বাটীর অন্য ছেলে মেয়েদের সম্মুখে নিজ কন্যাকে সিল্কের জামা পরাইয়া দিলেন। ছোট বৌও ছাড়িবার পাত্রী নহেন—বিশেষতঃ তিনি দারগার গৃহিণী, আর তাঁহার গায়ে সোণার গহনা ধরে না। এইরূপে পূজার শুভ ষষ্ঠীর দিন বাড়ীতে এক মহা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। তাহার ফলে সে দিন আর উনানে হাঁড়ি চড়িল না। সকলেই নিজ নিজ পয়সায় বাজার হইতে খাবার আনাইয়া খাইলেন। কেবল জুটিল না সেই বৃদ্ধা মায়ের কপালে কিছু—কারণ কেহই রাগ করিয়া তাঁহাকে খাইতে বলিল না। তিনিও অভিমান করিয়া কিছু খাইলেন না।

বলা বাহুল্য এই সংসার হইতে লক্ষ্মী অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই একান্নবর্ত্তী পরিবার যত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় ততই মঙ্গল। যেখানে হৃদয়ের মিল নাই, সেখানে একটা লোক দেখান বাহিরের মিল রাখিয়া কোন ফল নাই। লাভের মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব, কলহ ও ঘোরতর অশান্তি।

পাঠক বর্গ এখন বিবেচনা করুন, আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে এই তিনটী চিত্রের কোন্‌টী অধিক? আমি যত দূর জানি এই তৃতীয় চিত্রই আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিক হইয়া পড়িয়াছে—হয়ত শত করা ৭০টী; ২য় চিত্র শত করা ২০টী এবং প্রথম চিত্র শতের মধ্যে হয়ত পাঁচটী মিলিবে কিনা সন্দেহ। পল্লীগ্রামে হয়ত কিছু বেশী আছে, সহরে অনেক কম। সুতরাং যাহাকে প্রকৃত একান্নবর্ত্তী পরিবার বলা যাইতে পারে তাহার সংখ্যা নিতান্তই কম হইয়াছে; এবং যে দুই চারিটী আছে তাহাও ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে।

কিন্তু ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয়? ইহাতে বুঝা যায়, যে সকল মনুষ্যোচিত গুণ থাকাতে আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই থাকিতে পারি—যেমন স্নেহ, প্রীতি, সংযম, সহিষ্ণুতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য এবং পশু হইতে বিভিন্ন হয় আমরা সেই সকল গুণ ক্রমেই হারাইতে বসিয়াছি। আমরা ইংরেজীতে এম, এ, বি এল্‌ই পাশ করি, বা সংস্কৃতে বেদান্ততীর্থই হই, আমাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে না। আমরা স্বদেশ প্রীতি জাগাইতে বসিয়াছি অথচ আমাদের মধ্যে স্বজন প্রীতি দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। ইহা কি আমাদের একান্ত ভণ্ডামি নহে?

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন সংপ্রতি "গৃহশ্রী" নামক একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। তাহাতে তিনি আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। আমি সকলকে তাঁহার সেই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তিনি বলেন এই একান্নবর্ত্তি পরিবারের প্রথম দুইটা দিক্ আছে—একটা আর্থিক অন্যটী সাত্বিক বা পারমার্থিক। তিনি লিখিয়াছেন:—

"আত্মীয় স্বজন লইয়া আমাদের ঘর করুনা, তাহাদের কেহ বা অকর্ম্মা, কোন কাজই করে না, তাস খেলিয়া বাঁশী বাজাইয়া বেড়ায়; অনাথা দূর আত্মীয়া বিধবা হয়ত তাহার বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া আপাততঃ গলগ্রহের মত হইয়া আছে; তিনি জপের মালায় অঙ্গুলি

ঘুরাইতেছেন ও আতপ চাউল, কাঁচকলা লইয়া নারাচারা করিতেছেন। অনেক সময় বিবাদের কথায় সমস্যা পূরণ করিয়া এ পক্ষ বা সে পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন। কিন্তু যখন গৃহিণী পারিলেন না, তখন তিনি একাই একশ হইয়া রাঁধিতেছেন; আমিষ ঘরের রান্না সারিতে সারিতে বেলা হেলিয়া পড়িয়াছে, তারপর প্রসন্ন মুখে নিজের উনুনে আগুন ধরাইতেছেন। যে ছোঁড়া তাস খেলিয়া বাঁশী বাজাইয়া কাল কাটাইতেছিল, সে বাড়ীর কাহারও অসুখের সময় রাত্রি তিনটার সময় ডাক্তার ডাকিয়া বেদানা দাড়িম কিনিয়া আনিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত কাজ প্রফুল্ল মনে করিতে লাগিল,—কোন পরিবারে কেহ মরিলে এইরূপ অকর্ম্মা লোকেরাই শবদাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। বিপদের সময় দেখা যায়—ইহারা গৃহস্থের কিরূপ বন্ধু! আজও টাকা খরচ করিয়া ভাল অবস্থার লোক যাহা করিতে না পারে,—নিঃস্বার্থ ভাবে ইহারা তাহা করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা যে সকল উপকার পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় ইহাদের পাছে খরচ অতি সামান্য।"

ইহা হইল আর্থিক সুবিধার কথা। ভবিষ্যতে লাভের প্রত্যাশায় বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার। এই হিসাবে প্রত্যেক যৌথপরিবারকে এক একটা Joint stock company (যৌথকারবার) বলা যাইতে পারে। যেখানে স্নেহের বন্ধন শিথিল হইয়াছে, সেখানে স্বার্থের বন্ধনে আমরা যৌথপরিবারে আবদ্ধ থাকিতে পারি। আমার প্রথম চিত্রে ভ্রাতাদের মধ্যে স্বার্থের বন্ধন অপেক্ষা স্নেহের বন্ধন প্রবল। দ্বিতীয় চিত্রে স্নেহের বন্ধন অপেক্ষা স্বার্থের বন্ধন প্রবল। মহেন্দ্র ও দেবেন্দ্র হরেন্দ্রের কন্যার বিবাহে সাহায্য করেন কেন? আর তাঁহার পুত্রকেই বা পড়ার খরচ দেন কেন? অবশ্য সকলে জানেন অর্থ কাহারও চিরস্থায়ী নহে, লক্ষ্মী চিরদিনই চঞ্চলা। আজ যিনি খুব স্বচ্ছল অবস্থায় আছেন, দুই দিন পরে হয়ত উঁহাকে অভাবগ্রস্ত হইতে হইবে। কে জানে এমন দিন আসিতে পারে যখন হরেন্দ্রের সেই পুত্রটীই এ পরিবারের একমাত্র অবলম্বন হইবে এবং তাহার উপার্জ্জনের উপরই অন্য সকলকে নির্ভর করিতে হইবে? সুতরাং এইসব ভবিষ্যতের লাভ ক্ষতি গণনা করিয়াও আমাদিগের যৌথপরিবারভুক্ত থাকা উচিত এবং তাহাতে যথাসাধ্য টাকা লাগান (invest করা) উচিত। তবে এরূপ লোকও অনেক আছে যাহাদের কিছুমাত্রই দূরদৃষ্টি নাই—বর্ত্তমানের লাভ ক্ষতিই তাহাদের একমাত্র গণনার বিষয়। আমার তৃতীয় চিত্র তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অমল কমল বিমলের না আছে স্নেহের বন্ধন, না আছে স্বার্থের বন্ধন। সুতরাং এরূপ স্থলে যৌথকারবারের ন্যায় যৌথপরিবারও একদিনের তরেও চলিতে পারে না।

দীনেশ বাবু বলেন যৌথপরিবারের একটা সাত্ত্বিক দিকও আছে। "বহু আত্মীয়ের সঙ্গে একত্র থাকায় যে আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও উদার ভাবের চর্চ্চা করিতে হয়—তাহাতে মানুষ উন্নত হয় ও ভগবানের বেশী সম্মুখীন হয়। কোন কোন সংসার ভোগের, কোন কোন সংসার ত্যাগের। শুধু পতিপুত্র লইয়া যাঁহারা সংসার করেন, তাঁহারা যে ত্যাগশীল হইতে পারেন না, একথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু সেই যৌথপরিবারই সেই ত্যাগের প্রকৃত ক্ষেত্র। যেখানে ত্যাগ নাই, উচ্চ ধর্ম্মভাব নাই, সেখানে যেন কেহ যৌথপরিবার গড়িবার বিফল প্রয়াস না পান।"

ঠিক কথা। আমার তৃতীয় চিত্রই এই কথার জলন্ত উদাহরণ। সেখানে না আছে ত্যাগ, না আছে অন্য কোন ধর্ম্মভাব—কেবল ভোগলিপ্সা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ। আমার মতে যে পরিবারে এরূপ স্বার্থপরতা ও ভোগলিপ্সা প্রবল, সেখানে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়াই মঙ্গল।

দীনেশ বাবু পরিশেষে বলিয়াছেন—"কিন্তু এ আদর্শটি যাহাতে রক্ষা পায়—তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। অলসতার প্রশ্রয় না দিয়াও যৌথ-পরিবার বহু স্বগণের সমবেত চেষ্টায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন ধর্ম্মভাবের সঙ্গে এখন কার কর্ম্মের আদর্শের যদি যোগ করা যায়—তবে ত্যাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যৌথ-পরিবার নবজীবন লাভ করিতে পারে।

কিন্তু যৌথ-পরিবারের বন্ধন ঠিক রাখিতে হইলে

স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ দরকার। আমি অবশ্য এখনকার ফার্ষ্টবুক-দুর্গেশনন্দিনী পড়া, উলের টুপী বুনান, হার্ম্মোনিয়াম-বাজান স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতেছি না। আধুনিক সময়ের উপযোগী এরূপ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু-রমণীর মনুষ্যত্ব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ের শিক্ষা— যে শিক্ষা দ্বারা পরকে আপন করিয়া লওয়া যায় এবং যাহার ফলে সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয় - এবং যে সমদর্শনের দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্যি লাভ করা যায়, আমি সেই শিক্ষার কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিয়া অনেক রমণী এইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন। তাহার ফলে তাঁহারা সংসারকে সুখী করিতে পারিতেন এবং নিজেরাও ধন্য হইতেন। তাঁহারা যেরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিয়া উচ্চশিক্ষা দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিতেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারও তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া টিকিয়া থাকিত। দীনেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থে এই সকল মহীয়সী রমণীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমি তাহা এস্থানে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠক বর্গকে উপহার দিতেছি —

"আগেকার দিনে ঘরে ঘরে সেইরূপ লক্ষ্মীরা ছিলেন। তাঁহারা উলের টুপি বুনিতে জানিতেন না, বা ফার্ষ্টবুক হইতে দু'ছত্র ইংরেজী পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা বাড়ীর সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং সকলকে ভালবাসিতেন ; তাহারা ক্ষুধার সময় অন্ন দিতেন, গালি দিয়া বিদায় করিতেন না ; বাড়ীর কাহারও কোন কষ্ট হইলে তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন এবং আদর ও উপদেশে সেই ব্যথা ঘুচাইতে চেষ্টা করিতেন ; খাইবার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন, কাহার কি অসুখ করিয়াছে, এবং কে কোন্ জিনিষ খাইতে ভালবাসে, তাহা হয় ত সেই ব্যক্তি নিজে যতটা না জানে, গৃহিনী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানিতেন। প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহারা খাটাইতেন না ; যে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে তাহাকে তাড়া দিতেন না ; যে একটু শান্তির জন্য গৃহে ফিরিত, তাহাকে দ্বিগুণ অশান্তির মধ্যে ফেলিতেন না। তাঁহারা সরল কথায় দোষ দেখাইতে দ্বিধা করিতেন না ; যে অন্যায় করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাসন করিতেন, কিন্তু অন্যায় রূপ শাসন করিতেন না— যে শাসনে বিগড়াইয়া যায়, সে শাসন করিতেন না ; এবং যে আদরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ মাটি হয়, সেরূপ আদর দেখাইতেন না। ভাঁড়ার ঘরের তাঁহারা লক্ষ্মী ছিলেন, রান্নাঘরের তাঁহারা অন্নপূর্ণা ছিলেন, এবং পরিবেশন কালে তাঁহারা দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহারা নিজের সুখ খুঁজিতেন না ; নিজের দুঃখকে যতটা সরাইয়া রাখা সাধ্য তাহা রাখিতেন, এবং পরের দুঃখকে নিজের দুঃখের মত মনে করার দরুণ সকলকে আপন করিতে পারিতেন। আমি কি খাইব, কি পরিব, ও সেখরার বাড়ীর গহনার কার্য্য কিরূপ হইবে, বাজারে নূতন ধরণের কোন্ বহুমূল্য সাড়ী আসিয়াছে। স্বামীর কাছে দিনরাত্র তাহারই বায়না ধরিয়া থাকিতেন না। বাড়ীর সকলে সুখী হইলেই তাঁহারা সুখী হইতেন। সকলের সেবায় প্রাণপণে নিজকে নিবেদন করিয়া দিয়া - সেই সেবায় সকলে সন্তুষ্ট হইলে তিনি তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরস্কার মনে মনে করিতেন। স্বামীর প্রতি ভালবাসা লইয়া তাঁহারা আড়ম্বর করিতেন না, সেই প্রেম একান্ত ভাবে গুপ্ত থাকিত ; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রেম ধরা পড়িয়া যাইত, নিজের ছেলেদের নিদারুণ শোক উপেক্ষা করিয়া বিবাহের সময় যেরূপ নববস্ত্র পরিয়া সিন্দুর মাথায় স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ নূতন বস্ত্র পরিয়া সিন্দুর মাথায় তিনি স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে অগ্নিশয্যা আশ্রয় করিতেন। বৈধব্যেও তাঁহারা পাতিব্রাত্য ও ধর্ম্মের কঠোরতা অবলম্বন করিয়া এবং ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে উন্নত জীবন দেখাইতেন, তাহার তুলনায় এখনকার নভেল পড়ায় উৎপন্ন মনের সাময়িক উত্তেজনা গুলি একান্ত খেলো মনে হয়। তাঁহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া রান্না ও পরিবেসনাদি করিয়া তৃতীয় প্রহর বেলার পর খাইতে বসিতেন, এমন সময় অতিথি আসিল—আর নিজের ভাতের থালাটি ধরিয়া তাহাকে দিয়া হাসিমুখে উপবাস করিয়া রহিলেন, হয়ত বাড়ীর কেহই তাহা জানিল না। কিন্তু যিনি লোকের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা উহা নিশ্চয়ই তাঁহার দয়ার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

"কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে এসকল স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচারের কথা, ইহাতে প্রশংসার কথা কি আছে? পুরুষেরা যে একান্ত স্বার্থপর ইহাতে তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেখানে বাধ্য বাধকতা নাই, এবং প্রেমের জন্য কষ্ট স্বীকার করা হয় সেখানে যে কষ্ট তাহা তপস্যা; তাহাতে জীবন উন্নত হয়, সেই কষ্ট খুব বেশী হইলেও তাহা অসহনীয় হয় না, কারণ তাহা স্নেহ মমতার কষ্ট। স্নেহের জন্য মা কি না করিয়া থাকেন? তাহাতে কি তিনি কষ্টবোধ করেন? বরং তাহা সুখের, সেই সেবাতে আমাদের জীবন সফল হয় এবং ইহা আনন্দ ময়ের কাছে আমাদিগকে লইয়া যায়। যিনি বৃহৎ সংসারের মাতৃরূপিনী, তিনি মাতার মতই স্নেহের সহিত বুক পাতিয়া সেই সংসারের দুঃখ কষ্ট সহিয়া থাকেন।"

এইরূপ আদর্শ গৃহিনীই একান্নবর্ত্তী পরিবারের মেরুদণ্ড স্বরূপ। যদি আমরা রমণীদিগকে এইরূপ উচ্চাঙ্গের হৃদয়ের শিক্ষা দিতে পারি, তবেই আমাদের যৌথ পরিবার টিকিবে এবং আমাদের জাতীয় জীবন সফল হইবে, নচেৎ তাহা রক্ষা করার আর উপায় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কৃপণ।

এক পরিবারে, দুই সহোদর
আছিল কৃপণ বড়,
জ্যেষ্ঠ হ'তেও, কনিষ্ঠ একটু
সেয়ানা আছিল দড়।
একদা রাত্রিতে, দূর এক গ্রামে
আহারের নিমন্ত্রণে—
পথ দিল দাদা; কিন্তু আধাপথে
পড়িল তাহার মনে—
বাড়ী হ'তে চলি, আসিবার কালে
আলোটা রয়েছে ঘরে।
আসেনি নিবায়ে— মনে হলো যেই
ভেঁই সে দাঁড়ায়ে পড়ে।
ভাবি চিন্তি দাদা, নিবাতে প্রদীপ
আসিলা গৃহেতে পুনঃ,
বিস্ময়ে অবাক্, কহে ছোট ভাই
"ফিরে এলে দাদা কেন?"
দাদা কহে "ভাই, বয়স হয়েছে
মনে নাহি থাকে ভালো?
চলিয়া গিয়াছি, করি মস্ত ভুল—
জ্বালায়ে রাখিয়া আলো!
আধাপথে গিয়ে মনে হলো যেই
প্রদীপ রয়েছে ঘরে,
বৃথায় পুড়িবে, এতগুলি তেল—
ভাবিয়া ফিরিনু পরে।"
ভাই হেসে কহে, "আমি কি তোমার
নহি ছোট ভাই, দাদা!
বিশ্বাস বুঝি, নাহিক আমারে
দেখিয়া বনেছি গাধা।
যেইক্ষণে তুমি, ঘর হতে দাদা
বাহিরে দিয়েছ পা,—
সেইক্ষণে তব, যোগ্য ছোট ভাই
নিবায়ে দিয়েছে তা।
পাঁচ সিকা দিয়ে— দিব্যি চটী জোড়া,
পরশ্ব এনেছি, আহা,
সামান্য লাগিয়া, ডবল হাঁটিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলিলে তাহা!
সম্মুখেতে দাদা মশাটী দেখিলে,
পাছের খোজ না নিলে,
এখন দেখিনু, বেহিসাবী দাদা,
তোমার বাড়া না মিলে।"
মুচ্‌কি হাসিয়া, গদ্‌গদ্ ভাবে
দাদা কহিলেন, "ভাই
ভাবিও না মোরে, অত খানি বোকা,
আমার দোসর নাই।
তুমি আমি ভাই, দুজনি সমান,
একবৃন্তে জোড়া ফুল,
তবে কেন ভাই, দাদার তোমার
হইবে এমন ভুল?

দেখনা আমার, বগলেতে গোঁজা
রয়েছে কাগজে মোড়া—
পাঁচটী সিকায়, আনীত তোমার
যত্নের সে চটী জোড়া।”
ভাবে ঢল ঢল, ছোট ভাই ছুটে
পড়িল দাদার পায়.
হেসে রসে গ'লে, দাদাও তখন
কোলেতে নিলেন তায়।
অবাক্ সকলে, দেখিল যখন,
কেহই নহেক কম,
বিষম ফাঁপড়ে, পড়িয়া কবির
আটকে রহিল দম!

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন বৃটন জাতির সহিত ভারতীয় আর্য্যজাতির সম্বন্ধ।

বৃটনে কেল্‌টিক জাতিদিগের আগমন সম্বন্ধে ঋজ সাহেব বলেন যে 'গো-ঈডেল' নামে এক কেল্‌টিক শাখা প্রথমে বৃটনে আগমন করে; তাহাদের পর 'ব্রাইথন' (Brython) শাখা আগমন করে। ক্রমশঃ এই দুই শাখা মিলিয়া যায়। 'গো-ঈডেল' নাম এক্ষণে 'গেল' নামে পরিণত হইয়াছে। (১)

গো-ঈডেল শব্দে আমরা গো ও ঈড্ শব্দ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে আমরা ধেনুমীড়ে শব্দ প্রাপ্ত হই। (২) এই দুই শব্দের মধ্যে যে অত্যন্ত মিল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব গো-ঈডেল জাতি প্রাচীন আর্য্য দিগের সহিত কোন প্রকারে সম্পর্কিত ছিল, অনুমান করিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। "ব্রাইথন্" শব্দ হইতে বৃটন এবং উভয়ে বৃত্রহন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন মনে করি। 'বৃত্রহন্তা' আখ্যা আর্য্য জাতির অত্যন্ত প্রিয়। সেই জন্য বৃটনদিগকে জয় করিয়াও এংলোস্যাক্সনগণ বৃটন নাম ত্যাগ করেন নাই। এখনও ইংরাজগণ বৃটন নামের জয় গান করেন।

প্রাচীন বৃটনদিগের পুরোহিতগণ ড্রুঈড নামে বিখ্যাত। ড্রুঈড শব্দ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা দ্রু ও ঈড। দ্রুস্ শব্দে গ্রীক ভাষায় ওক বৃক্ষ বুঝায় এবং সংস্কৃতে দ্রু অর্থে দ্রুম বা বৃক্ষ।

দ্রবন্নো বন্বন্ ক্রত্বা............। ঋগ্বেদ ৬।১২।৪

দ্রুঃ দ্রুমঃ স এব অন্নং যস্য স তথোক্ত অতএব বন্বন্ বনানি সংভজন্ ক্রত্বা ক্রতুনা।

অর্থঃ—বৃক্ষ যাহার অন্ন (অর্থাৎ অগ্নি) বনসকল ভক্ষণ করিয়া যজ্ঞদ্বারা...।

ঈড অর্থে স্তব করা বা পূজা করা। প্রধানতঃ অগ্নির স্তবকেই ঈড বলে। যথা—

অগ্নিং হোতার মীডতে যজ্ঞেষু মনুষো বিশঃ। ৬।১৪।২

অর্থঃ—মনুষ্য প্রজাগণ হোতা অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করে।

অতএব ড্রুঈড্ শব্দ দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে বৃটন দিগের পুরোহিতগণ অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করিয়া স্তব করিতেন। ইঁহাদের বিষয় আমরা জুলিয়াস সীজারের লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হই। নিম্নে ইহার সারাংশ প্রদান করা যাইতেছে। পাঠক এই বিবরণে দেখিতে পাইবেন ভারতীয় ঋষিদিগের মত এই ড্রুঈড সম্প্রদায় তাঁহাদের দেব-স্তোত্র বা বেদ লিপিবদ্ধ করিতেন না। মুখে মুখে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন।

সীজারবর্ণিত ড্রুঈড জাতি।

সীজার বৃটনদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "তাঁহার সময়ে ইংলণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ঐ সকল রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজা দ্বারা শাসিত হইত। সময়ে সময়ে কোন রাজা অপর সকলের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেন। ঐ দেশে ড্রুঈড্ নামে একটী প্রতাপশালী পুরোহিত সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল। ইঁহারা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজা বা প্রজা যে কেহ যজ্ঞ করিতেন, তাঁহারাই সে যজ্ঞের

---

(১) Historian's History of the World England vol, I

(২) প্রবক্তুভ্যো দূতমিব বাচমিষ্য উপস্তিরে শ্বৈত্রীং ধেনুমীড়ে। ৪।৩৩।১

অর্থঃ—ঋভুদিগের নিকট দূতের মত বাক্য প্রেরণ করি। সোমের জন্য পয়োযুক্ত ধেনু প্রার্থনা করি।

ঋত্বিক্ হইয়া হব্য দান করিতেন। নানা প্রকার প্রাকৃতিক চিহ্ন দ্বারা তাঁহারা ভবিষ্যৎ শুভাশুভও নির্দ্ধারণ করিতেন। দেশের বহুযুবক তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্ম আগমন করিত। গল জাতির নিকটেও তাঁহারা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। রাজা প্রজার মধ্যে প্রায় সকলপ্রকার বিবাদই তাঁহারা মীমাংসা করিতেন। কেহ অন্যায় কার্য্য করিলে, কেহ অপরের দ্বারা নিহত হইলে, উত্তরাধিকারসত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, বা জমির সীমা সংক্রান্ত বিরোধ হইলে, ড্রুইড গণই তাহার বিচার করিয়া পুরস্কার বা শাস্তি বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাঁহাদের বিচার অমান্য করিলে, তাঁহারা তাহাদের যজ্ঞ করিতেন না। এইদণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ এইরূপে সমাজ পরিত্যক্ত লোক দেবহীন ও পাপী বলিয়া পরিগণিত হইত। পাছে তাহার সহিত বাক্যালাপ ও সহবাসে উহার অনুরূপ কোন দণ্ড ভোগ করিতে হয় এই ভয়ে সকলে উহার সংসর্গ ত্যাগ করিত। এই ব্যক্তির কেহ অনিষ্ট করিলে সে কোনরূপ প্রতীকারই প্রাপ্ত হইতনা এবং সকল প্রকার সম্মানার্হ পদবী লাভে বঞ্চিত থাকিত। ড্রুইডদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থাকিতেন। তিনিই উঁহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিম্নপদস্থ ব্যক্তিই ঐ পদ প্রাপ্ত হইতেন। যদ্যপি কতকগুলি সমান পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুকালে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে সাধারণের মতামত লইয়া একজন নির্ব্বাচিত হইতেন। কখনও কখনও উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ বাধিত। ... ... অনুমান হয় ড্রুইড্ সম্প্রদায় বৃটনেই প্রথম গঠিত হইয়াছিল। পরে এই দেশ হইতে গলদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। অদ্যাপিও যাঁহারা ইঁহাদের বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রায়ই এই দ্বীপে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিয়া থাকেন। ড্রুইড্গণকে কোন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইত না। অপর প্রজার ন্যায় তাঁহাদিগকে কর দিতে হইতনা। নাগরিক বা সামরিক কার্য্যভার তাঁহারা বহন করিতেন না। ড্রুইড্দিগের এই সকল সুবিধা ছিল বলিয়া অনেকেই স্বেচ্ছায় তাঁহাদের মত জ্ঞানলাভে নিযুক্ত হইত। অনেকে শিক্ষা লাভের জন্য পিতামাতা ও স্বজন দ্বারা তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইত। ছাত্রগণকে বহুসংখ্যক শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে হইত। এই নিমিত্ত কেহ কেহ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষালাভে নিযুক্ত থাকিত। ড্রুইডগণ ঐ সমস্ত শ্লোক লিখিয়া রাখা বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতেন। সাংসারিক অপরাপর বিষয়ে এবং সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিষয় কর্ম্মে তাঁহারা গ্রীক লিপি ব্যবহার করিতেন। মনে হয় তাঁহাদের এই পদ্ধতি অবলম্বন করিবার দুইটী কারণ ছিল। তাঁহাদের জ্ঞান সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় এইরূপ অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিলনা; অথবা তাঁহারা মনে করিতেন যে শ্লোক সমূহ লিপিবদ্ধ করিলে ছাত্রগণ স্ব স্ব স্মৃতিশক্তির উন্নতি সাধনে তেমন তৎপর হইবে না। বাস্তবিক দেখা যায় যাহারা লিখিত পুস্তকের উপর নির্ভর করে, তাহারা পরিশ্রম পূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করিতে চায় না, তাহাদের স্মৃতিশক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

ড্রুইড্দিগের মতে মানবাত্মার ধ্বংশ নাই, মৃত্যুর পরআত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করে। তাঁহারা মনে করিতেন যে মনুষ্যকে বীরকর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার যত প্রকার উপায় আছে তাহাদের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারণ ইহাতে মৃত্যু ভয় দূর হয়। নক্ষত্র ও তাহাদের গতিবিধি, স্বর্গ ও পৃথিবীর পরিমাণ, স্বভাবের প্রকৃতি, এবং অমর দেবতাদিগের শক্তি ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক বক্তব্য ছিল এবং এই সমস্ত জ্ঞানই তাঁহারা শিষ্যদিগকে প্রদান করিতেন।"

ইউরোপ মহাদেশ হইতে কেল্‌টদিগের বৃটনে আগমন যদ্যাপি সত্য হয়, তাহা হইলে বৃটন হইতে গল্‌দেশে ড্রুইড্ পদ্ধতির প্রচলন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ড্রুইড্ পদ্ধতি সীজারের কালে গলদেশে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। সেখানে পুরোহিতদিগের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া রাজশক্তি প্রবল হইতেছিল। কিন্তু বৃটন সভ্যতা অপেক্ষাকৃত হীন থাকায় এই প্রাচীন পদ্ধতি তখনও তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গ্রেট্ বৃটনের নানাস্থানে ও ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম ভাগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডবেষ্টিত বহুস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিকাংশ স্থলে বেষ্টনী গোলাকার বলিয়া উহাদিগকে প্রস্তর চক্র নাম দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকে অনুমান করে উহারা ড্রুঈড্ উপাসনার স্থান ছিল। ড্রুঈড্ শব্দ গ্রীক্ ড্রস্ শব্দ (অর্থাৎ ওকবৃক্ষ) হইতে উৎপন্ন বলা হয়। [Early Britain ; The story of the Nations Series হইতে অনুবাদিত]

বৃটনের ড্রুঈড্ দিগের সম্বন্ধে আরো জানা গিয়াছে যে তাহারা নগর ও গ্রাম হইতে দূরে ওক বৃক্ষের বনে বাস করিতেন। কোন ওক বৃক্ষে "মিসল্‌টো" নামে এক প্রকার লতা জন্মাইতে দেখিলে ড্রুঈড্‌গণ সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিতেন। প্রধান ড্রুঈড্ সুবর্ণময় অস্ত্র দ্বারা ঐ লতা ছেদন করিতেন ; দুইটী শ্বেত গাভীকে ঐ বৃক্ষতলে বলি দেওয়া হইত। পরে ভূরি ভোজন করাইয়া যজ্ঞ সমাধা হইত। (১)

মিসল্‌টো।

সার নরম্যান লকিয়ার তাঁহার Stone-henge নামক গ্রন্থে Mistletoe ও তাহার পূজা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধার করা যাইতেছে।

"মিসল্‌টো ও উহার পূজা এবং ওক বৃক্ষ সম্বন্ধে বহু প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে মিসল্‌টো ওক বৃক্ষের উপর জন্মে কি, না, এই বিষয় লইয়া অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে। এই লতা হারফোর্ড সায়ারে জন্মে কি না এই সম্বন্ধে Dr. Henry Ball এবং Quarterly Review এর লেখক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। Quarterly Review এর লেখক বলেন যে বর্ত্তমান কালে মিসল্‌টো ওক বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার মতে ড্রুঈড্ দিগের মিসল্‌টো ইংলণ্ডের বৃক্ষ ও কানন জাত Viscum-album লতা নহে। দক্ষিণ ইয়োরোপের ওক বৃক্ষে যে Lorenthus-Europaeus লতা জন্মে তাহাই সম্ভবতঃ ড্রুঈড্ দিগের মিসল্‌টো ছিল। বৃটিস Meusium এর Murray সাহেব ও অধ্যাপক Farmer এর নিকট হইতে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে Viscum-album নামে লতা উত্তর নরওয়ে ও উত্তর রুসিয়া ভিন্ন সমগ্র ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতের ৩০০০ ফিট হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। Viscum-aureum লতা—উহা Lorenthus-Europaeus নামে ও পরিচিত—সাধারণ মিসল্‌টোর (অর্থাৎ Viscum-album এর) নিকট আত্মীয় ; Viscum-aureum ইটালীর প্রায় সকল স্থলের ওক বৃক্ষে জন্মায়। ভারতীয় উদ্ভিদ জগতে প্রায় পঞ্চাশ প্রকার Lorenthus দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু Lorenthus-Europaeus জাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। Viscum-aureum লতার শাখা সুবর্ণ বর্ণের ; ইহাই ভার্জিল বর্ণিত ওক জাত Aureum Frondeus ও Ramus Aureus। ড্রুঈড্‌গণ বৃটনে গমন করিবার পূর্ব্বে যে দেশে বাস করিত তথায় Viscum-Aureum জন্মিত। তাহারা বৃটনে গমন করিয়া আপেল বৃক্ষোৎপন্ন Viscum-album নামক মিসল্‌টো ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। ডেভিস সাহেব তাঁহার "Celtic Researches" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ওক বৃক্ষের পরেই আপেল বৃক্ষ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ওক বনের সন্নিকটে আপেল উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইত। সম্ভবতঃ পুরোহিতগণ মিসল্‌টো যজ্ঞ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আপেল বৃক্ষ হইতে ওক বৃক্ষে ঐ লতা বাঁধিয়া রাখিত। জুন মাসে যখন ওক বৃক্ষ প্রচুর পত্র শোভিত হইত তখন একবার মিসল্‌টো যজ্ঞ হইত। পুনরায় ডিসেম্বর মাসে যখন ঐ পরগাছা চন্দ্রালোকে শোভন দৃশ্য হইত, তখন উহার দ্বিতীয়বার যজ্ঞ হইত। এই দুইকালে সূর্য্যক্রান্তি বিন্দুতে অবস্থান করিত।"

Lockeyer's Stonehenge পত্রাঙ্ক ২৬—২৮।

"সুইডেনেও জুন মাসে মিসল্‌টো সংগৃহীত হইত ;

(১) The Druids were accustomed to dwell at a distance from the profane, in huts or caverns, amid the silence and gloom of the forest.

If it (the oak) chanced to produce the mistletoe, the whole tribe was summoned ; two white heifers were immolated under its branches ; the principal druid cut the sacred plant with a knife of gold ; and a religious feast terminated the ceremonies of the day. H. H. of the world. England p. 5.

লোকে উহার অলৌকিক গুণে বিশ্বাস করিত। যদ্যপি ঐ লতার শাখা বাস গৃহের ছাদ হইতে লম্বিত হইত কিম্বা অশ্ব বা গোশালায় রক্ষিত হইত, তাহা হইলে মনুষ্য বা পশুদিগকে রাক্ষসাদি (Troll) অনিষ্ট করিতে পারিত না। ওক জাত মিসল্‌টোকে সুইডেন বাসীগণ অত্যন্ত ভক্তি করে। সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষার জন্য উহা গোলা ঘরের আড়কাটা হইতে ঝুলাইতে দেখা যায়। ইহা অগ্নি হইতে গৃহ রক্ষা করে, লোকের এই ধারণা। ওক মিসল্‌ কাষ্ঠের বাঁট যুক্ত ছুরি সঙ্গে থাকিলে মূর্চ্ছা রোগগ্রস্থ লোক নিরাপদ থাকে বলিয়া বিশ্বাসও ছিল। সুইডেন বাসীগণ ইহাও বিশ্বাস করিত যে মিসল্‌টো লতা যে কোন রোগীর কণ্ঠে মালারূপে বা অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়রূপে ধারণ করিলে সে আরোগ্য লাভ করে।

ফ্রেজার সাহেব অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ড্রুঈড গণ বিশ্বাস করিতেন যে পবিত্র মিসল্‌টো জুন মাসে অপেক্ষাকৃত প্রচুর পরিমাণে অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন হয়; সেই জন্য তখন ষোড়ষোপচারে উহার পূজা বিধি ছিল। পিডমণ্ড ও লম্বার্ডির কৃষকগণ এখনও জুন মাসে ওক পত্র আনিতে গমন করে। তাহাদের বিশ্বাস যে "সেণ্টজনের তৈল" সকল প্রকার ক্ষত আরোগ্য করে। এই "সেণ্টজনের তৈল" সম্ভবতঃ মিসল্‌টো বা তাহা হইতে নির্গত রস। হোলষ্টীনে ওক-মিসল্‌কে এখনও সদ্যকাটা ঘায়ের ঔষধ মনে করা হয়। বৃতেনি, ওয়েলস্‌, আয়ারল্যাণ্ড, ও স্কটল্যাণ্ডের বর্ত্তমান কেল্‌টিক ভাষায় এই লতার নাম "all healer" বা সর্ব্বৌষধি। ড্রুঈড্‌গণ এই নামেই উহাকে আহ্বান করিতেন। ফ্রান্সের Lacaune প্রদেশের লোকেরা মিসল্‌টোকে সকল বিষের নাশক বলিয়া এখনো বিশ্বাস করে। তাহারা রোগীর উদরে ঐ লতা রক্ষা করে বা ইহার রস সেবন করায়।" Lockeyer's Stone henge, p. 209.

লকিয়ার মনে করেন খৃষ্টের ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার বৎসর মে মাসে আরম্ভ হইত এবং মে ও নভেম্বর মাসে উহার উৎসব হইত। এই ধর্ম্মে বলডার (Balder) ও বেলটেন পূজা প্রচলিত ছিল এবং Rown ও May-thorn বৃক্ষ এই ধর্ম্মে পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইত। খৃষ্টের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এক নূতন ধর্ম্ম দক্ষিণ ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ধর্ম্মে জুন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং জুন ও ডিসেম্বর মাসে উৎসব হইত। মিসল্‌টো এই ধর্ম্মের পবিত্র বৃক্ষ; এবং উহার পূজা জুন ও ডিসেম্বরে সম্পন্ন হইত। সূর্য্য জুন মাসে কর্কট ক্রান্তিতে এবং ডিসেম্বর মাসে মকর ক্রান্তিতে আগমন করে। ঐ সময় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রাচীন প্রস্তর বেষ্টনীতে নূতন পদ্ধতি সম্মত প্রস্তর শ্রেণী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও বলডার ধর্ম্মের তিরোভাব লকেয়ারের নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন ডাকের কথায় নির্দ্দেশ করিতেছে।

"Balder was killed by Mistletoe".

লিকিয়ার মনে করেন সীজার যে ড্রুঈড্‌দিগের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা খৃষ্টের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে আগত মিসল্‌টো পূজক দিগেরই বংশধর।

সোম।

এক্ষণে আমি ঋগ্বেদ হইতে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, ঋগ্বেদের আর্য্যগণ যে সোম পূজা করিতেন তাহা ইয়োরোপের মিসল্‌টো। আমরা ওক শব্দ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। (১) সায়ণ উহার অর্থ নিবাস বা গৃহ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় ওক বৃক্ষে সোম জন্মাইত বলিয়া উহাকে সোমের গৃহ বলা হইত। ক্রমশঃ ওক অর্থে গৃহ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদের যুগে সোমকে কখন ওক্য কখন বা ওক বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় সে যুগে ওক বৃক্ষে যে সোম জন্মাইত তাহা জানা ছিল। নিম্নোদ্ধৃত ঋকে 'ওক্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতিরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ। ঋগ্বেদ ৯।৮৬।৪৫

হরি, ঘৃতক্ষরণকারী, শোভনদর্শন, উদকবান্, জ্যোতির্ম্ময় রথযুক্ত, ওক্য, ধনলাভে গমন করিতেছেন।

---

(১) তৎ ওকো গন্তা পুরুহূতঃ উতী। ঋগ্বেদ, ৫।৩০।১ সায়ণের ব্যাখ্যা। তৎ তস্য যজমানস্য ওকো গৃহং গন্তা প্রাপ্তো ভবতি। পুরুহূতঃ বহুভি র্‌রাহূতো ইন্দ্রঃ উতী রক্ষায়ৈ। অর্থ:—বহু লোকের দ্বারা আহূত (ইন্দ্র) রক্ষার নিমিত্ত তাহার (অর্থাৎ যজমানের) গৃহে গমন করেন।

[এই 'ওক্য' শব্দ দ্বারা সোমকে বুঝাইতেছে; সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন "ওক ইতি নিবাস নাম তস্ত্র হিতঃ এতাদৃশঃ সোমঃ"। কিন্তু ওক বৃক্ষে জাত অতএব "ওক্য" এই অর্থই সরল এবং ইহাই যথার্থ অর্থ বলিয়া অনুমান করা যায়।

সোমমিন্দ্রা বৃহস্পতী পিবতং দাশুষো গৃহে। মাদয়েথাং তদোকসা॥ ঋগ্বেদ, ৪।৪৯।৬

হে ইন্দ্র বৃহস্পতি! তোমরা দাতার (অর্থাৎ যজমানের) গৃহে সোম পান কর। তৎপরে ওক দ্বারা (অর্থাৎ সোমের দ্বারা) মত্ত হও।

[ওকসা অর্থে সায়ন যজমানের গৃহ স্থিত ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বুঝাইয়াছেন। "তদোকসা তদেব যজমান গৃহং ওকো নিবাস স্থানং যয়ো স্তৌ তাদৃশৌ সন্তৌ সোমং পিবতং।" কিন্তু "ওকসা" ওকস্ শব্দের তৃতীয়ার একবচন। ইন্দ্র বৃহস্পতির কিরূপে বিশেষণ হইতে পারে? যদ্যপি ওকস্ শব্দে সোম বুঝায় তাহা হইলে "ওকসা" অর্থে সোমের দ্বারা; এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঋকের অর্থও অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয় সোম ওক বৃক্ষে জন্মিত বলিয়া উহাকে কখন ওক্য, আবার কখন ওকস্ নাম দেওয়া হইত।]

স ইৎ ক্ষেতি সুধিত ওকসি স্বে তস্মা ইড়া পিন্বতে বিশ্বদানীং। ঋগ্বেদ, ৪।৫০।৮

অর্থঃ—সুন্দররূপে স্তুত হইয়া তিনি (অর্থাৎ সোম) স্বীয় ওকে নিবাস করেন, ইড়া তাঁহাকে সর্ব্বকালে বর্দ্ধিত করেন।

[এই ঋকে সায়ণ "ওকসি" অর্থে সদনে ও "ইড়া" অর্থে ভূমি করিয়াছেন। ওকসি অর্থে ওক বৃক্ষ বুঝাইতেছে অনুমান করি। ওক বৃক্ষ সোমলতার গৃহ ছিল বলিয়া, ক্রমশঃ ওক শব্দের অর্থ গৃহ হইয়াছে। আমরা লকিয়ার লিখিত মিসলটো লতার বিবরণে দেখিয়াছি, "পিডমণ্ড ও লম্বার্ডির কৃষকগণ এখন ও জুন মাসে ওক পত্র আনিতে গমন করে। তাহাদের বিশ্বাস যে 'সেণ্টজনের তৈল' সকল প্রকার ক্ষত আরোগ্য করে। এই "সেণ্টজনের তৈল" সম্ভবতঃ মিসলটো বা তাহা হইতে নির্গত রস।" এই বর্ণনায় আমরা মিসলটোকে ওক নাম প্রদান করিতে দেখিতেছি। কৃষকগণ মিসলটো আনিতে গেলেও কথায় বলে ওক পত্র আনিতে যায়। অতএব ওকে জন্মায় বলিয়া সোমকে ও ওক ও ওক্য নাম এদেশে ও দেওয়া হইত।

ইয়ুরোপে দুই প্রকার Mistle আছে একটী Earth ও অপরটী Oak-mistle। উদ্ধৃত ঋকে আমরা ওকে অবস্থিত সোমের উল্লেখ দেখিতেছি। ইড়া বা ভূমি ও সোমকে বর্দ্ধিত করে, এইরূপ উল্লেখ থাকায় Earth mistle বুঝাইতেছে বলিয়া অনুমান করি। Earth শব্দ জারমাণ ভাষায় Erde। অতএব ইড়া শব্দ হইতে যে Earth ও Erde উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না]

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বাবিশন্ত্বিন্দবঃ। মৎসরাস-স্তদোকসঃ॥ ঋগ্বেদ, ১।১৫।১

অর্থঃ—হে ইন্দ্র! ঋতুর সহিত সোম পান কর। ইন্দু সকল তোমাতে প্রবেশ করুক। সেই ওক গণ মৎসর গণ।

["মৎসরাস স্তদোকসঃ" অংশের ব্যাখ্যা সায়ণ এইরূপ করেন। মৎসরাসঃ তৃপ্তিকরাঃ তদোকস তন্নিবাসাঃ সর্ব্বদাত্বদুদর স্থায়িন ইত্যর্থঃ। মৎসরাস শব্দের অর্থ সায়ণ কোন ২ স্থলে মদকর করিয়াছেন। মৎসর ও সোমের এক নাম পরে ঋক উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে। ওকসঃ অর্থে ওক সকল মনে করি। এখানে ও সোমকে ওক নামে বলা হইয়াছে।]

আধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীত মন্থিনা। গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্॥ ঋগ্বেদ, ৯।৪৬।৪

অর্থঃ—হে শোভন হস্ত (ঋত্বিক্)! মন্থন দ্বারা ক্ষরণশীল শুক্র সকল (অর্থাৎ জ্যোতিযুক্ত রস) গ্রহণ কর। মৎসরকে গো সকলের দ্বারা সংস্কার কর।

[সোমরসকে মৎসর বলা হইল। ড্রুইড্ গণ যে লতা দ্বারা যজ্ঞ করিতেন তাহাকে Mistle toe বলে। মৎসর ও Mistle শব্দে সাদৃশ্য আছে। Toe শব্দে সম্ভবতঃ 'তোয়' বুঝাইত। মৎসরকে গো সকলের দ্বারা সংস্কার করা অর্থাৎ দধি বা দুগ্ধ দ্বারা সোমরস মিশ্রিত করা। ড্রুইড্ গণ মিসলটো যজ্ঞে গো বলি দিতেন।

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্॥ ঋগ্বেদ, ৯।৯৭।১

অর্থ :—ইহার (অর্থাৎ সোমের) প্রেরিত হিরণ্য দ্বারা পূয়মান দেব (সোম) দেবতাদিগের সহিত রসকে সংযুক্ত করিতেছেন।

সুবর্ণ হস্তে ধারণ করিয়া সোম হইতে রস বাহির করা নিয়ম ছিল। 'হিরণ্য পাণিরভিষুণোতীতি', এই নিয়ম উদ্ধার করিয়া সায়ণ বলেন যে সোম অভিষব কালে হিরণ্যপাণি হইতে হইত। ড্রুইড্ গণ Mistle toe বৃক্ষ সুবর্ণ ছুরি দ্বারা কর্ত্তন করিতেন দেখা গিয়াছে। অতএব এই বিষয়ে দুই জাতির মধ্যে সমান নিয়ম দেখা যাইতেছে। 'মৎসর' শব্দ 'মিসল্' রূপে পরিণত হইয়াছে মনে করি এবং 'রস' শব্দের পরিবর্ত্তে 'তোয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত দেখিতেছি।]

দ্রপ্সান্ ঈরয়ন্ বিদথেষ্বিন্দু র্বিবারমব্যংসময়াতি যাতি। ঋগ্বেদ, ৯।৯৭।৫৬

অর্থ :—দ্রপ্স (অর্থাৎ সোমরসের বিন্দু) দিগকে যজ্ঞে প্রেরণ করিয়া ইন্দু (অর্থাৎ সোম) মেষ লোমের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে (অর্থাৎ মেষ লোম দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ের ছাঁকনির মধ্য দিয়া গমন করিতেছে)।

[সোম রসকে দ্রপ্স বলা হইত এবং অবিবার দ্বারা filtered হইত। ইংরাজীতে drops শব্দ তরল দ্রব্যের বিন্দুকে বুঝায়। অনুমান করি ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে যেরূপ, সেইরূপ বৃটণে drops শব্দ সোমরসকেই বুঝাইত ; পরে সকল তরল দ্রব্যের বিন্দুকেই বুঝাইত।

ইংরাজীতে Ewe শব্দ মেষকে বুঝায়। 'w' র উচ্চারণ ব ধরিলে Ewর উচ্চারণ ইবি হইবে। এখানে অবি অর্থে মেষ। লোম অর্থে 'বার' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজী wool বা বুল্ ও বার্ শব্দে বেশ মিল দেখা যায়]

সাম কৃন্বন্ সামন্যো বিপশ্চিৎ ক্রন্দন্নেত্যভি সখ্যুর্ন জামিম্॥ ঋগ্বেদ, ৯।৯৬।২২

অর্থ :—সর্ব্বজ্ঞ, সাম কুশল, সাম (গান) করিতে ২ ডাকিতে ডাকিতে প্রিয়ার মত সখাদিগের অভিমুখে আসিতেছেন।

[সাম অর্থে গান। ইংরাজীতে song (সঙ্) অর্থেও গান। ইংলণ্ডেও সোমযজ্ঞে সাম গীত হইত অনুমান করি ; ইহার স্পষ্ট নিদর্শন song শব্দে বর্ত্তমান।

মদং স্বাদিষ্ঠং দ্রপ্সমরুণং ময়োভুবম্। ঋগ্বেদ, ৯।৭৮।৪

অর্থ :—(সোমকে) মদকর, স্বাদুতম, দ্রপ্স (বা রসাত্মক), অরুণ, সুখকর (করিয়াছেন)।

[সোমকে স্বাদিষ্ঠ বা sweetest বলা হইল স্বাদিষ্ঠ ও sweetest শব্দে মিল অসাধারণ। সোমকে মদ বলা হইয়াছে। আমার মনে হয় ইংরাজী mad শব্দ ও বৈদিক মদ শব্দের অর্থ এক রূপ ছিল। সোমকে 'অরুণ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরে আরো উদ্ধার করিয়া দেখাইব সোমের অরুণ আখ্যা অনেক স্থলে বর্ত্তমান। ভার্জিলে Aureum Frondeus" নাম ওক জাত Mistletoeকে বলিত, পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ল্যাটিন aureum শব্দ যে বৈদিক অরুণ শব্দের পর্য্যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।]

উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরঞ্জ্মো মদায়কম্।
বিনোরায়ে দুরোরধি॥ ঋগ্বেদ, ৯।৪৫।৩

অর্থ :—(হে সোম !) অরুণ (যে তুমি) তোমাকে আমরা মত্ততা উৎপাদনের জন্য গো সকলের দ্বারা (দধি দুগ্ধ প্রভৃতি গো বিকার দ্বারা ইতি সায়ন) সংস্কার করিব। আমাদের ধনের জন্য দ্বার খুলিয়া দাও।

[এখানেও সোমকে অরুণ নাম দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহা যে ওক বৃক্ষে জন্মাইত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ইটালীর লোকের সহিত যে ভারতীয় আর্য্য দিগের সংস্রব ছিল, তাহা অরুণ নামেই জানা যায়। বেদে দ্বারকে 'দুর' বলা হইত দেখা যাইতেছে। ইংরাজী door ও বৈদিক দুর যে একই তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এক্ষণে আমরা ঋগ্বেদ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব সোম কোথায় জন্মাইত ও তাহার কিরূপ বর্ণ ছিল।

বনস্পতিং পবমান মধ্বা সমঙ্গ্ধি ধারয়া।
সহস্র বল্শং হরিতং ভ্রাজমানং হিরণ্যয়ম্॥ ৯।৫।১০

অর্থ :—হে পবমান (সোম)! (তুমি) হরিতবর্ণ, সুবর্ণের মত উজ্জ্বল, সহস্র শাখাযুক্ত বনস্পতিকে মধুর ধারার দ্বারা শোভিত করিয়াছ।

[সোম যে সহস্র শাখাযুক্ত বনস্পতিতে জন্মায় এই ঋক হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল। ওক বৃক্ষ যে সহস্র শাখা যুক্ত বনস্পতি তাহাতে সন্দেহ নাই।]

মন্দ্রস্য রূপং বিবিদুর্মনীষিণঃ শ্যেনোযদন্ধো
অভরৎ পরাবতঃ॥ ঋগ্বেদ, ৯৬৮৬

অর্থঃ—মনীষিগণ মন্দ্রের (মদকরের ইতি সায়ন) রূপ জানিয়াছিলেন। যে অন্ধকে (অর্থাৎ সোমরূপ অন্নকে) শ্যেন (পক্ষী) দূরদেশ হইতে আনিয়াছিল।

[সোমের এক নাম মন্দ্র, অপর নাম অন্ধ; ইহাকে শ্যেন পক্ষী স্বর্গ হইতে আনয়ন করে, এই সংস্কার সেকালে ছিল। ১।৮০।২, ৮।৮২।৯, ৯।৭৭।২, ১০।১৪।১ প্রভৃতি ঋকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।]

যদা পীতাসো অংশবো গাবোন দুহ্র উধভিঃ। ৮ ৯ ১৯
অর্থঃ— যখন পীতবর্ণ লতা সকল, গাভীর পালানের মত, রস দোহন করে।

[সোম যে লতা এবং পীতবর্ণ তাহা এই ঋক্ হইতে বেশ বুঝা যায়।]

দিবিতেনাভা পরমো য আদদে পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সান বিক্ষিপঃ। ঋগ্বেদ, ৯।৭৯.৪
হে সোম! যিনি শ্রেষ্ঠ (তিনি) তোমার নাভি দিব্য লোকে স্থাপন করিয়াছেন; তোমার ক্ষিপ্ত অংশ সকল পৃথিবীর উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াছিল।

[সারণ পৃথিবীর উচ্চস্থান অর্থে পর্ব্বত করিয়াছেন। আমার মনে হয় বৃক্ষের উপর জন্মাইত বলিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে।]

তাভ্যাং বিশ্বস্য রাজসি যে পবমান ধামনী। প্রতীচী সোমতস্থতুঃ॥ ঋগ্বেদ, ৯।৬৬।২
হে পবমান! হে সোম! (তোমার) যে দুই ধাম পশ্চিম দিকে ছিল, তাহাদের দ্বারা (তুমি) বিশ্বের স্বামী হইয়াছ]

[এই ঋক হইতে জানা যাইতেছে যে পশ্চিমে দুই দেশে সোম জন্মাইত। সে দুইটী দেশ কি?]

সোম পান করিলে লোকে অমর হয় ও স্বর্গে গমন করে এই বিশ্বাস সে কালেছিল। সোমরসে সকল প্রকার রোগই যে দূর হয় তাহাতে আর্য্যদিগের সন্দেহ ছিলনা। নিম্নে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

অপাম সোম মমৃতা অভূমা গন্ম জ্যোতি রবিদামদেবান্।
কিং নুনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমুধূর্ত্তিরমৃতমর্ত্ত্যস্য॥ ৮।৪৮।৩

অর্থঃ—সোমকে পান করিব, অমর হইব, জ্যোতির্লোকে গমন করিব, দেবতাদিগকে জানিব। এক্ষণে শত্রু আমাদিগের কি করিতে পারে? হে অমৃত মর্ত্ত্যের হিংসক (আমার) কি করিবে?

[যাহারা মর্ত্তকে হিংসা করিতে পারে, তাহারা অমরকে হিংসা করিতে পারে না। অতএব সোমপান করিয়া কেহ অমর হইলে তাহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না।]

প্রণ আয়ুর্জীবসে সোমতারীঃ। ৮।৪৮।৪
অর্থঃ—হে সোম! আমাদের জীবনের জন্য আয়ু বর্দ্ধিত কর।

ত্বেমা রক্ষন্তু বিস্রসশ্চরিত্রাদুত মাস্রামা স্রবয়ন্ত্বিন্দবঃ।
৮।৪৮।৫

অর্থঃ—তাহারা (অর্থাৎ সোম সকল) আমাকে কর্ম্ম শৈথিল্য হইতে রক্ষা করুন এবং ইন্দুসকল আমাকে ব্যাধি হইতে পৃথক্ করুন।

অপত্যা অস্থু রনিরা অমীবা নিরত্রসন্ত মিষীচীরভৈষুঃ।
আ সোমো অস্মান্ অরুহৎ বিহায়া আগন্মযত্র
প্রতিরন্ত আয়ু॥ ৮.৪৮।১১

অর্থঃ—সেই সকল কঠিন পীড়া অবগত হউক, যাহারা প্রবল হইয়া (আমাদিগকে) অত্যন্ত কম্পিত করিতেছে। মহান্ সোম আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; আয়ু যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (তাহার নিকট) আমরা গমন করিব।

সোমস্য মিত্রা বরুণোদিতাসূর আদদে।
তদাতুরস্য ভেষজম্॥ ৮।৬১।১৭

অর্থঃ—হে মিত্র বরুণ! সূর্য্য উদিত হইলে সোমকে (অগ্নি) স্বীকার করেন। কারণ (উহা) আতুরের ঔষধ।

সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইষস্করৎ॥ ৩।৬২।১৪

অর্থঃ—সোম আমাদিগকে (এবং আমাদিগের) দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুদিগকে রোগবর্জ্জিত অন্ন প্রদান করুন।

ইংলণ্ডে যখন মিসল্‌টো পূজকগণ আগমন করেন, তখন 'বলডার' মিসল্‌টো দ্বারা হত হয় এইরূপ প্রবাদ যে প্রচলিত ছিল তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। নরয্যান

লকিয়ারের Stonehenge পুস্তক হইতে এবিষয়ে নিম্নে আরো কিছু উদ্ধার করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"The year-gods in Babylonia and Egypt respectively were Baal and Thoth. We find Bel, or Baal common to the two areas, (i. e. Western Europe and Babylonia), Mr. Borlase informs us (Op. cib. p. 1164) that in Western Europe Bel, Beal, Balor, Balder and Phol, Fal, Fail are the equivalents of the Semitic Baal. Balus, indeed, is named as the first King of Orkney. A May worship is connected with all the above.
p. 259.

ঋগ্বেদে আমরা বল ও ফলিগ নাম প্রাপ্ত হই। ঋগ্বেদ রচনার সময়ে যে সকল প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল, ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতাগণের ও অঙ্গিরা ঋষিগণের সহিত পণিদিগের যুদ্ধ তাহাদের মধ্যে প্রধান। কথিত আছে আর্য্যগণ এই যুদ্ধে সূর্য্য, উষা, আলোক, গো প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। এই পণিজাতির শ্রেষ্ঠ দেবতা বল, ফলিগ প্রভৃতি ছিল। নিম্নে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

স সুষ্টুভা স ঋকতাগণেন বলং রুরোজফলিগং রবেণ।
বৃহস্পাত রুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদৎবাবশতী রুদাজৎ॥

ঋগ্বেদ, ৪।৫০।৫ ও ১,৬২।৪

অর্থ:—সেই (বৃহস্পতি), সুন্দর স্তুতিযুক্ত দীপ্তিমান (অঙ্গিরস) দিগের সহিত শব্দধারা বলকে ফলিগকে সংহার করিয়াছিলেন। ভোগ্য সকলের উৎসরূপিণী, হব্য প্রদান কারিণী, গোসকলকে বৃহস্পতি শব্দ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। (আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।
আনন্দমোহন কলেজ।

কারাগারে সাহিত্য সাধনা।

কারাদণ্ড সর্ব্বদা বাণী সেবকগণের সাধনার বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায় নাই; বরং অনেক স্থলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহা তাহাদের সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। বোথিয়াস্ কারাগারে দর্শনের আশ্বাস নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গ্রোটিয়াস বন্দী-দশায় সেণ্ট মথি নামক ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা এবং অপরাপর গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন। কারাগারে বিভিন্নরূপে নানা বিদ্যার চর্চ্চার জন্য তিনি যে সময়-নির্দ্ধারণ-পত্রী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ।

বুকানন পর্ত্তুগালের কয়েদখানায় বসিয়া ডেভিডগীতা নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

কারভেণ্টিন্ তাহার ডনকুইগ্জোট নামক স্পেন ভাষার চিত্তাকর্ষক পুস্তকখানি বার্ব্বারিতে বন্দী থাকিবার কালে প্রণয়ন করেন। ক্লেটা নামক বিখ্যাত আইন গ্রন্থখানি দেনার দায়ে আবদ্ধ জনৈক ব্যক্তিকর্ত্তৃক বন্দী অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল; কোন স্থানে উক্ত পুস্তক রচিত হয় বা রচয়িতার নাম কি, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। একখানি পুস্তক 'ক্লেটা মাইনর বা ধাতু বিজ্ঞান সারজন পেট্রাস প্রণীত' এই নাম দিয়া কারাগারে বন্দী অবস্থায় এক ব্যক্তি জার্ম্মাণ ভাষা হইতে অনুদিত করিয়াছিলেন দেখা যায়।

দ্বাদশ লুই অরলিয়নের ডিউক থাকিবার কালে বর্জ্জেসের কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন। লিখাপড়া শিক্ষা করা আবাল্য তাহার নিকট হেয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল কিন্তু কারাগারে আসিয়া তাহার সে পূর্ব্বের মতিগতি ফিরিয়া যায়; কালক্রমে তিনি যে কিছুদিন বন্দী ছিলেন তাহারই কল্যাণে তিনি বিদ্বান্ নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ হেনরীর মহিষী মার্গারেট লুভারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তথায় সদগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার চিত্ত পরিশুদ্ধি লাভ করে, তাহার ফলে তিনি সুন্দর দক্ষতার সহিত তদীয় বিগত অসংযত জীবনের জন্য ক্ষমাভিক্ষা

করিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি হইয়াছিল।

গলদেশে কঠোর লৌহশৃঙ্খল এবং মৃত্যুর উগ্রমূর্ত্তি সুস্পষ্ট সম্মুখে লইয়া প্রথম চার্লস তৎপুত্রের উদ্দেশে রাজ-প্রতিমা নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। রাজার বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার খ্যাতি গডেনকে অর্পন করেন; বস্তুতঃ গডেনের পক্ষে অপরের অহেতুক দত্ত অপ্রাপ্য খ্যাতিলাভ করায় বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার গরজ না থাকিলেও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় পুস্তকখানা প্রস্তুত করিবার একেবারেই উপযুক্ত ছিল না।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ তদীয় ভগ্নি মেরীকর্ত্তৃক আবদ্ধ থাকিবার অবস্থায় কতিপয় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; কিন্তু তাহার অস্তিত্ব এখন খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কথিত আছে রাণী মেরীকে এলিজাবেথ যখন আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন তখন তাহারও শুষ্ক হৃদয় হইতে কবিতার উৎস উছলিয়া উঠিয়াছিল।

সার ওয়াল্টার র‍্যালের বিখ্যাত পৃথিবীর ইতিহাস তদীয় একাদশ বর্ষ ব্যাপী কঠোর কারাদণ্ডের সুফল। উক্ত অসম্পূর্ণ পুস্তক খানা দেখিলে এই দুঃখ হয় যে কারাবাসে অবস্থান কালে লেখকের হৃদয়ে এরূপ এক খানা পুস্তক লেখিবার উপযুক্ত যে মহদ্ভাব সমূহ উত্থিত হইয়া তাঁহার লেখনীকে বাঘ্যরী শক্তি দান করিয়া ধন্য করিয়াছিল তদীয় উত্তর জীবনে তাহার মধ্যে সে শক্তির সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছিল।

র‍্যালের সম্বন্ধে হিউম বলেন—"সকলেই তাঁহার প্রতিভার প্রখরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি নৌ-বিদ্যা এবং সমর বিদ্যার বীর্য্যদ্যোতক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও প্রবৃত্তির আবেগপূর্ণ তরঙ্গধারার মধ্য হইতে শান্তস্নিগ্ধ নিবৃত্তির উৎস ছুটাইয়া সুপণ্ডিতদিগকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। যে অবিচল ধৃতি এবং অমানুষী মানসিক শক্তি তাঁহাকে এমন বয়সে এবং ঈদৃশ দুরবস্থার পেষণের মধ্যেও পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়নরূপ মহৎব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে সকলেরই লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।"

ফরাসী দেশের জীর্ণ কারাপ্রাকারের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া ভলটেয়ার তদীয় গ্রন্থ হেনরীয়েডের দাঁড়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন; উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশই তৎকর্ত্তৃক বন্দী অবস্থায় রচিত হইয়াছিল।

এতদ্দেশে গীতার যদ্রূপ গৃহে গৃহে আদর, ইংরেজ ভাষা ভাষিত দেশে 'বুনিয়ানের তীর্থযাত্রীর অগ্রসর' নামক গ্রন্থের সেইরূপ সর্ব্বত্র সমাদর। উক্ত পুস্তকখানিও কয়েদীর হাড় পিষুণীর ফল।

হাওয়েলের পারিবারিক পত্রাবলীর অধিকাংশ দেনার দাবীতে কয়েদখানা ভোগের সময় লিখিত। তাঁহার সক্ষম, ও সরস লেখনী হইতে যাহা প্রসূত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ সারবান্ এবং প্রীতিপদ।

পুরোহিতেরা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির দশমাংশের অধিকারী ইহা বিধি সঙ্গত এবং রাজাভিজাত্য সর্ব্বত্র সর্ব্বজনমান্য এই বিশ্বাসদ্বয়ের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া পণ্ডিত সেলডেন কঠোর কারাদণ্ড হেলায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই কারাভোগকালে তিনি এডামারের ইতিহাস ও তাহার টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

লিডিয়াট দেনার দায়ে আটকা পড়িয়া পেরিয়ান ক্রনিকেলের দিব্য নোট লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। জনসন তাহার রচনায় বোধ হয় এই পণ্ডিতের কথাই পাড়িয়া-ছিলেন কিন্তু তাহা তদীয় জীবনীলেখক বসোয়েল এবং অপরাপরের অজ্ঞাত ছিল।

সংশয়বাদী বেলী তাহার অভিধানে যে সমস্ত যুক্তি নূতন করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থে উত্থাপিত করিয়াছিলেন কার্ডিনাল পেলিগন্যাক সে সকলের বিরুদ্ধে তর্ক উপস্থিত করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের কাজ কর্ম্ম তাহার সে অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার পথে বিঘ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভবল নির্ব্বাসনে তিনি সে সুযোগ পাকড়াইয়াছিলেন। লুক্রেশাস নামক গ্রন্থকেও তাঁহার দরবারে লাঞ্ছিত হইবার সুফল স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। ফরাসী পণ্ডিত ফেরেট যৎকালে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন তৎকালে বেলী তাহার একমাত্র সহচর

হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিধানখানি সদাসর্ব্বদা ফ্রেরেটের নিকট থাকিত, এজন্য তদীয় বন্দী দশায় লিখিত গ্রন্থে সংশয়বাদের সমর্থক শক্তিশালী প্রতর্করাজীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সার উইলিয়ম ড্যাভিন্যাণ্টকে যখন বিদ্রোহীরা ক্যারিস্ব্রুগ্ দুর্গে বন্দী করিয়াছিল তৎকালে তদীয় গণ্ডিবার্ট নামক কাব্য গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল।

ডি ফো একখানা রাজনৈতিক ইস্তাহার বিলি করিয়া নিউগেটের কয়েদখানায় বন্দী হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার সাময়িক পত্র 'দি রিভিউ' লিখিত হইয়াছিল। তৎপরে সেগুলি একত্রে বাঁধাই হইয়া নয়খানি সুবৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ষ্টীল তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধরাজী লিখিতে উক্ত সংগ্রহের বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ডিফো কারাগৃহে 'জুর ডিভিনো' নামক গ্রন্থখানিও রচনা করেন।

রাজব্যাপারে পড়িয়া য়ুইক্‌ফোর্ট কারাদণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজদূত নামক কৌতুকপ্রদ গ্রন্থে উহা রচিত হইবার যে তারিখ দেখা যায়, সে তারিখে তিনি জেলে ছিলেন। য়ুইকফোর্ট বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজী পাঠ করিয়া কারাগারের শ্রমাপনোদন করিতেন।

মাগ্যি নামক একজন ইটালীয় পণ্ডিত বাল্যকালে বিজ্ঞান পাঠে বিশেষতঃ অস্ত্রশাস্ত্র ও সমরশিল্পে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তুর্কিরা ফামানুষ্টার কেল্লা অবরোধ করিলে মাগ্যি তদাবিষ্কৃত যন্ত্র সাহায্যে তাহা বহুকাল রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে তুর্কিরা উক্ত স্থান অধিকার করে। তাঁহারা মাগ্যির পুস্তকালয় পোড়াইয়া দেয় এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া যায়। তুর্কভূমিতে মাগ্যিকে ক্রীত দাসরূপে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গুনি খাটুনী খাটিতে হইত। গভীর রাত্রিতে মাগ্যি সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হইতেন। তাহাই তাঁহার তৎকালীন জীবনে আনন্দের উৎস খুলিয়া দিত। এইরূপে দুরবস্থার দিগ্-ব্যাপী অন্ধকারকে পৃষ্ঠপট করিয়া তদীয় প্রতিভার রশ্মিরাজী খরতর হইয়া বিভাতিত হইয়াছিল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

করুণা।

দুইটী ছেলে লইয়া নিরুপায় বিধবা করুণা যখন আসিয়া তাহার ভ্রাতার গলগ্রহ হইল, তখন ভ্রাতা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভ্রাতৃবধূ নিত্য নব নব অভিযোগের ভিতর আর একটা নূতন উপসর্গ দেখিয়া রাগে গড় গড় করিতে লাগিল। উপায় নাই। করুণার যে আর আশ্রয় নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর ভিটাইতেই সে তাহার সতীন পুত্রের গলগ্রহ হইয়া কোন মতে পুত্র বধুর আব্দার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বৎসর খানেক হইল স্বামীর ঋণে বাস্তভিটা খানা পর্য্যন্ত নীলাম হইয়া গেলে পুত্রটী যখন তাহার স্ত্রীকে লইয়া নিজ শশুর বাড়ীতে চলিয়া গেল তখন করুণা একবারে নিরুপায় হইয়া গেল। পুত্রের সঙ্গে করুণার যাইতে লজ্জা ছিল না—পুত্রবধুর আজ্ঞা তামিল করিতেও তাহার কুণ্ঠা নাই; কিন্তু পুত্রবধু তাঁহাকে লইতে রাজি হইল না। আশ্রয় হীনা করুণা জগত অন্ধকার দেখিল।

অপত্য-স্নেহ ও পুণ্য আশা জীবনকে সস্নেহে রক্ষা না করিলে কঠোর সংসারের নির্দ্দয় নিষ্পেষণ সহ্য করিয়া থাকিতে এসংসারে কয়জন সমর্থ হয়? দারিদ্রের নিত্য নিপীড়নে করুণার প্রাণে সময় সময় আত্মঘাতী হইবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিলেও সুধু ছেলে দুইটীর দিকে চাহিয়াই সে কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। এই তিন বৎসর সে নিজে দুদিনে একদিন খাইয়া ও ছেলে দুটীকে আধপেট খাওয়াইয়া অভ্যাস করাইয়া ছিল; সুতরাং সে যখন দেখিল যে আর কিছুতেই তাহার দিন গুজরাণ হয় না, তখন সে ভাইএর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর উপায় দেখিল না।

করুণার একমাত্র আশা ও ভরসা তাহার ভাই। স্বামী বর্ত্তমানে ভাই এর নিকট সে যথেষ্ট আদরই পাইয়াছে। 'বিপদে কেহ বন্ধু হয়না' সত্য, কিন্তু মায় পেটের ভাই তাহাকে পায় ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবে না, এ ভরশা ও সে নিয়তই করিতেছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে একবার ভাইর বাড়ীতে আসিয়াছিল, তখনও সে ভ্রাতৃবধুর উপেক্ষা পাইয়াছিল।

সে টা এবার সে ভুলিয়া গেল। নিরুপায় অনেক সহ্য করিতে পারে—এটাও ভগবানের একটা দান। এবার সে অনেক সহ্য করিবে, যাইবে না—তাড়াইয়া দিলেও যাইবে না, অবহেলার অটল বর্ম্মে চিরদিনই আপনাকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই করুণা ভ্রাতার গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

(২)

অপরাহ্নে যতীশচন্দ্র কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া বারন্দায় একখানা জল চৌকিতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় করুণা আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

করুণার জীর্ণশীর্ণ দেহ লক্ষ্য করিয়া যতীশ বলিল "করুণা তোমার শরীর এমন হইয়াগিয়াছে।" করুণা শব্দ করিল না! ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এখানে কখন আসিয়াছ?"

করুণা একটু নম্রস্বরে বলিল "এই—দুপ্রহরের পর।"

এমন সময় একটী বালক দৌড়িয়া আসিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বালকের ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাইলেই বেশ বুঝা যায়, সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

যতীশকে দেখাইয়া করুণা বলিল "তোমার মামাকে প্রণাম কর, খোকা।" বিনা বাক্যব্যয়ে খোকা মায়ের আদেশ পালন করিল। যতীশ পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল "এসময় তুমি এখানে কেন আসিলে করুণা?"

শুষ্ক কণ্ঠে করুণা উত্তর করিল "আমার আর গতি কোথায় দাদা?"

যতীশ করুণার মুখের উপর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উত্তর করিল "আমার গতিরই উপায় নাই, তার উপর তোমার গতি?" করুণা দাদার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"আমার যে জাত যায় দাদা, আমার মান তুমি ছাড়া কে রাখিবে—কে বুঝিবে?" যতীশ মাথা নত করিয়া বলিল—"মহেন্দ্র কোথায়?"

করুণা বিমর্ষভাবে বলিল "সেও বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।"

যতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল "তা'হলে এখন তোমাদের বাড়ীতে আর কেহ নাই!"

করুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না"।

একটু নম্রভাবে যতীশ বলিল—"তোমার ত মহেন্দ্রের সঙ্গে যাওয়াই উচিত ছিল। সে কি আর তোমায় ফেলিয়া দিত।"

করুণার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া করুণা বলিল "বউ আমায় নিয়া বাপের বাড়ী যাইতে নারাজ। আর আমিই বা তাহার অনিচ্ছায় যাই কি করিয়া দাদা?"

যতীশ বলিল "স্বামীর ভিটায় পড়িয়া থাকাইত উচিত। অন্ততঃ শ্বশুরের ভিটায় সন্ধ্যায় একটা বাতি জ্বলিত।"

"মান ইজ্জত বজায় রাখিয়া যে থাকিতে পারি না দাদা। নিজের পেটের জন্য চিন্তা করি না। ছেলে গুলির পেটে ত দুবেলা না হউক—সারা দিনে চারিটা দিতে হইবে। আমি স্ত্রীলোক তাহা কোথায় যাইব?"

"তবে এখানে সংস্থান হইবে কিরূপে? আমার অবস্থাও ত জান? আমি নিজের তিন গোষ্ঠ লইয়াই অস্থির।"

অভাগিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"না হলেও মায়ের পেটের ভাই তুমি। তুমি ত আর আমায় ফেলিয়া দিতে পারিবে না। বড় আশা করিয়া একটু আশ্রয় নিতে আসিয়াছি দাদা! করুণাকে বাপের ভিটায় একটু স্থান দাও। না খাইয়া মরিলেও জাত যাইবে না।"

মাথা নীচু করিয়া যতীশ খরমে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল "আমি এত লোকের ভরণ পোষণ করি কেমন করিয়া, তুমি বুঝিতে পার না?" করুণা বিগলিত কণ্ঠে বলিল "কেন দাদা দশজনে যেমন আছে, আমিও তেমনি তোমার একখানা ঘরের নীচে কোন প্রকারে পড়িয়া থাকিব। তোমরা খাও, আমিও খাইব। না খাও, আমিও খাইব না। না হয়—আধ পেট খাইব, তার জন্ত ভাবনা কি দাদা, আমি যে তোমার ছোট বোন্! তথাপি মান

ইজ্জত বজায় থাকিবে; আমার যে জাত যায় দাদা। তোমার বাড়ীর আব। পেটেও যে আমার সন্মান। তুমি যে আমার এক মায়ের পেটের ভাই। আমার যে আর তিন ভুবনে আপনার বলতে কেউ নাই।” এক শ্বাসে করুণা অনেকগুলি কথা বলিয়া ক্লান্ত হইয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। অবোধ বালক মায়ের কান্না দেখিয়া বলিল “মামার বাড়ী আসিয়া তুমি আর কাঁদিবে না বলিয়াছিলে তবে এখন কাঁদ কেন মা”? বালকের কথা শুনিয়া করুণার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যতীশ আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। সে উঠিয়া গেল। করুণা সাহস করিয়া যতীশের মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না—পাছে যতীশের দৃষ্টির ভিতর হইতে এমন একটা কিছু ইঙ্গিত বাহির হয় যাহা তাহার কাছে কেবল মর্ম্মান্তিক নিরাশার সংবাদই বহন করিয়া আনিবে মাত্র।

(৩)

যতীশ যখন কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল, তখন সত্য সত্যই করুণার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বড় আশা করিয়া ভাইএর বাড়ীতে আসিয়াছিল। মায়ের পেটের ভাই তাহাকে পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে ও এত শীঘ্র তাহার সহিত বুঝাপাড়া হইয়া যাইবে সে ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, তাই তাহার চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল।

মানুষ যেখানে যেটা পাইতে প্রত্যাশা করে সেখানে তাহা না পাইলে সে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করে। করুণা ভাইএর নিকট যথেষ্ট আশা করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এক আঘাতে তাহার সব আশা ভগ্ন হইয়া গেল। কাঁদিয়া কাটীয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া করুণা কূল কিনারা দেখিল না। করুণা ভাইয়ের আশ্রয় ছাড়িবে বলিয়া আসে নাই। তাই ছাড়িবে না বলিয়াই স্থির সঙ্কল্প করিয়া রহিল।

ভ্রাতৃবধূ তাচ্ছিল্যের সহিত যাহা প্রদান করিত তাহাতেই ছেলে মেয়েকে লইয়া কোন প্রকারে দিন গুজরান করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম যে দুই একখানা তরি তরকারী তাহার জন্ত দেওয়া হইত এখন দিন দিন তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্বে বাজার হইতে তরি তরকারী আ সলে বড় ঘরে থাকিত; সুতরাং তাহা হইতে করুণাও গ্রহণ করিতে পারিত। চাকর পরিবর্ত্তনের পর অবধি নূতন চাকরকে গৃহিণী মাছ তরকারী পৃথক করিয়া আনিবার কোন উপদেশ দেন নাই, সেও তাহা বুদ্ধি খরচ করিয়া করিত না। সুতরাং মাছ মাংসের সহিত একত্র জড়িত করিয়া আনা তরকারী বিধবা করুণা গ্রহণ করিতে পারিত না। করুণা সেজন্ত দুঃখিতা নহে—কোন রকম তাহার দিন কর্ত্তন হইয়া যাউক। করুণা নিজের জন্ত মোটেই ব্যস্ত নহে; তবে দুঃখিনীর ছেলে দুটী যখন সময় সময় কেবল নুন ভাতের পরিবর্ত্তে দু একটু ভাজা-সিদ্ধও মুখে দিতে জেদ করিত—তখন আর করুণার চক্ষে বাধা মানিত না, তাহার দুই গণ্ডে অশ্রুধারা বহিয়া চলিত। দীন দরিদ্রের অশ্রু ব্যতীত আর সম্বল কি? মায়ের চক্ষে অশ্রু দেখিলে বালক দ্বয়ের জেদ-আব্দার জল হইয়া যাইত; তাহারা আর কোন কথা বলিত না—কোন বাহানা তুলিত না।

(৪)

আজ অম্বুবাচী। বিধবা করুণা অগ্নিস্পর্শ করিবে না। ছেলে দুটীও সুতরাং এ পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই—খাইবার আব্দার করিতেছে। করুণা ভাবিতেছে—বউ যদি নিতান্তই ছেলে দুটাকে ডাক না দেয়—তবে তারা আজ খাইবে কি? কি বলিয়া সে তাহাদের খাবার জন্ত আজ বউকে অনুরোধ করিবে। দাদার নিকটেই বা কি করিয়া তাহা প্রকাশ করিবে?

ছেলে দুটার কথাই বসিয়া বসিয়া করুণা ভাবিতেছিল। এমন সময় বাহির বাটীর দিকে যাইতে যাইতে যতীশ ডাকিল “করুণা আজ তোমার উপবাস?”

বহুদিন পরে করুণা অপ্রত্যাশিত ভাবে দাদার সস্নেহ সম্বোধন শুনিয়া নিজকে ঠিক রাখিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আবেগ ও বেদনা যেন অশ্রু কোন পথ না পাইয়া তাহার দুই চক্ষু ঠেলিয়া সবেগে বাহির হইতে লাগিল। করুণা শব্দ করিতে পারিল না।

ভ্রাতা ও ভাতৃবধূর নিত্য তাচ্ছিল্যে সঞ্চিত বেদনারাশি হৃদয়ের পরতে পরতে যাতনার উৎস জমাইতেছিল তাহা

সহসা যেন ভ্রাতার অযাচিত সস্নেহ সম্ভাষণের স্নিগ্ধ বাতাসে ঝড়িয়া পড়িল।

যতীশ করুণার গৃহের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল "করুণা তুমি কাঁদিতেছ?"

ভগ্ন স্বরে করুণা বলিল "না দাদা।"

যতীশ ঘরে উঠিয়া দেখিল ছেলেরা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে; যতীশ জিজ্ঞাসা করিল "করুণা ইহারা খায় নাই?" করুণা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "আজ অম্বুবাচি, আমি যে আগুন ছুইব না"।

যতীশের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে একটু উগ্রস্বরে বলিল "তুমি আগুন ছুঁইবে না বলিয়া তাহারা খাইতে পাইবে না। রোজ ত আর তুমি রান্না করিয়া দাও না!"

যতীশের উত্তর শুনিয়া করুণার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—সে কোন উত্তর করিল না। যতীশ বালক দ্বয়কে লইয়া রান্না ঘরে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল গৃহিণী সবে আহার করিয়া উঠিয়াছেন। দেখিয়া যতীশের দু চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—"সবার আগে যে খাইয়া বসিলে, এদের খাওয়া হইল কি না তাহা কি দেখিতে হয় না?" গৃহিণী তেমনি রুক্ষ স্বরে উত্তর করিল "আমি কি জানি তার?"

পত্নীর উত্তর শুনিয়া যতীশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল "কেন তারা বরাবর খায় কোথায়?"

গৃহিণী তেমনি ভাবে বলিল "সে কথা কি আমি জানি, তুমি যেমন ব্যবস্থা করিয়াছ তেমনই খায়।"

যতীশ স্বর নরম করিয়া বলিল "যাহা কিছু পাই মাস কাবারেতো তোমার হাতেই দিই, তবে আমি আর কি ব্যবস্থা করব?"

উগ্র স্বরে প্রতিধ্বনির মত উত্তর হইল "ত্রিশ টাকায় যেমন হইতে পারে তেমনই হইতেছে। এর অধিকতো আমি আর চুরি করিতে পারি না?"

যতীশ রাগে গড় গড় করিতে লাগিল। গৃহিণী অবশেষে বেগতিক দেখিয়া পুনরায় রান্না চড়াইতে বাধ্য হইলেন। ছেলেরা আজ মামার বাড়ীতে পেট ভরিয়া খাইবে বলিয়া আনন্দিত হইল।

গৃহিণীর উপর যতীশের বাক্যগুলি যতই তীব্রভাবে নিপতিত হউক না কেন। গৃহিণী সে গুলিকে আরো উগ্রতর করিয়া সুদে আসলে করুণার উপর বর্ষণ করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। শুনিয়া করুণা মরমে মরিয়া গেল। ইহার পর আর তাহার ভাতৃ গৃহে বাসের সাধ একেবারেই রহিল না।

সন্ধ্যার পর যতীশ আবার করুণার গৃহে আসিয়া ডাকিল—"করুণা।"—

করুণা তখনও জল গ্রহণ করে নাই। সে জন্য কোন ব্যবস্থাও ছিল না। যতীশ বলিল "আজ আফিসে কাগজ পত্র ঘাঁটিতে ঘাটিতে দেখিলাম তোমার স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তোমাদের একটা সম্পত্তি খাজানা বাকীতে নীলাম হইয়া গিয়াছিল। তার অনেক গুলি ডাক ফাজিলী টাকা কালেক্টরীতে আছে। এগুলি লইতে পারিলে এসময় উপকার হইত।"

করুণার এখন আর লুপ্ত সম্পদের গুপ্ত কাহিনী শুনিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে এখন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার জীবনের উপর ধিক্কার আসিয়াছে—তাই ভাইএর গুপ্ত অর্থের দিকে তাহার মন আসিল না। সে কথা গুলি শুনিবার মত করিয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র, কোনও উত্তর করিল না। যতীশও কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

(৫)

করুণার চক্ষে নিদ্রানাই। তাহার বুকের ভিতর অনন্ত চিন্তার ঝড় বহিয়া যাইতেছিল এবং কি উপায়ে এ যাতনার অবসান হইবে ছেলে দুইটীকে বুকের কাছে সজোরে ধরিয়া রাখিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এমন সময় দরজায় শব্দ হইল—"দরজা খোল মা ঠাকুরাণ"।

একটা পরিচিত শব্দ যেন করুণার কানে গেল। করুণা উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল—তাহার বহুদিনের পুরাতন দাসী মাদীর মা—ও আর একটী অপরিচিত লোক। করুণা অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে বলিল 'মাদীর মা তুই আজ এসময়ে কোথা হইতে আসিলি?"

মাদীর মা উত্তর করিল মাঠাকুরাণ—রমন বাবুর মেয়েটীকে লইয়া আসিয়াছিলাম। আজই রাত্রে আবার ফিরা

নৌকায় চলিয়া যাইতেছি। যখন আসিয়াছি, তখন তোমার দুখান চরণও দেখিয়া যাইব মনে করিয়াছি। তাই বাড়ীর দুটা কাঁঠাল ও কয়টা কলা অম্বুবাচিতে খাইবে বলিয়া লইয়া আসিয়াছি। আর দুইটা কথাও আছে, বলিয়া যাইব।"

"কি কথা মাদীর মা। তোর যত্ন আমি জীবনে ভুলতে পারব না মাদীর মা। অমি এখানে অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছি। আমি আর এখানে থাকিব না। তোর সঙ্গে আমিও যাইব। এই ফিরা নৌকাতেই যাইব।" বলিতে বলিতে করুণা মাদীর মার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই কাঁদিয়া ফে'লল।

যদি যাবেই মা ঠাকুরাণ তবে চল। আমার নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে।"

সহসা করুণা যেন ভগবানের অযাচিত দান পাইয়া সকল বিপদ এড়াইয়া উঠিল। সে বলিল "তবে ধর, বড় খোকাকে তুই কোলে নে, আমি ছোট খোকাকে লই।"

দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে করুণা সত্যসত্যই বাহির হইয়া পড়িল।

নৌকায় মাদীর মা করুণাকে বলিল "পরাণ বোস্ যে তোমার বাড়ী ঘর নীলামে কিনিয়া লইয়াছিল তাহাই এখন কিছু টাকা দিলে ছাড়িয়া দিতে রাজি আছে। তাঁর এখন টাকার বিশেষ দরকার। তিনি দুই দিন আমাকে তোমার নিকট পাঠাইতে আসিয়াছিলেন।"

করুণা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মাদীর মা, এক সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইবার আমার সম্বল নাই; তিন তিনটা পেট লইয়া দরজায় দরজায় দৌড়িতেছি—আমি টাকা কোথায় পাইব। আজ বাড়ী পৌঁছিয়া কাল কি খাইব মাদীর মা—এখন সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। আমি টাকা পাইব কোথায়?" বলিতে বলিতে করুণার চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

মাদীর মা কথাটা পাড়িয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন সে অন্য কথা তুলিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া মাদীর মা করুণার জন্য নিজ বাড়ী হইতে ডাইল চাউল ও তরিতরকারী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল। উহার সঙ্গে পাঁচটী টাকা রাখিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। মাদীর মার এ অযাচিত দান করুণা প্রথমে গ্রহণ করিতে চাহিল না। কিন্তু মাদীর মা ছাড়িবার পাত্র নহে। সে বলিল "মা ঠাকুরাণ! তোমার খাইয়া আমি মানুষ হইয়াছি এখন তোমার জিনিস তোমাকে দিব, তা লইতে আর আপত্তি করিও না। তাতে আমার প্রাণে বড় লাগিবে। আমার যাহা জুটিয়াছে তাই দিয়াছি, ঘৃণা করিওনা মা ঠাকুরাণ। তোমার হাতে হইলে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিও।"

পুরাতন আশ্রিতের এ কথাগুলি করুণার প্রাণে যেন কেমন একটা সান্ত্বনা প্রদান করিল। সে অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে বলিল মাদীর মা গত জন্মে তুই বোধ হয় আমার মায়ের পেটের বইন ছিলে, যে যুগে মায়ের পেটের ভাইর আশ্রয়ে নিরুপায় ভগ্নি মাথা রাখিতে পারে না—সে যুগে মাদীর মা, তোর মত মানুষ আছে, একথা ভাবিতেও—"করুণা আর কথা বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল।

মাদীর মারও আর সহ্য হইল না, সেও করুণার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

করুণা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল আজ হইতে ননী ও গোপালকে তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এখন একটু শান্তিতে মরিতে পারিব।

(৬)

"শুনিয়াছ খোকার মা, পরাণ বোস্ বলিয়াছেন, তিনি টাকা পাইলে বাড়ী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু টাকা যদি না দিতে পার, তবে এ বাড়ীতে তেরাত্রের পর চার দণ্ডও থাকিতে পারিবে না। এখন উপায় কি? এই সোমবারেই তিনি আদালতের নাজির আনিয়া বাড়ী দখল লইবেন।"

মাদীর মার কথা শুনিয়া করুণা চিন্তিত হইল। মাথা রাখিবার যে একটু স্থান ছিল, তাহাও আর রক্ষা পায় না বুঝি। করুণা বলিল 'মাদীর মা তুই আর এক বার তাঁর নিকট যা, বল যে তিনি বাড়ী ঘর লইয়া যাউন আমরা টাকা কোথায় পাইব যে তা দিয়া রাখিব। তাকে বল যে, ছেলে দুটাকে যেন পথের ভিখারী করেন

না। ভগবান তাঁর মঙ্গল করিবেন। তাঁর কিনা বাড়ী-তেই তিনটা প্রাণীকে মাথা রাখিতে দিন। আমরা আর কিছু চাই না। গাছের ফল—সব যেন তিনি নেন। আমরা তাঁহার জন হইয়াই থাকিব। তারতো এমন লোক ঢের আছে। মাদীর মা যা বোন্।"

মাদীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

অর্থে যাহার প্রলোভন, শত সহস্র আর্ত্তনাদেও তাহার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয় না। সেই ক্রেতা মাদীর মার কথায় একটুও বিগলিত হইল না। তবে সে নগদ টাকা পাইলে কিছু ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল। কিন্তু যে পথের ভিখারী, সে করুণা টাকা পাইবে কোথায়? যাহার দিন গুজরাণ কষ্টকর, সে টাকা দিবে কেমন করিয়া?

(৭)

তিন দিন মাত্র সময় আছে। করুণা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। এতদিন একটা আশ্রয় ছিল। করুণা আধপেট খাইয়াও একটা ঘরের নীচে মাথা রাখিতে পারিত। আর দুই দিন পর তাহার সে স্থানটুকু পর্য্যন্ত থাকিবে না। করুণা চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় খবর আসিল পর দিন প্রভাতে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। প্রাতে আদালতের লোক পরওয়ানা লইয়া বাড়ী দখল করিতে আসিবে। সে দিন রাত্রে করুণার গৃহে আর বাতি জ্বলিল না। দাসীটী কত অনুনয় বিনয় করিল—করুণা কিছুতেই আর মাথা তুলিল না। বালক দুটী করুণার দুই পার্শ্বে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। মায়ের দুঃখ দেখিয়া অবোধ শিশুদেরও কান্না লোপ পাইল। তাহারা আপন মনে ঘুমাইয়া পড়িল। মাদীর মা তাহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া যাইতে চাহিল, করুণা তাহা দিল না। সে পুত্র দুটীকে দুই হাতে দুই দিকে বুকে চাপিয়া লইয়া উপুর হইয়া পড়িয়া রহিল।

ভোরে পরওয়ানা লইয়া আদালতের লোক জন আসিয়াছে। প্যাদা পিয়নের কোলাহল ও ঢোলের উচ্চ শব্দে বাড়ীতে একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। এই সময় যতীশচন্দ্রও করুণার ডাক ফাজিলি টাকাগুলি লইয়া আসিয়া পহুছিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোলমাল একটু থামিয়া গিয়াছে। সহসা মাদীর মা বাড়ীর ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া সকলেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন ঘরের মাঝখানে বিছানায় পড়িয়া মরণাহতা করুণা শিশুদুটীকে আঁকরাইয়া ধরিয়া মৃত্যু যাতনায় ছটফট করিতেছে।

লাঞ্ছিত জীবনের যাতনাভোগ হইতে সদ্য অব্যাহতি লাভের জন্য দুঃখিনী বিষফল ভক্ষণ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

সকলেই তখন ডাক্তারের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ডাক্তার যখন আসিল, তখন অভাগিনীর দেহে মৃত্যুর চাঞ্চল্য শেষ হইয়াছে।

শিশু দুটী তখনও মাতার নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছিল।

দাদার যে স্নেহের আহ্বানের জন্য করুণা এত লালাইত ছিল—তাঁহার আকুল আহ্বান আজ আর তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিল না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সুজনের সহবাস।

সাবানের গায়ে জড়ানো গোলাপ
ভুর ভুর ছুটে গন্ধ!
মাখি মুখে তারে, প্রিয়া স্নানাগারে,—
মেতেছে সখের অন্ধ!
প্রিয়া কয় হাসি, "তুই লো সাবান,
বল্ কোন ছল করি,
মালঞ্চ লুটিয়া, গোলাপ বধূর
হৃদয় করিলি চুরি!"
ফেণাইয়া উঠি, রাঙ্গা মুখে তার
সাবান কহিল হেসে—
"চোরা নয় প্রাণ,—সম্পদ আমার
সুজনের সহবাসে!
মাধুরী মন্দিরে, স্বপন রঙীণ্
গোলাপ ফুলের সনে
কেটেছিল মোর, একটী রজনী
গন্ধভরা আলিঙ্গনে!

৺ স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সেই হতে মোর গোলাপী স্বপন
জড়ায়ে গিয়াছে বুকে
সে গরবে আজি ছুঁয়েছি তোমার
গোলাপ-আস্পদ মুখে!
তব সহবাসে, প্রেমিকের হাটে
হাতে হাতে মোর বিক্রী!
মোর আদরের মূলধন তুমি
জানো নাকি নারী চক্রী।
অনুরাগ ধনি! আমি যার আজি
গোলাপ-সেখানে শুরু,
তাইতে বাজারে, টাকায় আমার
তিনটী করিয়া বাক (?)!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু।

হেমেন্দ্রমোহন বসু ময়মনসিংহের অপ্রত্যাসিত H. Bose. অনেক লোকের বাল্যকালে উজ্জল ভবিষ্যতের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। হেমেন্দ্রমোহন সে শ্রেণীর ছিলেন না। পিতা ৺ হরমোহন, খুল্লতাত ৺ আনন্দ মোহন, রোহিনীমোহন বসু তাঁহার প্রতি বংশের যশ ও প্রতিপত্তি রক্ষার ভরসা স্থাপন করিতে পারেন নাই। H. Boseএর প্রথম উদয় সময়ে অনেকে তাঁহাকে দৈব-সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দৈবের পশ্চাতে পুরুষকার যে অসাধারণ আত্মনির্ভর ও অদম্য অধ্যবসায় গুণে গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহাই তাহার জীবনের বিশেষত্ব।

বাল্যকালে হেমেন্দ্রমোহন কিছুদিন ময়মনসিংহে ৺ শরচ্চন্দ্র রায়ের তত্বাবধানে ছিলেন। শরচ্চন্দ্র থাকিতেন ব্রাহ্মদোকানে; হেমেন্দ্রমোহন থাকিতেন তাঁহার পৈত্রিক বাসায়। শরচ্চন্দ্রকে তিন বেলাই তাহার তত্ব লইতে হইত। দেখা যাইত পাঠ্যপুস্তকে বালকের মন নাই। শরচ্চন্দ্র চক্ষুর অন্তরাল হইলেই সে বাঁশী ও বেহালা লইয়া বসিত। কিন্তু অপর দিকে বাহিরের বিষয়ের তত্ব-অনুসন্ধান জন্ত তাহার অসীম অনুরাগ ছিল। তাঁহার বয়সের উপযোগী শিল্প ও বিজ্ঞানের কোন বিষয় লইয়া বসিলে ঐ বালকের বাহ্য জ্ঞান থাকিত না, সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত।

কলেজ জীবনে প্রবেশ করিয়াও হেমেন্দ্রমোহন বিশ্ব-বিভালয়ের সরস্বতীর সঙ্গে তেমন সক্ষ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। হয় সে ফটোগ্রাফ লইয়া ব্যস্ত, নয় ছিনো-মেটগ্রাফ লইয়া মত্ত। কলিকাতার কর্ম্ম-দেবতা অনির্দিষ্ট অলক্ষ্য পথে তাহাকে লইয়া বহুদিন ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

হেমেন্দ্র মুনসেফের পুত্র, দেশ বিশ্রুত আনন্দমোহনের ভ্রাতষ্পুত্র। রাজকীয় উচ্চশ্রেণীর কার্য্যে প্রবেশ করিবার তার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু হেমেন্দ্রমোহন যে উপাদানে গঠিত ছিল তাহাতে ঐ সুযোগ গ্রহণে কখনও তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কেশ-তৈলে তাহার মন গিয়াছিল, তাহা জানিনা। আমি তাহার কলিকাতার কারখানায় দেখিয়াছি অপর্য্যাপ্ত পরিস্রুত গন্ধ-তৈল এবং রেসমি ফিতায় নিবদ্ধ-কুণ্ডলা রূপসী বালিকার ন্যায় স্বর্ণবর্ণ "কুন্তলীন।" "কুন্তলীনেই" H. Bose সর্ব্বত্র পরিচিত; কুন্তলীনেই H. Bose সম্পন্ন ও সৌভাগ্য শালী।

হেমেন্দ্রমোহনের সম্পদের কথা অধিক বলিব না। সে যে একটী অমূল্য ধনে ধনী ছিল তাহা তাহার সহৃদয়তা। যেমন সহৃদয়, তেমনি সদানন্দ। তাহাকে কখনও বিষন্ন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে নিজে প্রফুল্লছিল; সে যে বৈঠকে বসিত সে বৈঠক তাহার সদালাপ ও অট্টহাস্তে মুখরিত হইয়া উঠিত। অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া হেমেন্দ্র কেবল আত্মসুখের সন্ধান করে নাই। দীন দুঃখীর অভাব মোচন করিতে সে মুক্ত হস্ত ছিল।

দেশীয় শিল্পের উৎসাহ দানে তাহাকে সর্ব্বদাই অগ্র-বর্ত্তী দেখা যাইত। যেখানে শিল্প-প্রদর্শণী সেই স্থানেই হেমেন্দ্রমোহন স্বয়ং বা তাহার সহযোগীগণ উপস্থিত থাকিতেন। শিল্পের এক প্রধান আকর্ষণ—সৌন্দর্য্য। মনের মতন মনোরম না হইলে তাহার স্বস্তি থাকিত না। এই গুণেই হেমেন্দ্রমোহন "কুন্তলীন প্রেস"কে একটী আদর্শ মুদ্রা যন্ত্র করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল।

"কুন্তলীন পুরস্কার" কথা-সাহিত্যের সামান্ত উপকার

করে নাই। বর্ত্তমান সময়ের অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক তাহার নিকট ঋণী।

গত ২৮শে আগষ্ট সোমবার হেমেন্দ্রমোহন পরলোকে গমন করিয়াছেন। সহসা তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকল হইয়া যায়। মৃত্যুকালে তাহার বয়স অনুমান ৫০ বৎসর হইয়াছিল। যশঃ ও সম্পদের মধ্যাহ্নকালে হেমেন্দ্রমোহন চলিয়া যাইবেন ইহা ভাবিতে পারি নাই।

ময়মনসিংহ এখনও উপেন্দ্রকিশোরের শোক ভুলিতে পারে নাই। এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই হেমেন্দ্রমোহনও চলিয়া গেলেন। ময়মনসিংহ বাসীর পক্ষে ইহা অতি দুর্ভাগ্যের বিষয়।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা রওনা হইলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় আমরা হটাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া বিশেষ বিস্মিত ভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলাম। এসব স্থানের অধিবাসী'দগের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানের লোকেরা কেহ কেহ ইহা ব্যবহার করিতেছিল বটে,কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম।

কিয়দ্দূর গমনের পর আমরা অদূরে দুইজন সাহেব দেখিতে পাইলাম। উহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা বন্দুক। তাঁহারা পদব্রজেই আসিতেছিলেন। সহসা আমাদিগকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের সাহেব দুজনকে দেখিতে পাইয়া বোধ হইল যেন বিশেষ আনন্দের সহিত আমাদের পানে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারাও ইংরাজ। সখের ভ্রমণ ও শীকার করিতে এদেশে আসিয়াছেন। দুইজনেই ধনীর সন্তান। আজ প্রায় এক মাস উর্দ্ধে উঁহারা মোম্বাসা ছাড়িয়া এইদিকে আসিয়াছেন। উঁহাদের সঙ্গে নয়জন দেশী কুলি ছিল। দুই দিবস পূর্ব্বে প্রাতঃকালে উঁহারা নিদ্রাভঙ্গের পর দেখেন, সঙ্গের সমস্ত কুলি অদৃশ্য হইয়াছে। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনটা বন্দুক, কিছু বারুদ, ও আরও কয়েকটি দ্রব্য অদৃশ্য হইয়াছে। এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সাহেব দুইজন অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন। কি যে করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

তাঁহাদের এই কাহিনী শুনিয়া কাপ্তেন সাহেব কিয়ৎক্ষণ ডাক্তার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল যে, আজ আমরা উঁহাদের শিবিরে অবস্থান করিব, এবং উঁহাদের বিষয়ে কোনও বন্দোবস্ত করিয়া রওনা হইব। যে স্থানে আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহার নিকটেই উঁহাদের শিবির। অবিলম্বে আমরা ঐস্থানে উপস্থিত হইলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমাদের সঙ্গে একজন ঐ দেশীয় গাইড ছিল। সে বলিল যে ৫।৬ মাইল দূরে একজন দেশী রাজা বাস করেন। তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, আমরা অবিলম্বে ইচ্ছানুযায়ী কুলি পাইতে পারি। তখন স্থির হইল যে, আহারাদির পর কাপ্তেন সাহেব, ট, সাহেব (নূতন সাহেবদের একজন) ও আমি ঐ গাইডকে সঙ্গে লইয়া ঐ রাজার নিকট যাইব। ৬ মাইল পথ অধিক নয়। এইজন্য স্থির হইল যে, আমরা বেলা দুইটার সময় রওনা হইব। রতিকান্তের বিশেষ ইচ্ছা ছিল আমাদের সহিত যায়। কিন্তু কাপ্তেন সাহেব সম্মত হইলেন না।

যথাসময়ে আমরা রওনা হইলাম। পথ সামান্য বলিয়া আমরা পদব্রজেই রওনা হইলাম। দুইদিকে গভীর জঙ্গল। তাহার ভিতর দিয়া আমরা কোনও প্রকারে গমন করিতে লাগিলাম। এইভাবে বহুদূর যাইবার পর ট, সাহেব ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। তখন আমাদের মনে হইল যে ৬ মাইল দূরে থাক, বোধ হয় ১০।১১ মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছে। তখন গাইডকে জিজ্ঞাসা করা হইল। সে বলিল, "আর অধিক দূর নাই। এই স্থানে যাইবার দুইটি পথ আছে। একটা খুব সোজা, কিন্তু পথটা একটু দীর্ঘ। আমরা এই পথে চলিতেছি। দ্বিতীয় পথটি ২।৩ মাইলের অধিক নয়। কিন্তু অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল।

আমরা আর আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐখানে উপস্থিত হইব।” যাহা হউক. বেলা প্রায় ৫ টার সময় আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম।

চারিদিকে ঘোর জঙ্গল, মধ্যস্থলে একখানি গ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অধিবাসীর সংখ্যা বোধ হয় ২০০০ হইবে। অধিকাংশ বাড়ী মৃত্তিকা নির্ম্মিত। বড় বড় কাষ্ঠের খুঁটি পুতিয়া তাহার উপর সরু সরু কাট বা বাঁশ বিছাইয়া দেয়, এবং তাহার উপর মৃত্তিকা বিছাইয়া ছাদ প্রস্তুত করে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহারা খেজুর বা তাল পাতার ছাদ প্রস্তুত করে। গ্রামের মধ্যস্থলে রাজার বাড়ী। উহাও মৃত্তিকা নির্ম্মিত, তবে আয়তনে খুব বৃহৎ। আমরা একবারে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম। গ্রামে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বহুতর লোক আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল। ভাবে বোধ হইল সাহেব উহাদের মধ্যে অনেকেই দেখে নাই। তাহারা অবাক হইয়া সাহেবদের দিকে চাহিতেছিল ও নিজের ভাষায় নানা প্রকার মত প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রামের বোধ হয় সমস্ত কুকুর আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। তাহারা যে আমাদের আগমনে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা তাহাদের ক্রমাগত 'ঘেউ ঘেউ' শব্দে আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। গ্রামের লোকদের ব্যবহারও আমার নিকট ভাল বোধ হইল না। আমার মনের ভাব কাপ্তেন সাহেবকে বুঝাইয়া বলাতে, তিনি আমায় নিস্তব্ধ থাকিতে বলিলেন।

ক্রমে ক্রমে আমরা রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই সময় একজন প্রবীণ লোক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান কি ছিল বলিতে পারি না. কারণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একটা আল-খাল্লায় আবৃত ছিল। মস্তকে একটা পাগড়ী ছিল, কিন্তু পায়ে কিছুই ছিল না। বোধ হইল, উহার বয়স ৬০।৬৫র কম হইবে না। গাইড বলিল, “কাপ্তেন সাহেব! ইনিই রাজা পটারন্।” তাহার পর ঐ দেশীয় ভাষায় রাজার নিকট সাহেবদের পরিচয় ও তাঁহাদের রাজার নিকট গমন করিবার উদ্দেশ্য বিবৃত করিল। এই সময় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। রাজা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক বড় দালানে উপস্থিত হইলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে রাজা প্রস্তাব করিলেন যে, আমরা সে রাত্রি তাঁহার নিকট থাকিয়া পরদিবস প্রাতে কুলি লইয়া যাইব। সাহেবেরা কিন্তু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন রাজা বলিলেন, “কুলির বন্দোবস্ত করিতেই প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা লাগিবে। এ অবস্থায় আপনারা কি প্রকারে আজ ফিরিয়া যাইবেন?” তখন অগত্যা আমাদিগকে সম্মত হইতে হইল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে দুই জন লোক আমাদিগকে আহার করিতে ডাকিল। আমরা সকলেই উঠিলাম। এদিক ওদিক ঘুরিয়া আমরা এক বৃহৎ কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। উহার মধ্যে রাজা ও আরও নয়জন লোক বসিয়াছিলেন। মৃত্তিকার উপর চাটাই পাতা ছিল। তাহার উপর সকলে উপবিষ্ট ছিলেন। একটা বৃহৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত থালার মত পাত্রে খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত ছিল। উপরোক্ত নয়জন লোক উহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া আহার করিতেছিল। রাজা তামাক খাইতেছিলেন। আমরা ঐ কক্ষের একদিকে বসিয়া পড়িলাম। আমাদের জন্যও একই পাত্রে আহার্য্য আসিল, কিন্তু আমার কথায় গাইড আর একটা পাত্র আনাইল। তখন আমি ও গাইড এক পাত্রে ও সাহেব দুই জন অন্য পাত্রে বসিলেন। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে মোটা ২ রুটি ও ডাল আমার ভাল লাগিল। দুই রকমের মাংস ছিল— বোধ হয় কোনও বড় প্রাণীর। আমার কিন্তু তাহা খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। এক রকমের মিষ্টান্ন ছিল— অনেকটা আমাদের হালুয়ার মত। কিন্তু তাহার মধ্যে বোধ হয় লঙ্কা দিয়াছিল। আস্বাদ কিন্তু মন্দ হয় নাই। তিন রকমের তরকারি ছিল। তাহার আস্বাদন আদৌ ভাল লাগিল না। সাহেব দুইজন কিন্তু ঐ তরকারি ছাড়া সমস্ত দ্রব্য বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। আহারের পর ইহারা কেহই মুখ হাত ধুইল না। তাহার পর সুরা ও তামাক আনীত হইল। আমরা কিন্তু, কাপ্তেন সাহেবের ইঙ্গিতে তাহাতে যোগ দিলাম না। রাজার অনুমতি লইয়া আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট শয়ন কক্ষে গমন করিলাম। গাইড বাহিরে গেল। আমরা বসিয়া নানা প্রকার কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে গাইড ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল লোকটা খুব ভয় পাইয়াছে। সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই একবার চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিল, তার পর ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সাহেব দুই জন বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে সাহেব দুজনের নিকটে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল, "গতিক বড় ভাল নয়। ইহারা রাত্রে আমাদিগকে হত্যা করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। শুনিলাম, দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজার এক ভাই একজন লোককে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই অপরাধে ইংরাজরাজ তাহার ফাঁসীর হুকুম দেন। সেই রাগে আজ আপনাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, রাত্রি দুটার সময় এই ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে।" আমিত স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। কাপ্তেন সাহেব কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি স্থিরভাবে বলিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে, এই স্থানে আসিবার একটা খুব সোজা পথ আছে। এই রাত্রি-কালে তুমি সে পথ চিনিতে পারিবে? যদি পার, তবে তোমাকে আমি একটা বন্দুক পুরস্কার দিব।" এ দেশী লোকেরা বন্দুককে বোধ হয় নিজের প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান মনে করে। সাহেব তাহা জানিতেন। সেইজন্য তিনি এই বিপদের সময় গাইডকে এই বিষম প্রলোভন দেখাইলেন। গাইড বিশেষ হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিল, "খুব পারিব। আমি ঠিক আপনাদিগকে এই গ্রাম হইতে বাহিরে লইয়া যাইব। কোনও চিন্তা নাই। কিন্তু রাত্রি ১২টার পর আমরা বাহির হইব। তাহার পূর্ব্বে বাহির হইলে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু জুতা খুলিয়া যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "গ্রামের কুকুরগুলা যদি চীৎকার করিতে আরম্ভ করে।" সকলেই চিন্তিত হইলেন। কি করা যায়? গাইড বলিল, "যদি কয়েকখানা রুটি বা কিছু মাংস সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আর কোনও ভয় থাকে না।"

ঠিক এই সময় বাহির হইতে কেহ দরজায় আঘাত করিল। আমি তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলাম। রাজার একজন কর্মচারী কাপ্তেন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন আপনাদের আর কোনও জিনিষের প্রয়োজন আছে কি?" সাহেব উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাইড বলিল, "আমাদের সাহেব দুইজন এক ২ দিন রাত্রে দুইবার আহার করেন। সেই জন্য যদি খানকয়েক রুটি ও খানিকটা মাংস পাঠাইয়া দেন বড় ভাল হয়।" ভাবে বোধ হইল লোকটার এই প্রস্তাব ভাল বোধ হইল না। কিন্তু সে আর বাক্য ব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ লোকটা আমাদের প্রার্থিত খাদ্যদ্রব্য দিয়া চলিয়া গেল। আমি ঘরে দ্বার বন্ধ করিতেছিলাম, কিন্তু কাপ্তেন সাহেব মানা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এ ঘরের আর কোনও দ্বার নাই। আমরা যদি দরজা বন্ধ করিয়া দি, তাহা হইলে উহারা আমাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়া দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিতে পারে।" দরজা আমরা একবারে খোলা রাখিয়া দিলাম।

রাত্রি ১১টার পর একজন লোক আমাদের ঘরের নিকট আসিয়া কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিল, তাহার পর চলিয়া গেল। প্রায় ১৫ মিনিট পরে সে আবার ফিরিয়া আসিল ও সেইভাবে ঘুরিয়া ২ শেষে আমাদের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কহিল, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, আপনারা ঘর বন্ধ করিয়া দিন। এখানে রাত্রে কেহ দ্বার খোলা রাখে না।" আমরা সকলে লোকদেখান শয়ন করিয়াছিলাম। উহার কথায় গাইড উঠিয়া বসিল এবং কহিল, "সাহেবেরা কখনও দ্বার বন্ধ করেন না। দরজা বন্ধ করিলে উহাদের ঘুম হয় না।" এই জবাবে লোকটা যে সন্তুষ্ট হইল না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি জানি কেন, সে আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না। চলিয়া গেল।

কাপ্তেন সাহেব বলিলেন, "ভাবিয়াছিলাম, উহারা ঘুমাইয়া পড়িবে, অনধিক ২টার আগে উহারা আমাদিগকে আর বিরক্ত করিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উহারা আমাদিগকে ক্রমাগত বিরক্ত করিবে। এ অবস্থায় খুব শীঘ্র আমাদের এ স্থান ত্যাগ করা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে, আমরা একবারে নিরস্ত্র নহি। অবশ্য আমরা গোপনে বাহির হইব। তবে যদি উহারা জানিয়া

কেনে তবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বন্দুক চালাইতে হইবে।” এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমাদের প্রত্যেকের নিকট এক একটা ছয়নলা রিভলভার ছিল।

ঠিক ১২টার সময় আমরা চারি জনে বাহির হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজবাড়ীর দরজা উন্মুক্তই পাইলাম। তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমরা গ্রামের পথে প্রবেশ করিতে না করিতে ৩।৪টা কুকুর তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু মাংস ও রুটির টুকরা দিবামাত্র তাহারা নীরব হইল। আমরা অতি দ্রুত পদে অগ্রসর হইলাম। সকলেই জুতা খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমাদের গমন শব্দ কেহই শুনিতে পাইল না। বিশেষ, সেই গভীর রাত্রে বোধ হয় গ্রামের সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনুমান ৩ মিনিটের মধ্যেই আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এই সময় আমরা আমাদের পশ্চাতে অনেক লোকের কোলাহল শুনিতে পাইলাম। গাইড বলিল, “আমাদের পলায়ন উহারা জানিতে পারিয়াছে এবং বোধ হইতেছে উহারা আমাদের অবলম্বিত পথও জানিতে পারিয়াছে। এখন দৌড়িতে হইবে।” আমরা তখন রীতিমত দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা দলদল ভূমির (পাঁক পরিপূর্ণ জমি) উপর উপস্থিত হইলাম। গাইড বলিল, “ইহা পার হইবার কেবল মাত্র একটী পথ আছে। অন্য পথে যাইলেই পাঁকের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। কাহারও কাছে দিয়াশলাই আছে?” কাপ্তেন সাহেব বলিলেন “আছে।” গাইড বলিল, “আমাকে বাক্সটা দিন। ঠিক আমার পিছনে পিছনে সকলে আসুন। একটু এদিক ওদিক হইলেই পাঁকের মধ্যে পড়িতে হইবে।” গাইড অগ্রসর হইল, আমরা খুব সাবধানের সহিত তাহার পশ্চাৎ ২ চলিলাম। ভগবানের কৃপায় আমরা নিরাপদে ঐ ভীষণ স্থান পার হইলাম।

এই সময় গাইড আমাদিগকে দাঁড়াইতে বলিয়া ঐ দলদলের দিকে ফিরিয়া গেল। ২।৩ মিনিট পরে সে আবার ফিরিয়া আসিল, এবং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহার পর আমরা নিরাপদে ফিরিয়া আসিলাম। যখন আমরা ফিরিয়া আসিলাম তখন গাইড বলিল “আসিবার সময় আমি ঐ দলদলে পথের এক স্থান নষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। সেই জন্য তাহারা আর আমাদের পশ্চাৎ ২ আসিতে পারে নাই।”

পরদিবস আমরা সাহেব দুই জনের জন্য কুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেলাম। তাঁহারা অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। আমাদের সময় ও সুযোগ ছিল না বলিয়া ঐ বিশ্বাসঘাতক রাজার দণ্ডের কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। তবে কাপ্তেন সাহেব পুনঃ ২ বলিলেন যে, তিনি মোম্বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই রাজার শাস্তির বন্দোবস্ত করিবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জঙ্গল ক্রমে ক্রমে বেশ পাতলা হইয়া আসিতেছিল। আরও ৩। ৪ দিন ঐভাবেই চলিয়া বড় বড় গাছের সংশ্রব একবারে কমিয়া আসিল। তখন ছোট ছোট গাছ ও ডাল ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আগে মাঝে ২ এক আধটা গ্রাম নজরে আসিত। এ প্রদেশে কিন্তু জনমানব দেখিলাম না। একটা কারণ বেশ স্পষ্টই দেখিলাম। কোথাও এক বিন্দু জল দেখিলাম না। গাইড আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়াছিল বলিয়া আমরা সঙ্গে জল লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা না হইলে ঐ পথে আমাদের যাওয়া বোধ হয় সম্ভব হইত না।

এ সব দেশে বৃষ্টি খুব কম হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও বিল আছে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে উহা প্রায়ই শুখাইয়া যায়। এই প্রদেশ, এদেশে ‘তারু’ প্রদেশ নামে প্রসিদ্ধ। এ স্থানে আমরা জিরাফ ভিন্ন আর কোনও জন্তু দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই জন্তু উচ্চতায় সাধারণতঃ ১৫ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শুধু গলাটাই প্রায় ৭।৮ ফুট হয়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বড় বড় গাছের উপরের কচি ২ পাতা ইহারা অনায়াসে আহার করিতেছে। তবে যাহারা মনে করেন বা বলেন যে, ইহারা বড় বড় তালগাছের পাতা খাইতে পারে, তাহা-

দের কল্পনার বাহাদুরি আছে। ইহারা মৃত্তিকা হইতে কোনও জিনিষ তুলিয়া লইতে চায় না। কারণ সহজে ইহারা উহা করিতে পারে না। জল খাইবার সময় ইহারা সামনের দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ায়, তাহা না হইলে ঘাড় নীচু করিতে পারে না।

আফ্রিকার অনেক অসভ্য অধিবাসী বন্য জিরাফ্ পোষ মানাইয়া উহার পৃষ্ঠের উপর চড়িয়া থাকে। ইহারা উদ্ভিদভোজী। শীঘ্র কাহাকেও হিংসা করে না। তবে শত্রু উপস্থিত হইলে এমন বেগে পশ্চাতের পা ছুঁড়িতে থাকে যে অনেক সময় পশুরাজকে পর্য্যন্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়। একবার আমরা অনতিদূরে তিনটা জিরাফ্ দেখিতে পাই। কয়েক জন সিপাহী উহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে বড় সাহেব বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অনেক সময় উহারা এত ভীষণ হইয়া পড়ে যে, শীকারীকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হয়।"

তিন দিনে আমরা ঐ জলহীন মরুভূমি পার হইয়া পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর আমরা একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। শুনিলে হয়ত অনেকে বিস্মিত হইবেন যে, গ্রামটি বৃক্ষের উপর (বড় বড় গাছের উপর) অবস্থিত। এক একটা গাছের উপর ৩।৪ খানা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইবার বাঁশের বা কাঠের সাকো নির্ম্মিত হইয়াছে। কোনও কোনও বাড়ীতে ৩টা পর্য্যন্ত ঘর রহিয়াছে। উপরে চড়িবার জন্য মই লাগান আছে। রাত্রে উহা তুলিয়া ফেলা হয়। কচি ছেলেরা পর্য্যন্ত যে প্রকার অনায়াসে নামিতেছে চড়িতেছে দেখিলাম, তাহাতে আমরা সকলেই বিলক্ষণ বিস্মিত হইলাম। কাপ্তেন সাহেব বলিলেন যে, পৃথিবীর আরও অনেক স্থানে এই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সময় ছিলনা বলিয়া আমরা আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

পরদিন অপরাহ্নে আমরা স্থপো গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ইহার চারিদিকে গভীর জঙ্গল। গ্রামের সর্দ্দার বেশ ভাল লোক বলিয়া মনে হইল। সন্ধ্যার পর তিনি ঐদিন আমাদের আমোদের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। আফ্রিকায় আমি অনেক স্থানে অসভ্যদের নাচ গান প্রভৃতিতে যোগদান করিয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব দেখিলাম বলিয়া এস্থানে উহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। বলিয়া রাখা ভাল যে নৃত্যকারীরা সকলেই পুরুষ।

উহারা আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মাণ হইল। প্রত্যেকের হাতে এক ২ গাছা দীর্ঘ যষ্টি। প্রথমেই তাহারা গান আরম্ভ করিল। গান মোটে দুই লাইন। প্রথম লাইন আমার মনে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় লাইন 'ইয় ম ইপোরি।' ইহার অর্থ 'আমরা আপনাদিগকে অভিনন্দন করিতেছি। এই দুই লাইন গাইতে ২ তাহারা নানা প্রকার ভঙ্গিতে গোলাকার ভাবে ঘুরিয়া ২ নাচিতে লাগিল। দেখিলাম এক পায়ের উপর ভর দিয়া নাচাই উহাদের মধ্যে অধিক বাহাদুরি বলিয়া বিবেচিত হয়। বাদ্যযন্ত্র উহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। তবে একজনের হাতের লাঠি অপরের লাঠির উপর ঠুকিয়া উহারা তাল রাখিতেছিল। প্রায় ২০ মিনিট পরে মদের বোতল আনীত হইল। উহারা নাচিতে ২ উহা একে ২ পান করিতে লাগিল, এবং যত নেশা বাড়িতে লাগিল, উহাদের নৃত্য ও গীতের বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষ অর্দ্ধঘণ্টা কাল উহাদের মত্ততা বা উৎসাহ এ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল যে, উহারা পদদ্বয় আকাশের দিকে উঠাইয়া দুই হাতের উপর চারিদিকে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

শুনিলাম ইহারা নৃত্য, গীত ও মদ্য এই তিন দ্রব্যের বিশেষ ভক্ত। ইহারা ৪র্থ বৎসর বয়স হইতে শীকার করিতে আরম্ভ করে। যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করে তখন ইহারা জীবন সঙ্গিনীর সন্ধান করে। যাহাকে পছন্দ হয়, তাহার সহিত ভাব করে, এবং যখন দুজনে বেশ মনের মিল হইয়া যায়, তখন উহারা হঠাৎ গ্রাম হইতে অদৃশ্য হয়। ৫।৭ দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া উহারা একখানি কুটির প্রস্তুত করিয়া স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বাস করিতে থাকে। ইহাই বিবাহ। বিবাহের পর দুই এক বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী মহাশয় কাজকর্ম্ম করিয়া

সংসার পালন করে। কিন্তু ক্রমে২ সংসার চালাইবার ভার সঙ্গিনীর উপর সমর্পণ করিয়া সে সরিয়া দাঁড়ায়, এবং সমস্ত সময় নৃত্য, গীত ও সুরাপানে অতিবাহিত করে। অবশ্য এই মদ ইহাদিগকে ক্রয় করিতে হয় না। ঘরে২ প্রস্তুত হয়। এই প্রকার অলস ভাবে সময় কাটায় বলিয়া এই অসভ্য জাতির সংখ্যা দিন২ হ্রাস পাইতেছে।

এ দেশে চারিদিকে অসংখ্য তাল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তাড়ি ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে। তাড়ি ভিন্ন তাল গাছ অপর কোনও ব্যবহারে আনা হয় না। প্রত্যহ অপরাহ্ণে গ্রামবাসীরা সকলে নিজ২ নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের তলে উপস্থিত হয়; এবং বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীরা যে ভাবে এই সকল বৃক্ষে আরোহণ করে, ইহারাও অবিকল সেই ভাবে আরোহণ করে। এক২ গ্রামবাসীর অধীনে ৩।৩৫ টা করিয়া গাছ। এইজন্য এক২ জনের ভাগে অপর্য্যাপ্ত তাড়ি উৎপন্ন হয়। এদেশের ক্ষুদ্র২ বালক বালিকা হইতে চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত অপরিমিত তাড়ি পান করে। এ প্রকার তাড়ি পানের প্রথা পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোথাও নাই।

পরদিবস আমরা রাম্‌পো গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামখানি ক্ষুদ্র, অধিবাসীর সংখ্যা ১৫০ অধিক হইবে না। পথিমধ্যে আমরা এ প্রকার গ্রাম অনেক অতিক্রম করিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। তাইতর্ নামক একজন জর্ম্মন্ আজ ৫ বৎসর যাবৎ এইস্থানে বাস করিতেছেন। চারিদিককার জঙ্গল হইতে সর্প সকল ধৃত করিয়া ইনি মৃত ও জীবিতাবস্থায় ভিন্ন২ স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন। শুনিলাম এই কার্য্যে ইনি বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন। জর্ম্মানির ইনি একজন পাশকরা ডাক্তার। চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে ইনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আফ্রিকার এই গভীর জঙ্গলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ইঁহার বাসস্থানের শত২ মাইলের মধ্যে অপর কোনও য়ুরোপীয় নাই। অথচ তাহার জন্য ইনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য য়ুরোপের লোক যে কি প্রকার কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে পারেন, ইনি তাহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গ্রামের এক প্রান্তে ইনি একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সর্পাদি রক্ষার জন্য নানা প্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুঠারি প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা যে সময়ে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন ইঁহার নিকট প্রায় ৭০।৮০ টা ভিন্ন২ প্রকারের সর্প ছিল। উহার মধ্যে কয়েক জাতীয় সর্প সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইল। একটা সর্প লম্বায় ৩৫ ফুট অর্থাৎ প্রায় ২৪ হাত। একটি ক্ষুদ্র আধ হাতের অধিক দীর্ঘ হইবে না। গায়ে রং ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, মধ্যে২ লাল রংএর রিং। শুনিলাম ইহারা অত্যন্ত বিষাক্ত হয় এবং এত দ্রুতবেগে ধাবিত হয় যে, অতি দ্রুতগামী অশ্ব পর্য্যন্ত ইহাদের সহিত ছুটিতে পারে না। তৃতীয় এক প্রকার সর্প আমাদের দেশের কেউটের ন্যায়। তবে ইহার ফণা কেউটের অপেক্ষা অনেক অধিক চওড়া। সাহেব বলিলেন যে, এই ৫ বৎসরের মধ্যে তিনি ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা (সকলেই এদেশের লোক) কখনও কোনও সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হয়েন নাই। খুব বাহাদুরির কথা সন্দেহ কি ?

পরদিবস প্রাতঃকালে রওনা হইবার সময় জর্ম্মন্ সাহেব আমাদের কাপ্তেন কে বলিলেন, "ইহার কয়েক মাইল দূরে আপনারা স্পো জাতির অধিকারের মধ্যে উপস্থিত হইবেন। আপনারা হয়ত জানেন না যে, ইহারা নর খাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি নিজে কখনও উহাদিগকে এই কার্য্য করিতে দেখি নাই। তবে এখানকার সকলেই ইহা বলিয়া থাকে। আপনারা সকলে বিশেষ সাবধানে অগ্রসর হইবেন। আপনাদিগকে একটু অসাবধান পাইলেই উহারা আপনাদের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। আমার নিকট একজন এই দেশীয় লোক আছে লোকটা বিশেষ চতুর এবং এখানকার রাস্তা ঘাট ভাল করিয়া জানে। আপনারা যদি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান, বোধ হয় ভাল হয়।"

কাপ্তেন সাহেব বিশেষ ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

শ্রীতুলবিহারী গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

আধুনিক সভ্যতা—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকার বর্ত্তমান কালানুযায়ী সমাজের কিরূপ আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ হওয়া কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয়—শিষ্টতা ও ভদ্রতা; অভিভাষণ ও সম্ভাষণাদি; পরিচয়; বেশ ভুষা; অঙ্গরাগ ও অঙ্গসজ্জা ভদ্রতার কতিপয় সাধারণ বিধি মনের উচ্চতা সাধন প্রণালী; মহিলাগণের পরিচ্ছদ; মহিলাগণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি; অঙ্গ বিন্যাস; সময় নিষ্ঠা; অলসতা; নিমন্ত্রণ; চিঠি পত্র; সভা সমিতি ইত্যাদি। গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দ্বারা নানা জাতি ও শ্রেণীর সংমিশ্রণ জনিত বর্ত্তমান খিচুড়ি-সভ্যতার সংস্কার সাধন দ্বারা ভারতীয় সভ্যতাকে আদর্শ রাখিয়া তাহার সহিত পাশ্চত্য সভ্যতার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া—এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য উচ্চ এবং যদিও তাঁহার নির্দ্দেশিত আচার ব্যবহারের প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু সমাজও দেশকাল পাত্র ভেদে এইরূপ আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ সমাজ সঙ্গত হইতে অনেক সময় সাপেক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক তবুও বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল আচার ব্যবহারের একটা সংস্কার আবশ্যক। ভারতীয় নর নারী ভারতীয় সভ্যতার আদর্শে শিক্ষিত হউক ইহা প্রাচীন মতাবলম্বী দিগের মত হইলেও অবস্থার বিপর্য্যয় ও নানা কারণ বশতঃ সমাজের যে গতি দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে উহাকে পুনরায় দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন খাতে নিয়া ফেলা একবারেই সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ প্রদেশ ভেদে নানা আচার বিশিষ্ট ভারত বাসীদিগকে লইয়া পৃথিবীর অপরাপর জাতির সহিত প্রতিযোগীতা করিতে সক্ষম এমন একটা 'নেশন' গড়িতে হইলে পাশ্চত্য সভ্যতার সহিত ভারতের সকল প্রদেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহারের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। গ্রন্থকার এই পুস্তকে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। পরন্তু আধুনিক সভ্যতা প্রয়াসী অনেক শিক্ষিত লোকও সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রকৃত চাল চালনের সম্যক অনুশীলন করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে অপদস্থ হইয়া পড়েন। এই সকল নিবারণ কল্পেও গ্রন্থকার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি পাঠে যুবকদিগের আদব-কায়দার অনেক সংশোধন ও নূতন শিক্ষা হইবে। সুতরাং ইহা যে বালক ও যুবকগণের শিক্ষাও আদরের সামগ্রী হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। স্থানে স্থানে যৎসামান্য ভুল ভ্রান্তি থাকিলেও গ্রন্থের ভাবও ভাষা ভাল হইয়াছে। মূল্য আট আনা; কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সাহিত্য সংবাদ।

গো-ধন প্রণেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নূতন সামাজিক উপন্যাস "উধাও রমা" প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী" ১ম খণ্ড লিখা শেষ করিয়া তাহা মুদ্রণ জন্য রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এখন তিনি উহার দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীমান প্রফুল্ল কৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার "চমচম" বাহির করিয়াছেন।

Printed by Satish Chandra Rai at the Jagat Art Press. Dacca. Published by Kedarnath Majumdar, Mymensingh.
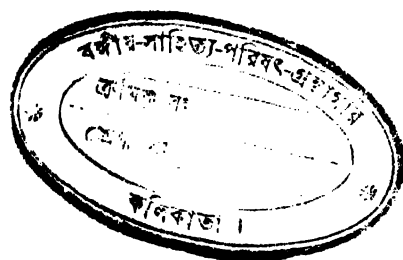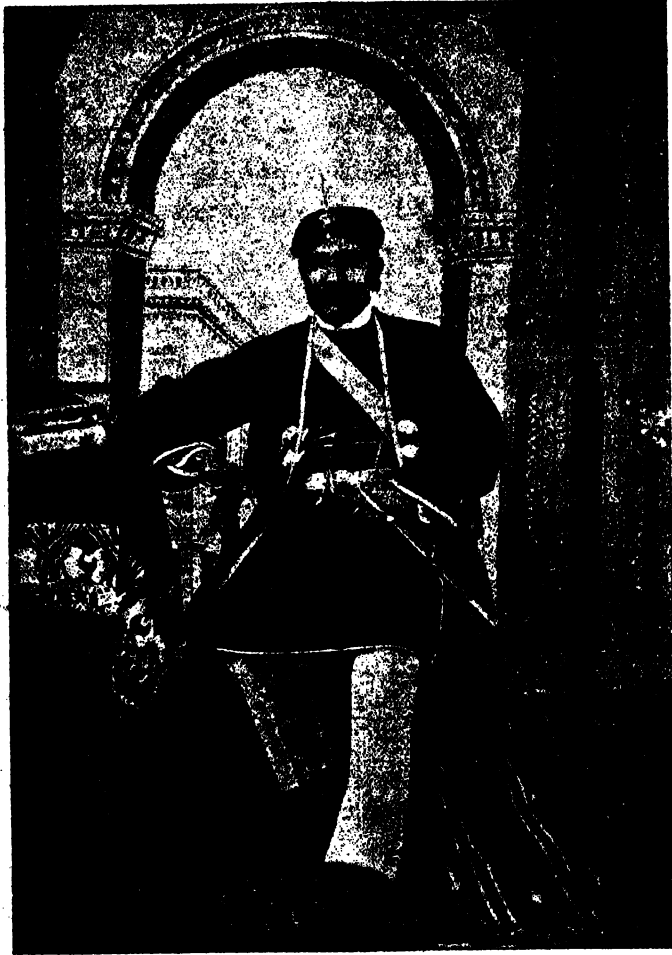
স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

পঞ্চম বর্ষ } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

সাহিত্যের নবীন বিষয়।

এথেন্সে যখন সক্রেতিসের দার্শনিক চিন্তা ও শিক্ষার প্রভাব দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল এবং তার ফলে, ধর্ম্ম ও নীতিতে এথেন্সবাসীদের গৃহীত মতের আসন যখন আস্তে আস্তে টলিয়া আসিতেছিল, তখন এরিষ্টফেনিজ্ দার্শনিক মাত্রেরই এবং বিশেষতঃ সক্রেতিসের বিরুদ্ধে 'বারিবাহ' নামক তাঁহার বিখ্যাত কৌতুকাত্মক নাটক লিখিয়াছিলেন। দার্শনিকদের গভীর, নীরস, মানবের সুখদুঃখে নির্ব্বিকার, চিন্তার যে বিশেষ কোন পরিণাম নাই—মেঘের গতি কিংবা মাছির দৌড় নির্ণয় করা ছাড়া যে ইহার আর কোন লক্ষ্য নাই—সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করা ছাড়া ইহার যে আর কোন কাজ নাই—উপহাসচ্ছলে এরিষ্টফেনিজ্ তাহাই কহিতে চাহিয়াছিলেন। ঋণদায়ে জর্জ্জরিত কোনও এক ব্যক্তি ঋণমুক্তির কোন উপায় না দেখিয়া সক্রেতিসের শরণ নিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; আশা ছিল, যদি সক্রেতিস তাঁহার গবেষণার ফলে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে তাঁহার ঋণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই এবং ঋণশোধ করা বলিয়া কোন ক্রিয়ার জন্ম হয় নাই। এরিষ্টফেনিজের নাটকের ইহাই গল্পাংশ। দার্শনিকেরা যে এক পরশমণির সন্ধানে ঘুরেন যাহার স্পর্শে প্রস্তর হীরক হয়, তামা সোণা হয় এবং অবস্তু বস্তু হয়, দার্শনিকের প্রতি সমাজের ইহা সনাতন উপহাস। শুধু দার্শনিক নয়, যারা একনিষ্ঠ, আত্মবিস্মৃত হইয়া কোনও সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, মানুষ তাহাদের সেই একাগ্রতাকে উপহাস না করিয়া পারে নাই। ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ (Bergson) বলেন যাহার জীবন-গতি ক্ষীণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যাহার দৃষ্টি নাই, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উপযোগী প্রতিক্রিয়া যে দেখাইতে পারে না, সে-ই উপহাস্য। একনিষ্ঠ ভাবুকের আত্মবিস্মরণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার—দেশকাল পাত্রের প্রতি অমনোযোগের লক্ষণ। সুতরাং মানুষ তাহার খরচে একটু হাসিয়া লইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সক্রেতিসকে এথেন্সবাসীরা হাজার সম্মান করিলেও এরিষ্টফেনিজের নাটক তাহাদিগের চিত্তে হর্ষসঞ্চার করে নাই, এমন নহে। কারণ, তাহা হইলে, এতদিন এরিষ্টফেনিজ জগতে টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না। সাহিত্য তখন দর্শনকে নিজের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে নাই, আর দর্শনও, তখন 'জগতের আদিকারণ জল না বায়ু না অগ্নি—ইত্যাদি প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোন চিন্তায় ব্যাপৃত হয় নাই। কিন্তু দর্শন আজ নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইয়াছে এবং সাহিত্যও অনেক নূতন বিষয়কে আপন করিয়া লইয়াছে।

ধর্ম্ম, সমাজ, বা গৃহ সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রশ্ন, কিংবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কোনও বিশিষ্ট সমস্যা, কিংবা কোনও বিশিষ্ট জীবন—সাহিত্য অনেক দিন নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করে নাই। নায়ক সদ্বংশপ্রভবই হউক কিংবা ইতরজনই হউক, মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখ, সাধারণ স্নেহ ভালবাসা, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির বিকাশ বর্ণন এবং শ্রোতা বা পাঠকের মনে তদনুযায়ী ভাব স্ফুরণই অনেক কাল সাহিত্য চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। উদাত্ত,

উদ্ধত, ললিত, কিংবা প্রশান্ত নায়ক, মুগ্ধা, মধ্যা কিংবা প্রগল্‌ভা নায়িকার সহিত যে প্রেম করিতে পারেন তাহাকেই মূল লক্ষ্য করিয়া প্রসঙ্গক্রমে সাধারণতঃ মানুষের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটিতে পারে—যে সব চিত্তপ্রবৃত্তির প্রকাশ হইতে পারে, তাহারও বর্ণনা, শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অনেক কাল দৃশ্য-শ্রব্য কাব্যের একমাত্র না হইলেও প্রধান উপকরণ ছিল। সাধারণতঃ মানুষের জীবনে যে মিত্রলাভ বা সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ বা সন্ধি হয় তাহার বাহিরে সাহিত্য অনেককাল যাইতে চায় নাই। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা, কোনও পরীর কিস্‌সা কিংবা কোনও প্রাচীন উপকথাকে আশ্রয় করিয়া অনেককাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের সম্পর্ক কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত বা সৌরভ মানুষের চিত্তে যে সব ভাবের, যে সব অনুভূতির সৃষ্টি করে তাহাকেই শিল্প সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত ভাষায় প্রকাশ করা অনেক কাল সাহিত্যের একমাত্র কর্ম্ম ছিল। ইংরেজ কবি টম্‌সন্ (Thomson) কিংবা ভারত-কবি কালিদাসের সীজন্‌স্ (Seasons) বা ঋতু-সংহার হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের অনেক কাব্যই মানুষের সাধারণ সম্পর্ক বা মানব-জীবনের সাধারণ ঘটনা হইতে যে সব অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাহার, কিংবা সাধারণ মানুষের চারিদিকে প্রকৃতির রঙ্গালয়ে যে সব নিত্য নূতন পট পরিবর্ত্তন—যে সব নিত্য নূতন দৃশ্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহার বর্ণনা ছাড়া অন্য কিছুকে সাহিত্য নিজের উপাদান বলিয়া অনেক কাল গ্রহণ করে নাই। মানবচিত্তের ভাবপ্রবাহও তার রসানুভূতিই ছিল কাব্যের প্রধান উপাদান এবং কাব্যই ছিল সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। কোন গভীর প্রশ্ন, ধর্ম্ম বা নীতি, সমাজ বা গৃহ প্রভৃতির কোন কূট সমস্যা—কোনও প্রবীণ সত্যের ধ্যান, কোনও নবীন সত্যের সন্ধান, ধর্ম্ম বা নীতির উন্নতি, সমাজ বা গৃহের সংস্কার—এ সকলকে কাব্য অনেক দিন নিজের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে নাই। কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আর, অনেককাল ধরিয়া দর্শন ভাবিয়াছে জগতের আদি উপাদান জড় না চেতন;—জগতের পরিণতি জীবনে বা মরণে—মানুষের আত্মা নশ্বর না অবিনশ্বর। শনি বড় না লক্ষ্মী বড়,—এই প্রশ্ন শ্রীবৎস রাজাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল; জড় বড় না চেতন বড়, এই প্রশ্নও অনেক কাল পৃথিবীর বিশেষতঃ ইউরোপের চিন্তাকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। মোক্ষোপায়ের কথা—ঐহিক জীবন হইতে মুক্ত হইবার উপায়, কিংবা অনাবশ্যক জ্ঞানের কথাই অনেক কাল দর্শন একমাত্র জ্ঞান লাভের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। আবশ্যক না অনাবশ্যক এই প্রশ্ন না তুলিয়া দর্শনের প্রবীণ জিজ্ঞাসা ছিল শুধু সত্যের সন্ধান। হৃদয়কে প্রশ্রয় দেওয়া, মানুষের সুখশান্তি লাভের ইচ্ছার প্রতি সহানুভূতি দেখান—এ সকলকে অনেক কাল দর্শন নিজের গাম্ভীর্য্যের বিরোধী মনে করিয়াছে। ঐহিক জীবনের উন্নতি, গৃহে সমাজে ও রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তির বিস্তার, মানুষের সকল বাসনার সংযত অথচ পূর্ণ সফলতা,—এ সকলের উপায় অনেক কাল দর্শনশাস্ত্র চিন্তা করে নাই। ব্যক্তি বা সমাজের অত্যাচার অবিচার—দুর্ব্বলের হীনতা ও দৈন্য—মানুষের ঐহিক দুঃখ ও দারিদ্র্য—ঐহিক উপায়ে এ সকলের নিরাকরণের চিন্তা অনেক কাল দর্শন-চেষ্টার অঙ্গীভূত হয় নাই। ধনী দরিদ্রের প্রভেদ, পুরুষ নারীর সম্পর্ক—মনীব চাকর বা নিয়োক্তা ও নিযুক্তের সম্বন্ধ,—রাষ্ট্রে ও সমাজে লোকের অধিকার অনধিকার,—এ সকলের কথা অনেক কাল দর্শন অবহেলা করিয়াছে। কিন্তু Auguste Comte, John Stuart Mill ও Herbert Spencer প্রভৃতি চিরস্মরণীয় হউন, আজ দর্শন তার বিপুলীকৃত চিন্তাক্ষেত্রের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে এ সকলেরও স্থান করিয়া দিয়াছে।

দর্শ-পৌর্ণমাসী ব্রত বা পুত্রেষ্টি যাগ,—পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পূত প্রেতের (God the father, God the son ও Holy Ghostএর) সম্বন্ধ—ধর্ম্ম যে কতকাল এ সকল কথার চিন্তায়ই ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু মানুষের ঐহিক সুখের চিন্তা, ঐহিক জীবনের আচার ও নীতি, সমাজের গঠন ও উন্নতি—সমাজে ব্যক্তির কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য—এ সকলের চিন্তা অনেক কাল ধর্ম্মের অঙ্গ হয় নাই। পিতা পুত্র, ভ্রাতা

ভগ্নী, পতি পত্নী প্রভৃতি বিবিধ সম্বন্ধে মানুষের বিবিধ কর্ত্তব্য, সমাজে তাহার বিবিধ অধিকার অনধিকার প্রভৃতির কথা ধর্ম্ম অনেক কাল অবহেলা করিয়াছে। ইহ জীবন ঐহিক সুখ দুঃখ প্রভৃতির প্রতি প্রবৃত্তিকে ধর্ম্ম অনেক কাল ঘৃণা করিয়াছে। সন্ন্যাস, বৈরাগ্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠাকে ধর্ম্ম অনেক কাল তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে। এ পৃথিবীকে একটা বন্ধনাগার এবং এ জীবনকে একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধন মনে করিয়া তাহার মধ্যেও যে কর্ত্তব্য থাকিতে পারে—এ কথা ধর্ম্ম অনেক কাল স্মরণ করে নাই। এশিয়ার বাহিরে উল্লেখযোগ্য কোন ধর্ম্ম পদ্ধতির উদ্ভব হয় নাই; এবং এশিয়ার সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই ইহ জীবনকে—এ দেহে অবস্থিতিকে—পাপ মনে করার দস্তর আছে। যাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত চেষ্টা একটা দূর ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, নিকট ঐহিক জীবনের করণীয়কে সে ভুলিয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আজ মানুষের সমগ্র চিন্তার গতি ফিরিয়াছে। ভবিষ্যতের, কল্পিত স্বর্গের মোহে আবদ্ধ, ভবিষ্যতে মঙ্গলপ্রসূ উপায়ের চিন্তায় ব্যাপৃত, কর্ম্মচিকীর্ষু মানব মণ্ডলীর কোলাহলে লুপ্তপ্রায় উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি' বলিয়া যে ধ্বনি উঠিয়াছিল, গ্রীক চিন্তায়—রাজনীতি ও কলাবিদ্যা ও ব্যবসায়ে লিপ্ত গ্রীকদের মনেও যে আত্মজ্ঞানের সাড়া পড়িয়াছিল—আজ পূর্ণ গতিতে সেই চিন্তায় মানুষের মন নিযুক্ত। গৃহের প্রতি কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য চিন্তা করা—নিকট বর্ত্তমানকে তুচ্ছ করিয়া দূর ভবিষ্যতের চিন্তা করা—এ জীবনকে ভুলিয়া গিয়া পর জীবনের সুখ সম্ভোগের চিন্তা করা—যে ভুল, ইহা যে একদেশদর্শিতা, জগৎ আজ এ কথা বুঝিয়াছে। ঐহিক জীবনের প্রতি আজ মানুষের দৃষ্টি পড়িয়াছে; ইহা যে নিতান্তই একটা ভ্রান্তি—একটা প্রকাণ্ড পাপ নহে, একথা বলিতে আজ আর মানুষ লজ্জিত নহে। ভবিষ্যতে আমরা আস্থাহীন নহি; কিন্তু ভবিষ্যৎ যে বর্ত্তমানের গর্ভে, পথ না বাহিয়া যে কখনও গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায় না, এ জীবনের কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিলেই যে ভবিষ্যতের জন্য পুণ্যসঞ্চয় হয় না—বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিলেই যে ভবিষ্যৎ সুন্দর হইয়া উঠে না, এ সত্য আজ আমাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান। মর্ত্ত্যে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা, ইহ জীবনে সুখময় অনন্ত জীবনের ভিত্তি স্থাপন, এ জীবনের কর্ম্ম-চেষ্টার ভিতরে ব্যক্তির ও সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বীজ বপন—এ সকলের চিন্তাকে ধর্ম্ম এখন আর পরমার্থ চিন্তার বাহিরে মনে করে না।

আজ ধর্ম্ম ও দর্শনের সহিত সাহিত্যের শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। চিন্তার কারুগৃহে মানুষ যে শ্রম-বিভাগ প্রচলিত করিয়া দিয়াছিল—সিদ্ধি-সৌকর্য্যার্থে রসায়নবিদ্ ও পদার্থবিদ্, দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রভৃতির মধ্যে যে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—একের ক্রিয়ার সহিত অন্যের ক্রিয়ার আপাততঃ যে সম্বন্ধের অভাব সৃষ্ট হইয়াছিল, মানুষ আবার স্মরণ করিয়াছে যে এ সকল চিরকালের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। পরিপূর্ণ চিন্তার স্রোতে মানুষ আবার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, ঋজু-কুটিল—কাব্য দর্শন—প্রভৃতি নানা পথ অনুসরণ করিয়া সে একই চরম লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছে। পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই যে ব্যক্তির সে যেমন বুঝিতে পারে না যে তাহার জীবনের বিবিধ বিচিত্র কর্ম্ম চেষ্টার লক্ষ্য এক বই দুই নয়, বিবিধ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র তত্ত্বের সন্ধানে নিযুক্ত মানবমণ্ডলীও তেমনই অনেক কাল ভুলিয়াছিল যে দর্শন ও বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সমস্তের ভিতর দিয়া সে একই চরম পরিণতির চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আজ বর্দ্ধমান ক্রিয়া ও পূর্য্যমাণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবার স্মরণ করিয়াছে যে বিজ্ঞানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট সত্য হইতে আরম্ভ করিয়া যেমন ব্যাপী সাধারণ সত্যের উৎপত্তি হয়—বিবিধ বিশিষ্ট বিজ্ঞান হইতে যেমন পরিণত দর্শনের জন্ম হয়, তেমনই দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত চেষ্টা হইতে একটা পূর্ণতর, মহত্তর জীবনের উদ্ভবই মানুষের চরম অভিলাষ। তাই আজ ধর্ম্ম-দর্শন প্রভৃতির সহিত সাহিত্যের আর কোন বিরোধ নাই।

তাই আজ দর্শনের প্রাচীন সমস্যা, বিজ্ঞানের নবীন সত্য, ধর্ম্মের গভীর অনুভূতি, ধীরে ধীরে সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং

প্রভৃতির কাব্যে ধর্ম্মের কথা, নীতির কথা, পরলোকের কথা, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধের কথা স্পষ্ট ভাবেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বাস্তব জগতের প্রতি দৃষ্টি, সমাজের অন্ত্য শ্রেণীর প্রতি করুণা, সমাজের আর্থিক ও নৈতিক নিয়ম প্রভৃতির বিষয় ইহাদেরও কাব্যের প্রধান বিষয় নয়। যে কবি লিখিয়াছিলেন 'what man has made of man' 'মানুষ মানুষের কি করিয়াছে' মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারে তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিত। যে কবি রমণীদের কলেজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন। তথাপি ইহাঁরা বাস্তব সমাজের কলঙ্ক, বাস্তব মানব মণ্ডলীর দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দ্দশাকেই প্রধান বিষয় করিয়া নেন নাই। অবস্থা বিশেষে পড়িয়া কিংবা প্রকৃতির নাট্যশালার কোনও এক বিশিষ্ট দৃশ্যের সম্পর্কে আসিয়া কিংবা আর্থারের বা লুসীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া কিংবা বন্ধুবিচ্ছেদে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহাদের নিজেদের চিত্তে যে ভাবের প্রবাহ বহিয়াছে, তাহাই তাঁহারা নানা ভঙ্গিতে আমাদের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা, উপকথার বিবরণ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির বৃত্তান্ত, এ সকলকে আশ্রয় করিয়াই ইহাঁদের কাব্য-সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে। লণ্ডন মিউনিসিপালিটীর কলঙ্কের কথা বিবাহিত নারীর অধিকার-অনধিকারের কথা, পতিতা রমণীদের প্রতি সমাজ-বিধির নিষ্ঠুরতার কথা, মজুরদের দুরবস্থার কথা—এ সমস্ত ইহাঁদের সময়েও কাব্যরূপ রসাত্মক বাক্যের রসসঞ্চার করিতে সমর্থ হয় নাই। তখনও মানুষ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ব্যায়ামের মত, সঙ্গীতের ন্যায় কাব্যকেও মানসিক স্বাস্থ্যের উপায় মাত্র মনে করিত। কাব্য তখনও শিক্ষার বাহন, সমাজ সংস্কারের পথ প্রদর্শকরূপে গৃহীত হয় নাই। চিত্রে যেমন, কাব্যেও তেমনই প্রকৃতিতে—বাস্তবে যাহা নাই, প্রকৃতি হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার সৃষ্টিকেই আদর্শ বলিয়া ধরা হইত। কবি সৃষ্টি করিবেন—কল্পনার সাহায্যে নূতন জিনিসের উদ্ভাবন করিবেন—বাস্তব হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া মধুরতর অবাস্তবের সৌন্দর্য্যে মানুষের চিত্তকে মোহিত করিবেন—তখনকার সাহিত্যে ইহা ছাড়া আর কিছু আশা করা হয় নাই। লোকের মনে মধুরতর, কোমলতর, মহত্তর ভাবের স্ফুরণ করিয়া দেওয়াই কবির শিক্ষা ছিল। 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'—চরিত্র চিত্রণ দ্বারা কবি ইহাই শিক্ষা দিবেন; আকাশে রামধনু দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উন্মেষ হয় তাহাই কহিয়া অন্যের চিত্তেও সে ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন; নানা উপায়ে বিবিধ অনুভূতির উৎপাদন ও চিত্তকে মার্জ্জিত করিয়া দিবেন; ইহাই ছিল কবির শিক্ষা। 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী সরসভাবে বিনোদনের সহিত চিত্তকে মার্জ্জিত করিবে, ইহার বেশী কবির কাছে আশা করা হয় নাই। হয় ত বা অনেকের কাব্যে ইহার চেয়েও বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু সে—আশার অতিরিক্ত।

এ শিক্ষারও প্রভূত মূল্য আছে, সন্দেহ নাই। বিলাতে এবং অন্যত্র অনেকবার কথা উঠিয়াছে যে কাব্য চর্চ্চা বিশেষতঃ মৃত ভাষার প্রাচীন কাব্যের চর্চ্চা মানুষকে কারখানা বা আফিসের উপযুক্ত করিয়া দেয় না; কি করিয়া হিসাব রাখিতে হয় কিংবা ইন্‌ভয়েস্ লিখিতে হয়, কিংবা আলপিনের মাথা সূক্ষ্ম করিতে হয়—কাব্য চর্চ্চা হইতে সে জ্ঞান লাভ হয় না; কাব্য, বিশেষতঃ মৃত ভাষার কাব্য সুতরাং মানুষকে জীবনযুদ্ধে কোনরূপে সহায়তা করে না; লোক শিক্ষায় কাজেই ইহার কোন মূল্যও নাই। স্পেন্‌সরের মত লোক একথা বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্য যে চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ করে এবং মার্জ্জিত অনুভূতি দ্বারা মনকে সরস করিয়া দেয়—এবং অনুভূতির মার্জ্জনাও যে মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল নিজের জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাহাদের এ সকল অনুভূতি ভোগ করিবার অবকাশ, তাহাদের মাত্র। শরতের জ্যোৎস্না দেখিয়া মনে আনন্দ হয়; কবির ভাষায় সে আনন্দ যে ভাবে প্রকাশ লাভ করে তাহাতে তাহা দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু সকলের ব্যক্তির নহে, গুটি কয়েক ভাগ্যবান্ ব্যক্তির মাত্র; সুতরাং এ প্রকার কাব্যের শিক্ষারও মূল্য আছে।

কিন্তু ইহা নিতান্তই ব্যক্তির শিক্ষা; তাহাও সকল

ভাগ্যেই কি শরতের জ্যোৎস্নাকে কবির সঙ্গে উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটে? সাধারণ কাব্য সুতরাং যে শিক্ষা ও যে জ্ঞান প্রদান করে, তাহাতে সমাজের অন্য শ্রেণীরা উপেক্ষিত। তাহাদের সুখ দুঃখ, আশা ভরসা, উন্নতি অবনতি অনেককাল সাহিত্যে অবহেলিত রহিয়াছে। গন্ধ পদ্য সকল সাহিত্য ব্যক্তির আনন্দের কথা যেমন ভাবিয়াছে, সমাজের, ধর্ম্মের, নীতির কথা তেমন ভাবে অনেককাল গ্রহণ করে নাই।

কিন্তু অন্যত্র না হইলেও ইউরোপে,--পদ্যে তত না হইলেও গদ্যে, বাস্তবের প্রতি ইহার চেয়ে শ্রদ্ধা সম্পন্ন সাহিত্যের উদ্ভব আজ হইয়াছে। ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলাকে অনেকে পছন্দ করেন না, অন্ত্যজাতির বিবিধ কদাচার প্রদর্শন করা তাঁহার উপন্যাসের একটী প্রধান বিষয়। সুতরাং তিনি বৈঠকখানার ঔপন্যাসিক নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার লেখায় একটা সামাজিক সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছে, অন্ত্যশ্রেণীদিগকে সমাজই নীচ করিয়া রাখিয়াছে—ইহাদের কদাচার সুতরাং সমাজের কৃত কর্ম্মের ফল, হাজার অনিচ্ছুক হইলেও আমাদিগকে এ কথা ভাবিতে জোলা বাধ্য করিয়াছেন। ভিক্টর হিউগোর উপন্যাসেও ঐ একই ধ্বনি। সমাজ যাহাকে সারা জীবন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখিয়াও নিজকে নিরাপদ্ মনে করে না, অনুকূল অবস্থায় পড়িলে সেই তথাকথিত পাষণ্ডও যে ঋষিচরিত্র হইতে পারে, জিন্ ভাল্জিনের চরিত্র চিত্রিত করিয়া হিউগো আমাদিগকে তাহাই বলিতে চান। সমাজ নিজে পাপীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের পাপের ফল যে নিজেই ভোগ করে, অথচ যারা সুবিধা পাইলেই ভাল হইতে পারিত তাহাদিগকে কয়েদখানায় পুরিয়া রাখিয়া সমাজ যে নিজের পাপের মাত্রা বাড়াইতেছে এবং সেই জন্য কখনও সুখ ও শান্তি অনুভব করিতে পারিতেছে না,—ইহাই হিউগোর লেখার ধ্বনি।

Resurrection বা 'পুনর্জ্জন্ম' নামক উপন্যাসে টলষ্টয়ও তেমনই পতিতা রমণীদের পতনের নিমিত্ত সমাজকে বিশেষতঃ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে দায়ী করিয়াছেন।

নরওয়ের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইব্‌সেনের নাট্যে নানা ভাবে এইরূপ সামাজিক সমস্যার আলোচনা হইয়াছে। তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'পুতুলের ঘরে' সমাজে এবং গৃহে স্ত্রীর অধিকারের কথাই মূল বিষয়। 'Ghosts' বা 'প্রেতাত্মা' নামক নাটকে প্রবৃত্তি ও রোগের বংশানুক্রমিকতাকেই ইব্‌সেন্ প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক কাল পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে বাইবেল বলিয়াছিল 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পাপের শাস্তি আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়।' তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারুইন প্রমুখ মনীষীগণের চিন্তা পরম্পরার ফলে জগৎ আবার নূতনভাবে এই মহৎ সত্য লাভ করিয়াছিল যে মানবের চিত্ত ও চরিত্র গঠনে বংশানুক্রমিকতা নামে একটা প্রবল শক্তি ক্রিয়া করে। এই সঙ্গে মানুষ আরও জানিয়াছিল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবও মানবের চরিত্র গঠনে নিয়োজিত রহিয়াছে। হয় ত বা এই অভিনব সত্যের নূতনত্বে মুগ্ধ হইয়া অনেকে এই নিয়মের অতিব্যাপ্তি ঘটাইয়াছেন—হয় ত বা অনেকে যেখানে ইহা সত্য নয়, সেখানেও ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—হয় ত বা অসঙ্গতরূপে অনেকে ইহাকেই মানবের ব্যক্তিত্বের একমাত্র কারণ মনে করিয়াছেন। তথাপি, ইহা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। নানাভাবে আজ ইহার প্রমাণ জুটিতেছে। শিক্ষা, সৎসঙ্গ প্রভৃতির উপকারিতা মানিয়া সমাজ নানাভাবে তাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। সুপ্রজনন-বিজ্ঞান বলিয়া যে নূতন বিজ্ঞানের জন্ম ইউরোপে হইয়াছে—এই বংশানুক্রমিকতাই তাহার ভিত্তি। জনক জননীর দোষে সন্তান দুষ্ট—তাহাদের রোগে সন্তান রুগ্ন হয়; সুতরাং পাপী, রোগী, দোষ দুষ্টের সন্তানাভিলাষ পূরণ করার সুবিধা দেওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর নহে—এ সত্য আজ গৃহীত। বাস্তব লোক-ব্যবহারে ইহাকে কার্য্যকর হইতে দেওয়া যায় কি না, স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু ইহার সত্যতায় সন্দিহান হওয়ার কোন যুক্তি নাই। সমাজের হিত চিন্তায় ব্যাপৃত ব্যক্তি মাত্রেই ন্যূনাধিক ইহার উপলব্ধি করিয়াছেন। প্লেটো যখন বলিয়াছিলেন

রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে সমাজ অনুকম্পা-পরবশ হইয়া নানা উপায়ে রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়া যদি তাহার বিনাশের পথ সুগম করিয়া দেয় তাহা হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল—তখন পৃথিবী অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে করিয়া এ উক্তি শ্রবণ করিতে চায় নাই। কিন্তু আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে—নিষ্ঠুরতাকেই গুণ বলিয়া জার্ম্মেণ দার্শনিক নীট্‌চে ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সুপজনন বিজ্ঞানের মুখেও আজ এই কথাই শুনিতে পাই। কেহ বা প্রিয় কেহ বা অপ্রিয়ভাবে এই কথার আবৃত্তি করিতেছেন। সামাজিক জীবনে সব দিক রক্ষা করিয়া কি ভাবে ইহাকে ফলপ্রদ করিয়া লওয়া যায়, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু পিতার পাপে পুত্র পাপী হয়, পিতার রোগ বা কুপ্রবৃত্তি পুত্রে সঞ্চারিত হয়,—নানা ভাবে সমর্থিত দর্শন বিজ্ঞানের এই সত্যকে সাহিত্যও আজ আপনার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইবসেন্ 'প্রেতাত্মায়' ইহারই অবতারণা করিয়াছেন।

'Pillars of Society' বা 'সমাজের আশ্রয়স্তম্ভ' নামক ইব্‌সেনের অন্যতম নাটকের বিষয়ও সামাজিক। ইহুদীরা যেমন নিজেদের সম্বৎসরের পাপের বোঝা একটী ছাগনন্দনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিয়া নিজেদিগকে পাপমুক্ত মনে করিত, সমাজে সেইরূপ ধনী নিজের পাপের বোঝা অন্যের স্কন্ধে আরোপ করিয়া—নিজের অন্তরের কলঙ্ক গোপন করিয়া, কিরূপে সমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মান ভোগ করিয়া থাকেন, —কিরূপে সমাজের আশ্রয়-স্তম্ভ রূপে পূজিত হইয়া থাকেন, 'সমাজের আশ্রয়-স্তম্ভ' নামক নাটকে ইব্‌সেন্ তাহা দেখাইয়াছেন। সমাজের এই আত্মপ্রবঞ্চনা—এই মিথ্যা, এই ভাণ, এই অন্তঃসারশূন্যতা দূর হউক, শুধু কবির নয়, দার্শনিকেরও তাহা চরম অভিলাষ। প্লেটো তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'দার্শনিক যে পর্য্যন্ত রাজ্য শাসনে অভিষিক্ত না হন এবং রাজারা যে পর্য্যন্ত প্রকৃত দার্শনিক না হন, সে পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গল নাই—আদর্শ রাষ্ট্রের সৃষ্টি সে পর্য্যন্ত হইতে পারে না'। ধর্ম্মে, নীতিতে, সুখে শান্তিতে সুন্দর সমাজের প্রতিষ্ঠার আশা শুধু কল্পনায় নয়, নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবি আজ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন।

ইংলণ্ডে বার্ণার্ড শ' শিষ্ট রুচিতে যতই আঘাত করুন না কেন, সমাজের বহুবিধ কলঙ্ক অপনীত হউক, মানব সমাজ তাহার নামের উপযুক্ত হউক, এই উদ্দেশ্য তাঁহার স্পষ্ট। অন্ত্য শ্রেণীদের দুঃখ দৈন্য, পতিতা রমণীদের দুর্দ্দশা—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম নীতির নামে অনীতি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সমাজ হইতে দূর হউক, ইহা বার্ণার্ড শ ইচ্ছা করেন। এ সকল যে সমাজে রহিয়াছে, অতি নির্ম্মম ভাবে তাহা তিনি আমাদিগকে দেখাইতে চান। শিষ্টেরা দূরে থাকিয়া 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং' মনে করেন; কিন্তু তাঁরা ভুলিয়া যান, সমাজে যে পঙ্ক, যে আবিলতা সঞ্চিত হইতেছে—বিস্তৃত হইয়া ক্রমে তাহা শিষ্টদের স্থানও কলুষিত করিয়া দিবে। কণ্টকের উন্মূলন না করিলে সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়; পায়ে রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। সমাজের অন্ত্য শ্রেণীতে পাপ রহিয়াছে; শিষ্টেরা চক্ষু বুজিয়া যে নিজদিগকে নিরাপদ্ মনে করেন তাহা ঠিক নহে। আর শিষ্টেরা কি বাস্তবিকই দূরে—বাস্তবিকই কি তাঁরা পাপদ্বারা স্পৃষ্ট নন? নানা রকমে তথাকথিত শিষ্টেরা তথাকথিত পাপীদের সহিত সংস্পৃষ্ট। সমাজের দেহে রক্তস্রোতের সহিত রোগের, পাপের—মৃত্যুর স্রোত মিশিয়া রহিয়াছে; নানা প্রকারের অধর্ম্ম, অনীতি ভণ্ডামিকে সমাজ প্রশ্রয় দিতেছে; ধনপতি কুবেরের একচ্ছত্র রাজত্ব স্বীকার করিয়া নানা রকমে সমাজ পাপকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। মৃত্যুর বীজের সহিত কোলাকুলি করিয়া কতকাল সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে? একদিন এই বীজ অঙ্কুরিত হইবেই; সমাজ যদি আপনার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না করে, মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য। চিকিৎসা-বিধানের কথা, মিউনিসিপ্যালিটীর কথা, বিবাহের কথা নানাবিধ কথার অবতারণা করিয়া তাঁহার নাট্যাবলীতে ও অন্যত্র নানাভাবে বার্ণার্ড শ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং দেখিতে পাই, ধর্ম্মনীতির কথা, সমাজের কথা নানাভাবে আজ ইউরোপের সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। শুধু ইউরোপেই বা কেন, সমস্ত পৃথিবী

আজ নানা রকমে গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্রের কথা ভাবিতেছে; দার্শনিক গবেষণায় যেমন, সাহিত্যেও তেমনই নানা ভাবে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ইউরোপে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাংলার সাহিত্যেও তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতিতে ইব্‌সেনের ছায়া স্পষ্ট।

সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানের বিরোধ যদি কখনও থাকিয়া থাকে, তবে আজ তাহা তিরোহিত। দর্শনও এখন ঐহিক জীবনের দিকে, সমাজের দিকে, নীতির দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করিতেছে। অক্সফোর্ডের শীলর প্রভৃতি কেহ কেহ দর্শনের ভাষা সংস্কারের জন্যও সযত্ন। স্পষ্টতঃ একথা সকলে না বলিলেও আধুনিক দার্শনিকদের ভাষা সরল, সরস। জর্ম্মেনীর অয়কেন্, ফ্রান্সের বার্গসোঁ, আমেরিকার উইলিয়ম জেম্‌স্ প্রভৃতির ভাষা সাহিত্যের সালঙ্কার ভাষা হইতে নিতান্ত হীন নহে। কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির ভাষাকে শীলর বর্ব্বর-ভাষার সহিত তুলিত করিয়াছেন।

দার্শনিক যদি কোনও দিন পরশ-মণির সন্ধানে 'পাগল পারা' ঘুরিয়া থাকেন, তবে আজ তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক যদি কখনও তামাকে সোণা করিবার চেষ্টা করিয়াও থাকেন, তবু আজ তাহা আর প্রথম চেষ্টা নহে। দর্শন-বিজ্ঞানের সকল সত্য আজ ইহ জীবনের উন্নতির জন্য—ব্যক্তির ও সমাজের উৎকর্ষের জন্য—প্রযুক্ত করিতে মানব সচেষ্ট। অনেক দার্শনিক আজ ইহ জীবনে অনাবশ্যক—ইহ জীবনের পরিপন্থী—যাহা, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক। জীবনে যাহা প্রয়োজন, যাহার উপর জীবনের ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাকেই মাত্র ইঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চান।

চারিদিক হইতে আগত বিভিন্ন স্রোতস্বতী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যায়, বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত, মানবের চিন্তাস্রোতও আজ তেমনই ধর্ম্ম নীতি, সমাজকে উন্নত করিয়া জীবনকে সুন্দর সুখদ করিবার উদ্দেশ্যে এক হইয়া গিয়াছে। মানুষের পরিণত চিন্তা আজ নানাভাবে যে এক বিশাল উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করিতেছে, বাঙ্গালার সাহিত্যে বাঙ্গালীও তাহা স্মরণ করিবে, বাংলার সাহিত্যিকগণ যেন এ কল্পনা পরিত্যাগ না করেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অঞ্জলি

(মহারাজ কুমুদচন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময় শ্রীচরণে)

(১)

আজিকে নিখিল কাঁদিয়া আকুল আঁধারে, ওগো
ঝঞ্ঝা বাদর রাতে,
আজিকে এল কি বিজয়া বোধনের বারে, ওগো
সজল অশ্রুপাতে!
অন্তরতম, দেবতা, বন্ধু মোর
সুসঙ্গে আজি কি উৎসব নিশি ভোর!
নিকুঞ্জ ভবনে আনন্দ দীপালি গেল কি মিটিয়া
মাধবীর মালা বাতাসে গেল কি ছিঁড়িয়া?
শরতের চাঁদে লেগেছে গ্রহণ,
কালিমা এসেছে ঘিরে,
প্রাণ তোমা চায়,　সাড়া নাহি পায়,
আর কি পাবো না ফিরে!

(২)

এসেছিলে তুমি, রাজার মতন, মোহন বেশে
তোমারে চিনেনি কেহ!
ঋষি ভারতের ব্রাহ্মণ তুমি, কর্ম্মের বশে
হেথা বেঁধেছিলে গেহ!
অন্তরতম, দেবতা, বন্ধু মোর
এতদিনে বুঝি ভাঙ্গিল স্বপ্ন ঘোর!
চোখে স্বপনের মুগ্ধ হাসিটী মাখিয়া,
তারা ঝিকিমিকি ছায়াতরী একা বহিয়া,
নীলাম্বরে পশি　ভুলিলে কি ধরা
নীরব নিদ্রার দেশে—
শূন্য ভবনে　ডাকে হাহাকার
ফিরিয়া এসোহে হেসে!

(৩)

আজি হ'লো কি বিদায় চির জনমের, ওগো
শুধাই নয়ন জলে,
একি গুরু অভিমান, গোপন মনের ওগো
বুঝালে বিদায় ছলে!

অন্তরতম, দেবতা, বন্ধু মোর,
অজ্ঞানের দোষ হ'লো কি কঠোর!
কি যোগ মন্ত্রে স্নেহ বন্ধন টুটিয়া
মুক্তির আকাশে নীরবে গেলে কি উড়িয়া!
মূর্চ্ছনায় বেজে থামিল কি বীণা
শান্ত সোমেশ্বরী কূলে!
সুসঙ্গের রাজ-লীলা সাঙ্গ হ'লো
আজি চিতা ভস্ম তলে!

(৪)

মৃত্যু নহে—গেলে তুমি মৃত্যুরে ছাড়ায়ে, ওগো
চির শান্তি ঝরে যথা,
ভালো যে লাগেনি হেথা, দুঃখের নিলয়ে, ওগো
বুকে তারো ছিল ব্যথা!
অন্তরতম, দেবতা, বন্ধু মোর,
মৃত্যুরে ভুলি ছিনু মোহে ভোর!
বিমল ঊষার দীপ্তি শতদলে বসিয়া,
মরণ যাত্রী আমাদেরে কহ ডাকিয়া,—
"পরপারে জ্বলে জীবনের রবি
মরম পদ্ম দলে,
শুনি সেই গান, মুছিগো নয়ন
তবু চোখ ভরে জলে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

রাজ ভাগ্য।

রাজাকে ফকীর বানানের অপেক্ষা মানবের প্রতি অদৃষ্টের তীব্র উপহাস আর কিছুই নাই। মানুষ যাহাকে এক দিন দেবত্বে উঠাইয়া পাদ্য অর্ঘ দিয়া পূজা করিয়াছিল, নিয়তিদেবী মুহূর্ত্তে কলের পুতুলের মত তাহাকে টিপ মারিয়া ফকীর করিয়া ফেলিয়া তাঁহার লীলাময়ী প্রকৃতির মহতী শক্তির পরিচয় দিয়া মানবীয় গর্ব্বের চূড়ান্ত খর্ব্বতা দেখাইতেছেন। ভলটেয়ার তাঁহার একখানা পুস্তকে লিখিয়াছেন এক সরাইয়ে আটজন পথিক একত্রে খানা খরচ দিতে না পারিয়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে কথাক্রমে তাহারা জানিতে পারিল যে তাহারা আটজনেই আটজন রাজাধিরাজ। নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে তাঁহাদের মাথার মণি মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে। লোথারিওর বিধবা পত্নী এডিলেডি তাঁহার সমসাময়িক যুগে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন। বিরেঙ্গার তাঁহাকে পেভিয়া নগরে বন্দী করিয়া স্বীয় পুত্রের সহিত বলপূর্ব্বক বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। রাণী তাঁহার একজন ভাণ্ডারী লইয়া কোনক্রমে পলাইয়া বাহির হন। জনৈক আর্কবিশপ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিলেন। রাণী ও তাঁহার অনুচরকে সেখানে পৌঁছিবার জন্য রাত্রিতে হাঁটিতে হইত। ধরা পড়িবার ভয়ে তাঁহারা দিবসে জঙ্গলে মাথা দিতেন। ভাণ্ডারীটি রাণীর পেটের ভাত যোগাইবার জন্য চুপে চাপে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত।

সম্রাট চতুর্থ হেনরী তাঁহার পুত্র কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দীভূত হইয়া কারাগার হইতে পলায়ন করেন। নিঃস্ব দুরবস্থ সম্রাট পেটের দায়ে স্পায়ার্সের বিশপের দ্বারস্থ হইয়া গীর্জ্জা ঘরের চাকরীর জন্য উমেদারী করিতে বাধ্য হন।

আমার যথেষ্ট পড়া শুনা আছে, আমি বেশ গান করিতে পারি সুতরাং আপনার কার্য্যের অনুপযুক্ত হইব না ইত্যাদি কত প্রকারে অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল না। যাঁহার বিজয় ঢকা নিনাদে ঐশ্বর্য্যের ঠমকে এক দিন সমগ্র ইউরোপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাকে অবশেষে লীজ সহরের গোহালটে পড়িয়া পচিয়া গলিয়া মরিতে হইল। নিয়তিঃকেন বাধ্যতে।

হেনরীর বিধবা পত্নী ত্রয়োদশ লুইয়ের জননী। তিনি রাজার শাশুড়ী এবং ফরাসীর রাজাসনের অছি ছিলেন। দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছিয়া তাহাকে মরিতে হইয়াছিল। রিশোলের ফেসাদে পড়িয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ লিলী ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য নৃপতি প্রথম চার্লসের দুঃখময় কাহিনী লিখিয়া নিয়তির প্রাধান্য জগতের সমক্ষে জাহির করিয়াছিলেন।

হায়, মানবের দৃষ্টির সীমা কত সঙ্কীর্ণ। অসীম অদৃষ্টের আঁধার বক্ষে সঞ্চরমান সে ক্ষুদ্র কীট সম।

ফ্রান্সের রাজমাতার কথা বলিতে যাইয়া লিলী লিখিয়াছেন—

১৬৪১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের রাজমাতাকে আরুণ্ডেলের আর্লের সহিত লণ্ডন ছাড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ক্ষণ বিধ্বংসী পার্থিব সম্পদের সেই শোচনীয় পরিণতি আমার এবং অপরাপর দর্শকবৃন্দের চক্ষে সেদিন অশ্রু বহাইয়াছিল। আজ বাদে কাল যে মরিতে বসিয়াছে এমন বৃদ্ধা জরাতুরা রাণীকে তখনই দুনিয়ায় ভিটামাটি ছাড়া অবস্থায় অদৃষ্ট কঠোর হস্ত বাড়াইয়া যথায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে সেই খানেই ছুটিয়া যাইয়া পড়িতে হইবে। তিনি না একদিন য়ুরোপে রাজরাণীদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন! তিনি না ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দণ্ডধাতার ধাত্রী এবং দুইজন সম্রাজ্ঞীর জননী? পর্তুগালের রাজা আন্তোনিও ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে প্যারি সহরে প্রাণত্যাগ করেন। রাজপদের দাবী বজায় রাখিতে ইনি কি না করিয়াছিলেন? অবশেষে ইংলণ্ডে আসিয়া দৌড়াইয়া পড়িয়া রাণী এলিজাবেথের হাতে পায় জড়াইয়া ধরিয়া সাহায্যার্থ কিছু সৈন্য যোগাড় করিলেন কিন্তু ফলং পুলাস্তদেবস্যাৎ যৎ বিধর্মনসি স্থিতং। তবে ইঁহার ভাগ্য এক বিষয়ে ভাল ছিল, কারণ সে সুবিধা অনেকের ভাগ্যেই জুটে না। পর্তুগালের রাজসভার সর্ব্বপ্রধান লর্ড তাঁহার অনুচররূপে নিজে বুক পাতিয়া তাঁহার দুঃখের গুরুভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়াছিলেন। রাজভক্ত তাঁহার ঈদৃশ সুকঠোর সাধনার প্রতিদানরূপে মৃত্যুর পরে রাজার পদ নিম্নে তাঁহাকে যেন সমাহিত করা হয়, শুধু এই ভিক্ষা চাহিয়া ছিলেন। বোহেমিয়ার রাজগোত্রে ইঁহার জন্ম হয়।

হিউম রাজদশার বিড়ম্বনা দেখাইতে যাইয়া লিখিয়াছেন—ইংলণ্ডের রাণী তাঁহার সন্তান চার্লসের সহিত যে সামান্য মাসোয়ারা পাইতেন তাহাতে তাঁহার সঙ্কুলান হইত না; যথেষ্ট ক্লেশ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। একদিন প্রভাতে কার্ডিনাল ডি, রেজ রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; রাণী তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যা হেনরিয়েটা আগুণের অভাবে শীতে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে, এজন্য তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া লেপ কাঁথা দিয়া জাতিয়া ধরিয়া রাখিতে হইতেছে। ইংলণ্ডের রাণী ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইয়ের কন্যাকে এইরূপ দুর্দ্দশার চরম সীমায় নামিয়া আসিয়া কাল কাটাইতে হইত। শ্লামাসিয়াস দ্বিতীয় চার্লসের পক্ষ সমর্থন করিয়া একখানা রাজনৈতিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। রাণীর বন্ধু বান্ধবেরা উক্ত পুস্তকের একখণ্ড রাণীকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় নাই বলিয়া শ্লামাসিয়াসকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন রাণী কোন গতিকে বইয়ের দামটা লোকের মারফৎ পাঠাইয়া দিতে পারিতেনই। ইহা হইতে রাজমহিষীর তৎকালীন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

ফরাসীরাজ সপ্তম চার্লস সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম হেনরী, চার্লসের রাজত্ব বোর্জেস সহরের মধ্যেই কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন চার্লস জুতার দোকানে গিয়া একজোড়া জুতা পরখ করিয়া বড়ই পছন্দ করিয়াছিলেন কিন্তু হাতে পয়সা নাই সখ মিটাইবেন কি দিয়া? জুতাওয়ালা লোকটাও ছিল নেহাৎ চক্ষু লজ্জাহীন! জুতা জোড়াটা ধারে দিতে সে কিছুতেই রাজী হইল না। কমাইন্স লিখিয়াছেন এই জন্যই রাজা গজা দিগেরও নিম্নশ্রেণীর সহিত খাতির রাখিয়া চলা উচিৎ। কালচক্রের গতিতে কখন কাহার মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে কে জানে? নগণ্য ভিস্তিওয়ালার মশকই মোগল সম্রাটদের সুধা ধবলিত সৌধরাজির ভিত্তি ভূমি। কিন্তু 'বিষয় পেলে আপন ভুলে মহতের দোষ।' আধুনিক বহু রাজাধিরাজ হয়ত কমাইন্সের উক্তির যথার্থ্যের নীচে ঢেরা সহি দিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্য মদে সে সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। উদ্ধত বলীর কামরাগ অক্টোপাশের মত বাহু বেড়িয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চুষিয়া পেট মোটা করিবার জন্য জলিয়া উঠে। বিশ্বদেবতা ও তখন দুই চারিটা তুবড়ি ফুটাইয়া তাহার বাজিমাৎ করিয়া দুনিয়ার ভেল্কি ভাঙ্গিয়া দেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের নূতন গাইডের নাম আরুলি। বয়স ৩০ এর অধিক হইবে না। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে আফ্রিকায় আমি গৌর বর্ণের লোক আদৌ দেখি নাই। আরুলির মুখশ্রী মন্দ নয়। চেহারা দেখিলেই মনে হয় যে লোকটার দেহে বলের অভাব নাই। পথ চলিতে চলিতে উহার মুখে এই স্থপো জাতির বিষয়ে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইহারা আফ্রিকার এই অঞ্চল ভিন্ন আর কোথাও বাস করে না। একত্রে পাশাপাশি ৩।৪ খানা গ্রাম অবস্থিত। উহাদের অধিবাসীর সংখ্যা ৩০০।৩২৫ এর অধিক হইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকার ঘরে উহারা বাস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদের সকলেই দেখিতে অত্যন্ত কদাকার। দূর হইতে দেখিলে মর্কট বলিয়া ভ্রম হয়। স্ত্রী পুরুষ কেহই কোনও প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার করে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থিতি করে। শুনিলাম, উহারা অশ্বারোহণে অত্যন্ত পটু, তবে জিনের ব্যবহার জানে না; কিন্তু উলঙ্গ অশ্ব পৃষ্ঠে এপ্রকার দ্রুতবেগে যায় যে, বিস্মিত হইতে হয়।

আফ্রিকার অন্যান্য অধিবাসীদিগের ন্যায় ইহারাও উল্‌কি ব্যবহার করে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জাতিরা সর্ব্বদা ইহাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে। এমন কি তাহারা এই স্থপোদিগের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে না। ইহারা সচরাচর দুই প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে—ধনুক ও বল্লম। তীরের মুখে প্রায়ই একপ্রকার বিষাক্ত লতার রস লাগাইয়া রাখে। উহা দ্বারা কেহ আহত হইলে ঐ বিষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া উহার মৃত্যু হয়। এইজন্য অপর কোনও জাতি সহজে উহাদের নিকট যায় না। যে সময়ে ইংরাজ সরকার ইহাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সে সময়কার একটি ঘটনা একজন ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীর ভাষায় এইস্থানে বিবৃত করিলাম।

"আমরা এই নর মাংস ভোজীদিগের বাসস্থান হইতে প্রায় ১৫মাইল দূরে শিবির স্থাপিত করিলাম। পরদিন আমাদের একদল লোক এই রাক্ষসদিগের দুইজনকে ধৃত করে। তাহারা যখন আমার সম্মুখে আনিত হইল, তখন তাহারা একবারে উলঙ্গ। তবে এত উলকি পরিয়াছিল যে হটাৎ মনে হয় যেন কটিদেশে কিছু পরিয়া আছে। ইহাদের সম্মুখের দাঁত এপ্রকার ধারাল যে, তাহারা যে নর মাংস-ভোজী তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

"আমরা যখন উহাদের গ্রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম স্ত্রী পুরুষ সকলেই উলঙ্গ। তবে স্ত্রীলোকদিগের কটিদেশের সম্মুখে কতকগুলি গাছের পাতা ঝুলান রহিয়াছে। ইহা লজ্জা নিবারণের জন্য নয়। শত্রুপক্ষ আক্রমণের সময় উহারা এইভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করে—উদ্দেশ্য যাহাতে শত্রুরা স্ত্রীলোকদিগের উপর আক্রমণ না করে। ইহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়া নারীকে অতি মূল্যবান সম্পত্তি মনে করা হয়। নারী লাভের জন্য ইহাদের মধ্যে প্রায়ই কলহ ও যুদ্ধ উপস্থিত হয়।

"যাহারা যুদ্ধক্ষম গ্রামে সে প্রকার লোক একজনও ছিল না। কয়েকজন বৃদ্ধ ও বালক ভিন্ন গ্রামের পুরুষ মানুষেরা সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। প্রথম যে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে একজন বৃদ্ধ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিলাম না। কিন্তু একি! বৃদ্ধ যে ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল তাহার একদিকে তিনটি নরমুণ্ড ঝুলিতেছিল। বোধ হইল উহার মধ্যে কোনও প্রকার আরক বা ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, কারণ উহাদের মধ্যে পচিবার কোনও চিহ্ন পাইলাম না। বৃদ্ধ বলিল, ৭ বৎসর পূর্ব্বে সে নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এগুলি স্বহস্তে অর্জ্জন করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে এখনও সে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত এবং ঐভাবে শত্রুর মস্তক কাটিয়া আনিতে পারে। বৃদ্ধের মজবুত হাত পা এবং বিশাল বক্ষস্থল দেখিয়া তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ পাইলাম না।"

ঐদিন রাত্রিকালে আমরা শয়ন করিয়া আছি এমন সময় সাহেবদের তাঁবুর মধ্যে ভীষণ গোল উঠিল। আমি

ও রতি এক তাঁবুতে থাকিতাম। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা। আমরা তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে সাহেবদের তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমাদের সিপাহীরা দুইজন ঐদেশীয় লোকের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছে।

শীঘ্রই তাহারা বন্দী হইল। দেখা গেল যে প্রত্যেকে একখানা করিয়া বড় ছোরা হাতে লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মৎলব যে ভাল ছিল না তাহা বেশ স্পষ্টই বোধ হইল। পরে উহারা স্বীকার করিল যে, তাহারা আমাদের শিবিরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী। উহারা সুপো। দলপতির আদেশ অনুসারে উহারা সাহেব দুইজনকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে সাহেব দুই জনকে মারিয়া উহাদের মুণ্ড লইয়া যায়। তাহারা যে মধ্যে মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ করে, তাহা তাহারা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করিল না। মৃত দেহকে আগুনে ঝলসাইয়া উহার মধ্যে মসলা দেয়, তাহার পর উহা ছুরির সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলে।

পরদিবস আমরা এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। ইহা এত গভীর যে অধিকাংশ স্থানে সূর্য্যের আলো একবারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এক একটা গাছ এত মোটা যে, বোধ হয় ১০।১২ জন লোকও উহা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না। শুনিলাম, পৃথিবীতে এমন জন্তু খুব কম আছে, যাহা এই বনের মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য এতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রায়ই জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু তাহার সহিত এই জঙ্গলের অনেক প্রভেদ। ২।৩ মাইল গভীর জঙ্গল, তাহার পর হয়ত ময়দান, তাহার পর কয়েক মাইল পর্য্যন্ত ছোট ছোট গাছের জঙ্গল, তাহার পর লোকালয় আবার জঙ্গল। এতদিন এই ভাবেই চলিতেছিল। আজ কিন্তু ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। শুনিলাম, এই জঙ্গল প্রায় ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার চওড়াই ৩০ হইতে ১৬০ মাইল। এই বিস্তৃত ভূভাগ এই প্রকার বড় বড় গাছে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে ইহা এত গভীর যে, আমাদিগকে গাছ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এই জঙ্গলে নানা জাতীয় সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডারও ইহার মধ্যে অনেক আছে। পক্ষী যে কত প্রকারের আছে, বোধ হয় তাহার সংখ্যা নাই। এই সুবিস্তৃত গভীর জঙ্গলের মধ্যে অত্যন্ত জলাভাব বলিয়া অন্য লোক দূরের কথা এখানকার অসভ্য অধিবাসীরাও ইহার মধ্যে প্রায় প্রবেশ করে না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা এই জঙ্গলের উত্তর ধার দিয়া অগ্রসর হইলাম। আমাদের গাইড আরলির পরামর্শে আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম না।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমরা মাসোনগলেনি নামক এক বৃহৎ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সুমতি।

ব্রজ গোপাল, মদে বিভোর
দিন রাত ভেদ বোঝে না,
আপন জনের, হিতের কথা
এখন আর তার রোচেনা।
বাপ মায়ে তার, হদ্দ মেনে
হতাশ হয়ে চেষ্টাতে,
বুদ্ধি করে, মনে মনে
যুক্তি করে শেষটাতে—
গোসাই প্রভু, ভক্ত প্রধান,
উপদেশে খুব জবর
আচ্ছা না হয়, তাঁরেই এবার
আসতে হেথা দেই খবর!
গোঁসাই এসে, বল্লেন ডেকে
"ওরে ব্রজ, কথা রাখ—
মদ ছেড়ে দে, লক্ষ্মী ছাড়া
শান্ত শিষ্ট হ'য়ে থাক্।

মদ খেলে হয়, নরকে বাস,
শাস্ত্রে আছে এই ধারা
সবাই যাবে, নরক কুণ্ডে,
মদ আর গাঁজা খায় যারা।"
"নবাব সাহেব, দিন্ দুনীয়ার
মালীক হয়েও মদেই ভোর"
"হোন না তিনি, রাজার রাজা
তাঁর নসিবে (ও) নরক ঘোর।"
"অমৃতলাল, মস্ত উকীল
মদে মাতাল দিনরাতি,"
"তিনিও যাবেন, নরক কুণ্ডে
যম দুতেরি কীল লাথি।"
"বাইজী সাহেব, খেমটাওয়ালী
মদ বিনে আর বোঝেনা।"
"সত্য জেনো, তাদের কভু
নরক জ্বালা ঘুচ্‌বেনা।"
"ইন্দ্রমোহন, সেরা ওস্তাদ
সেতার, তবলা, বেহালায় —
সেও কিন্তু, দুটী বোতল
নিকেশ করে দু'বেলায়।"
"সে ও তবে, নরক কুণ্ডে
পচে মরবে, রক্ষা নাই।—
মদ খেলেই, নরক বাস—
বল্‌ছি খাঁটি তোমার ঠাঁই।"
"ওরাই যদি, নরকে যাবে
বলছ তুমি গুরু জি!
তবে আমি একলা ক'রে
স্বর্গে গিয়ে করব কি?
মদই খাব, নরকে যাব,
গুলজার করব সেই সভা—
চুপ্‌টী করে, অন্ধকারে
স্বর্গ ভোগে লাভ কিবা?"

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আসাম রেল-পথের কয়েকটী দৃশ্য।

আসাম যাত্রার আদেশ পত্র লইয়া যথাসময়ে নারায়ণ-গঞ্জ পঁহুছিলাম, এখান হইতে ষ্টিমারে চাঁদপুর যাইতে হইবে; পুনরায় রেল। শীতকাল। নদীবক্ষ আলোড়ন করিতে করিতে আসাম মেইল ষ্টীমার আমাদিগকে লইয়া চাঁদপুর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। এতক্ষণ মানসিক অশান্তি উপলব্ধি করি নাই—সেই চিরপরিচিত পথে পরিভ্রমণ করিয়াছি মাত্র। এখন বুঝিলাম সঙ্গীহীন আমি আসামের কোন্ সুদুর পার্ব্বত্য প্রদেশে চলিয়াছি। মনটা বড়ই নীরস হইয়া পড়িল। শতাধিক আরোহীর মধ্যেও নিজকে আজ সঙ্গীহীন মনে হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সকলেই গল্প গুজবে, হাস্য কৌতুকে ব্যস্ত, কেবল আমারই প্রাণে শান্তি নাই—আমার হৃদয়ের নিভৃত খবর কেহ লইল না—আমার আশা নৈরাশ্য কেহ জানিতে পারিল না। ভাবনার জটীলতায় নিজকে নিজে হারাইয়া ফেলিলাম। এভাবে কতক্ষণ কাটিল বলিতে পারি না; কিন্তু যখন নিজকে বাস্তব রাজ্যে ফিরিয়া পাইলাম তখন বেলা প্রায় অবসান। সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। আদি অন্তহীন নীলিমার বুকে অস্তগামী সূর্য্যের বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন প্রাণ আপনা হইতেই নাচিয়া উঠিল। সে অপরিসীম সুন্দর দৃশ্য ব্যক্ত করিবার নহে। উর্দ্ধে অনন্ত সুনীল আকাশ, নিম্নে বিশাল কায়া-নদী—দিগন্তে উভয়ের আলিঙ্গন। গগনের বুকের ভিতর হইতে দিনমণি হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে নদীর ক্রোড়ে ডুবিয়া যাইতেছে। কি মহিমময় দৃশ্য! কি গরীমাময় প্রেম। দুইয়েরই আদি অন্তহীন বিরাট হৃদয়—একের বুক হইতে অন্যের বুকে সেই শ্রান্ত, ক্লান্ত শিশুকে টানিয়া লইতেছে। কত কোমল, কত প্রাণ জুড়ানো সেই মহান্, উদার ভাব। দেখিতে দেখিতে সারাদিনের পরিশ্রান্ত শিশু চক্ষু মুদিয়া নীরবে নদীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। ধরার বুকে অন্ধকার নামিয়া তাহার রাজ-সিংহাসন পাতিয়া বসিল। উদাস প্রাণে উপরে চলিয়া গেলাম।

রাত্রি নয়টার সময় আসাম থাপ মেইল ট্রেণ অসংখ্য কুলি বোঝাই করিয়া চাঁদপুর ছাড়িল। রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি গাড়ীতে একাকী। বসিয়া বসিয়া দুইপার্শ্বে নিবিড় অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—আকাশে তারকানিচয় ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল—আমি আকাশ, পাতাল, কত কিছু ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম। সাড়ে দশটার সময় "লাকসাম" পৌছিলাম। তখন বেশ শীত বোধ হইতেছিল। সঙ্গে খাবার ছিল—জলযোগ করিলাম। তারপর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। প্রভাতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে তখন ট্রেণখানা একটী ষ্টেসন হইতে ছাড়িয়াছে—দেখিলাম আরও দুইটী ভদ্রলোক গাড়ীতে আছেন। একজন নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন—অপরটী তামাকু সাজিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন. ট্রেণ "কুলাউরা" ছাড়িয়াছে—তাহারা "সায়াস্তাগঞ্জ" হইতে আসিতেছেন—জোরহাট যাইবেন। এতক্ষণ একা ছিলাম, এখন নবাগত সঙ্গীদের সহিত
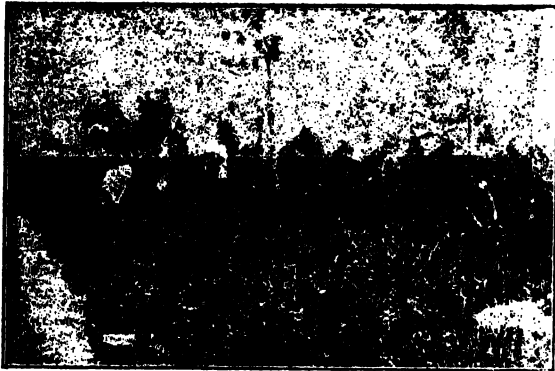
চা বাগান।

কথাপ্রসঙ্গে জমাটবাঁধা মানসিক অশান্তি মন্দীভূত হইতে লাগিল।

সূর্য্য-কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেণ দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে। দুই দিকে বিস্তৃত মাঠ, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোথাও বিস্তৃত চা বাগান—কুলীরা গাছের নিম্নে মাটী খুঁড়িয়া দিতেছে—কোথাও কুলীরমণীগণ গান গাহিতে গাহিতে ঝোপরীতে চা-পাতা উঠাইতেছে—কোথাও ২।৪ জন কুলী আড়ালে বসিয়া গল্প করিতেছে। কুলীদের লম্বা লম্বা চালানির্ম্মিত গৃহগুলি দূর হইতে বাজারের ন্যায় দেখায়। দেখিতে দেখিতে ৯ টার সময় বদরপুর

বরাক নদীর পুল।

ষ্টেসনে পৌছিলাম। এখান হইতে শিলচরে একটী ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে। আমার সহযাত্রীদের পূর্ব্ববন্দোবস্ত মত তাঁহাদের লোকেরা ২ থালা ভাত ও ডাল, তরকারী আনিল। তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে ২৪ ঘণ্টা পরে আমারও অন্ন জুটিল। পরিতৃপ্তির সহিত উদরপূর্ত্তি করিলাম। কুলীদেরও এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত দেখিলাম।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের মেইন লাইন চট্টগ্রাম হইতে তিনসুকীয়া পর্য্যন্ত ৫৭৪ মাইল বিস্তৃত। এই লাইনই আসামের প্রধান রেলপথ। মেইন লাইনের সহিত কতকগুলি শাখা লাইন সংযুক্ত আছে। 'লাকসাম' জংসন হইতে নোয়াখালী, 'আখাউরা' জংসন হইতে ভৈরববাজার, 'কুলাউরা' জংসন হইতে শ্রীহট্ট, 'বদরপুর' জংসন হইতে শিলচর এবং 'লামডিং' জংসন হইতে গৌহাটী প্রভৃতি শাখা লাইনগুলি গিয়াছে। মেইন লাইনটী উত্তর কাছাড় পাহাড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে। বদরপুর স্থানটী দেখিতে বড় সুন্দর। বদরপুরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া 'বরাক' নদী প্রবাহিত হইয়াছে। 'বরাক' পার্ব্বত্য নদী। ইহা নাগাপাহাড়ের দক্ষিণাংশে

হইতে উৎপন্ন হইয়া মণিপুর রাজ্যের মধ্যদিয়া দক্ষিণে বাহিত হইয়াছে তৎপর উত্তর বাহিনী হইয়া কাছাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। 'কাছাড়ে' এই নদীর গতি বক্র বলিয়া উহাকে 'বরাক' বলে। 'বরাকের' সুরমা নামে একটী শাখা বদরপুর হইতে শ্রীহট্ট জেলার উত্তর সীমা দিয়া সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে।

পাহাড়ীয়া পুল।

এজন্য উহাকে 'সুরমা' উপত্যকা বলে। আসাম রাজ্যটী দুই ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা আসামভেলি এবং সুরমা উপত্যকা। প্রত্যেক উপত্যকায় এক একজন কমিশনার আছেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কমিশনার গৌহাটী বাস করেন এবং সুরমা উপত্যকার কমিশনার শিলচরে বাস করেন। 'বদরপুর' স্থানটী বেশ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। উহা সমতল ভূভাগে অবস্থিত—কিন্তু দূরে কাছাড়ের পর্ব্বতমালার রেখা দৃষ্ট দেখা যায়। 'বদরপুরে' 'বরাকের' উপর একটী অদ্ভুত রেল-সেতু আছে। মেইন লাইন এই সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। 'বদরপুর' ছাড়িয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে 'বিহারা' ষ্টেসনে পৌছিলাম। 'বিহারা' হইতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ হইয়াছে এবং উহা 'লামডিং' পর্য্যন্ত ১০৫ মাইল বিস্তৃত। যতই যাইতে লাগিলাম প্রাণে এক নবীন অনির্ব্বচনীয় সুখ উপলব্ধি করিতে লাগিলাম—পূর্ব্বগ্লানি বিস্মৃত হইলাম। বোধ হইল যেন এক অভিনব স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি যতদূর যায় অনন্ত বিস্তৃত শৈল শ্রেণী—পাহাড়ের পর পাহাড়, তারপর পাহাড়, শ্রেণীবদ্ধ, তরঙ্গায়িত, অবিচ্ছন্ন, অফুরন্ত পর্ব্বতশ্রেণী চলিয়াছে। ভাবিলাম পাহাড়ের দেশে প্রবেশ করিয়াছি। এই পার্ব্বত্য রেলরাস্তাটী 'বিহারা' হইতে 'জাঠিংঙ্গা' উপত্যকার মধ্য দিয়া উত্তর কাছাড় পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এবং 'হাফলং' এর নিকট আসাম এবং কাছাড়ের নদীসমূহের উৎপত্তিস্থল পর্ব্বতসমূহের উপর দিয়া গিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অতিশয় চমৎকারজনক। 'জাঠিংঙ্গা' নদীর গতিপথ অবলম্বন করিয়া রেলরাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। নদী পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নে অবতীর্ণা হইয়াছে এবং রেলপথ নিম্ন হইতে ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়াছে। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে উপরে উঠিয়াছে—স্থানে স্থানে সুদৃঢ় সেতুর সাহায্যে রেলপথ পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে নীত হইয়াছে। কোথাও পাহাড়ের ভিতর সুরঙ্গ খনন করিয়া, কোথাও বা পাহাড় কাটিয়া এই অদ্ভুত রেলপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চিত্তবিমোহন স্বপ্নরাজ্যে কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কোথাও কলকল নাদিনী ক্ষুদ্রকায়া স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতী

অন্ধকার সুরঙ্গের ভিতর দিয়া রেল চলিয়াছে।

বৃক্ষসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তরতর বেগে রজতধারার ন্যায় ছুটিয়াছে—কোথাও অযত্ন সম্ভূত নানাবর্ণের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি গভীর পর্ব্বতারণ্যে দর্শকের নয়ন মন মুগ্ধ করিতেছে—কোথাও প্রস্রবণধারা পর্ব্বত গাত্রে পড়িয়া সহস্র স্ফটিকচুর্ণের ন্যায় দৃষ্ট

হইতেছে। বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য-পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে একবার আকাশ পানে উঠিতেছে, আবার পর্ব্বত পানে ছুটিয়া বৃক্ষশাখায় বসিতেছে—তাহাদের অব্যক্ত শব্দ সুস্নিগ্ধ পার্ব্বত্য মারুত দিগন্তে বহিয়া নিতেছে। বিচিত্র বৃক্ষলতা বিচিত্র ফলপুষ্পভরে হাসিতেছে। কোথাও অমল

পাহাড় কাটা রেল পথ।

ধবল মেঘমালা পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহন করিয়া কোথাও বা পর্ব্বত গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলাম। মনে হইতে লাগিল,—

পাহাড়ে ঘেরা সারাটা দেশ,
স্তরের উপর স্তর।
যোজন ব্যাপী বিটপী রাজী,
নিবিড় বনের ঘর।
তরু লতার জন্ম সেথা,
উর্দ্ধে অধেঃ বাড়ী।
শৈলে শৈলে মহীরুহ,
দাড়িয়ে সারি সারি।
উশৃঙ্খল ঝরণাগুলি,
ছুটছে আপন মনে।
হেথা হোথা কইছে কথা,
গানের লহর প্রাণে।
নানা রঙের পাখীগুলি,
ধাইছে আকাশ পানে।
সুধা হাসি পীযুষ রাশি,
ছড়ায় বনে বনে।

এই পার্ব্বত্য রেল লাইনে ৩২টী সুরঙ্গ ও ৮০টী সেতু আছে। মাহরের নিকটবর্ত্তী ২২ নম্বর সুরঙ্গটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা অতিক্রম করিতে ট্রেণের তিন মিনিট সময় লাগে। যখন সুরঙ্গ মধ্যে ট্রেণ চলিতে থাকে, তখন সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব বোধ হয় না। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি পার্ব্বত্য রেলপথটী পাহাড় ঘুরিয়া২ গিয়াছে। 'হারাংগাজাও' (Harangajao) এবং জাটিংগা (Jatinga) ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী মাইলংডিসা (Mailongdisa) ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একস্থান হইতে একসঙ্গে তিনটী রেললাইন দেখিতে পাওয়া যায়। একই লাইন পাহাড় ঘুরিয়া আসিবার দরুন তিনটী লাইন বলিয়া বোধ হয়। 'মাইলংডিসা' হইতে 'জাটিংগা' পর্য্যন্ত রেল পথ এত খাড়া যে অগ্র পশ্চাৎ দুইটী ইঞ্জিনের সাহায্যে ট্রেণের গতি ঠিক রাখিতে হয়। মিঃ রায়ারের কার্য্যকুশলতায় এই অদ্ভুত লাইনটী নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গম প্রদেশে এই রেল পথটী প্রস্তুত হইতে পারিবে এরূপ বিশ্বাস পূর্ব্বে
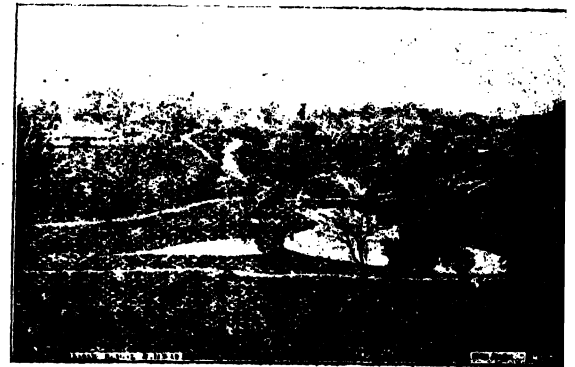
গাড়ী হইতে নিম্ন ভূমির দৃশ্য।

কাহারও ছিল না। ১৮৮২—৮৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই পথের জরীপ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন এই লাইনটী খুলেন।

পার্ব্বত্য রেল রাস্তার ষ্টেসন গুলিতে ঘৃত পক্ক জল খাবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দধি, দুগ্ধ এবং ক্ষীর বেশ

মিলে। অপরাহ্ন দেড় ঘটীকার সময় আমরা 'হাফলং' পৌছিলাম। উহা উত্তর কাছাড় মহকুমার প্রধান স্থান। স্থানটী স্বাস্থ্যকর এবং তুলার একটী প্রধান বানিজ্য স্থান। জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক ইংরেজ পরিবার এখানে আসিয়া বাস করেন। 'হাফলং' ষ্টেসনে বহুকাল পরে একটী বাল্য সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধুটী 'রেলীব্রাদার্স' কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন। তুলা ক্রয় করিতে 'হাফলং এ' আসিয়াছেন। সাক্ষাতের পর অতীতের স্মৃতি উভয়ের প্রাণে লাগিয়া উঠিল। সে স্মৃতি কত মধুর। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে আদি অন্তহীন কত কথা বলিলাম। বন্ধুটী আমাকে নামিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, ইহা সত্বেও পারিলাম না। ট্রেণ ছাড়িবার ৩।৪ মিনিট পূর্ব্বে বন্ধুটী নানাবিধ মিষ্টান্ন গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া সুদূর অতীতের বাল্য স্মৃতিরাশি হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। আবার প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে বিভোর হইলাম। অপরাহ্ন প্রায় ৪টার সময় 'মাইবং' ষ্টেসনে পহুছিলাম। 'মাইবং' এর নিকটে কাছাড়ি রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। আহম এবং নাগাজাতির উপদ্রবে কাছাড়িরাজ রাজধানী ডিমাপুর পরিত্যাগ করিয়া অত্যল্পকাল 'মাইবং'এ অবস্থান করেন। 'মাইবং' হইতে নাগাপাহাড়ের 'হেনেমা' অধিক দূর নয়। এখানে অনেক 'কুকি' নাগা দেখিলাম। ইহারা 'হেনেমা' অঞ্চল হইতে তুলা আনিয়া বিক্রী করে। দেখিতে২ সন্ধ্যা ৬ টার সময় 'লাইডিং' পৌছিলাম। বায়স্কোপের ন্যায় অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি কোথায় মিশিয়া গেল। 'লামডিং'এ ট্রেণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া এবং ব্লেকওয়াটার জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এখানকার জল অব্যবহার্য্য। চতুর্দ্দিক জঙ্গলাকীর্ণ এখান হইতে সুবিস্তৃত 'নামুর' জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকারে নিবিড় অরণ্যানী জমাট বাঁধা অন্ধকারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। 'লামডিং' ছাড়িলে সকলেই আপন আপন শয্যায় দেহ ভার ন্যস্ত করিয়া গল্প গুজবে সময় কাটাইতে লাগিলাম। মণিপুর রোড ষ্টেসনে আমাকে নামিতে হইবে। এখান হইতে ৪০ মাইল টোঙ্গায় যাইতে হইবে। তারপর আমার গন্তব্যস্থান কোহিমা। রাত্রি অনুমান দুই টায় মণিপুর রোডে গাড়ী থামিল, আমি অপরাপর যাত্রীদিগের নিকট বিদায় হইলাম।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মজুমদার।

প্রাচীন বৃটনজাতির সহিত ভারতীয় আর্য্যজাতির সম্বন্ধ।

ঋগ্বেদের কালের বর্ষারম্ভ।

লকিয়ার দেখাইয়াছেন যে মিসল্‌টো পূজা যখন ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়, সেই সঙ্গে২ সূর্য্যের কর্কট ও মকর ক্রান্তিতে অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হয়। আমরা ঋগ্বেদ হইতে দেখাইব যে বর্ষা কালে বৈদিক কালের বৎসর আরম্ভ হইত এবং সূর্য্যের কর্কট ক্রান্তিতে আগমন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত।

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থা মন্বেত বা উ।
ঋগ্বেদ, ১।২৪,৮

রাজা বরুণ সূর্য্যের গমনের জন্য বিস্তীর্ণ পথ করিয়া ছিলেন। [সূর্য্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গমন করেন যে পথে তাহাই এখানে বলা হইল।]

অসৌযঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ।
ন স দেবা অতিক্রমে তং মর্তাসো ন পশ্যথ বিত্তং মে অস্য রোদসী। ১।১০৫।১৬।

অর্থঃ—দিব্য লোকে ঐ যে পথ আদিত্য বিখ্যাত করিয়াছেন, হে দেবগণ। তিনি (অর্থাৎ আদিত্য) অতিক্রম করেন না; তাহাকে (অর্থাৎ পথের সীমাকে) মর্ত্যগণ দেখিতে পায় না। হে দ্যাবা পৃথিবী!. আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

[সূর্য্য কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির মধ্য পথে বিচরণ করেন। তিনি তাহার বাহিরে গমন করেন না। কিন্তু ঐ সীমা সাধারণে বুঝিতে পারে না—কারণ আকাশে এরূপ কোন চিহ্ন নাই যে তাহা চক্ষে দেখা যায়। তবে ঋষিগণ তাহা কোন প্রক্রিয়া দ্বারা জানিতে পারিতেন। সে প্রক্রিয়ার বিষয় পর অঙ্কে প্রকাশিত।]

ব্রহ্মা কৃণোতি বরুণো গাতুবিদং তমী মহে। ব্যূর্ণোতি হৃদামতিং নব্যো জায়তা মৃতং বিত্তং মে অস্য রোদসী। ঋগ্বেদ। ১।১০৫।১৫।

ত্রিতঃ কূপেবহিতো দেবান্ হবত উতয়ে।

তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু।

বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ঋগ্বেদ, ১।১০৫।১৭।

অর্থঃ—বরুণ স্তোত্র করিতেছেন। সেই পথজ্ঞকে প্রার্থনা করি। হৃদয়ে স্তুতি প্রকাশ করিতেছেন। নূতন ঋত (অর্থাৎ বৎসর) উৎপন্ন হউক; হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও। ত্রিত কূপে থাকিয়া দেবতা দিগকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বৃহৎ বৃহস্পতি কূপ হইতে (উৎপন্ন) সেই স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

বরুণ দেব পথজ্ঞ। কখন সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আসিবেন তাহা যানেন। স্বর্গে ও নূতন বৎসর, হইতেছে। [বৃহৎ বৃহস্পতি অর্থাৎ সূর্য্য, ত্রিত কূপে থাকিয়া যে স্তোত্র করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিরূপে জানিলেন যে ত্রিতের স্তোত্র তিনি শ্রবণ করিয়াছেন? পর ঋকে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।]

অরুণোমা সকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি।

উজ্জিহীতে নিচায্যা তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী।

বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১।১০৫।১৮।

অর্থঃ—লোহিত বর্ণ নেকড়ে বাঘ পথে যাইতে ২ একবার আমাকে দেখিয়াছিল। যেমন ছুতার (অনেক ক্ষণ কাজ করিতে ২) পৃষ্ঠে ক্লেশ বোধ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়, (সেইরূপ নেকড়ে বাঘ আমার) দেখিয়া (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল)।

[লোহিত বর্ণ নেকড়ে বাঘ বা বৃক সূর্য্যকে বুঝাইতেছে। কারণ, দেখান গিয়াছে নূতন ঋতের জন্ম হইতেছে, সেই উপলক্ষে পথজ্ঞ বরুণকে প্রার্থনা করিয়া ঋষি বলিয়াছেন যে দিব্যলোকে আদিত্যের পথ আছে তাহা আদিত্য অতিক্রম করেন না। সেই পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই বরুণের নিকট প্রার্থনা। ত্রিত কূপে থাকিয়া সেই পথ আবিষ্কার করিতেছেন। যে দিন সূর্য্য রশ্মি লম্ব ভাবে কূপের নিম্নে অবস্থিত ত্রিতের নিকট গমন করিল, সেই দিন সূর্য্য ঐ পথের শেষ সীমায় আসিয়া পড়িয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে সূর্য্যরশ্মি কূপের তল দেশে না পড়িয়া উহার গায়ে পড়িতেছিল। ত্রিতের নিকট উহা বক্র বলিয়া বোধ হইতেছিল। এই slanting ও straight আলোক পাত ঋষি যে তুলনা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বেশ সুন্দর হইয়াছে। একজন ছুতার অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে করিতে পৃষ্ঠে যখন ব্যথা বোধ করে, তখন সোজা হইয়া যেমন দাঁড়ায়, সেইরূপ সূর্য্য রশ্মি অনেক দিন ধরিয়া বক্রভাবে কূপে পতিত হইতেছিল ঐদিন ঠিক লম্বভাবে কূপের মধ্যে পতিত হইল দেখিয়া ঋষির ঐ তুলনা মনে হইয়াছিল। কেহ বলিতে পারেন, উত্তর ভারতে সূর্য্য ঠিক মাথার উপর আসে না। ঋগ্বেদের অপরাপর স্থলে, এইরূপ কূপ যে তির্য্যক্ ভাবে গঠিত হইত, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।]

এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব ঋগ্বেদের যুগে বৎসর কোন্ ঋতুতে আরম্ভ হইত।

ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রেন সোমে সরোন পূর্ণ মভিতো বদন্তঃ।

সংবৎসরস্য তদহঃ পরিষ্ঠ যন্মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব॥

ঋগ্বেদ, ৭।১০৩।৭

অতি রাত্র সোম যজ্ঞে ব্রাহ্মণ সকল (পর্য্যায় ক্রমে) অপূর্ণ সরোবরের নিকটে (গমন করিয়া) বলিতেছেন, 'হে মণ্ডূকগণ! সংবৎসরের সেই দিন আসিয়াছে যে দিনে বর্ষাকাল হইয়াছিল।'

[এই ঋক্ হইতে বুঝা যাইতেছে যে পুষ্করিণী সকল প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; বর্ষাকালের প্রথম দিন আসিয়াছে। অতি রাত্র সোম যজ্ঞ হইতেছে। বৈদিক যুগে ৫ বৎসরে একটী যুগ হইত। ইহার প্রথম বৎসরকে সংবৎসর, ২য় কে পরিবৎসর, ৩য় কে ইদা বৎসর, ৪র্থকে অনুবৎসর এবং ৫মকে ইদ্ বৎসর বলিত। প্রত্যেক বৎসরের প্রথম দিনে ও শেষ দিনে একটী অতিরাত্র সোম যজ্ঞ হইত। উদ্ধৃত ঋকে সংবৎসরের শেষ দিনে যে অতিরাত্র সোম যজ্ঞ হইত তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কারণ পর ঋকে আমরা পরিবৎসর নাম প্রাপ্ত হই। নিম্নে উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।]

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রতঃ ব্রহ্ম কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্।
অধ্বর্যবো ঘর্মিণঃ সিষিদানা আবির্ভবন্তি গুহ্যা ন কেচিৎ॥
৭।১০৩।৮

অর্থঃ—সোম যজ্ঞকারী, স্তোত্রকারী, ব্রাহ্মণ সকল পরিবৎসরীয় বাক্য বলিয়াছেন; সোমরস উত্তপ্তকারী অধ্বর্যুগণ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। আর কেহ লুক্কায়িত নাই।

[পূর্ব্ব বৎসরের অতি রাত্র যজ্ঞ শেষে নূতন বৎসরের অতিরাত্র আরম্ভ হইত। দেখা গেল পরবৎসরীয় বাক্য আরম্ভ হইয়াছে। ঋত্বিকৃগণ মণ্ডূকরূপে শুষ্ক সরোবরে লুক্কায়িত থাকিয়া স্তোত্র উচ্চারণ করিতেন। পরিবৎসর দিনে তাঁহারা পুনরায় প্রকাশিত হইতেন। বর্ষাকাল আগমন করিলে ভেক সকল ডাকিতে থাকে। সম্ভবতঃ সেকালে মনে করিত ভেকগণ বর্ষা ঋতুকে আহ্বান করিয়া শব্দ উচ্চারণ করে। স্বভাবের অনুকরণে ঋষিগণ মণ্ডূকদিগের মত বর্ষা ঋতুকে আহ্বান করিবার জন্য এইরূপ যজ্ঞ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই ঋকে স্পষ্ট দেখা গেল সংবৎসরের শেষে অতিরাত্র সোমযজ্ঞ হইবার পর পরিবৎসর আরম্ভ হইল। অতএব বৎসর যে বর্ষা ঋতুতে আরম্ভ হইত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। পর ঋকে সংবৎসরের শেষে বর্ষাঋতু আসে এবং বার মাসে এক বৎসর হয় উল্লেখ আছে। নিম্নে উদ্ধার করা গেল।]

দেবহিতিং জুগুপু র্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো ন প্রমিনন্ত্যেতে।
সংবৎসরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্॥
৭।১০৩।৯

অর্থঃ—(ঋত্বিকৃগণ) দেববিধান (স্বরূপ) দ্বাদশের (অর্থাৎ বৎসরের) ঋতুকে রক্ষা করিলেন। এই সকল নেতাগণ (ঋতু) হিংসা করেন না। সংবৎসর পূর্ণ হইলে প্রাবৃট্‌কাল আসিলে গ্রীষ্মদ্বারা পীড়িতগণ মুক্তি-প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, কূপে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের কর্কটক্রান্তি আগমন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। তখনই নূতন বৎসর উৎপন্ন হইত। এক্ষণে দেখা গেল বর্ষাকালই বৎসরের প্রথম ঋতু। সেই সময়ে সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতেই আগমন করে। অতএব ভারতীয় আর্য্যগণের বৎসর ও বৃটনে ১৬০০ খৃঃ পূর্ব্বে আগত ড্রুঈড্‌দিগের বৎসরের সহিত মিল রহিয়াছে।

সীজারের সময়ে বৃটনদিগের জাতি, রাজা রাণী প্রভৃতির নাম।

বৃটনদিগকে যখন সীজার জয় করেন, তখন তাহাদের রাজা, রাণী, সাধারণ লোক, প্রদেশ প্রভৃতির নাম যাহা ছিল তাহা উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে বর্ত্তমান বিকৃত আকারে ও তাহারা বৈদিক যুগের আর্য্য শব্দের সহিত অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া যায়।

১। বৃটন্ বা বৃথ্‌অন (Brython)=বৃত্রহন্।

২। Cunobelin — রাজার নাম = শুনোবেলিন্ (কুকুরের মত যাহার স্বর)।

[শুনঃ অর্থে কুকুর। ঋগ্বেদে এক প্রসিদ্ধ ঋষির নাম শুনঃশেফ। বেল্‌ অর্থে to count or declare the time. Vide Monier William's Sanskrit Dictionary. Bell=Du. bel—A. S. bellon, to bellow, make a loud sound—From Idg.

Bhels, to re-sound; whence also Skt. Bhash, to bark; G. bellen, to bark.

Skeat's Et. Dictionary].

৩। Togidumnus — রাজার নাম=(তজিদ্যুম্নস্) (উজ্জ্বল দেহযুক্ত)।

[তুবিদ্যুম্ন=বহু ধনোপেত; ঋগ্বেদ ৩।১৬।৩, ৬
সুদ্যুম্নাং=সুতেজসাং ঐ ৩।১৯।২
মহাভারতের ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম স্মরণ করুন।
তজ্জী অর্থে তন্বী (Vide M. William's Dictionary)
অতএব তজিদ্যুম্নস্ অর্থে উজ্জ্বল দেহযুক্ত বলিয়া মনে হয়।]

৪। Prasutagus—রাজপুত্রের নাম—প্রসুতেজস্

[প্রসুশ্রুত=পুরাণে রাজপুত্রের নাম; (Vide M. William's Dictionary)]।

৫। Cogidumnus—রাজার নাম—কজিদুম্নস্ (বর্দ্ধিষ্ণু তেজযুক্ত)।

[কজ্ অর্থে সুখী হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া (শৌতধাতু) (Vide William's Dictionary)। অতএব কজিদুম্নস্ অর্থে বর্দ্ধিষ্ণু তেজ যুক্ত অনুমান করি।]

৬। Cartis Mandua—রাণীর নাম—কর্তী মন্দুয়া বা (কর্ত্রী মন্দুয়া)।

৭। Venutius—রাজার নাম—বেন উতিয়স।

[ঋগ্বেদে বেন নামে এক দেব বা গন্ধর্ব্বের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদ ১০।১২৩ দেখুন। উতি অর্থে রক্ষা; ঋগ্বেদের ১।১০৫।১৭ ঋক্ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে "উতয়ে" শব্দ বর্ত্তমান। অতএব মনে হয় বেন উতিয়স্ অর্থে রক্ষাকারী বেন।]

৮। Cassi-Vellanus—রাজার নাম—চসিস্‌বেল্লোনস্ [বেল্লন = a sort of rolling-pin with which cakes &c are prepared. (Vide M. William's Dictionary). চসিস্ অর্থে চর্ষণ বলিয়া অনুমান করি। চসিয়া যে বেলিয়া দেয় অর্থাৎ সমতল করে তাহাকে চসিস্‌বেল্লোনস্ বলা যাইতে পারে।]

৯। Mandubratius—রাজপুত্রের নাম—মন্দুব্রতিয়স্ (বা মন্দব্রত)।

১০। Caswallon—রাজার নাম—কস্বল্লন্ বা চস্বলন্ [কস্ = to beam, to shine (Vide M. William's Dictionary)। কস্বল্লন্ = কস্‌বর্ন্ অর্থে জ্যোতি, শ্রেষ্ঠ বা জ্যোতিষ্মান্ হইতে পারে। যদ্যপি এই শব্দ 'চস্বল্লন্" রূপে উচ্চারিত হয় তবে চসিস্-বেল্লোনস্ ও চস্‌বল্লন শব্দের একই অর্থ অনুমান করি।]

১১। Caradoc—রাজপুত্রের নাম—করদক্।

[কর বা রশ্মি দান করেন যিনি তাঁহাকে করদক্ বলা যাইতে পারে।]

১২। Adminius—রাজপুত্রের নাম—অধ্মিনিয়স্।

[অধ্মনি অর্থে অগ্নি (Vide M. William's Dic.) অতএব অধ্মনিয়স নামের অর্থ অগ্নিরূপী।]

১৩। Arviragus—একজন প্রজার নাম—অর্ভিরজস্ [অর্ভ = little, small, unimportant (Vide M. William's Dictionary)। রজস্ অর্থে তেজস্, দিবা, জ্যোতিঃ। অতএব অর্ভি-রজস্ অর্থে অল্পতেজযুক্ত বলিয়া অনুমান করি।]

১৪। Trinobantes—জাতির নাম—তৃণোবন্তেস্।

[তৃণবন্ত জাতি। তৃণ শব্দ সংস্কৃত]।

১৫। Regni—জাতির নাম—রেগ্নি।

[রাজন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন মনে হয়।]

১৬। Iceni—জাতির নাম—ঈশেনি।

[ঈশান বা ঈশ শব্দ হইতে উৎপন্ন।]

১৭। Durotriges—জাতির নাম—দুরোত্রিজেস্ বা দুরোত্রিজ।

[দুরোত্রি হইতে জাত। ঋগ্বেদে অত্রি নামে এক প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। সেইরূপ বোধ হয় দুরোত্রি নামে ঋষি বংশ এখানে বাস করিত।]

১৮। Brigantes—জাতির নাম—বৃজন্তেস।

[বৃজন্ অর্থে pasture or camping ground, settlement, town or village and its inhabitants. (Vide M. William's Dictionary).

১৯। Ordovicos—জাতির নাম—অর্দ্ধবিশেস্।

[বৈদিক কালে 'বিশ' অর্থে জনসাধারণ বা প্রজা। অর্দ্ধবিশ নাম বোধ হয় কোন রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইবার পর হইয়াছিল।]

২০। Ostorius—জাতির নাম—অস্তোরিয়স্।

[অস্তোরি = অস্ত্রি = a thrower, shooter. (Vide M. William's Dictionary)। ইহারা সম্ভবতঃ ধনুর্ব্বাণ ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সেইজন্য অস্তরিয়স নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।]

২১। Sagambri—জাতির নাম—শগম্ব্রী।

[শক্ + অম্বরী = আকাশবাসী শকগণ। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়কে শকতম বলা হইয়াছে।]

২২। Cantium—প্রদেশের নাম—কান্তিয়ম।

২৩। Camolodunum ঐ কমলোদুনম (বা কমলোদ্যানম)

২৪। Mona ঐ (মোন বা মন)

২৫। Murdochmoor—স্থানের নাম—মর্ডক্‌মুর

[ব্যাবিলনীয় দেবতা 'মর্ডক' তিয়ামস ও অহিনাশ করিয়াছিলেন। (Vide Historian's History of the world Vol. I. p. 522)।

ঋগ্বেদে (৪।১৮।১২) ইন্দ্রকে 'মার্ডীক' বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে মূর নামে এক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

যাতুধানান্ মূরদেবান্ ক্রব্যাদঃ। ১০।৮৭।২]

২৬। Cenimagni—জাতির নাম — শেনিমঘী।

[ঋগ্বেদে দেখিতে পাই শ্যেন সোমলতা পৃথিবীতে আনয়ন করে। মঘবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মঘোনী। মঘোনী অর্থে beautiful, liberal, munificent। আমার মনে হয় ল্যাটিন magnus শব্দও মঘবন্ শব্দ তুল্যরূপ। শেনিমঘী অর্থে বৃহৎ বা দানশীল শ্যেন বুঝাইতেছে।].

২৭। Duboni—জাতির নাম—দুবোনি।

[দুব অর্থে দেব যাজন। ঋগ্বেদের ৩।১৬।৪ ঋকে দুব শব্দ আছে।

চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রির্দেবে দ্বাদুবঃ।

যিনি (অগ্নি) সকল ভুবনের কর্ত্তা, (ও সৃষ্টির পর তাহাতে) অনুপ্রবিষ্ট ; হবি বহনকারী (তিনি) আমাদের দত্ত হবি দেবতাদিগের নিকট আনয়ন করেন।

অতএব যে জাতি দুব বা হবি প্রদান করেন তাহাদিগকে দুবোনি বলা যাইতে পারে।]

২৮। Carnavii—জাতির নাম—কর্ণভী।

২৯। Volantii ঐ বলন্তী

৩০। Catu Vellonni ঐ চতুবেল্লোনী

৩১। Coitanni—জাতির নাম—চৈতন্নী।

[চৈতন্য হইতে বিকৃত হইয়া চৈতন্নী হইয়াছে।]

৩২। Caledonian—জাতির নাম—কলিদোনী।

[কলি নামে এক ঋষির উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।]

৩৩। Somerton—স্থানের নাম—সোমেরতন্।

[বর্ত্তমান Somersetshireএর প্রাচীন নাম। সম্ভবতঃ এই স্থানে পূর্ব্বে সোমলতা জন্মাইত ; সেইজন্য ইহাকে সোমপুত্র বলা হইত।]

৩৪। Lindiswaras—স্থানের নাম—লিন্দীশ্বর।

[বর্ত্তমান Lincon shireএর প্রাচীন নাম।]

৩৫। Cuiron—মদ্যের নাম—সুইরং (বা সুরা)।

[দৃভিং সুরাবতো গৃহে। ঋগ্বেদ, ১।১১১।১০]

৩৬। Mead—এক প্রকার মদ্যের নাম—মীড্

[স বর্ধিতাবর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বান্।

ঋগ্বেদ ৯।৯৭।৩৯

অর্থ :—(দেবতাদিগের) বর্দ্ধনকারী, (স্বয়ং) বর্দ্ধনশীল, মীঢ্ (মধুবৎ) সোম।

সোমকে মীঢ্ বলা হইল। Mead প্রাচীনকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। Welsh ভাষায় ইহাকে Medd বলা হয়।]

৩৭। Home—গৃহের নাম—হোম।

[আয়বে সহস্রনীথো অধ্বরস্য হোমনি। ঋগ্বেদ ৩।৬১।৭ আয়ুকে দানের নিমিত্ত, হে সহস্রপ্রকার দানশীল (ইন্দ্র) যজ্ঞের হোমে (আগমন কর)। হোম অর্থে অগ্নিতে সোমাদি নিক্ষেপ করা। যেখানে হোম করা যায় তাহাকে হোম স্থান বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে Home অর্থে গৃহ। আমার মনে হয় পূর্ব্বে Home অর্থে সোম যজ্ঞের স্থান বুঝাইত। ক্রমশঃ উহা বুঝাইয়াছে।]

উপসংহারে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাস সংকলনে আমার দ্বারা প্রদর্শিত চিহ্ন সকল যদি কোন মাত্র সাহায্য করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

বিসর্জ্জন।

"ওকি, তুমি অমন চুপটী করে বসে পড়লে যে ? ডাক্তার এবেলা কি বলে গেল ?"

"বল্লে খুব বেদানার রস খেতে দিয়ো ওকে। সেদিন যে বেদানাটা এনেছিলাম তাকি সব ফুরিয়ে গেছে ? থাকেতো একটু রস ওকে দেও না। আহা খোকার গলা বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।"

"একটা বেদানায় আর কদিন চলবে ? ফুরিয়ে

গেছে। তা থাক, বেদানা একটু পরে আন্‌লেও চলবে; কিন্তু আমি তোমার পায়ে ধরে বলচি আর যে কেউ আমায় ফাঁকি দিতে চায় দিক্, কিন্তু তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে ভুলাতে চেষ্টা করো না। জগতের সব ফাঁকি হয়ে যাক, দুঃখ নাই কিন্তু সব ফাঁকির ভিতরে এক তোমাকেই সত্য বলে জানি, সত্য বলে জানবো—তাতে কখনো মনে সন্দেহ আস্‌তে দিও না!"

"তোমার কথা তো আমি ভাল করে ঠাউরে উঠতে পারচি নে সুহাসিনি!"

"আমি এই কথাটা আজ তোমাকে স্পষ্ট করে বলতে পাচ্চিনে। বিপদ যদি এসেই থাকে, তবে শুধু ফাঁকির জোরে তাকে চেপে রাখবে কতক্ষণ! বিপদতো শেষকালে কখনও চাপা থাকবার নয়!"

"তা ঠিক সুহাসিনি, শেষকালে কিছুই চাপা থাকেনা, কোনো অপ্রিয় সত্যই না! কিন্তু সুহাসিনি, বিপদ সবে সুরু হয়েচে। শেষের কথা সুরুতে তোমার শুনে দরকার নেই!"

"দরকার নেই? বল কি তুমি! ছি ছি তুমি আমায় অত ছেলে মানুষ ভাব? দরকার আছে বলেই তো আমার জবরদস্তি কিছুতেই থাম্‌বে না! ডাক্তার কি বলে গেল তা আমায় খুলে না বলা পর্য্যন্ত তোমায় ছাড়বো না!"

"ডাক্তার যা বলবার তাই বলে গেছে কিন্তু—"

"কি আশ্চর্য্য! আমারি বুকের উপর খোকাকে দিন রাত চেপে রাখচি, আর তুমি মনে করচ আমি কিছুই বুঝতে পারচি না?—তা কখখনো নয়। আসল কথাটা কি জান, সত্য যত বড় নিষ্ঠুরই হোক না কেন, সে যদি কাছেই এসে থাকে, তবে তাকে স্পষ্ট করে জেনেই প্রস্তুত হওয়া দরকার—"

"প্রস্তুত হতে চাও?—ডাক্তার সত্যি সত্যি বলে গেছে খোকার ইনফ্যানটাইল লিভার হয়েচে। ছেলেপিলেদের এ ব্যামো হলে নাকি আর রক্ষা নাই!"

"মিছে কথা। তোমার এ ডাক্তার খোকার ধাৎই বুঝতে পারে নি! তুমি এখনি আর একজন বড় ডাক্তার দেখাও!"

"এ ডাক্তারটীও তো নিতান্ত ছোট নয়! আর স্বয়ং মৃত্যু রাজই যদি রোগের ছদ্মবেশে আমাদের বুক থেকে খোকাকে ছিনিয়ে নিতে এসে থাকেন, তবে ছোট বড় কোনো ডাক্তারই তো তাঁকে ঠেলে রাখতে পারবে না!"

"ছি ছি অমন অকল্যাণের কথা কি মুখে আনতে আছে? তুমি ভাবনা কর কেন, আমার মন বলচে খোকা নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবে!"

"তোমার মন যা বলচে তা কি আর আমি বুঝতে পারচি না? কিন্তু সুহাসিনি! ডাক্তারের মন আর তোমার মন তো ঠিক এক জিনিষ নয়।"

"সুধু আমার মন বলেও নয়, আমার মনের ভিতরে যিনি অন্তর্য্যামী, যাঁর দয়ায় সব হচ্চে, তিনি বলচেন ভাল হবে আর তোমার ডাক্তার 'না' বল্লেই হলো? ইস! অত বড় তোমার ডাক্তার!"

"কি বলচো, ভগবানের দয়ার কথা? অবিশ্যি তাঁর দয়া হলে কিনা হতে পারে! কিন্তু সুহাসিনি, একটা দুর্লভ মানব জন্ম প্রায় শেষ হতে চল্লো, তাঁর দয়ার যোগ্য হবার জন্য কি করেচি আমরা, বল দেখি!"

"তাঁর দয়ার যোগ্য হওয়া! ওকি বলচো তুমি! তিনি যে অহেতুক কৃপাসিন্ধু! পৃথিবীতে ক'জনে তাঁর সমুখে যোগ্যতার দাবী নিয়ে দাঁড়াতে পারে! কিন্তু তবু কত কীট পতঙ্গ, তরুলতা পশুপক্ষী কোনো রকম যোগ্যতার দাবী না রেখেও কি তাঁরি সুমঙ্গল করুণার মাঝে বিচিত্র হয়ে ওঠে নি! মৃত্যুর পানে আমাদের ক্ষণিক জীবন যাত্রাটার এই যে নিস্ফল চেষ্টা, এত সুখ দুঃখ,—সে কার করুণার মাঝে অমন বিচিত্র হয়ে উঠ্‌চে? ঠিক জেনো এ বিশ্বজগত তাঁরি করুণার মাঝে বিকশিত কিরণের সহস্র দল! যাঁর করুণায় ফুল ফুটচে, তারা উঠচে, দিন রাত্রি হচ্চে, তুমি মনে করোনা যে আমাদের খোকা তাঁর কেউ নয়!"

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক সুহাসিনি! তাঁর করুণার রসে আমাদের ঝরা ফুলটা আবার জেগে ফুটে ওঠে তবে আর ভাবনা কি! কিন্তু ফুল ফোটার মধ্যেই যে তাঁর করুণা আর ঝরার মধ্যে নয়,—এ মৃত্যুশীল পৃথিবীতে সে কথা কেমন করে স্বীকার করবো?"

"খোকা যে কখনো ভাল হতে পারে না একথা কখনো মনে করো না। লিভারের রোগী কি আর ভাল হয় না? ভগবানের দয়া কোন দিক দিয়ে কখন কেমন করে আসে, তা কি আমরা সব সময় বুঝতে পারি? আচ্ছা খোকাকে যদি আমরা সত্যি সত্যি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, সে কি আমাদের কম ভাগ্যি?"

জন্মাবার পরদিন ওকে যেমন আমরা সৎমার মরা বুক থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি, খোকাও তেমনি মা ডাকেই তোমার কোলে উঠেছে! বেঁচে যদি ওঠে, আর সে মধুর ডাকের রসে যদি ওর সারাটী জীবন ভরে থাকে, তবে তোমায় মা বলেই জানবে, মা বলেই ডাকবে। বৌদিদি বল্লে ও তোমায় চিনবে না বটে কিন্তু ও কখনো ওর কুড়িয়ে পাওয়া মাকে ভুলবে না!"

"পেটে না ধরেও সত্যির মা হওয়া কি সহজ কথা? মা কখনো নয়—"

"তবে, সহজে মা হয়েচি বলে মা হওয়ার দায়িত্বটাকে যেন কখনো সহজ মনে না করি, তুমি আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করো—খোকা নিশ্চয় সেরে উঠবে!"

"জানিনা সুহাসিনি, কতখানি ইচ্ছা নিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে আশীর্ব্বাদ ফলে, কিন্তু—"

আর কিন্তু কিন্তু নয়। এখন আমাদের এই কথাটা খুব জোর করেই মনে রাখতে হবে যে খোকা যতক্ষণ আমাদের, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই ভরসা ছাড়তে পারবো না!"

"ভরসা?—ভরসার কথা তোমায় আর কি বলবো সুহাসিনি! খোকাকে যে আমি ভরসার অকূল সিন্ধু ভেবে কত সুখেরই না স্বপ্ন দেখেছিলাম! সে সিন্ধুজলে ডুব দিয়ে আমি যে কত রঙ্গের সুখ দুঃখ কত ভাবের মণিরতন কুড়িয়ে এনেচি, তাতেই আজো আমার স্বপ্ন-রাজ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে! কত স্বপ্নই দেখেচি সুহাসিনি! এই অঙ্কুর থেকে গাছ হলো, গাছে ফুল হলো, আর সেই ফুলের জগত থেকে খোকা আমার ফুলের শিশু, দেব শিশুর মত হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এলো! মনে হয়েচে ও যখন একদিন মানুষ হয়ে দাঁড়াবে, তখন হয়তঃ ওর মনে থাকবে না, ও আমাদের কত কষ্টের মানুষ করা ধন! কি যাতনা, কি লাঞ্ছনা পেয়ে ওর শিশু প্রাণটী একদিন আমাদের যমের মুখ থেকে কেড়ে রাখতে হয়েছিল। এমন করে মানুষকে ভয়ে ভয়ে মানুষ করে তুলার মাঝে, যে কি নিবিড় সুখ,—কত অস্ফুট বেদনা, যদি খোকাকে কোনদিন মানুষ করে তুলতে পারি, তবে একদিন ওকথা নিশ্চয় বুঝবে! একথা সত্যি সুহাসিনি! ভগবানের করুণাতে আমাদের মনে কখনো সন্দেহ আনতে নেই! কিন্তু আমাদের এই কুড়িয়ে পাওয়া ধনকে মানুষ করে আমরা সব দুঃখ দৈন্যকে ভক্তিভরে প্রণাম করে একদিন মনুষ্যত্বের গর্ব্ব করবো আমাদের পোড়া অদৃষ্টে কি ততটুকু সৌভাগ্য সইবে? ভগবান জানেন কি হবে!"

স্বামীর অশ্রুবিদ্ধ কণ্ঠস্বর আপন বিদীর্ণ হৃদয়ের অব্যক্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাস, অবুঝ মমতার দুঃসহ বেদনা, সূচীর সন্ধ্যার সুতীব্র বিলাপ ধ্বনির মত সুহাসিনীর কোমল নারী হৃদয়টী ঘিরিয়া ঘিরিয়া, সরোদনে বাজিতে লাগিল! সে দুঃসহ বেদনার অগ্নিশিখায় সুহাসিনীর হৃদয় অনন্ত অসম্ভ মরুভূমির সতৃষ্ণ মরিচীকায় ভরিয়া উঠিয়াছিল!

সে রুগ্ন নিরুপায় মাতৃহীন শিশুটীকে বুকে লইয়া সুহাসিনী আজ যে নিজেকে কত নিরুপায় মনে করিতেছিল, আমাদের তরুলতা ঘেরা পৃথিবীকে কত-খানি নিরাশ্রয় ভাবিতেছিল তাহার সকরুণ মৌনকাহিনী তার স্নিগ্ধ সজল নীলচক্ষু, তার রক্ত অশোক-মঞ্জরীর মতো ঈষৎ স্ফুরিত কোমল অধরপুটে অনির্ব্বচনীয় ভাষায় ফুলিয়া উঠিতেছিল। তবু তাঁর হৃদয়ের তীব্র ঝটিকা বেগ যে তার সান্দ্র-নেত্র-পল্লবের সজল বাধা পার হইয়া সে মধুর স্ফুরিত অধরের মৃদুনিষেধ অবজ্ঞা করে নাই, সে কেবল তার ব্যথিত সুন্দর অধিকতর নিরুপায় স্বামীর মুখখানার দিকে চাহিয়া! সুহাসিনীর মনের উপর ভর না পাইলে তার স্বামী হিমাংশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ প্রবণ হৃদয়টী যে আশ্রয়চ্যুত লতা জালের মত একান্ত শ্রীহীন হইয়া চারিদিকে লুটাইয়া পড়ে, সে কথা সুহাসিনী যেমন করিয়া জানিয়াছে, তেমন আর কে পারিয়াছে!"

রুগ্ন শিশুটী তখন অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে মাতৃ-স্বরূপার ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সে

যেন বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত সাগরের উচ্ছ্বাসের উপর ছিন্ন মেঘান্তরাল হইতে নীরব চন্দ্রোদয়!—শান্ত বিচিত্র, গম্ভীর ছন্দোময়! শীর্ণ সুন্দর ব্যথিত পাণ্ডুর অজ্ঞান শিশুর একখানা যথার্থই নিরুপায় হাসি মাখা চাঁদ মুখ। সে চাঁদ মুখখানার লোভেই যে স্বয়ং মৃত্যুরাজ দীপাধারের পশ্চাতে জমাট অন্ধকার হইতে ধীরে ধীরে শিশুর রুগ্ন শয্যাটীরদিকে ভিড়িয়া বসিতেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন খবর, কোনো উদ্বেগ না রাখিয়া শিশুটী ক্ষুদ্র হাত দুটী মুঠি করিয়া নির্ভয়ে সুহাসিনীর কোলে আরামে ঘুমাইতেছিল! সুহাসিনীর কৃষ্ণকেশ জাল তার বাম কাঁধের উপর হইতে তরঙ্গে তরঙ্গে বুকের উপর নামিয়া পড়িয়া শিশুটীর মুখের উপর পরম ঔৎসক্যে যেন চুম্বন নত হইয়া দুলিতেছিল! আর সুহাসিনী তার রংজ্বালা পরশের মত বিবর্ণারিকা চুল গুলির উপর আলগোছে হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

তখন ছায়ামগ্ন গগনতলে মেঘলগ্ন সোণার চাঁদের রেখা এক অস্ফুট স্বপ্ন কুহেলীর মাঝে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল! খোলা জানালা দিয়া স্নেহশীলা নারীর বেদনা মধুর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শিশির সিক্ত সৌরভ ঘরের ভিতর ভাসিয়া আসিতেছিল, পরদুঃখ কাতর স্নেহমুগ্ধ শত শত মাতৃ চক্ষুর মতো, সুনীল আকাশের সংখ্যাতীত তারাগুলি অন্ধকারের নিবিড় বক্ষ খচিত করিয়া নিষ্প্রভ পাণ্ডুর শিশু চাঁদের মৃত্যুশয্যার চারিদিকে অস্ত শিখর স্নিগ্ধ ঔজ্জল্যে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আকাশের অনন্ত নীলিমা পৃথিবীর অসংখ্য নিরুপায় মাতৃহীন শিশুগুলির প্রতি বিশ্বজননীর অজস্র অনাবিল করুণা ধারায় যেন ভরিয়া উঠিতেছিল।

(২)

"সুহাসিনি!"

"ওকে—তুমি? আজ অত রাত হলো যে!"

"তুমি আপিসে খবর পাঠিয়েছিলে, তাই আপিস থেকে ডাক্তার ডাকতে বেরিয়েছিলাম।"

"তুমি আপিসে চলে গেলে পর খোকা বড় অস্থির অস্থির করতে লাগলো। মুখ কালো হয়ে উঠলো, দুই চোখ কেমন অস্বাভাবিক রকম বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে কেমন হাঁস-ফাঁস করতে লাগলো! তুমি আপিসে, রাজেশ্বরীও নাইতে গিয়াছিল। আমি ভয় পেয়ে তোমার কাছে ডাক্তার ডাকতে খবর পাঠিয়েছিলাম!"

"জানতো হাতে একটী শিকি পয়সাও নেই। আর সব না হয় মুদির ঘর থেকে ধার করে এক রকম করে চলবে। কিন্তু ডাক্তারের ভিজিট তো যখন তখন না হলে চলে না!"

"তার জন্যে অত ভাবচো কেন, আমাদের এ বিপদের কথা শুনলে ডাক্তার বাবু অবিশ্যি—"

"ডাক্তারকে বলেছিলাম ভিজিটের টাকাটা জোগাড় করে দেবো এখন, তা ডাক্তার বাবু রাজি হলেন না!"

"তার জন্য ভাবনা কি!"

"ভাবনা কি বলচ সুহাসিনী! ভাবনায় যে আমার বুক থেকে গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। খোকা অচিকিৎসায় মারা যাবে, আর আমি চুপ করে কপালে হাত দিয়ে বসে থেকে দেখবো?'

"আমরা দুজনে যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন খোকার অচিকিৎসা কিছুতেই হবে না। হাতে টাকা না থাকে, ধার করে এক রকমে চলবে। আমাদেরি না হয় সময় খারাপ পড়েচে, কিন্তু মহাজনের ঘরে তো আর ডাকাতি হয় নি!"

সে কথা আর তুলো না সুহাসিনী। ডাক্তারের বাড়ী থেকে মহাজনদের গদি গদি ঘুরে ঘুরে ইস্তক বন্ধু বান্ধবদের দুয়ারে দুয়ারে এত রাত ঘুরে বেড়িয়েচি। টাকায় দুআনা পর্য্যন্ত সুদ কবুল করে, সকলের কাছে দশটী টাকা ধার চেয়েছি! আমাদের দুঃখ দেখে জগতের আর একটী প্রাণীরও দয়া হলো না! আজকার বিপদ তোমার আমার—তাতে পৃথিবীর আর কারো কি কিছু আসে যায়? খোকা যদি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলেও যায়, সে দিনো আমাদের দুঃখে আকাশের একটী তারাও ঢাকা পড়বে না।"

"সে জন্য দুঃখ করো না তুমি। ভগবান আছেন ভগবান আছেন, তাঁর উপর যতক্ষণ নির্ভর রাখতে পারবো, ততক্ষণ আমি কোনো বিপদকেই ভয় করি না।",

"তা খোকাকে এ বেলা কেমন বুঝচো?'

"ঘুমের অষুধ খাওয়াবার পর থেকে খোকা একটু ঘুমাচ্চে!"

"তোমার হাতে সোণার বাকী চুড়ী চারগাছা দেখতে পাচ্চি না—"

"তুমি ওঠে হাত মুখ ধোও, কাপড় ছাড়, কিছু খাও। তোমার মুখ চোখ যে একেবারে কালী হয়ে গেছে!"

"না, সুহাসিনী, জিব থেকে গলা পর্য্যন্ত একেবারে তিতো হয়ে আছে। এখন মুখে আর কিছু রুচবে না!"

"সে আবার কি কথা! মুখের দিকে চাইতে পারা যাচ্চে না, আবার বলচো কিছু মুখেও দিবে না! তুমি কি মনে কর, তুমি এক বেলা না খেলে কারো কিছু ক্ষতি হবে, না, তুমি উপোস করে থাকলে খোকা আপনিই ভাল হয়ে উঠবে! বাবা যে বলে গেছেন, এক হাতে চোক মুছবে আর এক হাতে কাজ করে যাবে, এখন আমাদের সে কথা ভুললে চলবে কেন? যাও, একটু কিছু মুখে দাও। দেখচো তো খোকাকে ছেড়ে আমি এখন কোথাও উঠতে পারচি না!"

"হিমাংশু ঢাকনি উঠাইয়া রেকাবী হইতে একটী মুড়ির লাড়ু ভাঙ্গিয়া মুখে দিতেই খোকা বিকৃত কণ্ঠে একবার মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হিমাংশুর হাত হইতে মুড়ির লাড়ু মাটীতে পড়িয়া গেল। হিমাংশু তাড়াতাড়ি কোনো মতে হাত ধুইয়া খোকার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। সুহাসিনী আস্তে আস্তে রুগ্ন শিশুকে তপ্তশয্যা হইতে কোলে তুলিয়া এমন ভাবে দুলাইতে লাগিল যে কে বলিবে সে খোকার মা নয়, আর কেহ! খোকার অরোগ্য পাণ্ডুর মুখচ্ছবি মুহূর্ত্তের জন্ম হাসির ক্ষীণ আভাষের মাঝে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ক্ষণকালের জন্ম স্নেহ করুণ চক্ষে সুহাসিনীর তরুণ মাতৃমূর্ত্তির পানে চাহিয়া লইয়া তার ইহকালের সমুদয় স্নেহঋণ যেন শোধ করিয়া লইল। তার পর সে ক্ষীণ হাসির মৃদুরেখা রুগ্ন মুখেই কোথায় কোথায় মিলাইয়া গেল, সুহাসিনীর মুখের দিকে ক্ষণকাল সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে চরম সুখে, পরম শান্তিতে সুহাসিনার কোলে পুনরায় নির্ভয়ে ক্লান্ত নয়ন-পল্লব মুদ্রিত করিল। শীত রজনীর শিশিরাহত মুকুলিত পদ্মের মত খোকার মুখখানার উপর তাঁর স্নেহদৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া সুহাসিনী তার মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। তার সে সময়কার করুণা বিগলিত নীলচক্ষু দুটীর পানে তাকাইলে সত্যসত্যই মনে হয়, বুঝি এমনি নীলপদ্মে মা ত্রিনয়নীর পূজা হইয়া থাকে।

ঘরের ভিতরে একটী জীর্ণ টিপাইর উপরে ছোট্ট একটী দস্তার লেম্পে একটী মৃদু কেরাসিনের দীপ চীনে মাটীর চিমনীর ভিতরে অত্যন্ত ঘোলা হইয়া জ্বলিতেছিল। ঘরের কোণে কোণে, দেয়ালের আড়ালে, মসারীর পেছনে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ক্ষীণ আলোকের ঘোলাটে আভায় ঘরের অন্ধকারই একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র! কেবল খোকার গা ঢাকা কাঁথার উপরে, বালিশের পাশে, তক্তপোষের এক কোণে রাখা কাঁসার গ্লাসটীতে আলোক-মৃদুরেখা থাকিয়া থাকিয়া ঝিকমিক করিতেছিল! ঘরের ভিতরের লোকজন, আসবাব পত্র এমন কি যে শিশুটীর চারিদিকে সংসার লীলার করুণ রস এমন করিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল, সেটী পর্য্যন্ত ছায়াজগতের অভিনীত সূক্ষ্মতর জীবনযাত্রার একটী সকরুণ স্বপ্নদৃশ্যের মত অত্যন্ত বাস্তবতা হীন দেখাইতেছিল!

হিমাংশু আপনাকে ছায়া জগতের মাঝখানে অচেতন শিশুর সম্মুখীন একমাত্র জীবিত মনুষ্যের ন্যায় অনুভব করিয়া এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। সংসার নাট্যশালার আসন্ন বিয়োগান্ত দৃশ্যের সবটুকু হৃদয় বিদারক মাধুর্য্য তার বেদনাপ্লুত হৃদয় অতি নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিল।

মনে পড়িল, কতদিন আপিসের সারাদিনের খাটুনির পর বাড়ীতে ফিরিয়া খোকার সুধাকণ্ঠে অর্দ্ধোচ্চারিত 'দা' 'দা' ডাক শুনিয়া তার ক্লান্ত স্বামীর সমুদয় অবসাদ চক্ষের নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। কতদিন আপিস হইতে অনেক রাত্রে ফিরিয়া আসিয়াও খোকাকে অদ্ভুত ভাবে দুলাইবার সুমধুর কর্ত্তব্যটী একটী দিনের জন্যও তার কখনো ভুল হয় নাই! কতদিন উদ্বিগ্ন চিত্তে বাসায় ফিরিয়া খোকা একটু ভাল আছে শুনিয়া হিমাংশুর সকল দুঃখ যেন মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইত। খোকার জন্য তারা

টাকাকে টাকা জ্ঞান করে নাই, দৈন্যকেও দুঃখপূর্ণ মনে করে নাই। সুহাসিনীর যে দু চার খানা গহনা ছিল, সেগুলিও একে একে বাঁধা দিয়া খোকার চিকিৎসা করিতে স্বামীস্ত্রীর মনে কখনো উৎসাহের অভাব হয় নাই, বা কখনো কুণ্ঠার উদয় হয় নাই। কতদিন তারা স্বামীস্ত্রীতে এক সঙ্গে ভগবানের চরণে আকুল হইয়া সজল নেত্রে ভক্তিরুদ্ধকণ্ঠে শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছে!

কিন্তু আমাদের কর্ম্মসূত্র জটিল ঘটনা জালে সমাচ্ছন্ন। অনেক সময়ই নিস্বার্থ ভালবাসাও এ জগতে প্রত্যাশিত ফলের আকাঙ্ক্ষাটী অপূর্ণ রাখিয়াই ব্যর্থ হইয়া যায়! কিন্তু চিরকরুণাময় মমতাকে জন্মান্ধ করিয়াই রাখিয়া দিয়াছেন! তাই সুহাসিনীর মনে হইল, যে সেদিন এক অশ্রুসিক্ত করুণ প্রভাতে তার হৃদয় নিলয়ের শ্যামল কুঞ্জে নীড় রচনা করিয়াছে, সে কি প্রভাতের গান না থামিতেই চরণকমলের রক্তিম বিক্ষেপে হৃদয়প্রাঙ্গন সুরভিত গুঞ্জরিত করিয়া সহসা দেশান্তরের নীলাম্বুচুম্বিত সিন্ধুকূলে সহসা উড়িয়া যাইতে পারে? যার ছন্দে সুহাসিনীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য মৃদু হইতে মৃদুলে, ভাষা হইতে ভাবে, এমন করিয়া স্পন্দিত হইয়াছিল, সে কি সহসা এমন করিয়া বিস্মৃতির মাঝে মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে?

নীলনক্ষত্র রঞ্জিত আকাশের দিকে তাকাইয়া সুহাসিনী ভাবিতে লাগিল ঐ যে নীলাকাশে সোণালি চাঁদের রেখা উজ্জ্বল নক্ষত্র জালে আচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে, সেই যেন তার খোকা। তার খোকাই যেন চাঁদের বেশে নক্ষত্রলোক উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের নিশীথের ছায়ালীন পৃথিবীকে জ্যোৎস্নাময় করিয়া রাখিয়াছে। আকাশে বাতাসে, জ্যোৎস্নায় গন্ধে যেন উথলিতেছে তারি খোকার হাস্যমাধুরী! আজ যেন নৈশপ্রকৃতির নীরব ছন্দের সহিত বাঁধা হইয়াছে তারি খোকার ঘুমের রাগিনীটী নিবিড় আনন্দের মাঝে তার রুগ্ন শিশু নূতন হইয়া উঠিল। গৃহের স্নেহ বেষ্টনী এক রহস্যময় মায়া যষ্টির পরশে জ্যোৎস্নাঙ্কিত দিকপ্রান্তে ব্যাপ্ত করিয়া নীলাম্বরের কিরণোজ্জ্বল স্বর্ণমেঘ খণ্ডের উপর তারি খোকা যেন অপরূপ মূর্ত্তিতে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। আজ যেন সুহাসিনীর খোকার অর্দ্ধ শ্রুত অর্দ্ধ কল্পিত সুমধুর হাস্য-ধারায় সমুদয় অন্তরীক্ষ ভরিয়া ভাসিয়া গেল, ছড়াইয়া গেল! এই অতটুকু শিশু, এই অপরূপ শিশু আজ আপনার শিশির স্বচ্ছ একবিন্দু প্রাণের লীলায় সুহাসিনীর সমুদয় স্বপ্নলোক দীপ্ত করিয়া দিল! সুহাসিনী হাত জোড় করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিল,—দয়াময়, এতদিনে সুর মিলিল, তোমাকে আমি এতদিন আমার খোকা বলিয়া চিনিতে পারি নাই!

(৩)

সুহাসিনি, তুমি একটু ওদিকে সরে যাও, শরৎ একবার খোকাকে দেখবে?

সে আবার কে?

"শরৎ আমার বন্ধু ডাক্তার। কাল যখন অত করেও এখানে ডাক্তার জোটাতে পারিনি, তখন শরতকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছিলাম। ভোরের ট্রেণে এসে পৌঁচিয়েছে। ও আমার কাছে ভিজিট ফিজিট কিছু নেয় না, নেবে না।"

"কাল রাতে ঐ ঘুমের অষুধটা খাওয়ার পর থেকে খোকা বেশ শান্ত হয়ে ঘুমাচ্চে। একবারটীও কাঁদে নি। শরৎ বাবুকে না হয় বাইরের ঘরে একটু বসতে বল, ও ততক্ষণ একটু ঘুমাক।"

"ঘুম না ভাঙ্গিয়েও তো শরৎ একবার খোকাকে দেখতে পারে, তাই না হয় করিনা, কাল রাত্রে সময় সময় খোকার নাড়ী মোটেই পাওয়া যাচ্চিল না!"

শরতকে সঙ্গে লইয়া হিমাংশু যখন পুনরায় রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ভোরের আলো দরমার বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে হীরার মালা বসাইয়া ঘরটীর চারিদিক হইতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতের মায়া রুগ্ন শিশুর ঘুমন্ত মুখখানা চুম্বন করিয়া যেন শয্যা প্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

"দেখুন হিমাংশুদা—"

"কি শরত, তুমি খোকার হাত দেখে এমন চমকে উঠলে যে?"

"চমকে উঠবার কোনো কারণ হয় নি। আপনি বৌদিদিকে এখান থেকে একটু সরে যেতে বলুন না!"

"কেন, কি হয়েচে, ওকে সরে যেতে বলচ কেন ?"

"ওঁকে আর এখানে বসে থাকবার দরকার নেই।"

"দরকার নেই ? শরত তুমি আমার নিকট লুকিয়ো না, এরি মধ্যে সব চুকে গেছে তবে ?"

"হিমাংশুদা আপনারা দুজনে মিলে যদি অমন গোলমাল জুড়ে দেন, তবে তো আমি খোকার চিকিৎসা করতে পারবো না। হঠাৎ অত ঘাবড়াবার কোনো কারণ হয় নি। আপনারা একটু সরে যান, আমি ততক্ষণ একটু ভাল করে খোকাকে দেখি।"

"সুহাসিনি শরত কি বলচে শুনচো তো? ওকি, তুমি অমন করে চুপ করে বসে রইলে যে! সরে এসো, সরে এসো, এখন আর আমাদের গোলমাল খোকার সইবে না।"

"হিমাংশুদা, শেষকালে আপনিও অমন পাগলামো জুড়ে দিলেন? আপনি বৌদিদিকে এখান থেকে একটু সরিয়ে নিন, ওঁর মুখ চোখ ভাল দেখাচ্চে না।"

"সুহাসিনি।"

"তুমি চুপ কর, আমি বেশ আছি। এখনি খোকাকে আরেক দাগ ঘুমের অষুধ খাওয়াতে হবে।"

"না হিমাংশুদা বৌদিদিকে বলুন অমনি খোকার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আছে, আর ওকে ঘুমের অষুধ দিবার দরকার হবে না। ওকে জাগাতে পারি কিনা, আমার এখন সেই চেষ্টা দেখতে হচ্চে। বৌদিদিকে বলুন, খোকার জন্যে একটু দুধ গরম করে আনতে। আমি ততক্ষণ টেম্পারেচারটা নিই।"

"খোকার ঝিনুকটা আমার দিকে দাও দেখি।"

"সুহাসিনি, ঝিনুকের হয়তো আর দরকার হবে না।"

"ও কথা বলো না, খোকাকে এ পর্য্যন্ত আমি ঝিনুক দিয়েই দুধ খাইয়েচি, কলে দুধ খাওয়ার অভ্যাস কখনো করাই নি।"

"আমি বলি কি জান, খোকা যদি ঘুমিয়েই থাকে, তবে ওকে জোর করে ঘুম ভাঙ্গাবার দরকার নাই।"

"মা সে কি কথা। কাল সারারাত খোকা আমার কিছুই খায় নি, এখন পর্য্যন্ত না। সকালে একটু দুধ না খেলে খোকা যে গলা শুকিয়েই মারা যাবে।"

"সুহাসিনি এতদিন তোমার বুক ভরা স্নেহে যার গলা ভিজলো না আজ দুধেই কি তার গলা আর ভিজবে ?"

"ছি ছি, কি নিষ্ঠুর তুমি! তুমিও কি শেষকালে খোকার উপর রাগ করে ওকে দুঃখ দিতে চাও?"

"দুঃখ দিতে চাই না সুহাসিনি! আমাদের কাছে খোকা যতদিন আছে, ততদিন আমরা ওকে আরামের জন্য কেবল দুঃখই দিয়েচি, আরাম কখনো দিতে পারি নাই। আজ যদি ও সত্যি সত্যি আরাম হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর ওকে আমি দুঃখের মাঝে ফিরিয়ে আনতে চাইনা।"

"অমন অকল্যাণের কথা মুখে আনতে নাই। তুমি খোকার ওষ্ঠের কোণে হাসিটুকু দেখচো না? এ হাসির যে মৃত্যু নাই! এই হাসি দেখেই না তুমি বলেছিলে খোকার নাম রাখবে প্রত্যুষ চন্দ্র। তুমি বুঝতে পারচ না, আমি ঠিক জানি খোকা এতদিনে সেরে উঠ্‌ছে।"

বাস্তবিক এতক্ষণ খোকাকে আরামে ঘুমাইতে দেখিয়া সুহাসিনী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিল। সে ভাবিয়াছিল, খোকার উদ্দেশ্যে সে ভগবানের চরণে এতদিন যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, তার এক বিন্দুও ব্যর্থ হয় নাই। হিমাংশু শেষ রাত্রে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে সুহাসিনী একবারও চোখের পাতা বুজে নাই। প্রদোষের মুখে শেষ রাত্রির অন্ধকারটা যখন সবে একটু ফিকা হইয়া আসিতেছিল, তখন অস্পষ্ট অন্ধকারে ছায়ার হাত বাড়াইয়া স্বয়ং মৃত্যুরাজ খোকাকে সুহাসিনীর বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনো—শিশুর সে নিঃশব্দ চরম যাতনার সময়ও খোকার চোখে মুখে বারংবার অশ্রুসিক্ত চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া তার শিশির স্বচ্ছ জীবনটুকুর উপর হইতে মৃত্যুর অভিশাপ মোচন করিয়া দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

হায়রে অন্ধ মাতৃ স্নেহ! তোমার সকল দাবী বারংবার সবল পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়া তোমার ভগ্ন হৃদয়ের উপর দিয়াই মৃত্যুর বিজয় রথ রাজগর্ব্বে চলিয়াছে। তবু এ মায়ার সংসারে স্নেহ কখনো মিথ্যা

নয়, কারণ মানুষের হৃদয় যে চিরকাল স্নেহাস্পদের পানেই অনন্ত তীর্থযাত্রা করিয়াছে। কণ্টকাকীর্ণ অশ্রুসিক্ত বনপথে রক্তাক্ত পদে চলিতে চলিতে কতবার হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু স্নেহ কি কখনো মৃত্যুর নিকট পরাভব মানিয়াছে? আপনার অমৃত মাধুরী দিয়া যে মৃত্যুকেও মধুর করিয়া রাখিয়াছে, তারি নাম স্নেহ।

হিমাংশু ষ্টোভ ধরাইতেছিল, সুহাসিনী খোকার দুধের বাটী জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতেছিল। শরৎ চোখে ইঙ্গিত করিলেন, বাড়ীর ঝি মৃত শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন প্রভাতের রোদ নারিকেল গাছের কম্পিত শাখাটীর উপর মৃদু স্পর্শটী স্বর্ণাঙ্কিত করিয়া হিমাংশুদের বাড়ীর ছোট্ট উঠানটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিরল পত্র কুল গাছটীর পত্র ব্যবচ্ছেদের ভিতরে ছায়াঙ্কিত হইয়া ঝির কোলের মৃত শিশুর মলিন মুখখানার উপর বিশ্বজননীর চুম্বনের মতো ঝরিয়া পড়িল। সুপ্তোত্থিত পাপিয়ার প্রভাতী তখনো শ্যামল আম্রকুঞ্জে নীরব হয় নাই। আঙ্গিনার দুর্ব্বার উপরে শিশির জাল সোনার কিরণে শত শত হীরক বিন্দুর মত জ্বলিতেছিল।

মৃত শিশুর মুখের হাসিটী কি যেন চরম শান্তির আশ্বাস লাভ করিয়া স্থির হইয়া গেছে! প্রভাতের মধুর আলো ছায়ার আভায় মৃতশিশুর মুদ্রিত চক্ষু যাতনা-হীন হলুদ বর্ণ মুখখানা দেখিলে সত্যি সত্যিই মনে হয়, সুহাসিনীর কথাই ঠিক,—আহা, খোকা বুঝি আজ স'ত্য সত্যিই আরাম হইয়া গেছে!

মৃত শিশুকে বাহিরে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া শরৎ ডাক্তার পালাইতেছিলেন।

"ডাক্তার ডাক্তার ভিজিটের টাকা পাও নি বলে রাগ করে চলে যাচ্ছ! আমার হাতের সোনার চুড়ী বাকী দু গাছাও নিয়ে যাও,—তাতে তোমার পুরা ভিজিট হবে। কিন্তু তোমার পায় পড়ি ডাক্তার,—তুমি অমন জল্লাদের মত আমার ঘুমের শিশুকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যেয়ো না।'

এই বলিয়া সুহাসিনী তাহার হাতের চুড়ী দুই গাছি ডাক্তারের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খোকার দিকে ছুটিয়া যাইবার পথে সিঁড়ির উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অঙ্গনের বাহিরের রাস্তা দিয়া সে সময় একটী অন্ধ ভিক্ষুক উদাস বাউলের সুরে এক তারার সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান ধরিয়াছিল,—

ও মন, এই দেহের গুমর মিছে,
ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে,—
কাল শমন ফাঁদ পেতেছে,
ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা—
জীবনের নাই ভরসা,
ওরে তোর মাটীর দেহের নাই ভরসা!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ।

মহারাজ কুমুদচন্দ্র আর ইহ জগতে নাই। বঙ্গ-মাতার অঙ্ক হইতে একে একে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি ঝরিয়া যাইতেছে, বঙ্গভূমি দিন দিন কাঙ্গালিনী হইয়া পড়িতেছেন। ময়মনসিংহের কথা আর কি বলিব? পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ চন্দ্রকান্ত, দেশ পূজ্য আনন্দমোহন, মহারাজ সূর্য্যকান্ত—ইঁহাদের এক এক জনের অভাবে ময়মন-সিংহের এক একটী দিক্‌পালের পতন হইয়াছে। উঁহাদের শোক না বিস্মৃত হইতেই আজ সর্ব্বগুণাধার মহারাজ কুমুদচন্দ্রের তিরোধানে ময়মনসিংহে যে গভীর শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, শীঘ্র তাহার অপনোদন হইবে না।

সুসঙ্গের রাজবংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। কুমুদ-চন্দ্র এই সম্ভ্রান্ত রাজবংশের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরকান্তি বিশিষ্ট সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি, অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, গভীর পাণ্ডিত্য, বিনয় নম্র চরিত্র, শিষ্টাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহাকে কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র সমাজের শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছিল। আজ তাঁহার স্বর্গারোহণে বিভিন্ন স্থানে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সর্ব্বত্র সর্ব্বসমাজে তাঁহার লোকপ্রিয়তারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

১২৭৩ সালের ১৮ই আষাঢ় রবিবার সুসঙ্গ দুর্গাপুর রাজবাটীতে কুমুদচন্দ্রের জন্ম হয়। মৃত্যুকালে মহারাজের বয়স মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং তিনি অতি অকালে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন, তদুপরি আমাশয় পীড়াও ছিল। কলিকাতা হইতে সুসঙ্গ প্রত্যাবর্ত্তন কালে মহারাজ কয়েক দিন এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। পুজাবকাশের কিছু পূর্ব্বে একদিন ব্রহ্মপুত্র বক্ষে বজরা আরোহনে বায়ু সেবন করিতে

স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ।

মহারাজকে আমরা দেখিয়াছিলাম। কে জানিত ঐ দেখাই শেষ দেখা! ময়মনসিংহের এই কৃতী সন্তান যেন কালের আহ্বানে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পিতৃ পুরুষের প্রাসাদে চির বিশ্রামের জন্য আসিয়াছিলেন। রাজবাটীতে মহারাজের জ্বর প্রকাশ পায়। ক্রমে জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও নানা উপসর্গ দেখা দেয়। অবশেষে ইউরিমিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। ময়মনসিংহের সিভিল সর্জ্জনকেও চিকিৎসার্থ দুর্গাপুরে নেওয়া হয়। কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্যের নিকট মানুষের সকল চেষ্টা ও যত্নই পরাজিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিগত ১৬ই আশ্বিন সোমবার রাত্রি ১০½ ঘটিকার সময় কুমুদচন্দ্র মহাপ্রস্থান করিলেন।

বাল্যকালে কুমুদচন্দ্র কিছুকাল দুর্গাপুরে নিজবাটীস্থিত এন্ট্রান্স স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্কুলটী অধিক কাল স্থায়ী না হওয়াতে তাঁহাকে অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। তথায় প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সুখ্যাতির সহিত তিনি সকল পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৯ সনে কুমুদচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহাকে জ্ঞান ভাণ্ডারের মহারত্নগুলির সন্ধান প্রদান করিয়াছিল। জ্ঞান সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কলিকাতায় যাপন করিতেন। তথায় বিভিন্ন ভাষার নানাগ্রন্থাদি পাঠই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কুমুদচন্দ্র কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন নাই। বাটীতে সর্ব্বদা সংস্কৃত কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ, ও সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি উহাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানে কোনও উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আনাইয়া পাঠ করিতেন। তিনি অনেক দুষ্পাপ্য ও বহুমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ কুমুদচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বোর্ডের অন্যতম সভ্য ছিলেন। মহারাজ একজন আদর্শ হিন্দু ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ময়মনসিংহ ধর্ম্মসভার সভাপতির পদে তিনি বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় ময়মনসিংহ দুর্গাবাড়ী হইতে কুরুচিপূর্ণ আমোদ প্রমোদাদি দুরীভূত হইয়াছে। কলিকাতা ব্রাহ্মণ সভার

উপরও মহারাজের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং তিনি ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর প্রর্ব্বপ্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি আজীবন বাণী সেবক ছিলেন। মহারাজ কুমুদ চন্দ্রকে কলিকাতা সাহিত্য সভার সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ময়মনসিংহে যে ১৩১৮ সালে সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশন হয়, মহারাজ কুমুদচন্দ্র তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ময়মনসিংহ সম্মিলনীর স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। মহারাজ কুমুদচন্দ্র ভিন্ন কোনও সভা বা কোনও সমিতি যেন পরিপূর্ণতা লাভ করিত না। পণ্ডিত সভায় কিম্বা সাহিত্য সমিতিতে, জমিদার সভায় কিম্বা বঙ্গেশ্বরের সভামণ্ডপে—সর্ব্বত্র মহারাজের অপ্রতিহত গতি ছিল, এবং সর্ব্বত্র তিনি বিমল আনন্দ বিতরণ করিতেন।

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে মহারাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। হস্তী চিকিৎসা ও গোপালন বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। "সাহিত্য সংহিতা" "আরতি" "সৌরভ" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "দুগ্ধ", "হস্তী প্রসঙ্গ", "প্রাচীন ভারতে পশু চিকিৎসা" "প্রাচীন ভারতে চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যা" প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে ও মহাকবি ভাসের সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিলাসিতার জন্য নয়, কিন্তু পশু পক্ষীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য রাজ বাটীতে নানাজাতীয় পশু ও পক্ষী পরম যত্নে পালন করা হইয়া থাকে। সুসঙ্গ রাজবাটীর ইহা এক বিশেষত্ব। মহারাজ চিত্রবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Garo Hills Act এর বলে নানাবিধ খনিজ পদার্থ, কাষ্ঠ, হস্তী ও প্রচুর আয়কর দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ গারো পাহাড় সুসঙ্গ রাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। তদবধি রাজ্যের আয় বিস্তর হ্রাস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু রাজবংশের সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়া যায়। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মহারাজকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। কুমুদচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে Right of private Entryর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ কুমুদচন্দ্র কলিকাতায় বঙ্গেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, উহার প্রতিদান স্বরূপ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর মহারাজের ময়মনসিংহ স্থিত বাস ভবনে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। মহারাজকে একশত সান্ত্রীসহ অস্ত্র আইন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। সুসঙ্গ রাজ বংশ উত্তরাধিকার সূত্রে এই সম্মান ভোগ করিতে পারিবেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারে মহারাজ যোগদান করিয়াছিলেন এবং ভারতেশ্বর ও ভারতেশ্বরীকে Homage অর্থাৎ রাজ পূজা অর্পণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

স্বীয় বংশ মর্য্যাদা ও বিদ্যাবত্তায়, অকলঙ্ক চরিত্র ও সৌজন্যে মহারাজ কুমুদচন্দ্র স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র পরম শ্রদ্ধা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সরল, উন্নতমনা, উদার প্রকৃতি, স্বধর্ম্মানুরাগী, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। এইরূপ নিরহঙ্কার ও অমায়িক লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

আজ আমরা প্রার্থনা করি যে শাশ্বত লোকে তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তিনি মহানুভব পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হয়েন।

বিদ্যা, বিনয় এবং নানা সৎগুণে তাঁহার স্থান কবে পূর্ণ হইবে বিধাতা জানেন। *

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায়।

---

* ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ভক্ত কবি কানাই বলাই।

ময়মনসিংহস্থ জেলায় হোসেনপুরের কিঞ্চিদক্ষিণে "দগ্‌দগা" গ্রাম। এই দগ্‌দগা গ্রাম ভক্ত কবি কানাই বলাইর জন্মভূমি। কানাই-বলাইর পিতার নাম আশারাম নাথ। বলাই জ্যেষ্ঠ,—কানাই কনিষ্ঠ হইলেও লোকে কিন্তু "বলাই-কানাই" না বলিয়া, "কানাই-বলাই"ই বলিত। আমিও সকলের সঙ্গে সঙ্গে "কানাই-বলাই" বলিতেই বাধ্য হইলাম। অনেক দিন হয়, কানাই-বলাই মায়িক জগতের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন।

কানাই-বলাই দুই ভাইই পরম ভক্ত ও কবি ছিলেন। ইঁহাদের রচিত অসংখ্য গীত আমাদের ময়মনসিংহে এবং ঢাকা, শ্রীহট্ট, পাবনা ও ফরিদপুরে অদ্যাপিও গীত হইতেছে। কিশোরগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী ভাটগ্রাম নিবাসী কবি ঈশাননাথের মুখে শুনিয়া কানাই-বলাইর রচিত কয়েকটী গীত সংগ্রহ করিয়া এখানে উপস্থিত করিতেছি।

কানাইর ছয় পুত্রের মধ্যে একটীও নাই। বলাইর একটী বিধবা পুত্রবধূ আছেন মাত্র। কানাই-বলাই অতি বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কানাই স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির বশীভূত ছিলেন, বলাই ছিলেন একমত উন্মাদ।

কানাইর মালুসী।

দিনে দিনে দিন গেল দীন দয়াময়ি!—
(আমি) দীনহীন অজ্ঞানে চরণ চাই।
চরণ দেও যদি মা, নিজগুণে,
সাধনের জোর নাই॥
মনে করি সাধ্‌ব চরণ,
করি না সেই ভাবাচরণ,
কু আচরণ করে দিন কাটাই,—
দেখো অন্তকালে, চরণ তলে, বলে রাম কানাই॥

(২) লহর মালুসী।

চিতান,—তুমি ত্রিগুণধারিণী তারা, বেদে শুন্তে পাই।
পারাণ,—তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ,—
মা গো, সে গুণের সংখ্যা কিছু নাই।

লহর।— তুমি আদ্যাশক্তি তারা,
তোমায় ধর্‌তে দেও না ধরা,
জীবকে সারা, কল্লে মায়াজালে,
তোমার মায়াতে মা হয়ে মুগ্ধ,
বিষয় বিষে হলেম দগ্ধ,
সার পদার্থ সকলি যাই ভুলে।

মিল, — পাপ-পুণ্য মা তোমার কার্য্য
দোষের ভাগী আমি,—ঠিক বাজীকরের মেয়ের মত,
দেখাও ভোজের বাজী ভূমণ্ডলে।

মহড়া,—এমা দুর্গে! পাপ-পুণ্যের বিচার কর তুমি মা,
আমি সে ভার দিয়াছি তোমার চরণ কমলে॥

ধুয়া,——এ দেহে মা তুমি রাজা,
দেহ রাজ্যে তোমার প্রজা ছয় জনা এখানে,
তারা প্রজা হয়ে রাজার হুকুম আমলে না আনে,
ছয় জনা মা, প্রতিবাদী, সূক্ষ্ম বিচার কর যদি,
হয়ে ছয় জনার নামে ফৈরাদী,
আমি ডিক্রী পাব এক সওয়ালে॥

খাদ,—— সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণ তারা,—আপনি সৃজিলে।

লহর, — আমি তর্‌ব তম গুণে,
এবার সার ভেবেছি মনে মনে,—
সত্ত্ব গুণের গুণ কি আছে বল,—
সাক্ষী আছে মৈষাসুরে
তমগুণ সে প্রকাশ করে,
মা তোমার এই রাজা চরণ পেল॥

মিল,——তমগুণে সাধন সিদ্ধি, সত্য জানা গেল,
জানি তমগুণে তরে গেল,
কালকেতু এক ব্যাধের ছেলে॥
(এমা দুর্গে গো! ইত্যাদি।)

ঝুমুর।—সদা তাই ভাবি মা বসে নিশি দিন।
কবে হবে আমার বিচারের দিন॥
বিচারের দিন যে দিন হবে,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে,
আমার সে দিন বা কিরূপে যাবে,
ভেবে হৈল এই তনু ক্ষীণ॥

(৩) গীত মনোশিক্ষার ভাবে।
ও ভোলা মন, আছ কি সুখে ?
তোমার দিন গেল, কাল সম্মুখে।
মনরে, ভবের মায়া দুরে রেখে ভজ ব্রহ্মময়ীকে।
মনরে, কি ধন লোভে এসেছ ভবে, কি ধন লয়ে যাবে,
যখন সরকারী তলব আসিবে, কি বলে দাঁড়াবে ?
এ দেহ মাটীর ভাণ্ড, ভেঙ্গে যাবে ঠুকে।
শমন দুতে হাস্‌বে তখন ধিক্ দিয়ে তোর মুখে ॥
মনরে, বিষয় গোলে দিন কাটালে, খাট হৈল বেলা,
আর কিরে মন্ খুজলে পাবে সে ধন সন্ধ্যাবেলা,
শেষে কানাই বলে, ও পাগল মন, ঠেক্‌লে মায়া পাকে,
তর্‌বে যদি, ভব নদী দুর্গা বল সুখে ॥

বলাইর গীত।

(১)

করুণাময়ী মা, আজ জানা যাবে তোর কেমন করুণা।
দণ্ডহাতে, শিয়রেতে, বসিয়াছে রবির নন্দন গো মা,
রবির নন্দন, আমি ভয় পেয়ে মা বলে ডাকি, ঘনে ঘন।
মাতা পিতা বর্ত্তমানে, যদি সন্তানে কষ্ট পায়,
গো সন্তানে কষ্ট পায়,
রাগে কি সন্তান ত্যাগে গো, দয়াল বাপ মায় ॥
আমি দীনহীন ক্ষীণ অতি, দুঃখ হর দুঃখহরা,
গো দুঃখহরা।
তোরে খেয়াঘাটে বসে ডাকে বলাই কপাল পোড়া।

(২নং)

তোরে বারে বারে মা বলে মা ডাকি কেন শুনছ না।
বুঝি দীনের প্রতি দয়া হৈল না।
মাগো। ভব ঘোরে, এনে মোরে দিলে কি জঠর যন্ত্রণা।
সুতে এত বিপরীত, কাঁয়ও মায় কখন করে না।
পুরাণে কয়, শমনের ভয় দুর্গানামে থাকে না,—
আমি ভেবে দেখি, সবি ফাঁকি,
কর্ম্মপাশ আর কাটা যায় না।
জান্‌লাম তত্ত্ব, কপাল সত্য, কপাল বৈ আর কিছুই তো না।
—পাগল বলাই বলে, দুর্গা বলে,
আর কেহ তোরে ডাক্‌বে না।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

বিত্তহারা।

সবার ছোট করলে বলে
ঐ পায়েরি ধুলা
সবার চেয়ে সহজ হোল
শিরের 'পরে তোলা।
সবার চেয়ে দুরে বলে
এমনি এসে যাওনা চলে,
বিত্তহারা বলে আমার
চিত্ত দুয়ার খোলা।

কাঁকণ যে মোর নাইক হাতে
নুপুর যে নাই পায়
মনের কথা নিরিবিলি
তাইত বলা যায়।
বৈভবেরি মোহ যবে
প্রাণের চেয়ে বড় হবে,
প্রাণ দেবনা তারেই নিয়ে
দেব চরণ ছায়।

কণ্ঠ যে মোর করলে মৃদু
গান দিলে না প্রাণে,
তাইত কাছে বস্‌লে, কথা
শুনলে কাণে কাণে।
ওরা সবাই দিবস নিশি
ছড়ায় যে গীত দিশি দিশি,
শোন যে কোন সুদুর হতে
কেউ তা' নাহি জানে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদ।

বিগত ৫ই কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্য স্থানীয় মহাকালী পাঠশালার গৃহে ময়মনসিংহ সাহিত্য পারিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

মিঃ কে. সি. নাগের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গ মোহন ঘোষের সমর্থনে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিয়া সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণন করিলে কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ, বাহাদুরের লিখিত 'অঞ্জলি' নামে একটী কবিতা তাহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার কর্ত্তৃক পঠিত হয়, এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মহারাজ কুমুদচন্দ্রের জীবনী ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—ময়মনসিংহের মুকুট মণি, বঙ্গ সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকালে পরলোক গমনে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তজ্জন্য অদ্য ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন; এবং স্বর্গীয় মহারাজার শোকার্ত্ত পত্নী, পুত্র ও স্বজনবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল
(অবসরপ্রাপ্ত সবজজ)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী বি, এল

অনুমোদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম,এ,বি,এল
" " রেবতীমোহন গুহ এম,এ,বি, এল
কবিরাজ "গিরীশচন্দ্র' কবিরত্ন।

উপস্থিত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে নিম্ন লিখিত সান্ত্বনালিপি স্বর্গীয় মহারাজের পুত্র শ্রীযুক্ত মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া প্রেরিত হউক।

সান্ত্বনালিপি।

মহারাজোচিত বহুল সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

মহারাজ!

এই মহাশোকে আপনাদিগকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব জানি না। আপনি পিতৃহীন হইলেন, ময়মনসিংহ বাসীগণও বিদ্বজ্জন সভায় আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের তুল্য সৎপরামর্শদাতা এবং সুপরিচালক একজন নেতা হারাইলেন। অনন্য সাধারণ সদগুণে তিনি বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার জন্য অকৃত্রিম শোক যেরূপ বিস্তৃত, তদ্রূপ সুগভীর।

বিদ্যায় বিনয়, ঐশ্বর্য্যে অমায়িকতা, সভায় পাণ্ডিত্য, সাহিত্যে অসীম অনুরাগের কথা মহারাজা কুমুদচন্দ্রের সেই প্রসন্ন মূর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। এরূপ দুর্লভ জনের প্রতি সসম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য আমরা অদ্যকার সভায় সমবেত হইয়াছি; এবং আমাদের সকলের শোকাশ্রু সংগ্রহ করিয়া এই সান্ত্বনা লিপি মহারাজের সমীপে প্রেরণ করিতেছি। যিনি সকল শোক হরণকারী, তিনি সন্তপ্ত রাজ পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। ইতি—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত এস, বসু ব্যারিষ্টার-এট-ল।

তৃতীয় প্রস্তাব—অদ্যকার এই সভার কার্য্য বিবরণ সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সমীপে প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী, মুন্সেফ।

সমর্থক—নবাবজাদা এ, এফ, এম, আবদুল আলি, এম, এ, এম, আর, এ, এস, ডিবুটী মাজিষ্ট্রেট।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

চতুর্থ প্রস্তাব—এই সভার কার্য্য বিবরণ স্থানীয় পত্রিকায় এবং ভিন্ন জেলার পত্রিকা সমূহে প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, বিদ্যাভূষণ।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ বি, এল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কে, সি, নাগ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

Printed by Satish Chandra Rai at the Jagat Art Press. Dacca. Published by Kedarnath Majumdar. Mymensingh.
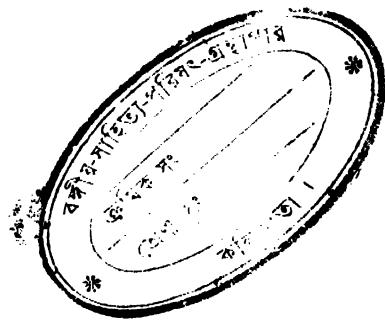
মহারাজ কুমুদচন্দ্র
ও
ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবীগণ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

পঞ্চম বর্ষ } ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৩। { তৃতীয় সংখ্যা।

কোম্পানীর আমলের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা। *

"রাষ্ট্র বিপ্লবে দেশ উচ্ছন্ন হইয়া যায়।" বাঙ্গালার ভাগ্যে তাহা হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিপ্লবের বিরাট তাণ্ডবে বাঙ্গালী আপনার অন্যান্য অনেক সম্পদের সহিত সাহিত্য বৈভব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উন্নত সৌধ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, লোচন দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি প্রাণপণ করিয়া যাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন করিয়াছিলেন; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সক্ষ তুলিকা যাহার অঙ্গরাগ বিধানে যত্ন করিতেছিল—অকস্মাৎ সে উন্নত সৌধ মহারাষ্ট্র বিপ্লবের তাণ্ডব তাড়নায় ও রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনের বিরাট বিভীষিকায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, বাঙ্গালী তাহা চিন্তা করিবারও অবকাশ পাইল না। উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ রোগীর অতীত স্মৃতি বিস্মরণের ন্যায় বাঙ্গালী তাহার অতীত সম্পদ একরূপ বিস্মৃত হইল।

রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনে দেশে যে ভীতি ও ব্যাকুলতার ভাব আসিয়াছিল—দেশবাসীর মন হইতে সে ব্যাকুলতা ও ভয় বিদুরিত হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালা দেশ বাঙ্গালীর চক্ষের সম্মুখেই নুতন আকারে দেখা দিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্য তাহাদের নিকট স্বপ্নের অলীক কল্পনায় পরিণত হইয়াছিল। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব-উৎসন্ন বাঙ্গালী আপন মাতৃভাষার চর্চ্চা এক রকম ত্যাগ করিয়া পরভাষা ভাষী ও বিকৃতভাষা ভাষী হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরেজের কৃপায় বাঙ্গালী ক্রমে তাহার ভাষা ও সাহিত্যের নবজীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে। তারপর আপন বিপুল চেষ্টায় স্তূপীকৃত ধুলি খুঁড়িয়া বিপ্লব-বিদ্ধস্ত তাহার সেই প্রাচীনতম ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল সৌধ পুনরুদ্ধার করিয়াছে। আজ ভাষার প্রাচীন ও নবীন সম্পদে বাঙ্গালী সম্পদশালী—ইহা ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয়ের পক্ষেই মহাগৌরবের বিষয়।

কত উত্থান পতনের ভিতর দিয়া কত ঘাত প্রতি-ঘাতের মধ্য দিয়া, কত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গলা ভাষা বর্ত্তমান সময় এইরূপ সম্পদশালী হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে একটা বিরাট ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। আমরা তাহার সেই প্রাচীন ইতিহাস এখানে আলোচনা করিব না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমার্দ্ধের বাঙ্গলা ভাষার যে নমুনা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি—এই অধ্যায়ে বাঙ্গালীর সেই মাতৃভাষা শিক্ষার আধুনিক ইতিহাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

মুশলমান শাসনকালে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য এক একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইত। মুশলমান রাজত্বের অবসান হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা শাসন সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াও দেশীয় লোকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ঐরূপ না করিবার তাহাদের কারণ ছিল—ঐ সময় ইংলণ্ডের রাজশক্তি ইংলণ্ডের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। এ সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়াছেন:—

"During the early days of the East India Company's rule, the promotion of education was not recognised as a duty of government. Even in England at that time education was entirely left to private and mainly to clerical enterprise. A state system of instruction for the whole people is an idea of the latter half of the present century."

অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রাকালে

---

* 'সৌরভ' সম্পাদকের "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের একটী অধ্যায়।

"Life and Times of Carey, Marshman and Ward The good old days of Hon'ble John Company, Adam's Report, Report of the G. C. P. I. 1838, Calcutta report. Report of the School Book Society, selections from Calcutta Gazettes, Calcutta Reviews, The

শিক্ষার উন্নতি বিধান ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না। এমন কি ইংলণ্ডেও সেই সময় শিক্ষা-ব্যবস্থা বেসরকারী ছিল অর্থাৎ জনসাধারণকে নিজের চেষ্টায়ই শিক্ষালাভ করিতে হইত। দেশবাসীকে শিক্ষাদান করিবার রাজকীয় ব্যবস্থার ভাব বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সুতরাং দেশবাসীকে শিক্ষাদান করিবার ভাব তখনকার রাজপুরুষদিগের মনে উদিত হয় নাই। না হইলেও পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষাদান প্রথা ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বেই এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে The Society for Promoting Christian Knowledge নামক এক খ্রীষ্টিয়ান সমিতি কলিকাতায় আগমন করেন। এই সমিতি ১৭৩১ অব্দে কলিকাতায় একটী স্কুল স্থাপন করত আহার এবং পরিধান বস্ত্র পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া বালকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইহাই বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যভাবে স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিতরণের প্রথম উদ্যম। ইহার পর ১৭৫৮ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে—পলাশী যুদ্ধের পনর মাস পরে—Zacharich Kiernander নামক সুইডেন দেশীয় জনৈক পাদরী ট্রেঙ্কুবার হইতে কলিকাতা আসিয়া কর্ণেল ক্লাইভের উৎসাহে এবং কলিকাতাবাসী খ্রীষ্টান সমাজের সহায়তায় ও অর্থসাহায্যে একটী দরিদ্র স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরেজ, আমেরিকান, পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় বালকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। চারি মাসে তাঁহার স্কুলে ৪০টী বালক হইয়াছিল। এই ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার বিষয় ছিল—সাধারণ নীতি ও খ্রীষ্টীয় উপদেশ।

এই সময় বাঙ্গালা দেশে পর্ত্তুগীজ ভাষার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। কর্ণেল ক্লাইভ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ পর্ত্তুগীজ ভাষায় আলাপ করিতেন, গির্জ্জা সমূহে পর্ত্তুগীজ ভাষায় প্রার্থনা হইত ও উপদেশ প্রদত্ত হইত। কোন বিদেশীয়ের সহিত বিদেশীয় ব্যক্তির আলাপ পরিচয় পর্ত্তুগীজ ভাষা ব্যতীত উপায় ছিল না। দেশীয় ভদ্রলোকেরা আলাপ পরিচয়ে পারস্য ভাষা ব্যবহার করিতেন, আইন আদালতেও পারস্য ভাষাই রাজভাষা বলিয়া গণ্য হইত। ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার আদর তখন একেবারেই ছিল না। সরকারী চিঠিপত্রে ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গালীর পরিবারের ভিতর বাঙ্গালা ভাষা আশ্রয় লাভ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে একজন ইংরেজী ও পারস্য ভাষা অভিজ্ঞ দ্বিভাষিকের প্রয়োজন হয়। বঙ্গদেশে তখন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব ছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম জজ সার ইলাইজা ইম্পি তাঁহার সহযাত্রী বিলাত প্রত্যাগত দিল্লী নিবাসী গণেশরাম দাসকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পশ্চিম প্রদেশবাসী গণেশরামের এইরূপ সমাদর দেখিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরেজী শিখিবার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। চাকুরী প্রত্যাশী অনেক বাঙ্গালী তখন পাদরী Kiernander নিকট যাইয়া ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন, অনেকে তাঁহাদের ছেলেদিগকে ইংরেজী শিখিবার জন্য উক্ত পাদরীর সেই দরিদ্র স্কুলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনেক বড় লোকও ইংরেজ সমাজে মিশিবার প্রত্যাশায় স্ব স্ব চেষ্টায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ভাব জাগারত দেখা যাইতে লাগিল।

ইহার পর প্রাদেশিক বিচারক বা জজের পদ প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সকল দেশীয় রীতি নীতি অনভিজ্ঞ ইংরেজ জজেরা যখন বিচারের পরিবর্ত্তে ব্যভিচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই ইংরেজ জজদিগকে, হিন্দুর শাস্ত্র ও মুশলমানের সরার অনুযায়ী পরিচালিত করিতে প্রত্যেক জজের সঙ্গে এক এক জন করিয়া হিন্দু জজ-পণ্ডিত ও মুশলমান জজ-মৌলবী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন সহৃদয় রাজ পুরুষগণের মনে উদিত হয়। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এই দুই পদের উপযুক্ত দেশী লোক প্রস্তুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস দেখিলেন, নবদ্বীপ ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে তখন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হইতেছে, কিন্তু

শাস্ত্রদর্শী মুশলমান মৌলবী প্রস্তুত হইতে পারে এমন কোন বিশ্বাস যোগ্য মাদ্রাসা এদেশে নাই। এই শেষোক্ত অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি কলিকাতার কতিপয় শ্রেষ্ঠ মুশলমান নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭৮১ অব্দে নিজ ব্যয়ে কলিকাতা-মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এইরূপে জাতীয় ভাবে বঙ্গীয় মুশলমানদিগের উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

অতঃপর আরও দশ বৎসর চলিয়া গেলে ১৭৯২ অব্দে বারাণসীর রেসিডেণ্ট জোনাথান ডানকান সাহেব সেই স্থানের পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য বারাণসীতে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই সময় দিল্লী নগরীতেও একটী আরবি-পার্শি-সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এইরূপে এ দেশীয়দিগের শিক্ষা দানের নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজপুরুষেরা আপনাদের অভাব ও প্রয়োজন বুঝিয়া দেশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৬৫ হইতে ১৭৯২ অব্দ পর্য্যন্ত—পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে এই দুইটী কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদান ব্যতীত আর কিছু করিতে যাওয়া নিরাপদ মনে করেন নাই।

১৭৯৩ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার দেশের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনার সহিত ভারতবর্ষে শিক্ষাদানের ও তথাকার অশিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মনীতি প্রচারের প্রশ্ন উত্থিত হয়।

এই সময় পর্য্যন্তও ইংলণ্ড হইতে কোন মিসনারি সম্প্রদায় ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার জন্য আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ১৭৮৭ অব্দে মিঃ থমাস নামক ইংলণ্ডের জনৈক ডাক্তার কলিকাতা আসিয়া চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম প্রচারের চষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টা আপত্তি জনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং মালদহে যাইয়া নীলকরের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই নীলের ব্যবসায়ে থাকিয়াও তিনি অবসর ক্রমে অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের নিকট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রচার করিতেন।

একাকী এইরূপ কার্য্যে ফল প্রসবের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মিঃ থমাস ১৭৯২ অব্দে ইংলণ্ডে চলিয়া যান এবং তথায় যাইয়া বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লোক-মত সংগ্রহে যত্নবান্ হন। ইঁহারই চেষ্টার ফলে সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম কেরি প্রভৃতিকে লইয়া ১৭৯২ অব্দের ২রা অক্টোবর বিলাতের নর্দ্দামটন সায়ায়ের অন্তর্গত কেটারিং নামক স্থানে এক "ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় বিলাত হইতে কোন লোককে ভারতবর্ষে যাইতে হইলে ডাইরেক্টার সভার নিকট হইতে অধিকার পত্র (licence) লইয়া যাইতে হইত। যাহার নিকট উক্ত অধিকার পত্র না থাকিত তাহাকে কোম্পানীর কোন জাহজে স্থান প্রদান করা হইত না। এতদ্ব্যতীত দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম মতের উপর বিধর্ম্মীর হস্তক্ষেপ সুশাসন সংস্থাপনের বিরোধী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, সেজন্য বিলাত হইতে কোন মিসনারি যাহাতে বঙ্গদেশে না যাইতে পারে তৎপ্রতি ডাইরেক্টার সভার এবং ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

সুতরাং কোর্ট অব ডাইরেক্টারের নিকট হইতে অধিকার পত্র লইয়া ভারতবর্ষে যাওয়ার চেষ্টা সুদূর পরাহত দেখিয়া এই নবীন ব্যাপটিষ্ট সোসাইটী পার্লিয়া-মেণ্ট মহাসভা দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা করাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

এখন—১৭৯৩ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাবের সময় এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। মিসনারি সম্প্রদায় মহাসভায় জয়লাভ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের সুখ সুবিধার প্রশ্ন এই সময় মহাসভায় বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছিল। মহাত্মা পিট, ফক্স, বার্ক, সেরিডেন, উইণ্ডহাম প্রভৃতি মহাসভার সভ্যগণ ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় প্রশ্ন অত্যধিক মনোযোগের সহিত মীমাংসা করিতেছিলেন।

যথাসময়ে মিসনারি সম্প্রদায়ের পক্ষে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদকারী মহাত্মা মিঃ উইলবার ফোর্স মহাসভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ঃ—

"That it is the opinion of this House that it is the peculiar and bounden duty of the legislature to promote by all just and prudent means, the interests and happiness of the inhabitants of the British dominions in the East; and that for these ends such measures ought to be adopted as may gradually tend to their advancement in useful knowledge and to their religious and moral improvement."

অর্থাৎ এই মহাসভার পক্ষে প্রস্তাব এই যে আমাদের বৃটীশ রাজ্যের প্রাচ্য অধিবাসীগণের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য; সেই কর্ত্তব্য সমাধানের জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি ও ব্যবহারিক বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে পারে।

এই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস, হলহেড প্রভৃতি ভারত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহাসভা তাঁহাদিগের অভিমত ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের মিসনারি সম্প্রকীয় মন্তব্যগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ভারতবাসীর ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষা নীতির উপর বিধর্ম্মী রাজার হস্তক্ষেপ করিবার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। সুতরাং মিসনারিদিগের পক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাব সেবার মহাসভায় পরিত্যক্ত হইল।

মিসনারিদিগের প্রস্তাব মহাসভায় পরিত্যক্ত হইলেও তাঁহাদিগের বিপুল উদ্যম প্রশমিত হইল না। মিঃ কেরি ও মিঃ থমাসের ভারত আগমন ইচ্ছা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহারা অধিকার পত্র (license) সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে না পারিয়া বিনা অধিকারপত্রেই গোপনে "Cron Princessa" নামক একখানা ডেনমার্ক দেশীয় পোতে আরোহন করিয়া আসিয়া ১৭৯৩ অব্দের ১১ই নবেম্বর কলিকাতায় উপনীত হন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর তখন দিনেমারদিগের শাসনান্তর্গত ছিল; সুতরাং কলিকাতায় দিনেমারদিগের কোন জাহাজ আসিলে তাহার যাত্রীদিগের অধিকার পত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হইত না। এই সুযোগে কেরি তাঁহার সহযাত্রীকে লইয়া কলিকাতায় অবতরণ করিয়া নিরাপদে তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময় কলিকাতার কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায়ও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ইংরেজ বণিকদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য করিতেছিলেন। রাম রাম বসু ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। কেরি সাহেব কলিকাতা আসিয়া এই রামরাম বসুকে নিজ মুন্সী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষালাভ করিতে থাকেন।

১৭৯৪ অব্দের জুন মাসে কেরি মালদহের নিকটবর্ত্তী মদনাবতী নামক স্থানের নীল কুঠির কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং সেই স্থানে দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী দেশী স্কুল স্থাপন করেন। ইহাই এদেশের আধুনিক রীতিতে প্রথম বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়।

মিঃ কেরি যে কেবল একটী স্কুল স্থাপন করিয়া কয়েকটী বালককে বর্ণমালা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা নহে, এদেশের প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ছেলেদিগকে অন্ন বস্ত্র এবং বাসস্থান দিয়া বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা দিবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্কুলে প্রথমে কয়েকটী বালক পড়িতে আসিত। কিন্তু কিছুদিন পরেই যখন তাহাদের দরিদ্র পিতা মাতা দেখিল, আপাততঃ ছেলেদিগের দ্বারা সংসারের যে কাজ হইত, স্কুলে যাওয়ায় তাহাদিগের দ্বারা সংসারের সে কার্য্যত হইতেছেই না, অধিকন্তু পরে যে এই লেখা পড়া দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা তাহাদের ছেলেদিগকে স্কুল ছাড়াইয়া আনিতে চাহিলেন। কেরি ছেলেদিগের অভিভাবক দিগকে তাহা করিতে দিলেননা। তিনি শিক্ষার্থীদিগের অন্নবস্ত্রের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পার্শি ভাষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ কবিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগের জন্যই কেরি নিউটেষ্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহা মুদ্রণ জন্য মদনাবতীতেই একটী কাঠের অক্ষর যুক্ত বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৯৫ অব্দে কলিকাতার "Old Calcutta Charity" সমিতিও একটী স্কুল স্থাপন করিয়া আহার এবং বস্ত্র যোগাইয়া খ্রীষ্টান বালক বালিকাদিগের পাঠের বন্দোবস্ত করেন। ঐ স্কুলে কলিকাতা ফ্রি স্কুল নামে পরিচিত ছিল।

১৭৯৯ অব্দের শেষ ভাগে মার্সম্যান প্রভৃতি চারিজন মিসনারি বিলাতের ডাইরেক্টার সভার কোন অধিকার পত্র (License) ব্যতিরেকেই আসিয়া কলিকাতা পঁহুছায় লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ প্রদান করেন। মিসনারিগণ ভীত হইয়া শ্রীরামপুরে ডেনিস গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উপলক্ষে—এদেশে আরও কোন মিসনারি গোপন ভাবে বাস করিতেছে কিনা—তাহার অনুসন্ধান হইতে থাকে ; সুতরাং নিরুপায় হইয়া কেরি সাহেব ও তাঁহার মালদহের নীলকুঠির সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন এবং সকল মিসনারি মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে ডেনিস পতাকার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদনাবতীর মুদ্রাযন্ত্রটীও কেরি শ্রীরামপুরে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরের এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৮০০ অব্দে মিঃ কেরির অনূদিত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইতে থাকে। এই যন্ত্রে আর যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সময় এদেশে যে সকল ইংরেজ সিভিলিয়ান বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তাঁহারাও দেশীয় রীতিনীতি এবং দেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রযুক্ত শাসন কার্য্যে পদে পদে মহা বিভ্রাট সৃষ্টি করিতেন। এই মহা অসুবিধা বিদূরীত করিবার জন্য তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় একটী শিক্ষানবিশী বিদ্যালয় (Training College) স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে ১৮০০ অব্দের ৪ঠা মে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নবাগত ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ও বিচারপতিদিগের শিক্ষানবিশীর জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়।

এই কলেজ স্থাপিত হইলে এদেশের সংস্কৃত অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। লর্ড ওয়েলেসলি উইলিয়ম কেরির সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অধিকারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে (১৮০১ অব্দের ১২ই মে) ৫০০৲ টাকা বেতনে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই অধ্যাপকদিগের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা এদেশে যথা সম্ভব বিকাশ পাইয়াছিল। এই কলেজের ইংরেজ ছাত্রদিগের পাঠের জন্য যে সকল বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ইঁহারাই যথাসম্ভব শক্তি ব্যয় করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল পুস্তক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা এই সকল গ্রন্থের বিবরণ প্রদান করিয়াছি।

এই সময় পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ প্রয়োজনে বঙ্গদেশে একটী মাদ্রাসা ও এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটী ব্যতীত—দেশের জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন নাই। ইহার কারণ—এই সময় রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনে এ দেশীয় হিন্দু ও মুশলমান সমাজের মধ্যে ভীতির ভাব যেমন প্রবল ছিল, উত্তেজনার ভাবও তেমনি বিলক্ষণ ছিল। বিদেশীয়দিগের কোন কার্য্যে এদেশীয় লোকের ধর্ম্মে বা মর্ম্মে কোন আঘাত না লাগে ইহা প্রত্যেক রাজপুরুষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতেন। এ সম্বন্ধে ২।১টী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

১৮০০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণ নামক এক হিন্দুর খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ লইয়া ডেনিস গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় জন সাধারণের বিরাট হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ইহাতে লর্ড ওয়েলেসলি এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে কিছুদিনের জন্য কোন মিসনারিই তাহার নিকট অগ্রসর হইতে অধিকার পাইতেন না।

১৮০৭ অব্দে পাদ্রি বুকানন "Literary Intellegence" নামে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিলে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা এ দেশবাসীগণের আপত্তিজনক হইবে বলিয়া উহার মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন। বুকানন তাহা অবশেষে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত

করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টও তাহা মুদ্রিত হইতে দেওয়া নিরাপদ মনে না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন। বুকানন স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোক; তিনি কাহারও আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া বড় বড় অক্ষরে তাহার পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া রাজপুরুষদিগের মনে ঝড় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

১৮০৭ অব্দের শেষ ভাগে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে মুশলমান ধর্ম্মের উপর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন-করিয়া একখানা পারস্য ভাষায় পুস্তিকা প্রচারিত হয়। কলিকাতার এক মুশলমান ব্যবসায়ীর পুত্র এই পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহার অধ্যাপককে একটা প্রতিবাদ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই পুস্তিকা ঘুরিয়া ফিরিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী এড্‌মনষ্টোনের হস্তে উপস্থিত হয়; তখন গবর্ণমেণ্ট হাউসে বিষম ভীতি-ভাব সঞ্চারিত হইয়া উঠে। ডাঃ কেরি আহূত হন। লর্ড মিণ্টো ডেনিস গবর্ণরকে মিসনারিদিগের হস্ত হইতে এই পুস্তিকা ছিনাইয়া লইয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। অবিলম্বে সমস্ত কাগজ ভস্মে পরিণত হইয়া যায়।

এইরূপ ভীতিভাব লইয়াই সে কালের রাজপুরুষগণ এদেশে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে সহসা কোন প্রকার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা তাঁহারা একেবারেই নিরাপদ ও সঙ্গত মনে করেন নাই।

ক্রমশঃ।

সের সিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রামখানি খুব বড় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। গ্রামের সর্দ্দার মহাশয় এ অঞ্চলে রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী কাপ্তেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

কর্ম্মচারী মহাশয়ের গলদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত এক খানা দীর্ঘ বস্ত্রে আবৃত ছিল। মস্তকে বা পায়ে কোনও আবরণ ছিল না। উহার দক্ষিণ হস্তে এক সুদীর্ঘ বল্লম। লোকটার সুদীর্ঘ বপু, কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের বড় বড় চুল ও হস্তে বল্লম থাকাতে সেই রাত্রি কালে উহাকে বড়ই ভয়ানক বলিয়া মনে হইল। যাহা হউক, তাঁহার সহিত আরও তিন জন লোক উপস্থিত ছিল। ইহাদের চেহারাও অনেকটা প্রথমের মত, তবে অত লম্বা নয়।

কর্ম্মচারী বলিলেন যে তাঁহার প্রভু ইংরাজ আগমনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধ যে নবাগতেরা সকলে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। তিনি চিরদিনই ইংরাজের বন্ধু। সাহেব দুইজন গাইডের সহিত কিয়ৎকাল পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার প্রভুর ভদ্রতায় তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কল্য প্রাতঃকালে যে তাঁহারা তাঁহার রাজার অতিথি হইবেন, তাহা কাপ্তেন সাহেব স্বীকার করিলেন।

পরদিবস আমরা সকলে রাজবাড়ীর এক অংশে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। সমস্ত বাড়ীখানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত। প্রায় ৬।৭ বিঘা জমির উপর উহা প্রস্তুত হইয়াছে। বাড়ীখানা একতালা। ঘরগুলি বেশ বড় বড়, তবে জানালা নাই। ঘরের ছাদের উপর প্রথমে কাঠ বিছান হইয়াছে, তাহার উপর মাটী ফেলিয়াছে। এ অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম বলিয়া গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই এইভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের বাড়ী তাল পাতার ছাওয়া।

গ্রামের অধিবাসীরা শম্বুরু জাতি নামে প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার এই অঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ শম্বুরু বাস করে। ইহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই দীর্ঘাকার, গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তবে সুশ্রী। গ্রামের অধিবাসীরা একবারে অসভ্য নয়। কাহাকেও উলঙ্গ দেখিলাম না। স্ত্রীপুরুষ প্রায় সকলেরই কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত—অপর সমস্ত অংশ খোলা। বাঙ্গালীদের ন্যায় ইহারা মাথায় কোনও প্রকার আচ্ছাদন ব্যবহার করে না। আফ্রিকার অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় ইহারাও অত্যন্ত উল্কী ব্যবহার করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা

ভদ্রশ্রেণীস্থ তাহারা একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখে। জুতার ব্যবহার আদৌ নাই, তবে এক অদ্ভুত রকমের খড়ম কেহ ২ ব্যবহার করিয়া থাকে।

গহনাপ্রিয়তা স্ত্রীজাতির বোধ হয় এক স্বাভাবিক রোগ। এমন স্ত্রীলোক এই গ্রামে একজনও দেখিলাম না যাহার অঙ্গে অলঙ্কার নাই। ভদ্রশ্রেণীর রমণীরা হাতে ও গলায় রৌপ্যের গহনা ব্যবহার করে। গলার গহনা অনেকটা হাঁসুলির মত। হাতে চুড়ীর মত গহনা রহিয়াছে। তবে উহা এক এক হাতে ১৫।১৬ গাছা করিয়া ব্যবহার করে। নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা লৌহ ও হাড়ের গহনা পরিধান করে। পায়ে কাহারও কোনও গহনা দেখিলাম না। ছোট ২ ছেলেমেয়ের গলায় দাঁতের হার অনেক দেখিলাম। শুনিলাম, উহাদিগকে ভূত প্রেতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহা ব্যবহার হয়।

এখানকার লোকেরা ভাতেরই বিশেষ ভক্ত। বৃষ্টির অভাব বলিয়া ঠিক এই স্থানে ধান জন্মায় না। তবে ১০০।১২৫ মাইলের মধ্যে স্থান বিশেষে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হয়। এখানে যব, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি মন্দ উৎপন্ন হয় না। ইহা ছাড়া, এখানকার সকলেই বেশ ভাল শিকারী। জঙ্গল কাছে বলিয়া ইহারা নানাপ্রকার জন্তুর চামড়া এবং মাংস ও অনেক রকমের পাখীর পাখা সংগ্রহ করে এবং উহাদের বদলে তাহাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনায়াসে প্রাপ্ত হয়।

নিকটে কোনও জলাশয় বা নদী নাই বলিয়া ইহারা মৎস্য খাইতে পায় না। তবে মাংস প্রচুর পাওয়া যায়। এ প্রদেশে তাল, আম, জাম, সকরকন্দ, চীনা বাদাম, আক, খেজুর, তরমুজ, খরমুজা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত শাল, দেবদারু, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ এখানে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। পার্ব্বত্যভূমি এদেশে অত্যন্ত কম বলিয়া খনিজ্ দ্রব্য বড় বেশী পাওয়া যায় না।

কাষ্ঠের ব্যবসায়ের জন্য এই গ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই জন্য এখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সওদাগরেরা উপস্থিত হয়। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, তখন এখানে দুইজন ইংরাজ, তিনজন জর্ম্মান্, ৫০।৬০ জন আরব দেশের লোক, ৮ জন চীনা কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বাস করিতেন। ইহাঁরা এখান হইতে মূল্যবান কাষ্ঠ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইতেন এবং এদেশে নানা প্রকারের বস্ত্র, অস্ত্রাদি, মদ, ছুরী, কাঁচি, লৌহ দ্রব্য এবং অন্যান্য সৌখীন দ্রব্যের আমদানি করিতেন। তাঁহারা বলিলেন যে, এই কাজে তাঁহারা বিশেষ লাভ করিতেছেন। গ্রামের লোকের ব্যবহার তাঁহাদের উপর খুব ভাল। যাহাতে তাঁহাদের কাজের সুবিধা হয় রাজা সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইউগণ্ডা, পশ্চিম আফ্রিকা, ও জর্ম্মান পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা এক প্রকাণ্ড ভূভাগ লইয়া বিস্তৃত। ইহার অধিকাংশ স্থান এখনও জঙ্গলা, মরুভূমি ও বিস্তৃত সমতল ভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন। লোক সংখ্যা খুব কম। কিন্তু উদ্যোগী য়ুরোপীয়েরা ইহার জন্য বিন্দুমাত্র ভীত বা চিন্তিত না হইয়া এই সকল দেশের চারিদিকে উপস্থিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। ইহাঁদিগকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) ব্যবসায়ী ইহাঁদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। (২) ধর্ম্ম প্রচারক। (৩) ভ্রমণকারী।

এই সকল দেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ৬০০।৭০০ মাইলের মধ্যে একজন বা বড় জোর দুই জনের অধিক য়ুরোপীয় নাই। অথচ তাহার জন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করেন না। তবে পীড়া উপস্থিত হইলে বড় গোলোযোগে পড়িতে হয়। তবে আজকাল খ্রীষ্টান মিশনারিরা আফ্রিকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াতে এ অসুবিধাও দূর হইতেছে, কারণ এদেশের মিশনারিরা সকলেই ডাক্তারি পাশ করা।

আফ্রিকার এই অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে য়ুরোপীয়দিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। পাঠক এই স্থানটি পড়িবার সময় আফ্রিকার মানচিত্র লইয়া বসিবেন। মিশর উত্তর আফ্রিকায়। সকলেই জানেন ইহা ইংরাজের অধীন। ইহার পশ্চিমে সুদন প্রদেশ। ইহাও ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে। ইহার দক্ষিণে ও লোহিত সাগরের পশ্চিম

উপকূলে এরিট্রীয়া প্রদেশ। ইহা ইতালীর অধীন। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ব্রিটিস্ সোমালি ভূমি। এরিট্রীয়া ও সোম্যালির পশ্চিমদিকে আবিসিনিয়া প্রদেশ। ইহা একজন স্বাধীন মুশলমান ভূপতির অধীন। ইঁহার উপাধি 'সুলতান'। ইংরাজ সোমালি ভূমির দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ইতালীয় সোমালি ভূমি। আবিসিনিয়ার দক্ষিণে ব্রিটিস্ পূর্ব্ব আফ্রিকা। মোম্বাসা ইহারই এক বন্দর। ইউগণ্ডা রেল পথ এইখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ঠিক পশ্চিমে ইউগণ্ডা ভূমি। আমরা এক্ষণে ঐস্থানে গমন করিতেছিলাম। ব্রিটিস্ পূর্ব্ব আফ্রিকা ও ইউগণ্ডার ঠিক দক্ষিণ দিকে জর্ম্মান্ পূর্ব্ব আফ্রিকা। ইহার পশ্চিমদিকে কঙ্গো প্রদেশ। সুদন ও কঙ্গোর পশ্চিমে প্রসিদ্ধ মরুভূমি সাহারা।

এই সকল স্থানের মধ্যে এক আবিসিনিয়া ছাড়া সমস্ত দেশগুলি য়ুরোপীয়দিগের অধীন। কিন্তু এইসকল দেশ একেত বড় বড় তাহার উপর ইহাদের অধিকাংশ স্থান এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন যে য়ুরোপীয়েরা এখনও ইহাদিগকে আয়ত্বে আনিতে পারেন নাই। এইসকল প্রদেশের আদিম অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য অধিবাসীরা আপনাপন দেশে আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। পূর্ব্ব ব্রিটিস্ আফ্রিকায় বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আছে। আপনাপন অধিকারের মধ্যে ইহারা প্রায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে। ইংরাজ রাজের আদেশ আছে বটে যে, ইংরাজ অধিকারের মধ্যে কোনও রাজা যেন কাহারও জীবনে হস্তক্ষেপ না করেন। কাহাকেও কঠিন শাস্তি দিতে হইলে তাহাকে যেন ইংরাজ বিচারকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ব্রিটিস্ পূর্ব্ব আফ্রিকা তের ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক এক ভাগে একজন করিয়া কমিসনার ও জজ আছেন। কমিশনার কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। জজ সেসন জজের কাজ করেন এবং এই তেরজন জজ মিলিয়া এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেশটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন। দেশের মধ্যে ২৬ টা স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। জজেরা বৎসরে এক বার করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া সমস্ত সেসনের মোকদ্দমার বিচার করেন। এই সমস্ত বন্দোবস্ত সত্ত্বেও দেশের রাজারা যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেশের চারিদিক জঙ্গলে আচ্ছন্ন, রাস্তা ঘাট প্রায় নাই বলিলেই চলে, রেল তারত অনেক দূরের কথা। এই সব কারণে এই বিশাল দেশের কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায় না।

এদেশের রাজাদের জীবন বড় সুখের নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সামর্থ্য থাকে,দক্ষিণ হস্ত কর্ম্মক্ষম থাকে, ততদিন তাঁহাদের প্রভুত্ব। এদেশের রাজারা বৃদ্ধ বা পীড়িত হইলে প্রায়ই রাজ্যচ্যুত ও নিহত হয়। এই মাসোনগনলেরি উপস্থিত রাজা পূর্ব্বতন রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। অনেক সময় উপযুক্ত পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।

২০।২৫ বৎসর আগে এইসব স্থানে ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা খুব প্রচলন ছিল। তখন য়ুরোপের লোকেরা দলবদ্ধ ভাবে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া হত ভাগ্য অধিবাসীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া দিত। এই ভাবে ইহারা মা,বাপ, ভাই, ভগিনী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরস্পরের নিকট হইতে চিরজনমের তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। যাঁহারা টম কাকার কুটীর' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এসব কথা খুব ভাল করিয়া জ্ঞাত আছেন। ইংরাজের চেষ্টায় এই ভীষণ কুপ্রথা বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু গোপনে তাহা এখনও অনেক স্থানে চলিতেছে। শুনিলাম, চারিমাস পূর্ব্বে এই স্থানের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে জনৈক পর্টুগীস্ আসিয়া ১১ জন নরনারীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই পর্য্যন্ত তাহাদের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এদেশের রাজারাও এই প্রথা বিশেষ উৎসাহের সহিত সমর্থন করিয়া থাকেন। এই সকল রাজাদের মধ্যে যুদ্ধাদি প্রায়ই উপস্থিত হয়। যে পক্ষ হারিয়া যায় তাহারা বিজেতার হাতে পড়িলে প্রায়ই গোলাম রূপে বিক্রীত হয়। এপ্রকার ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। ইংরাজ রাজ এই দেশের চারিদিকে পুলিস প্রহরী রক্ষা করিয়াছেন। তথাপি এসব গোলোযোগ নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার কারণ,

দেশের আয়তন অনুসারে পুলিসের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাহার পর, এখানের পুলিস প্রহরীরা প্রায়ই এই দেশের লোক। এখানেও উহারা সামান্য ঘুশ পাইলে সমস্ত কাজই করিতে পারে। এইজন্য এদেশের অর্থশালী লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। দেশের চারিদিকে যতদিন পর্য্যন্ত না রেলপথ ও তার প্রস্তুত হইতেছে এবং ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িতেছে, ততদিন এই সব যথেচ্ছাচার বন্ধ হইবে না।

দেশ খুব বিস্তৃত বটে, কিন্তু সে প্রকার রাজকর আদায় হয় না। একেত অধিবাসীর সংখ্যা খুব কম, তাহার উপর অর্থের প্রচলন এখনও হয় নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশ স্থলে আজ পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি বিনিময় প্রথা দ্বারা ক্রয় বিক্রয় হয়। রাজকর অধিকাংশ স্থানে নানা প্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোধ করা হয়। অনেক জায়গায় স্বচক্ষে দেখিয়াছি চারিটা লাউ বা পাঁচটা মুরগি দ্বারা রাজকর দেওয়া হইতেছে। কড়ির প্রচলন এ দেশের সর্ব্বত্র আছে। ইংরাজ রাজ ভারতের টাকা ও পয়সা এ দেশে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও সফল কাম হয়েন নাই। আমারা এখন যে গ্রামে অবস্থান করিতেছিলাম—সেখানে পয়সা বা টাকা আদৌ দেখিতে পাইলাম না। মোম্বাসায় টাকা পয়সা খুব চলিতেছে।

শুনিলাম ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্ত আদিম অসভ্য জাতিরা নানাপ্রকার দেব দেবী ও ভূত প্রেতের উপাসক ছিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের পরিষ্কার কোনও ধারণা ছিল না। তাহার পর তাহাদের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। আরব দেশের অনেক মুসলমান প্রচারক আসিয়া নানা প্রকার উপায়ে ইহা-দিগকে দলে দলে মুসলমান করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রচারকেরা অনেক সময় এদেশে ব্যবসায় করিতে আসিয়া অবশেষে প্রচারক হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইউগণ্ডা, কঙ্গো, আবিসিনিয়া, সাহারা প্রভৃতি স্থান মুসলমানপ্রধান হইয়া পড়ে। মিশর ও শুদানে ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবশ্য বহু শত বৎসর হইতে প্রচলিত। তাহার পর এই সকল দেশ যখন য়ুরোপীয়দিগের অধিকার-ভুক্ত হইল, তখন অবশ্য মিসনারি মহাশয়েরা ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে লাগিলেন। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের কথা জানিনা, তবে পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইউগণ্ডা ও জর্ম্মন্ পূর্ব্ব আফ্রিকায় এমন স্থান নাই যেখানে মিশনারিরা দেখা দেন নাই। এই সব স্থানে তাঁহাদের সংখ্যা যে খুব অধিক তাহা নহে। সমগ্র বিটিশ আফ্রিকায় বোধ হয় ১০০ বা ১২৫এর অধিক মিশনারি নাই। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোক প্রচারের জন্য এত অধিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান যে শুনিলে ঘোর বিস্মিত হইতে হয়। এই মসোনে একজন ইংরাজ পাদরীর নিকট শুনিলাম যে, প্রতি মাসে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে গড়ে প্রায় ১২০০।১৩০০ মাইল ভ্রমণ করিতে হয়। এই বিস্ময়কর ভ্রমণের সহায় একটি কৃশকায় ঘোড়া। পাদরী মহাশয়ের স্ত্রীও এই কার্য্যে স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা দুজনে এই ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ অসভ্য জাতির দেশে আজ প্রায় ছয় বৎসর ক্রমান্বয়ে বাস করিতেছেন। দেশে ফিরিবার চিন্তা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। তিনি বলিলেন, "এ দেশের লোক ঘোর অসভ্য ও অজ্ঞান। আমাদের দুজনের চেষ্টায় এই অজ্ঞানতা ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। সত্য ধর্ম্মের আলো ধীরে ধীরে তাহাদের মনের নিবিড় অন্ধকারকে দূর করিতেছে। এ সময় আমরা সরিয়া গেলে আমাদের এত দিনের এত পরিশ্রম সব নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। এতগুলি লোকের আত্মার মঙ্গলের অপেক্ষা কি আমাদের সামান্য সুখ অধিক মূল্যবান্? আজ যদি আমরা ইহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে ইহাদের অবস্থা পুনরায় খুব শোচনীয় হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের নিকট কি জবাব দিব ?" বুঝুন, কত মহৎ প্রাণ ইহাঁদের! আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রকার উচ্চ ধারণা সুধু যে ইহাঁরই আছে এমন নয়। এ দেশে যতজন মিশনরি আছেন, প্রায় সকলেই এইভাবে পরের জন্য নিজের সমস্ত সুখ ও স্বার্থকে বলি দিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে এই প্রকার উচ্চ ধারণা আছে বলিয়াই, আজ খ্রীষ্টধর্ম্ম দিন দিন এপ্রকার উন্নতি করিতেছে। সুধু তাকিয়া ঠেসান দিয়া পূর্ব্বপুরুষের সুখ্যাতি করিলে যে জাতি বা

ধর্ম্ম উন্নত হইতে পারে না তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না। একদিন বৌদ্ধ প্রচারকেরাও ঠিক এই ভাবে নিঃস্বার্থভাবে ও নির্ভীক প্রাণে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া, কোনও সময়ে ঐ ধর্ম্মও জগতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মের আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই পাদরীদিগের চেষ্টায় এ দেশের স্থানে স্থানে অনেক গুলি নিম্নপ্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার লোক এত অজ্ঞান যে এ দেশে আগে কোনও অক্ষর প্রচলিত ছিল না। পাদরীদিগের যত্নে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশের উপযোগী অক্ষর প্রস্তুত হয় এবং উহার সাহায্যে পুস্তক ছাপাইয়া স্কুলে পড়ান হইতেছে। সমস্ত ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় এখন মোটে একটি হাই স্কুল। উহা মোম্বাসায় অবস্থিত। এখানকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কয়েকজন এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া আফিসে চাকরী করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই খ্রীষ্টান্।

পূর্ব্ব আফ্রিকা ও ইউগণ্ডার সহস্র সহস্র আদিম অধিবাসী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন কুসংস্কার সকল ইহাদের মধ্যে এখনও খুব প্রচলিত রহিয়াছে। এ দেশের লোক অজাগর সর্প, হাঙ্গর, কুমীর, বাঁদর, গিরগিটি, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে দেবতা জ্ঞান করে। এই সকলকে ইহারা কখনও হিংসা করে না। কোনও কোনও স্থানে হস্তীকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়। একবার একজন সাহেব এক হস্তী শীকার করেন। ঐ দেশের লোক এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। সাহেব অনেক কষ্টে উহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান এবং ইংলণ্ডে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

প্রত্যেক গ্রামে একদল ভূত প্রেত বাস করে। ইহারা সুযোগ পাইলেই মানুষের উপর আবির্ভূত হয়। ইহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য জুজু-পুরোহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা একাধারে আমাদের দেশের ওঝা ও চিকিৎসক। সমস্ত প্রকার পীড়া ও অপদেবতার উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীকে রক্ষা করাই ইহাদের কাজ। মন্ত্র ইহাদের প্রধান অবলম্বন। ঔষধাদি বড় একটা ব্যবহার করে না। প্রত্যেক জুজুর বাড়ীর দ্বারে মড়ার মাথা ঝুলান থাকে। ঐ চিহ্ন দ্বারা জুজুর বাড়ী সকলে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে।

অপদেবতা তাড়াইবার প্রধান উপায় বলিদান। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পীড়া ও অপদেবতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিদানের প্রথা আছে। জ্বর হইলে মুরগী, পেটের পীড়ায় হাঁস, বসন্তে বলদ, আমাশয়ে ছাগল নির্দ্দিষ্ট আছে। অপদেবতারা কিন্তু নরবলিতে যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, এমত আর কিছুতে নয়। এইজন্য এ দেশে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নরবলির কথা শুনা যায়। এই বলির জন্য মানুষ ইহারা অন্য গ্রাম হইতে সংগ্রহ করে। এই বলি গভীর রাত্রে হইয়া থাকে। গ্রামের সমস্ত পুরুষেরা এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সন্ধ্যা হইতে মদ্যপান আরম্ভ করে। যখন খুব নেশা জমিয়া আসে, তখন বলির জন্য সংগৃহীত ব্যক্তিকে থানমূলে আনা হয়। জুজু মহাশয় প্রথমে মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া লন। তাহার পর এক উচ্চ বেদীর উপরে তাহাকে বলি দেওয়া হয়। বলির পর সকলে ঐ নররক্ত দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া ঐ বেদীর চারিদিকে নৃত্য করিতে থাকে। ইহার পর সেইস্থানে ঐ মৃতদেহ পুতিয়া ফেলা হয়।

ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়াইবার জন্যও এদেশে নরবলি দেওয়া হয়। যে ভূমির শক্তি বাড়াইতে হইবে তাহার মধ্যস্থলে বলিদান দিয়া ঐ তাজা রক্ত চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

অনেক সময় বলির মানুষ খরিদ্ করাও হয়। গৃহস্থের যদি ৪।৫টী পুত্র থাকে, তাহা হইলে এক জনকে বিক্রয় করা হয়। বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা, খুড়া বা পিতামহ প্রভৃতি থাকিলে তাহাদিগকে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া বলির জন্য বেচিয়া ফেলা হয়। এই নরবলির জন্য স্ত্রীলোক বা ১০ বৎসরের কম বয়সের বালককে ব্যবহার করা হয় না।

এই ইউগণ্ডা এবং ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রদেশে আর এক রকম মানুষ বলির প্রচলন আছে। কোনও অবস্থাপন্ন লোক বা রাজার মৃত্যু হইলে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী, অনুচর, এমন কি প্রিয় পালিত জন্তুকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া একত্রে কবর দেওয়া হয়। ইহাদের বিশ্বাস যাহাদিগকে এইভাবে হত্যা করা হয়, তাহারা

মৃত ব্যক্তির সহিত একত্রে বাস করিতে পারে। ইহা ছাড়া, মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার অস্ত্র শস্ত্র, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্তই কবর দেওয়া হয়। ইহারা মনে করে, এ জগতে আমরা যেভাবে বাস করি পরলোকেও ঠিক সেইভাবে থাকিব। অশান্টি, ডাহোমী বিনিস্ প্রভৃতি দেশের রাজাদের মৃত্যুর পর ৭।৮ শত গোলামকে হত্যা করা হয়। অনেক সময় গোলামেরা স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। ইংরাজ রাজের বিশেষ চেষ্টায় এই সমস্ত ভীষণ নিষ্ঠুর প্রথা ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইতেছে। কিন্তু একবারে বন্ধ হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি।

এই দুই প্রদেশে যমজ সন্তান জন্মিলে প্রায়ই রাখা হয় না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য শিশুদ্বয়কে মারিয়া ফেলা হয়। ইহারা বলে, ইহা যখন অস্বাভাবিক ব্যাপার তখন ইহাদ্বারা কখনও মঙ্গল হয় না। যে রমণী বহু সন্তান প্রসব করে, তাহাকে হয় গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছাড়িয়া আসে, নতুবা হত্যা করিয়া ফেলে। যে সন্তানের অঙ্গে কোনও অস্বাভাবিক চিহ্ন থাকে, তাহাকে ইহারা জন্মের দিনই শেষ করিয়া দেয়।

এদেশে ডাইনির প্রচলনটা খুব অধিক বলিয়া মনে হইল। গ্রামের কোনও বিশিষ্ট লোকের কোনও পীড়া উপস্থিত হইলে, অবশ্য জুজু পুরোহিত তাহার চিকিৎসা করে। কিন্তু তাহাতে যদি আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে স্থির হয় যে গ্রামের কোনও স্ত্রীলোক উহার উপর নজর দিয়াছে। গ্রামে কোনও প্রকার মড়ক, জলকষ্ট পঙ্গপাল প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও ইহারা এইরূপ বিশ্বাস করে। তাহার পর ঐ ডাইনির অনুসন্ধান হইতে থাকে। এক নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গ্রামের সমস্ত নর নারী একত্র হয়। জুজু মহাশয় একজন বাদককে সঙ্গে লইয়া ঐ সভায় উপস্থিত হন। ঐ সময়ে সে এক ভীষণদর্শন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। এক ভীষণ দর্শন রাক্ষসের মুখস্ পরিয়া পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত কোনও এক হিংস্র জন্তুর চামড়া দ্বারা আবৃত করে। এক হাতে এক নরমুণ্ড ও অপর হাতে তাজা রক্তপূর্ণ এক প্রকাণ্ড মৃৎপাত্র রক্ষিত থাকে। বেঙ, গিরগিটি, সর্প, মানুষের হস্ত পদ প্রভৃতি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝুলিতে থাকে। সে যে কি ভীষণ চেহারা হয় তাহা আমি বুঝাইতে পারিতেছি না। একবার আমি এই প্রকার এক জুজু দেখিয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ঐ চুব্ মন্ ব্যাপার দেখিয়া সত্যই ভয় পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, সেখানে আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহা এই স্থানে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

জুজু একবারে সেই লোক সমাগমের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। উহার সঙ্গে তিন জন বাদক ছিল। দুই জনের নিকট ঢোল ও অপর এক জনের নিকট একটা বৃহৎ কাঠের করতাল ছিল। উহারা আসিয়াই সেগুলি সজোরে বাজাইতে আরম্ভ করিল এবং জুজু উহার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিল। প্রায় ১০ মিনিট পরে হঠাৎ নৃত্য থামিয়া গেল কিন্তু বাজনা আরও জোরে চলিতে লাগিল। জুজু প্রথমে এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বেঙের মত থপ্ ২ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লাফাইতে লাগিল। এই সময় সে ঐ দেশীয় ভাষায় এক বিতিকিচ্ছি স্বরে এক কবিতা আওড়াইতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে সে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ একজন লোকের সম্মুখে দাঁড়াইতে লাগিল এবং উহার মাথার উপর উহার হস্তস্থিত নরমুণ্ড ঘুরাইতে লাগিল। এইভাবে প্রায় ২৫।৩০ জন লোকের সম্মুখে দাঁড়াইবার পর এক যুবতী রমণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে দেশের রাজার সম্মুখে হাজির করিল। ইহার পর শুনিলাম, ঐ যুবতীই ডাইনি বলিয়া স্থির হইয়াছে। হতভাগিনীকে নাকি এই অপরাধে পুঁতিয়া ফেলা হইবে।

জুজুর হাতে এই ডাইনি ধরার ক্ষমতা থাকাতে উহারা প্রায়ই নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। গ্রামে যাহার সহিত উহার শত্রুতা থাকে, তাহাকে সচরাচর এই ভাবে উহারা সাজা দেয়। অনেক স্থানে জুজুর অত্যাচারের ভয়ে গ্রামের অনেক লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। জুজুর প্রতাপ এদেশে এখনও এত অধিক যে দুর্দ্দমনীয় ইংরাজের আইন কানুনও ইহাকে দমন করিতে পারে নাই। এদেশে অবস্থান কালীন যে কয়েকটী অদ্ভুত ঘটনা আমি দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে দুইটী সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

অতিথি।

ভিখারী অতিথি বেশে, দেবতা ধরায় এসে
নিয়ে যান মানবের দান।
যতটুকু দেয় যেই, ততখানি পায় সেই,
ফলাফল দান পরিমাণ ;
ফল দাতা অন্তর্য্যামী ভগবান্।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সৌভাগ্যের সোহাগ।

সৌভাগ্যের স্বর্ণ তোরণ যে সর্ব্বদাই প্রকৃত গুণীব্যক্তির সম্মুখেই খুলিয়া যায় এমন নহে। সম্পূর্ণ গুণহীনকেও অদ্ভুত এবং অচিন্ত্যরূপে উন্নতির উচ্চ শিখরে সমারূঢ় হইতে দেখা গিয়াছে।

সুলতান ওসমান একদিন ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া দেখিলেন তাঁহার বাগানে এক মালী শাক শবজী লাগাইতেছে। লোকটীর কর্ম্ম কৌশল তাঁহার বড় মনে ধরিল ; তিনি অচিরাৎ তাহাকে রাজসভার কোন উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ইহার কিছু কাল পরেই বাদশার এই বাগানের মালী সাইপ্রাসদ্বীপের বেগলার-বেগ বা রাজ প্রতিনিধির পদে জাঁকিয়া বসিয়াছিল।

মার্ক আন্তনী রোমীয় নাগরিকের সম্মান একজন পাচককে দান করিয়াছিলেন। লোকটা তাঁহাকে বড় তোফা করিয়া পাক করিয়া খাওয়াইত। অনেক খাম খেয়ালী রাজা-গজার খেয়ালের মাথায় পড়িয়া গিয়া বহু লোক বাহার দিয়া গিয়াছে। একাদশ লুই এক বেচারা গরীব পুরোহিতকে তরাইয়া দিয়াছিলেন। লোকটা গীর্জ্জা ঘরের রোয়াকের উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া রাজার খেয়াল হইল, 'নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ' এই প্রবাদটা যে সত্যে নাই তাহা এই ক্ষেত্রে ফলাইয়া দেখিতে হইবে। তিনি তাহাকে রাজ্যের এক শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিলেন।

সপ্তম হেন্‌রী কাজের খাতিরে যতটা হউক না হউক জিদের দায়ে পড়িয়া আয়র্ল্যণ্ডের একরাজ প্রতিনিধিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। কে যেন তাঁহার নিকট বলিয়াছিল সমস্ত আয়র্ল্যাণ্ড জোট পাকাইলেও কিলডেয়ারের আর্লকে হাত করিতে পারিবে না। এই কথা যেই শুনা রাজারও অমনি জলদি হুকুম, তবে তাহাকেই সমস্ত আয়র্ল্যাণ্ড শাসন করিতে দিতে হইবে।

কথিত আছে. অষ্টম হেন্‌রী তাঁহার এক চাকরকে খুব উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছিলেন। একদিন রাজার শূকর পোড়া খাইবার বড় সাধ হয় ; লোকটা সেজন্য বড় খাটিয়াছিল! মিঃ কর্ণওয়ালিসের বিধবা স্ত্রী ভাল পিঠা করিয়া খাওয়াইয়া উক্ত রাজার নিকট হইতে একটা গীর্জ্জাঘর বক্‌শিস পাইয়াছিলেন।

কার্ডিন্যাল ডিমণ্ট পোপের মুকুট মাথায় পড়িয়া অধিবাসের ঘর হইতে পা না বাড়াইতেই তাঁহার এক চাকরকে কার্ডিন্যালের টুপী পরাইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোকটার প্রধান গুণ এই যে সে জগৎ গুরু মহারাজের প্রিয় বানরটার বড় খিদমৎ করিত। জর্জ্জ ভিলিয়াস সুশ্রী ছিলেন, শুধু এইজন্যই প্রথম জেম্‌সের নেক্‌নজরে পড়িয়া হঠাৎ ফাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা-জর্জ্জের প্রিয় পরিষদগণের অধিকাংশই কেবল রাঙ্গামূলার মত রূপের জোরে জাঁকাল ছিলেন।

একমাত্র চ্যামিলার্টই চতুর্দ্দশ লুইকে বিলিয়ার্ড খেলায় হারাইয়া দিতে পারিতেন। এইগুণে তাঁহার উন্নতির দৌড় মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত যাইয়া ঠেক খাইয়াছিল। দেশের রাজস্ব বিভাগের মাথাটী খাইয়া বসিয়া ইনি চৌদ্দ সুখে মোটা পেন্সন ভোগ করিবার ভাগ্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

ডিউক লুইনেস ছোট কালে পাড়া গাঁয়ে টো টো কোম্পানীর মস্ত উমেদার ছিলেন। চড়ুই পাখী আটকাইবার জন্য ছেলেরা যে পরগাছার ফলের আঁঠা তৈয়ার করে তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়া তাহার কপাল ফাটিয়া উঠে। ভলটেয়ার লিখিয়াছেন—ইহা কখনই ভাবা গিয়াছিল না যে এমন নির্দ্দোষ আমোদের পরিণতি ভীষণ বিদ্রোহের ধ্বংসময়ী শিখার উগ্রতায় যাইয়া পৌঁছিবে। ডি লুইনেস তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মার্শাল অব্ আঙ্কারকে কোন মতে ফাঁসীতে লটকাইয়া এবং ধাত্রী রাণীকে কল কৌশলে কয়েদ করিয়া রাজার আসনে বসিয়াছিলেন।

সার ওয়ালটার র‍্যালের পদোন্নতি হইয়াছিল এলিজাবেথের কাছে একদিন বীরত্বের বাহাদুরী দেখাইয়া। ক্রিষ্টোফার হেটনের উন্নতির কারণ তাঁহার নাচিবার ঢং। গ্রেংগার লিখিয়াছেন মানুষ কি উপায়ে ভাগ্যবান্ হইয়াছে ইহার সংগ্রহ করিলে জগতে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক হয়। বড় বড় লোকের অজ্ঞাত ইতিহাসের খোঁজ করিলে জানা যাইবে যে মানুষের গুণ কচিৎ তাহার উন্নতির কারণ হইয়াছে। সাধারণ সামান্য বিশেষত্ব, এমন কি পাপই অধিকস্থলে মানবের বৈষয়িক উন্নতির কারণ হইয়াছে।

বাহ্য জগতে পাপের এইরূপ প্রসার ও ধর্ম্মের লাঞ্ছনা দর্শনে লক্ষ্মণের ন্যায় মানবও তাহার মনকে ধর্ম্মের দিক হইতে দিনে দশবার এই বলিয়া ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছে, "জায়তে তত্র মে দুঃখং ধর্ম্মসঙ্গশ্চ গর্হিতঃ। তবায়ং ধর্ম্মসংযোগো লোকস্যাস্য বিগর্হিতঃ।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

পাতকী।

আরিস্তত্‌ল্ কহিয়াছিলেন, সমাজে কতকগুলি মানুষ যে গোলাম হইয়া থাকিবে, ইহা বিধির বিধান। মনু কহিয়াছিলেন, কতকগুলি মানুষ ব্রহ্মার পাদ দেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, চিরকাল দাস হইয়া থাকাই তাহাদের প্রতি বিধির বিধান। মনু ও আরিস্তত্‌ল্ উভয়ের মতেই সমাজের কোন উচ্চ কর্ম্মে ইহাদের অধিকার রহিবে না। মনু ও আরিস্তত্‌লের বিধান কোন সভ্য সমাজে এখন আর আইনের সংহিতায় স্বীকৃত নহে। কোন সভ্য দেশের আইনই এখন আর একথা বলিতে সাহস পায় না যে অমুক অমুক বংশের সকলই চিরকাল দাসত্বই শুধু করিবে, আর কিছু করিতে পাইবে না। কিন্তু দাস এবং তার চেয়েও বেশী, ক্রীতদাস, ত এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। নামে না হইতে পারে, আইনের চোখে না হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যে দাস বর্ত্তমান নাই এমন সমাজ কোথায় আছে?

সকল সমাজেই উচ্চ ও নীচ, ভদ্র ও অভদ্রের পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন খানে বা ইহা অত্যন্ত কঠোর, কোথাও বা কোমল, কোথাও বা পরিবর্ত্তনসহ আর কোন খানে বা অভঙ্গনীয়, কিন্তু সব খানেই এই একটা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আরিস্তত্‌ল ও তাঁহার মতানুযায়ীদিগ হইতে আমরা এইটুকু মাত্র উন্নীত হইয়াছি যে, আমরা আর এখন এরূপ প্রভেদকে বৃক্ষ ও লতার প্রভেদের মত সনাতন প্রভেদ বলিয়া মনে করি না। এরূপ প্রভেদ ছাড়া সমাজ কিরূপ হইত, কবি ও দার্শনিক কল্পনার চক্ষে দেখিতে চাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু সামাজিকগণ কখনও সেরূপ সমাজের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাস্তব সমাজে উচ্চ ও নীচ, প্রভু ও ভৃত্য, রক্ষক ও রক্ষিত, শাসক ও শাসিত—এ পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে।

আর আমরা যতই মিষ্ট কথা কই না কেন, সমাজে সব চেয়ে জঘন্য কাজ যারা করে তাহাদিগকে আমরা এমনই ভাবে রাখি যে কোনও খাতায় লেখা না থাকিলেও তাহারা আরিস্তলের বিধি-সৃষ্ট ক্রীতদাস। মালী মেথরকে খুন করিলেও অপরাধ খুনেরই হয় বটে, কিন্তু মালী মেথর ও নবাবজাদার মধ্যে তফাৎ অনেক; অন্য সব রকমেই উভয়ের অধিকার-অনধিকারের প্রভেদ অনেক। অবশ্যই এমন দেশও আছে যেখানে মুচিখানা হইতে রাজ প্রাসাদে ঢুকিবার অধিকার ও উপায় আছে; এমন দেশও আছে যেখানে মুচির ছেলেও রাষ্ট্র-নায়ক হইতে পারে; কিন্তু তেমন যে দেশ আমেরিকা সেখানেও রকফেলর ও তাঁহার জুতা বুরুস করে যে ব্যক্তি, এ উভয়ের সামাজিক আসন ঠিক এক নয়। গোপাল ভূপাল হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচুর রহিয়াছে; তথাপি ভূপাল না হওয়া পর্য্যন্ত গোপাল গোপালই; এবং পথে, ঘাটে, হাটে মাঠে এ উভয়ের সাম্য কোথাও নাই। একথা সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমাজে উচ্চ ও নিম্নের প্রভেদ রহিয়াছে।

আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইতিহাসে যে সব বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সে সকলের মধ্যে মাঝে মাঝে উচ্চ ও নীচের বিরোধও দৃষ্ট হয়। অনেক সময়

অবশ্য জমীদারে জমীদারে যেমন ভূমি নিয়া ফৌজদারী হয়, তেমনই রাজায় রাজায়ও দেশ লইয়া কিংবা বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা লইয়া কলহও হইয়াছে। সেগুলি ঠিক সামাজিক বিপ্লব নয়; কারণ তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের সমাজে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু কোনও একটা সমাজের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর মধ্যে যে সব কলহ হইয়াছে তাহাতে সেই সেই সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন প্রচুর হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল কলহের কারণ রাষ্ট্রীয় অধিকার, শাসন প্রণালী গঠিত করিবার অধিকার, সমাজের বিধান কানুন প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার অধিকার। এবং সাধারণতঃ ইহা দেখা যায় যে যখনই এরূপ কলহ হইয়াছে, তখনই তার ফলে নিম্নশ্রেণীর অধিকার বাড়িয়াছে, এবং মোটের উপর জাতি উন্নতির পথেই চলিয়াছে। শক্তিস্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক; সকল ব্যক্তি এবং সকল শ্রেণীই চায় ষোল আনা শক্তি নিজের হাতে রাখিতে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহা চায়, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও চায়। এবং যখন উচ্চ শ্রেণীর শক্তিব্যবহারের ফলে নিম্ন শ্রেণীর অধিকার ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, বাঁচিবার হইলে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের তখন আত্মজ্ঞান হয় এবং তাহারাও শক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে; নইলে তাহাদের একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাওয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকদের হাতে পূর্ব্ব হইতে শক্তি থাকায় তাহারা একেবারে শক্তিশূন্য বড় হয় না; প্রায়ই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সমাজশাসনের শক্তি ভাগাভাগি হইয়া যায়। প্রাচীন রোমেও এইরূপ হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফরাসী দেশে তাহা হইয়াছে; ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্টের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ফলেও তাহাই হইয়াছে।

কোনও একটা জাতির জীবনে যখন এইরূপ জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়, যখন সাধারণ লোকেও বিশিষ্ট, সম্রান্ত শ্রেণীর কবলস্থিত শাসন-শক্তিতে ভাগ বসাইতে চায়, তখন সেই উদ্বোধনের উত্তেজনা যাদের নিকট হইতে আসে তারা সাধারণ, গণ্ডমূর্খ, কৃষক মাত্র নহে; এইরূপ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার যারা করে, দরিদ্র হইলেও তারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ লোক। ফরাসী দেশের অত বড় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিপ্লবের যারা প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিল তারা লেখা-পড়া জানা লোক। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় বিধানে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার মূলে ও ঐরূপ লোকেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। সাধারণতঃ আমরা এই শ্রেণীর লোককে মধ্য-বিত্ত কহিয়া থাকি। যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহারা ঠিক সকলের উচ্চ শ্রেণীর লোক নয়। কিন্তু একেবারে নিরক্ষর কৃষক শ্রেণীর লোকও নহে। সেইজন্যই ইহাদের চেষ্টার একটা বিশিষ্টতা আছে।

এক জনের একচ্ছত্র অধিকারে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা, কিংবা তাহার অংশ কাড়িয়া লইতে হইলে প্রায়শঃই যে বলপ্রয়োগ করিতে হয়, ইহাদের চেষ্টা সাধারণতঃ সে চেষ্টা নহে। অবশ্যই এইরূপ বলপ্রয়োগের সময় যখন যে দেশের ইতিহাসে আসিয়াছে, তখন এই শ্রেণীর লোক যে কখনও তাহা করে নাই, এমত নহে; কিন্তু এই বল প্রয়োগের পূর্ব্বে লোকের মন গড়িয়া তুলিতে হয়, সমাজে নূতন ভাবের, নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে হয়; তাহাতে অনেক সময় রক্তপাত বিনাও অভীপ্সিত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া যায়। এইজন্য এই ভাব পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সাহিত্যে তাহার আভাস দৃষ্ট হয়। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে এইরূপ নূতন ভাব নিয়া সেদেশে এক প্রকাণ্ড সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্ত্তনে সাহিত্যিকের দান কতটুকু তাহা সহজেই অনুমেয়।

অবশ্যই একটা নব জাগরণের উন্মাদনা যখন জাতির মনে আস্তে২ প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, ভাবের নেশায় সাহিত্যিক তখন প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন। বাস্তব জগতের কার্য্যকারণ পরম্পরার লৌহ-নিগড়ে তাহা কি ভাবে পরিণতি লাভ করিতে পারে; সাহিত্যিক অনেক সময় তাহা দেখিবার অবসর পান না। কিন্তু সে দোষ কেবল সাহিত্যিকের নয়; অভূতপূর্ব্ব ভাবের উন্মেষ যার চিত্তে হয় তাহারই এই দোষ হইয়া থাকে। ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে স্বাধীনতা সাম্য, মৈত্রীর যে মন্ত্র সমস্ত জাতির চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রভাবে তখনকার

লোক দেখিতে পায় নাই যে তাহাদের এই আদর্শের পূর্ণ সিদ্ধি সম্ভব হইবে না। পরিপূর্ণ সাম্য ও মৈত্রী শুধু ফরাসী দেশে নয়, কোথাও আসে নাই, এবং জগতে কখনও আসিবে কিনা সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করেন। তথাপি বাস্তব জগতে সম্পূর্ণরূপ সম্ভাব্য না হইলেও এই মন্ত্রের উৎপ্রেরণা না থাকিলে ফরাসী বিপ্লব যাহা করিয়াছে তাহা সাধিত হইত না। সুতরাং সাহিত্যিকদের কল্পনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইলেও, তাহারা সমাজের চিন্তা যে কোনও এক বিশিষ্ট দিকে চালিত করেন তাহার ক্রিয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রকাশ না পাইয়া পারে না। বর্ত্তমানে রুশিয়া দেশ তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত।

রুশিয়া প্রকাণ্ড দেশ। ইউরোপ ও এশিয়ার এক প্রকাণ্ড অংশ লইয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল কলেবর পুরিয়াছে। জায়গার অনুপাতে লোকসংখ্যা তত বেশী না হইলেও সমষ্টিতে নিতান্ত কম নহে। এত বড় একটা জন-সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বহুভাষাভাষী পৃথক্ পৃথক্ জাতির লোকের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও একদেশবাসী ও এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুণ ইহাদের মধ্যে একটা স্থূল ঐক্য রহিয়াছে। এবং ইহাদের একটা রাষ্ট্রীয় ইতিহাসও রহিয়াছে। খুব প্রাচীন না হইলেও অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জগতের ইতিহাসে রুশের নাম অনেকবার উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে, ফরাসীদেশের সঙ্গে এবং ইদানীং চীন ও জাপানের সঙ্গে রুশের বহু সংঘর্ষ হইয়াছে; এবং প্রায়শঃই পরাজিত হইলেও, দূর হইতে প্রহারের মত এই সকল পরাজয় রুশ-দেহে কাহারও স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এই সকল পরাজয় সত্ত্বেও, বরং রুশ-সাম্রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে রুশ সুতরাং নিতান্ত নগণ্য নহে।

তথাপি দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার যে সকল উপকরণ রহিয়াছে সে গুলির ইতিহাসে রুশের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রের যে কয়খানা নামকরা ইতিহাস আছে তাহাদের বেশীর ভাগই জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের লেখা। কিন্তু সেগুলিতেও ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ ছাড়া চলে নাই। এমন কি, এমন যে অধঃপতিত দেশ হিন্দুস্থান তাহারও নাম করিতে হইয়াছে। অবশ্যই গভীর জ্ঞান পরিপূর্ণ জর্ম্মাণ মনেও ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী নহে। ইউবারবেগ্ নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক-ঐতিহাসিক শকুন্তলাকে ও মনুসংহিতাকে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে, যে ইহাদের ভিতর তিনি দার্শনিক তত্ত্ব তেমন কিছু পান নাই। ইউবার্‌বেগের পরে ইউরোপ ভারত সম্বন্ধে অবশ্যই আরও জানিয়াছে। ইউবার্ বেগের মত লোকও ভারতের উল্লেখ আবশ্যক মনে করিয়াছেন। কিন্তু কই, রুশিয়ার ত সেখানে উল্লেখ নাই। তেমনই বিজ্ঞান ও কলা শিল্পেও রুশিয়ার বিশিষ্টতার তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশ লুইর আমলে ফরাসী সাহিত্য ও চিন্তার প্রভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এমন কি জর্ম্মেণীতেও তাহার প্রচুর আধিপত্য ছিল। কিন্তু জর্ম্মেণী তার পরে নিজের জাতীয় একটা বিশিষ্ট ধারা বুঝিয়া লইয়াছে, রুশিয়ায় বোধ হয় এখনও তাহা সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই।

কিন্তু বিগত শতাব্দীতে বিশেষতঃ তাহার শেষভাগে রুশিয়ায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্ত্তন বহু হইয়া গিয়াছে। রুশিয়াতে ক্রীতদাস প্রথারই একটা প্রকারান্তর অনেক কাল বর্ত্তমান ছিল। আমাদের দেশে যেমন নান্‌কার জমী দিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদের ঘরে পুরুষানুক্রমিক 'গোলাম' রাখা হইত এবং এখনও যেমন স্থানে স্থানে এই প্রথার কোমলতর রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, রুশিয়াতে প্রায় সমস্ত কৃষকই এক সময়ে ভূম্যধিকারীর এইরূপ নানকার প্রজা ছিল এবং ভূম্যধিকারীর যত কিছু কাজ তাহা এই সকল নানকারভোগীরাই করিত; এমন কি, বিলাসী রোমে যেমন ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শিক্ষার ভারও এক সময়ে ক্রীত-দাসের উপর পড়িত, রুশেও তেমনই এই নানকার ভোগীরা প্রভুর ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইত, সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রভুর মনোরঞ্জন করিত, এবং গৃহ কর্ম্মের অন্য সকল কাজও ইহাদেরই দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহা

এক প্রকার ক্রীত-দাস প্রথা এবং রুশিয়ার জাতীয় প্রকৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে অন্ততঃ যেমন কঠোর, ইহার ভিতরও সেই রূপ একটা কঠোরতা বর্ত্তমান ছিল। আমেরিকাতে যখন নিগ্রো ক্রীতদাস রাখা প্রচলিত ছিল, তখন যেমন পলাইয়া যাওয়া ক্রীত-দাসের পক্ষে একটা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ ছিল, রুশিয়াতেও তেমনই এই প্রকার ক্রীত দাসেরা যে ইচ্ছামত নানকার পরিত্যাগ করিবে এবং দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে, সে উপায় ছিল না।

অর্থশাস্ত্রবিদেরা বলেন, যে সমাজে অস্থাবর সম্পত্তির মত ভূমিরও সহজ ক্রয়-বিক্রয় না চলে সে সমাজ অর্থ শাস্ত্রের চক্ষে অন্ততঃ তেমন উন্নত নহে। আমাদের দেশে—বিশেষতঃ বাংলার স্থানে স্থানে এখনও দেখা যায় এক খণ্ড ভূমির উপর পাঁচ সাত জনের পাঁচ সাত রকমের অধিকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। জমীদার, তালুকদার, পত্তনীদার, জোতদার, বর্গাদার, এবং 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ' রেহানদার—প্রভৃতি বহু 'দায়ের' ধার এক খণ্ড ভূমি ধারিয়া থাকে। এরূপ স্থলে এমনও ঘটে যে, নিজের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়াও ক্রেতা ভূমিতে প্রবেশ করিতে পায় না। এবং যদিও প্রত্যেকেই প্রায় তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার রাখে, তথাপি অন্য সব জিনিসের মূল্য যেমন সাধারণতঃ বাজারে উপস্থিত জিনিসের পরিমাণ এবং ক্রেতার আগ্রহ ও তাহাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে, ভূমির বেলা প্রায়ই তাহা নহে। সেখানে দেশাচার—গ্রাম সরহ তাহার মূল্য ঠিক করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত, ভূম্যধিকারী যখন তাহার স্বত্বের কতক অংশ বিক্রয় করিতে চায় অর্থাৎ জমী পত্তন করিতে চায়, তখন সে যদি ভূমিগ্রহণেচ্ছু প্রজার গরজ অনুসারে ভূমির খাজানা ধার্য্য করিয়া লয় তাহা হইলে আইন তাহা অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। অথচ, বহু ক্রেতা যেখানে উপস্থিত সেখানে মাছ তরকারী বিক্রেতা যদি সুবিধা বুঝিয়া জুলুম দাম আদায় করে তাহা হইলেও আইন অন্যায় মনে করে না। ক্রয় বিক্রয়ের বাজারে ভূমির এই স্থাণুবৎ নিশ্চলতা অনেকের মতে সমাজের অনুন্নতির লক্ষণ। কিন্তু রুশিয়ার ভূমি আমাদের ভূমির চেয়েও স্থাণু ছিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে অন্ততঃ ভূমি একাধিক ব্যক্তির স্বত্ব অক্লেশে বহন করিতে পারে, এবং কৃষকের স্বত্ব আইনের রক্ষকতায় সুরক্ষিত; কিন্তু রুশিয়াতে যারা চাষ করিত তাহাদের বৃক্ষের মত ভূমিতে শিখর-বদ্ধ হইয়া থাকিবার অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার কিছু ছিল না। বিক্রয় বা পরিত্যাগের স্বাধীনতা তাদের ছিল না। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে এই প্রথা লুপ্ত হইয়াছে এবং সাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রথম সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পর রুশিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—রুশিয়ার জনসাধারণের অধিকার এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টের অনুকরণে 'ডুমা'-নামক একটা প্রতিনিধি-সভার প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্যই ইংলণ্ডের অনুকরণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, তথাপি সাধারণের অধিকার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগে যেখানে রাজা এবং উচ্চ রাজসচিবেরা সুরক্ষিত না হইয়া সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতে সাহস পাইতেন না, সেখানে সেদিন সম্রাট্ স্বয়ং 'ডুমায়' পদার্পণ করিয়া ইহাকে দেশের শাসন পরিচালনের একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মনে হয়, রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে; এবং কেহ কেহ আশা করেন, এক সময়ে ফরাসী সভ্যতার যেমন দোহাই চলিত, কিছু দিন পূর্ব্বেও সমগ্র জগতে যেমন জর্ম্মাণ সভ্যতার দোহাই চলিত, কালে রুশিয়ার সভ্যতাও সেরূপ স্থান অধিকার করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে যাহা হউক, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রথম সোপান যে সাধারণের অধিকার-বৃদ্ধি, রুশিয়ার নবীন ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাই।

কুসুম কলির ফুটিবার সংবাদ তাহার সুবাস বহন করিয়া আগেই যেমন প্রাভাতিক সমীরণ দিয়া থাকে, জাতির জাগরণের পূর্ব্বাভাসও তেমনই সাহিত্যে পাওয়া গিয়া থাকে। রুশিয়ার এই নব জাগরণের পূর্ব্বাভাস যে সকল সাহিত্যিকের মনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, টলষ্টয় ও ডোষ্টয়েফস্কী তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা উভয়েই প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক।

টলষ্টয় তাঁহার লেখায় এবং কার্য্যে সাধারণের প্রতি যে অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহার কাহিনী দীর্ঘ। কিন্তু

ডোষ্টয়েফ্‌স্কী সাধারণের জীবনের যে একটা বিশিষ্ট দিকে দৃক্‌পাত করিয়াছেন, তাহার আংশিক বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া এখানে অসম্ভব নয়।

ইংরেজের সুশাসনের ফলে আমাদের প্রত্যেক বড় সহরে, প্রত্যেক জিলায় এবং মহকুমার সদর সহরে উচ্চ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত, সশস্ত্র-প্রহরী-পরিরক্ষিত, সাধারণের দৃষ্টির ঈষৎ অন্তরালে যে একটী সুনির্ম্মিত গৃহ দেখা যায়; আমাদের দৃষ্টি বড় একটা সে দিকে যায় না, সাহিত্যিকের ত মোটেই নয়। 'দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-চক্রৌ চ দৃষ্ট্বা' মেঘ তাহার বাড়ী চিনিয়া লইতে পারিবে, যক্ষ মেঘকে এই কথা বলিয়াছিল। কয়েদ খানার দ্বারে তেমন কিছু লিখিত না থাকিলেও ইহার চারিদিকে এমনই একটী বিষাদ-গম্ভীর ছায়া রহিয়াছে যে, সহজেই ইহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। কবির নিকট শুনিতে পাই নরকের তোরণে নাকি লিখিত আছে 'এখানে যারা প্রবেশ করিবে তারা সকল আশা পরিত্যাগ করুক'; জেলখানার দ্বারে তেমন কিছু লিখিত না থাকিলেও, যারা সেখানে প্রবেশ করে তাদের প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ? বাহুর শক্তি, বিধানের শক্তি, নিন্দাস্তুতির শক্তি—সামাজিক সকল শক্তিই কি ইহাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নহে? সব দেশেই এইরূপ পাতকী রহিয়াছে। এবং সব দেশেই ইহাদিগকে এমনই কঠোরভাবে পিঞ্জরে পুরিয়া রাখা হয়।

কিন্তু ইহাদের দুঃখের কথা—ইহাদের পাপ-চিকীর্ষার মূলে যে অংশতঃ হইলেও সমাজের সহায়তা রহিয়াছে তাহার কথা, টলষ্টয় ও ডোষ্টয়েফ্‌স্কী ছাড়া আর কেহ বোধ হয় এমন করুণ ভাবে সাহিত্যে উপস্থিত করেন নাই। ইহাদের বেশীর ভাগই সাধারণ শ্রেণীর লোক,—কদাচিৎ দুই একজন উচ্চশ্রেণীর লোক দেখা যায়। আর ইহাদিগকে যারা শাস্তি দেয়, স্বাধীন দেশে শাসন-দণ্ড যাদের হাতে থাকে, তারা সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক। অথচ ধনীর অর্থ যে ইহাদিগকে সময়ে সময়ে পাপের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, টলষ্টয় একস্থানে তাহা দেখাইয়াছেন; এবং অর্থাভাবই যে অধিকাংশ স্থলে পাপ-প্রবণতার মূল কারণ, টলষ্টয় ও ডোষ্টয়েফ্‌স্কী উভয়ই তাহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং পাতকীর প্রতি কয়েদের বিধানে সমাজের অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর লোকদের ন্যায়তঃ অধিকার কতটুকু, এ প্রশ্ন আজ উঠিয়াছে। যে দেশ, যে সমাজ নিজেকে সকল রকমে উন্নত করিতে চায়, এই পাতকীদের প্রতি আইনের ব্যবস্থার কথাও কি তার ভাবা উচিত নহে? জনসাধারণের উন্নতি ছাড়া কখনও দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না যে।

সুদূর সাইবেরিয়াতে কয়েদীদের জন্য যে সকল কয়েদ খানা রহিয়াছে, কয়েদীদের ভাষায় সেগুলিকে 'মৃতের গৃহ' বলা হয়। 'মৃতের গৃহ' নামক উপন্যাসে ডোষ্টয়েফ্‌স্কী জেলখানায় কয়েদী জীবনের দীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা নামে উপন্যাস বটে, কিন্তু উপন্যাস বলিতে বাংলাদেশে অন্ততঃ যাহা বুঝায় তাহার কিছুই ইহাতে বর্ত্তমান নাই। বরং ইতিহাসকে কার্য্যকারণের কঠোর, বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত না করিয়া মানুষের সুখদুঃখের সহিত সমঞ্জস করিয়া লিখিলে যেমন মধুর হয়, ইহা তাহাই।

কিন্তু 'বিধিভঙ্গ ও তাহার শাস্তি'—নামক তাঁহার অন্যতম উপন্যাসে ডোষ্টয়েফ্‌স্কী পাপীর চিত্তের গভীরতম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই উপন্যাস খানার নায়ক একজন কলেজের ছোকড়া। দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; আলোক-বাতাস-রহিত এক খানা জীর্ণ কোঠায় সে থাকে এবং অর্থের অভাব হেতু ভাল করিয়া সব দিন খাইতে পায় না, কোন দিন বা অনাহারেই কাটিয়া যায়। সামান্য মূল্যের জিনিসও যাহা ছিল তাহা একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকট বন্ধক দিয়া যে কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে কয়েক দিন চলিয়াছে। কিন্তু আর চলে না। একটী অতি জীর্ণ শীর্ণ পরিচ্ছদ ছাড়া তাহার এখন আর কিছুই নাই।

তাহার চিত্তে অনেক দিন হইতে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে, যারা দিগ্বিজয়ী বীর, যারা পৃথিবীর প্রভু তাহারা শত শত লোকের শোণিত পাত করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়াছে; আমি কেন ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর সংহার করিয়া তাহার অর্থে নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে পাইব না? নেপোলিয়নের মত বীর, "সত্য

সত্যই যে প্রভু, সে সকল কাজই করিতে পারে, তুলোঁ সহর ভূমিসাৎ করিতে পারে, প্যারিসে শত শত লোকের রক্তপাত করিতে পারে, একটী সমগ্র সেনার কথা ভুলিয়া গিয়া মিশরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া আসিতে পারে, মস্কো-অভিযানে পাঁচ লক্ষ লোক অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলিলে তাহার পক্ষে দোষের হয় না, এবং ভিলনা সহরে একটু কৌতুক করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিতে পারে; আর মৃত্যুর পর তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়; এরূপ লোক সকল কাজই করিতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই দূষণীয় নয়।" সমাজের কোন কাজে আসেনা এমন যে একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, আমি কেন তাহাকে নিহত করিতে পারিব না? এই ভাবিয়া সত্য-সত্যই সে ঐ স্ত্রীলোকটাকে নিহত করিয়াছিল। অবশ্যই, সে এই পাপ হজম করিতে পারে নাই; প্রচুর মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়া সে তাহার পাপ স্বীকার করে এবং সমাজের বিহিত শাস্তি—সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে।

উপাখ্যানটীর এই মূল ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হয়, অভাব অনাহার পাপের জন্য কতটুকু দায়ী। অভাব হইতে শুধু এই প্রকার পাপেরই উৎপত্তি হয় না; সমাজে যাহারা পতিতা রমণী তাহারা যে অনেক সময় চিত্তে পাতকিনী নয়, দুর্জ্জয় অভাবের পীড়নে বাহিরে শুধু পাতিত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এই উপন্যাসেই সোনিয়ার চরিত্রে ডোষ্টয়েফ্‌স্কী তাহাও দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানার সাহিত্যিক মূল্যই বেশী; ইহার নৈতিক উদ্দেশ্য খুব প্রকট নহে। তথাপি উদ্দেশ্য যে একটা রহিয়াছে, বিষয় নির্ব্বাচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডোষ্টয়েফ্‌স্কীর ইহার চেয়ে বেশী পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, যে জাতির জাগরণের দিনে সাহিত্য সাধারণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং এই সাধারণের চিন্তায় পাতকীর কথাও উঠিয়া পড়ে। পাতকীর প্রাচুর্য্য সমাজের কলঙ্ক, পাতকীর অস্তিত্ব তাহার অসম্পূর্ণতা। যে সমাজ নিজেকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চায়, তাহায় সাহিত্যকে ভাবিতে হইবে পাপ কেন হয় এবং কিসে তাহার নিবৃত্তি বা হ্রাস সম্ভব। পাপীকে কয়েদে আবদ্ধ করিলেই সমাজ নিরাপদ্ হইবে না, কারণ যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে কার্য্য তত দিন দেখা দিবেই। আর রুশিয়ায় যদি নিহিলিষ্ট-দের সংখ্যা কমিয়া থাকে, অন্যদেশেও তবে পাতকীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চোখের ভাষা।

কি কথা যে বলতে এলে, একটুও তা হয়নি বলা;
অধর যদি কাঁপল মৃদু, রুদ্ধ হয়ে এল গলা।
একটু খানি ভয়ে ভয়ে চাইলে মম মুখের পানে,
—মনের কথা মুখের চেয়ে চোখই বেশী বলতে জানে।
প্রাণের সুরে গানের সুরে যেই খানে হয় মেশামেশি,
সব সুরেরে আড়াল করে আঁখির সুরই জাগে বেশী।
প্রাণে আমার কি সুর বাজে, আকুল আমার ভালোবাসা
লুটিয়ে পড়ে ধূলার পরে, প্রকাশ হইতে পায় না ভাষা।
তুমি আমায় বুঝবে কিগো? আমার কথা আমি বুঝি,
জীবন ভরে বিলিয়ে দিলে ফুরাবে না হাসির পুঁজি।
এক নিমেষে সব টুকু মোর চাই যে দিতে পায়ের তলে,
সকল হাসি জমাট হোল একটি কণা নয়ন জলে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

"ভালবাসা—ও ভালবাসা—আরে ও তুমি—"

"আহ্লাদ; লজ্জা নাই ছেলেগুলির সাম্নে—ভালবাসা ভালবাসা।"

"এ আবার লজ্জার কথা কি হইল? যে প্রাণের আদরের সোহাগের জিনিস তাহাকে আদর করিয়া ডাকিব তাহাতেও আবার বাধা-নিষেধ, অর্ডার সার্কুলার আছে নাকি?"

"ছেলেপেলে সম্মুখে; শুনিলে লোকেই বা কি বলিবে?"

"কি আশ্চর্য্য—জীবন নাট্যের অর্দ্ধ সম্বন্ধ যাহাদিগের সহিত—তাহাদিগের সঙ্গে একটা ডাকা-খোজার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত থাকিবে না—শ্বশুর কে কিছু ডাকা যাইবেনা, শাশুড়ীকে কিছু ডাকা যাইবে না, শালাকে শালা বলিলে তো দস্তর মত মানহানী। এখন স্ত্রীকেও যে একটু আদর করিয়া একটা কিছু ডাকিব, দেখিতেছি, তাহাও চলিবে না। এত আইন কানুনের ধারতো ধারিতে পারিব না। এসো দেখি—তোমার একটা জ্যাকেট দাও, খলিফা আসিয়াছে—মাপ নিয়া যাউক।"

"কেবল কি আমার মাপ নিলেই চলিবে? ছেলে দুটার গায় কিছু নাই, শীতে টিরটির করে। নিজেরও তো কিই বা আছে? কোন খানে যাইতে হইলে নাড়া নেংটা।"

"ওগো দাও দাও সকলের একেবারে হবে না। মাসে মাসে এক এক দফে হইবে। সর্ব্বাগ্রে Her majesty's Service."

স্বামীর ব্যবস্থার উপর স্ত্রী আর অধিক কথা বলিলেন না। যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একটী পাতলা কাপড়ের জ্যাকেট বাহির করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ছেলেদের না দিয়া আমিই বা এটা পরিব কি করিয়া? লোকেই বা বলিবে কি?"

যতীন স্ত্রীর গণ্ডে একটী টোনা মারিয়া বলিলেন "তোমার যে বয়স যায়: কুড়ি পার হইলেই তো বুড়ী; তারপর তো আর বয়সও থাকিবে না, সখও থাকিবে না।"

মনোরমা তাহার বালক দুটীর জন্য দুটী গরম জামার কথা ভাবিতেছিল। যতীন খলিফা বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়া বলিল—"ছেলেদের দুটী গরম কোট খলিফা দোকান হইতে কিনিয়া দিব। তৈয়ার করাইতে গেলে বেশী দাম পড়িয়া যাইবে।"

"জ্যাকেট আসিবার আগেই কিন্তু দিতে হইবে।"

"যখন আদেশ—তখন দিতেই হইবে। আরো যেন তুমি কি বলবে বলবে বোধ হইতেছে—ঠোট খোলে খোলে খুলে না। বলিবে তো বলিয়াই ফেল না। শুনা যাউক।"

"খুব ভাল নাকি সার্কাস আসিয়াছে—একটা লোককে দড়ি দিয়া বুকেপিঠে বাঁধিয়া ছালার ভিতর পুরিয়া সিন্দুকে তালা-বন্দি করিয়া রাখে; লোকটা নাকি দুই মিনিটের মধ্যে বাহির হইয়া আসিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গায়—যেই তার গান বন্ধ—সেই পূর্ব্বের মত—সিন্দুকের মধ্যে ছালায়-বান্ধা-মানুষ।"

"তাই কি দেখিবার সখ্?"

"না হয় কার?"

"এবার বাসা খরচ কিছু বাঁচিয়াছে বুঝি?"

"কেমন করিয়া? সেতো তুমি ষোল আনা হিসাব করিয়াই দিয়াছ।"

"নিজে হিসাব বুঝিয়া খরচ করিলে এ হইতেও কিছু রাখা যায়। তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াও টাকা পয়সার হিসাবটা শিখাইতে পারিলাম না। কেবল বিনাইয়া বিনাইয়া বাজে কথায় ভরিয়া চিঠি লিখিতে শিখাই লেখা পড়ার স্বার্থকতা নহে। পয়সার ভিতর হইতে পয়সাটী বাহির করিতে পারিলে, দরিদ্র-গিন্নীর শিক্ষার স্বার্থকতা আছে। পাঁচ আনা সের হইলে তাহা তিন পয়সার আনা উচিত কি পাঁচ পয়সার আনায় লাভ—টাকা হইতে পনর পয়সা খরচ হইলে কত বাকী থাকে, এগুলি বুঝা ও জানা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। সোয়া ছয় টাকা চাউলের মণ হইলে—"

"সে দেখ গিয়া তোমরা; আমরা ঘর লেপিয়া, উঠান ঝাড়িয়া—দিন কাটাইতে পারিলেই—বুঝি দিন শান্তিতে গেল। বুদ্ধি শুদ্ধির ধার ধারি না—বাঁচিবইবা আর কয় দিন?"

"ওগো দিন যাইবার নহে। সধবা মরিতে পারিলে সহজেই দিন যায় বটে। বিধবা হইলে কিন্তু মরণ নাই—দিন যাইতে চাহিবে না—বিশেষ হিন্দু বিধবার দিন। তবে আর আজ যাওয়া হইবে না। আজ মাস্কাবার, আফিস হইতে ফিরিতে রাত হইবে ৮টা, তারপর কখন খাইবে কখনই বা যাইবে। আচ্ছা কার সঙ্গে যাইবে?"

"তুমি লইয়া যাওতো যাই, অন্যের সঙ্গে যাইব না।"

তাহা হইলে ছেলে শুদ্ধ—মায় গাড়ীভাড়া মবলগ আড়াইটী টাকার দরকার। হুঁ হুঁ হইবে না—বেতন না

পাইলে হইবে না। অপেক্ষা কর মহাকালীর Benefit nightএ যাব; দেখাবেও ভাল, টাকাটাও যাইবে স্বার্থক।"

"আচ্ছা।" বলিয়া মনোরমা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

(২)

আফিসে যাইবার পোষাক লইয়া যতীন বলিলেন—"সেদিনের টাকাগুলি দাও দেখি; মহেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন; চুরীচামারির দিনে ঘরে টাকা লইয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ্ নহে।"

মনোরমার ভাবান্তর হইল। সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিবর্ণ-পাংশু দৃষ্টি পাত করিয়া পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে গিলিতে জড়িত ভাষায় বলিল—"কোন টাকা।"

যতীন্ চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল মহেন্দ্র বাবুর ঋণ শোধ করিব বলিয়া বেঙ্ক হইতে যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, মাসে মাসে বেতন হইতে যাহা কাটা যাইয়া যাইয়া শেষ হইবার কথা—সেতো তোমার হাতেই দিয়াছিলাম—আলমারির পুস্তকের পাছে তুমি রাখিয়াছিলে বোধ হয়।

মনোরমা কথার উত্তর দিতে পারিল না। মাটীর দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

যতীন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"কি বলিবার আছে—দেখ!"

স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে আজ একটা বিরুদ্ধ চিন্তা নীরবে ক্রীড়া করিতে অবসর পাইল।

(৩)

"বৌদি কোথায়, এ সময়ে গরীবের উপর গ্রেফতারী কেন? যে ছেলে তোমার, বাবা, একটু ঘুমাইতে পারলাম না।"

পরদার একদিক উঠাইয়া অন্য কোঠা হইতে মনোরমা বলিল "বসুন আপনি। আমি আজ বড় বিপদে পড়িয়া আপনাকে এই কষ্ট দিয়াছি।"

এই বলিয়া মনোরমা ছেলে দুইটাকে অন্য ঘরে যাইয়া খেলা করিতে উপদেশ দিয়া ঘরের সম্মুখের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পরেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন "একি, দোহাই তোমার বৌদি, আমি জেল খানার কয়েদী হইতে আসি নাই। খুলিয়া দেও—খুলিয়া দেও দরজা!"

আমার একটু কথা আছে, আপনাকে গোপনে শুনিতে হইবে। আপনার পায়ে ধরি আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিতে পারিবেন না।" বলিতে বলিতে মনোরমা আসিয়া পরেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হঠাৎ এই অচিন্তনীয় ব্যাপারে যুবক পরেশ আপনাকে সামলাইয়া উঠিতে পারিল না। তাঁহার স্বাভাবিক দুর্ব্বল বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; মাথা ঘুরিয়া গেল। সে মনোরমাকে তাহার প্রকোষ্ঠ ধরিয়া তুলিতে যাইয়া বাহু ধরিয়া ফেলিল—চখের জল মুছিতে যাইয়া গণ্ডে হাত বুলাইয়া দিল। তার পর সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সরলা মনোরমার সেদিকে চৈতন্য নাই। সে কাঁদিয়াই আকুল।

মনোরমার শিশু পুত্র ভুলু যখন মার পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহার কাপড় টানিয়া বলিতেছিল "মা কাঁদ কেনো?" তখন মনোরমার চৈতন্য হইল; সে পাছের দিকে চাহিয়া দেখিল লালু ভুলু দুই ছেলেই তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান, তখন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। ত্রস্ত উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল।

ততক্ষণে পরেশনাথ নিজকে সামলাইয়া সংযত করিয়া লইয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিলেন এবং উঠিয়া গিয়া নিজেই দরজাগুলি খুলিয়া দিয়া আসিয়া স্থিরচিত্তে বলিলেন, "দেখ বৌদি, আমি বামুনের ছেলে, বয়সেও বড়, তুমি পায় হাত দিলে বলিয়া আমার চিন্তার বড় বিশেষ কারণ নাই। তবে যতীন যে বলে তুমি নেহাৎই বুদ্ধিশূন্য—খেলার পুতুলটী—তার পরীক্ষা বেশ পাইলাম। তুমি এই নীরব দুই প্রহরে একলাটী আমাকে ডাকাইলে—আর দরজাটী বন্ধ করিয়া আটক করিয়া লইয়া বসিলে, বল দেখি এই সময় এই অবস্থায় যদি কেউ আসিয়া তোমায় আমায় দরজা বন্ধ দেখত তো কি ভাবতো? ছিঃ, এত বড় হইলে, দুটী ছেলের মা হইলে, তবু হিতাহিত বুঝিবার শক্তি হইল না?"

মনোরমা নীচের দিকে চাহিয়া তাহার ছোট ছেলের মাথাটীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"আমি জ্ঞান শূন্য হইয়াছি।—আপনি আমার সম্মান রক্ষা না করিলে হইবে না।"

"আপনার সম্মান রক্ষার পন্থা কি এবং আমাকেই বা তার জন্য কোন সাগর সন্তরণ করিতে হইবে তাহাই বলুন।"

তবে আপনি এ কথা আর কাহারও নিকট বলিতে পারিবেন না।

"বলিবার কথা হইলে বলিব, না বলিবার কথা হইলে বলিব না। আপনার কথাই আগে শুনিতে দিন।" বলিয়া পরেশ তাহার হাস্যোজ্জ্বল চসমা অলঙ্কৃত চক্ষুদ্বয় মনোরমার নিতান্ত অসহায় করুণ দৃষ্টির উপর স্থাপন করিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত বিপদ কাহিণী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মনোরমা পুনরায় বলিল—"আমি বড়ই বিপদে—"

"সেতো আসিয়াই শুনিয়াছি—এখন শুনি সে বিপদটা কি ?"

মনোরমা ছেলে দুটীকে যাইয়া খেলিতে উপদেশ দিয়া মাটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"তিনি ঋণ শোধ করিবার জন্য সরকারী বেঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিয়া কিছু ঋণ শোধ করেন। বাকী মহেন্দ্র বাবু কলিকাতায় চলিয়া যাওয়ায় শোধ দিতে পারেন নাই। আমার নিকট রাখিয়া দেন।"

"সেতো সে দিনের কথা সমস্তই আমি জানি। তার পর।"

"সে দিন আমার বাবা আসিয়া হঠাৎ একেবারে আমার হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়েন। আমি বাবার দুঃখে স্থির থাকিতে পারিলাম না। বাবা আমাকে কত ভালবাসিতেন, আমার নিকট কত না আশা করেন; যখন তিনি বলিলেন, মা, আমার বাড়ীখানা আজ বুঝি নীলাম হইয়া যায়; এই বুড়া বয়সে শেষে পথে বসিতে হইল"—তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ক্ষমতা না থাকিলেও পিতামাতার কষ্টে, স্বামী পুত্রের কষ্টে, সাহায্য করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বাবা পনর দিন মধ্যে টাকাটা ফেরত দিবেন বলিয়া স্বীকার করায় তাহাকে সেই টাকা হইতে একশত টাকার একখানা নোট দেই। পরেশ বাবু, বাবা নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাসহারা হইতে দিবেন না। তিনি সে রকম প্রকৃতিরই লোক নন। কিন্তু আজ মহেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন; আবার ২।১ দিনের মধ্যেই নাকি চলিয়া যাইবেন। বাবু আফিসে যাইবার সময় আজ হঠাৎ টাকাগুলি চাহিয়াছিলেন। আমি সদুত্তর দিতে পারি নাই। এ বিপদ্ হইতে আপনি দয়া করিয়া আমাকে না তরাইলে আমি যে কি করিব ভাবিয়া কূল পাইতেছি না।"

কথা শেষ করিয়া মনোরমা ব্যগ্রভাবে করুণাপ্রার্থী হইয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে জলভরা করুণ চাহনি পরেশকে পুনরায় উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল। সে মনোরমার চক্ষে চক্ষে চাহিয়াই মাথা নত করিয়া রহিল। তারপর ঢোক গিলিয়া বলিল—"সে জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না বৌদি। আমি তোমার বিপদের ভার গছিয়া নিলাম। আমিই তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

"মনোরমার ঈষৎ উজ্জ্বল মুখশ্রী পরেশের শেষ কথায় পুনরায় ম্লান হইয়া গেল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"তা হইবে না পরেশ বাবু; আমি তাঁহার নিকট অবিশ্বাসী বনিতে পারিব না। এ আট বৎসর ধরিয়া তিনি আমাকে এক দিনের জন্য অবিশ্বাস করেন নাই। বলিবার হইলে আমি নিজেই বলিতাম। তাহার নিকট আমার ভয় নাই। আমার বাবাকে টাকা দিয়াছি বলিয়াই সে কথা তাঁহার নিকট এতদিন বলা প্রয়োজন মনে করি নাই, আজও জানিতে দিব না। যদি বাবা টাকা না দেন, তবে তখন অবশ্যই সকল কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিব—ক্ষমা চাহিব। আমায় আপনিই রক্ষা করিবেন। দোহাই আপনার।"

আবার উভয়ের চক্ষে চক্ষে তাড়িত খেলিয়া গেল। পরেশের হৃদয় পুনরায় ঘন স্পন্দনে আলোড়িত হইতে লাগিল। পরেশ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। একশত টাকা তাহার পক্ষে অতি সামান্য হইলেও বর্ত্তমান

ব্যাপারটী যেন তাহার নিকট অত্যন্ত জটীল বলিয়া বোধ হইতেছিল।

পরেশকে নীরব দেখিয়া মনোরমা আরও একটু অগ্রসর হইয়া সম্মুখের টেবিলে ঝুকিয়া পড়িয়া ছেলে মানুষের ন্যায়—নিতান্ত গরজি মানুষের ন্যায় বলিল—"আপনার শেষ উত্তরের উপর আমার ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। আপনি আজ আমাকে রক্ষা করুন। যদি বাবা নিতান্তই টাকা না দেন, পরেশ বাবু, আপনার টাকা মারা যাইবে না। কালই আমি তাঁহার নিকট সকল কথা নিজ মুখে প্রকাশ করিয়া আমার অদৃষ্টের ফল গ্রহণ করিব—আর আমার এ উৎকণ্ঠা সহ্য হইতেছে না।"

মনোরমার গণ্ডস্থল ভাসিয়া দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। সুন্দরীর অশ্রুজল বড়ই সুন্দর—পরেশ বুঝি তাই মুগ্ধনেত্রে সেদিকে চাহিয়া সে অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল। তাহার মুখে কথাটী ফুটিল না।

মনোরমার আজ আট বৎসরের স্বামীসোহাগ, অকৃত্রিম বিশ্বাস পিতৃভক্তির অতি ক্ষীণ স্পর্শে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অথচ পিতার সাহায্যের জন্য সে তাহার দরিদ্র স্বামীকে ভারগ্রস্থ করিয়া তাঁহার মন একটুও ক্ষুন্ন করিতে ইচ্ছা করে না। তাই সে আজ একজন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট একটী কথার ভিখারী হইয়া সকল লজ্জা, সকল সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়াছে। দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতা মানুষকে কত অমানুষ করিতে পারে। মনোরমার মনে যে তাহা সময় সময় উদয় হইতেছিল না, এমন নহে। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। বিপদ যে সে নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে।

মনোরমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে পরেশের হাত দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আপনি বলুন আমাকে আজ একশত টাকা দিবেন। কালই আমি সকল কথা বলিয়া আমার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

পরেশ চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিল না। মনোরমার হাত হইতে হাত দুখানা টানিয়াও লইতে শক্তি পাইল না। মুগ্ধ হরিণের ন্যায় ফাঁদে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার দেহের ভিতরে যেন তখন বিশ্বকর্ম্মা দধীচির অস্থি পিটিয়া দৈত্যজয়ের বজ্র নির্ম্মাণ করিতেছিলেন।

পরেশ বেকুবের ন্যায় মনোরমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহাস্য বদনে সেই প্রাচীন কথাই পুনরায় বলিল—"আপনি আজই যতীনকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলুন—আমিও তাহাতে সাহায্য করিব।"

নিরাশভাবে মনোরমা বলিল—"আপনি আমার অবস্থাটা বুঝিতেছেন না। একটী মাত্র সামান্য ভুল—ভুলই বা বলি কেন—সামান্য কথাই আমার জীবনকে অসীম লাঞ্ছনার অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। আপনার একটী কথা যদি সেই অসীম লাঞ্ছনা ও অশান্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারে, আপনি কি তাহা করিতে পারেন না? এক শতটী টাকাই কি আপনার অধিক হইল। টাকা না পাইলে আমার দশা যে কি হইবে তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত অন্যে বুঝিবে না। আমার জন্য কি আপনার মমতা হইবে না?"

পরেশ মনোরমার দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিয়া হাসিল।

মনোরমা আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল "তবে কি বলেন আপনি?"

পরেশ তাহার সেই স্পন্দনহীন দৃষ্টি স্থির রাখিয়াই বলিল "আপনি কি বলেন?"

"আমি বলি আজ আমাকে আপনি একশত টাকা দিয়া রক্ষা করুন।"

"আপনার কথা রাখিব।"

"তবে আজ ৪টার পূর্ব্বেই দিতে হইবে।"

"তাহাই করিব।"

"কেহ যেন জানিতে পারে না; তিনিও না।" আপনি নিজে আসিয়া দিয়া যাইবেন। ১০০ টাকার একখানা নোট দিবেন। দুইখানা নোটই ছিল।"

"আচ্ছা, তবে আসি।"

"কবে টাকাটা পরিশোধ করিতে হইবে?"

"আপনার যবে সুবিধা হইবে।"

পরেশ নূতন রকমের একটী হাসি টানিয়া শিশ দিতে দিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনোরমা বড় ছেলেটীকে চারিটী পয়সা দিয়া বলিলেন—মিঠাই কিনিয়া

দিব। কিন্তু দেখিস্ তোর কাকা বাবু যে আসিয়াছিলেন, সে কথা কিন্তু তাঁকে বলিস্ না। সাবধান। বলিলে কিন্তু সার্কাসের তামাসায় যাইতে দিবনা।

(৪)

"পরেশ আসিয়াছিল কি ?"

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়াছিল ; পরে আর আসে নাই।"

"আজ যাবে নাকি তুমি সার্কাস দেখ্তে ?"

"তবে নাকি পয়সা নাই, অন্য দিনে দেখাইবে বলিয়াছ।"

"আজ অল্পেতেই কাজ শেষ হইল—তাই সকাল সকাল আসিতে পারিলাম ; যাও ত যাইতে পার।"

"আয় বুঝিয়াতো ; সে কথা কে বলিবে ?"

"আচ্ছা দেখি পরেশ যদি তার স্ত্রীকে নিয়া যায়।"

"না আর কাহারও সঙ্গে যাইব না ; যাই ত তোমাকেই লইয়া যাইতে হইবে।"

"আচ্ছা দেখিয়া আসি ত।" বলিয়া যতীন আলোয়ানটী গায়ে মাথায় মুড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"যতীন্—যতীন্—বৌদি, তোমার কর্ত্তা কোথায় ?" পরেশ আজ আর বৈঠক খানায় না বসিয়া একে বারে আসিয়া রান্না ঘরে উঁকি দিয়া ডাকিলেন। মনোরমা অন্যান্য দিনের ন্যায় সসব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বসুন গিয়া, তিনি আপনাদের বাসায়ই গিয়াছেন; এখনি আসিবেন।"

পরেশ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল—"বেশ ভেল্কী জান দেখি বউদি, তুমি! এই অভিনয়, আর এই নয়া বউটী। সার্কাসে দিলে পারবে বেশ। কৈ আজ চা-টা কর নাই।"

মনোরমা লজ্জিত ভাবে বলিল—"বসুন গিয়া, আমি আনিতেছি।"

"খালি ঘরে ব'সিয়া তো আর দেয়ালের সঙ্গে আলাপ চলবে না? তোমাদের একটা চাকরও নাই—এ বড় বিপদ তুমি কেমন করিয়া একা একা যে এত সব ঝঞ্ঝাট সহিতে পার। বাড়ী খানা ফিট কাট—যেন আয়না। তুমি কি রোজ দুবেলাই ঝাড়ু দাও।"

মনোরমা নম্রভাবে বলিল—"কি করি খরচ পত্র কুলাইয়া উঠে না। চাকর রাখিতে গেলে মাসে ১২টী টাকায় কুলায় না। ঠিকায় জল দেয়, তাতেই প্রায় টাকা তিনেক যায়। বাড়ীতে কল থাকিলেই সুবিধা হইত। নতুবা তো চলে না।"

"আমার বাড়ীর অবস্থা যদি শুন বৌদি—মাথা ব্যথা আর হাড় ব্যথা, উঃ আরি আঃ—সকাল বিকাল লাগিয়াই আছে। একটা না একটা থাকিবেই। তার পর চাকর বলে ঠাকুর চোর, ঠাকুর বলে চাকর চোর।"

যতীন ঘরে আসিয়া তাহাদের কথা শুনিতে ছিল। সে মনোরমার কথা শুনিয়া নিজকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছিল। এইবার ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল "কিহে ভায়া একেবারে যে অন্দর মহলে। আরতো কখনও তোমায় এমন পাপটী করিতে দেখি নাই। বলি তুমিই বা কেমন একখানা বস্‌বারও কিছু দিলে না?"

"তা আর দিবে, মুখের কথাটীই কত পয়সার মাল।"

"সার্কাস দেখাইবার সখটানি মিটাইতে পারহে ?

"চলনা একদিন সকলেই যাওয়া যাউক। আমিত Benefit nightএ যাইব বলিয়া বাড়ীতে ভরসা দিয়াছি।"

"তবে তাই হউক।"

মনোরমা দুই পেয়ালা চা আনিয়া হাজির করিয়া দিয়া পুণরায় রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

(৫)

"মহেন্দ্র বাবুর টাকাগুলি কালই নিয়া দিয়া আইস।"

"টাকা কোথায় মনু ?—তুমি না—"

"টাকা পাওয়া গিয়াছে—এই নেও।" বিছানার নীচ হইতে দুইখণ্ড নোট মনোরমা স্বামীর সম্মুখে রাখিল।

যতীন নোট দুইখানা দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "টাকা পাইলে কোথায় ?"

"পাইয়াছি।"

"পাইয়াছ যে তা ত দেখিতেইছি। কিন্তু পাইলে কেমন করিয়া ?"

"সারাদিনটা আমার বড়ই অশান্তিতে কাটিয়াছে। না জানি কাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার রাত পোহাইয়াছিল ?"

"শান্তি এবং অশান্তি সকলি নিজ কর্ম্মের উপর নির্ভর

করে। আজ তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ—ফলও সেই কর্ম্মের অনুযায়ী হইয়াছে; ইহার জন্য কোন নিরপরাধ ব্যক্তির মুখকে দায়ী করা নিরর্থক।"

"তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"বুঝিয়াছ, কিন্তু ধরা দিতে চাও না।"

"তবে তোমার বিশ্বাস, কোন মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছি?"

"কর নাই বলিলে আর একটী বৃদ্ধি হইবে মনে হয়।"

"তবে কি তোমার বিশ্বাস আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছি?"

"যদি বল কর নাই, তবে আমি বলিব, যে তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে, গত ৮ বৎসরের মধ্যে একদিন যে মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে অবিশ্বাস করে নাই, তুমি তোমার সেই পূজনীয় স্বামীর সহিত অতি সামান্য কারণে একটী নয়, দুইটী নয়, তিন তিনটী মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ। এখন মনে মনে গণিয়া দেখ, মিথ্যা কি সত্য।"

মনোরমা নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। যতীন একখানা ডাকের চিঠি পকেট হইতে বাহির করিয়া মনোরমার সম্মুখে দিয়া বলিলেন—তোমার বাবার চিঠি আসিয়াছে, দেখ দেখি তিনি কি লিখিয়াছেন। মনোরমা শিহরিয়া উঠিল।

যতীন বলিল "এ চিঠি আমি আফিসে যাইবার পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম—তাই তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মনু, আত্মরক্ষার জন্য একটী মিথ্যায় যেন পাপ নাই। কিন্তু সেই বীজটীকে ধরিয়া যদি অনবরত অসত্য প্রশ্রয় পায়, তবে তাহা কদাপি কল্যাণকর হয় না। উহা চরিত্রকে কলঙ্কিত করে, মনকে সঙ্কুচিত করে, জীবনেও শান্তি ও সুখ বিনষ্ট করিয়া—উহাকে কলুষিত করিয়া ফেলে। এটা তোমার একটুও চিন্তার বিষয় হইল না?"

মনোরমা নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীন্ বলিল "চুপ করিয়া রহিলে কেন? তুমি এই যে সামান্য ত্রুটীটাকে প্রকাণ্ড অসত্যের আবরণে ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছ, ইহাতে কি তোমার বিবেক একটুও তোমাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছে না। তুমি সন্তানের জননী, গৃহের কর্ত্রী, স্বামীর আজীবন বিশ্বাসের একমাত্র পাত্রী—তোমার আদর্শ এরূপ মিথ্যার আবরণে মণ্ডিত—কি পরিতাপের কথা! মনু তুমি কুলীনের মেয়ে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক; কিন্তু কৌলীন্য কি জন্মে হয়? চরিত্রের আভিজাত্যই প্রকৃত আভিজাত্য; ইচ্ছার আভিজাত্য এবং মনের আভিজাত্যই লোককে প্রকৃত কুলীন করে। সেই কৌলীন্য যে স্ত্রী ও মাতাতে নাই, সে সংসার দুঃখের আগার। মাতার দায়িত্ব বড় দায়িত্ব অধিকাংশ লোক মাতার দোষে নষ্ট হইয়া যায়।

মনোরমা আর থাকিতে পারিল না। সে কাঁদিয়া স্বামীর পায় লুটাইয়া পড়িল। তার পর আবেগ কম্পিত স্বরে বলিল—"ওগো আমার এইরূপ ব্যবহারের জন্য কি তুমি একেবারেই দায়ী নও?"

"আমি কি প্রকারে দায়ী মনু?"

"কেন তুমি এ চিঠিখানা আমাকে তখন দেখাইলে না। কেন তুমি আমাকে মিথ্যা পরীক্ষার ভান করিয়া সমস্ত দিন অশান্তি ভোগাইলে? বাবার টাকা নেওয়ার কথা আমি তোমাকে বলি নাই। বলিবার প্রয়োজনও মনে করি নাই। এমনতো কত কাজই করিতেছি। আমার এ কার্য্যে যদি অপরাধ হইয়া থাকে, এ অপরাধ তোমার নিকট হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মের নিকট হয় নাই। ধর্ম্ম জানেন—যাহা করিয়াছি কেবল তোমার নিকট বিশ্বাসী থাকিবার জন্য—তোমার বিশ্বাস নষ্ট হইবার ভয় আমাকে পাগল করিয়াছিল। আমি যাহা করিয়াছি শেষ অপ্রকৃতস্থ হইয়া করিয়াছি—তোমার জন্য আমি সম্মান হারাইয়া লঘু হইয়া পড়িয়াছি—তুমি ইহার জন্য দায়ী না—এ কথা তুমি বলিতে পার না। যদি বল, তবে আমার উপায় নাই—সান্ত্বনা নাই।

"কোন টাকা"—বলিয়া তুমি টাকার কথা অস্বীকার করিয়াছিলে কেন?

"প্রথমে আমি বুঝিতে পারি নাই। পরে যখন বুঝিয়াছিলাম—তখন উত্তর করি নাই—এইটী আমার এক মাত্র ত্রুটী। তুমি তখন চিঠি খানা না দিয়া "কি বলবার আছে দেখ" বলিয়া কেন আমাকে পাগল করিয়া

গেলে। ওগো আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না; সর্ব্বদা তোমার পোষাপাখীটীর মত ইঙ্গিতে চলিয়াছি। আমাকে পরীক্ষার ফাঁদে ফেলিয়া অসম্মানী করিলে কেন? এই একটী ত্রুটী ঢাকিবার জন্য আরও দশটী অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত করাইলে কেন? আজ আমার দিন কি অপমানে, কিলাঞ্ছনায় গিয়াছে ওগো, সেই অন্তর্য্যামী ব্যতীত তাহা অন্যে বুঝিতে পারিবেনা।"

মনোরমা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফুঁকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতীন্ বলিল "টাকা সংগ্রহ করিলে কোথায়?"

মনোরমা দুইহাতে যতীনের পায়ে ধরিয়া বলিল "আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে পাগল করিও না। সে কথা এখন বলিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। তোমাকে মুখ দেখাইতে পারিব না। তুমি এক দিনের জন্য আমার প্রতি বিশ্বাস হারা হও নাই। আজও হইওনা। আমি তেমন কোন কাজ করিনাই—করিতে পারিনা। সময়ে সকল কথাই বলিব—শুনিবে।"

যতীন মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া ভয় পাইল। মনোরমার চেহারা পাগলের ন্যায়—দৃষ্টি উদাস। সে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিল "আমি তোমাকে অবিশ্বাসিনী মনে করি নাই। কেবল জানিয়া সুখী হইবার জন্য এত কথা বলিতেছিলাম।"

"তুমি ৮ বৎসর আমার কোন অপরাধ দেখিয়াও দেখ নাই। তাই আমি অপরাধ কাহাকে বলে জানিতে শিখি নাই। তুমিও তাহা বুঝিতে দেও নাই। আজ যাহা করিয়াছি তাহা তোমারই জন্য করিয়াছি। তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী না হইবার জন্যই করিয়াছি।"

"আর কেন,তোমাকে তো আমি শাসন করিতেছিনা।"

"ওগো-শাসনে প্রায়শ্চিত্ত আছে; প্রায়শ্চিত্তেই শান্তি। আমি বুদ্ধিহীনা—বুদ্ধির ত্রুটীতে যাহা করিয়াছি যখন তাহা জানিবে তখন দেখিতে পাইবে আমার শত অপরাধ সত্ত্বেও আমি তোমার বিশ্বাসী স্ত্রী; চিরকাল তোমার ছায়ার অনুবর্ত্তিনী। আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই জানিনা।"

মনোরমা ক্রমেই বেশী কথা বলিতেছে এবং এক কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছে দেখিয়া যতীন্ চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে মনোরমার মুখের উপর পতিত কুঞ্চিত চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া অত্যন্ত সহানুভূতি ও সোহাগজড়িত স্বরে বলিল "আমি তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করি না—করিতে পারিনা। করিলে আমার সংসারে এত সুখ, এত শান্তি থাকিত না। তোমাকে যে দুই একটী কথা বলিলাম তাহা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলাম তাই বলিলাম। এগুলি কোন ত্রুটী না করিলেও স্ত্রীকে বলা যায়। তারপর এমন ঘটনাও আমি জানি যে তোমার মত অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্তা, দুর্ব্বল স্বভাবের অল্প বুদ্ধির মেয়েরা অতি সামান্য কারণে কত অঘটন ঘটাইয়া ফেলিতেছে—সে জন্য কেবল তারাই দায়ী তাহা নহে—ভোগবিলাসী কর্ত্তব্যে উদাসীন স্বামীরাও দোষী সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। সত্যগোপন করিয়া আমার নিকট বিশ্বস্ত হইবার জন্য মিথ্যা উপায় অবলম্বন করা অপেক্ষা অপ্রিয় সত্যটী প্রকাশ করিয়া দেওয়া যে অধিকতর বিশ্বাসের কার্য্য এটী আমারই তোমাকে প্রথম বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল" বলিয়া যতীন্ স্ত্রীর মুখ চোখ পুনরায় মুছাইয়া দিয়া সোহাগ ভরে সেই সিক্ত গণ্ডে ভালবাসার দান মুদ্রিত করিয়া দিল।

মনোরমা তখনও সান্ত্বনা পায় নাই। সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল এইরূপ শ্লেষ করিলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। দোহাই তোমার, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর; বাক্য যন্ত্রণায় আর কষ্ট দিও না। নিজের অপবাধ হইয়াছে বলিয়া ব্যঙ্গ করিও না। তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই—আমার প্রাণ জুড়াইবার আর স্থান নাই।"

যতীন বলিল "তবে আমি আর ভাল মন্দ কোন্ কথাই বলিব না।" এখন ঘুমাও রাত সাড়ে এগারটা।

মনোরমা অধোমুখে শয্যায় পড়িয়া ফুঁকাইতে লাগিল।

(৬)

প্রাতঃকালে উঠিয়া যতীন্ মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। গাড়ু গামছা জায়গা মতে ঠিক আছে দেখিয়া তিনি দুই একবার ডাক হাঁক করিয়াই গাড়ু

গামছা লইয়া চলিয়া গেলেন। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়াও যখন ডাকিয়া হাকিয়া সাড়া পাইলেন না পরন্তু পুনঃ পুনঃ ছেলে দুটীর ক্ষুধার আব্দারই পাইতে লাগিলেন—তখন মনোরমার অনুসন্ধান প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তখন যতীন্ লক্ষ্য করিলেন—বিছানাগুলি এখনও তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে, ঘরটা এখনও ঝাড়ু দেওয়া হয় নাই; উঠানে গো-ময় ছিটা পড়ে নাই—নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলি যেন সকলি কাহারও অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে। তবে কি মনোরমা এখনও ঘুমাইয়াই রহিয়াছে?

ছেলেরা কাঁদিয়া বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল। যতীন্ এঘর সেঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, কোথাও মনোরমা নাই। তখন তিনি তাঁহার দুই চক্ষু দুই মুষ্টিতে আটকাইয়া মুছিয়া ভগ্ন জড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন "ওগো তুমি কোথায় গেলে—ছেলে দুটা যে কাঁদিয়া খুন হইতেছে একবার দেখিলে না; আমি যে আর পারি না।"

সে অরণ্যে রোদন, কেহ শুনিল না।

ক্রমে লোক জমিল। এবাড়ী, সেবাড়ী, এপথ, সেপথ এঘাট, সেঘাট অনুসন্ধান হইতে লাগিল।

তখন বাড়ীর পশ্চাতের পুকুর পাড়ে কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মনোরমার মৃতদেহ দুইজনে ধরাধরি করিয়া আনিয়া উঠানে রাখিল। সে দৃশ্য দেখিয়া যতীন্ চিৎকার করিয়া মৃতদেহের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

(৭)

* * * *

মনোরমার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছিল তাহা এইরূপ:—

প্রিয়তম,

আজ হৃদয়ে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছি। চক্ষের জলে কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে।

একটী ক্ষুদ্র মিথ্যাকে সামালাইতে বহু মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলাম। সকল অপরাধ না শুনিয়াই তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ এটা তোমার আদর্শ চরিত্রের মহত্ব। তোমাকে বাকী কথাগুলি বিশেষ করিয়া লিখিয়া বলিবার আমার সময় নাই কিন্তু না বলিয়াও শান্তি পাইতেছিনা—তাই সংক্ষেপে বলিতেছি—তুমি পরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা জানিতে পারিবে।

বড় খোকাকে পাঠাইয়া কাল দ্বিপ্রহরে পরেশ বাবুকে আনাইয়াছিলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে একশত টাকা কর্জ্জ লইয়া বাবাকে দেওয়া টাকার স্থলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছিলাম। অভাবে পড়িলে লোক কি প্রকার কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইতে পারে ও আত্মসম্মানে ঔদাসীন্য দেখাইতে পারে, তাহা আমি ফলে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পরেশ বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া আমি এই একশত টাকা লইয়াছিলাম। যদি তিনি না দিতেন, তবে আমার অবস্থা আরো শোচনীয় হইত—আমি উন্মাদ হইতাম। পরেশ বাবু ব্রাহ্মণ; তাঁহার পায়ে ধরিয়া ও হাতে ধরিয়া আমি নিজকে কলঙ্কিত করিয়াছি বলিয়া মনে করিনা। আমার প্রতি তোমার অটুট বিশ্বাস অনাহত রাখিবার জন্যই আমি আমার সরল বিশ্বাসে নিজকে এতদূর লাঞ্ছিত করিয়াছিলাম। ইহার বেশী আমার এদিকে একটুও ত্রুটী নাই তুমি তাহা বিশ্বাস করিও এবং আমাকে ক্ষমা করিও—শান্তি পাইব। তোমার বিশ্বাস অটুট রাখিবার জন্য আমি এই কাল্পনিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম সেটা ভাল করিয়াছিলাম কি মন্দ করিয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। পিতার দারিদ্র্যের সহিত তোমার যাহাতে সম্বন্ধ না হয়, তাহাই ইচ্ছা করিয়া আমি তোমাকে তাহা বলা প্রয়োজন মনে করি নাই। এখন যখন মনে হইতেছে আমার দরিদ্র পিতাকে সাহায্য করিবার জন্য এবং স্বামীর বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই অপরাধ করিয়াছিলাম তখন মনে সুখ হইতেছে, গর্ব্ব হইতেছে। মনে হইতেছে লোক কত জঘন্য বিষয়ের জন্য কত ভয়ানক পাপ করিতেছে আর আমি পূজনীয় পিতার জন্য পরম দেবতা স্বামীর জন্য—পাপী হইয়াছি তখন, মরিতে ইচ্ছা হয় না—মরণকে ভয় হয়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইতেছে আমি তোমার মত আদর্শ স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী নই তখন প্রাণে বল পাই না। মরণ ব্যতীত অন্য আশ্রয় দেখি না।

আমি যে তোমার সন্তানের জননীর আসনে থাকিবার

উপযুক্ত নহি তাহাও আমি আজ গুরুতর ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। ছেলে দুটীকে পর্য্যন্ত আমি তোমার নিকট এসকল কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। গর্ভধারিণী জননীর পক্ষে ইহা যে কত বড় দোষণীয় ব্যাপার আমি তাহা তখন একেবারেই লক্ষ্য করি নাই। আমার এ গুরুতর ক্রটীটার কথাও তোমাকে না বলিয়া শান্তি পাইতেছি না। ইহার পর আমার জীবনে তোমার চরণে আর তৃতীয় অপরাধ নাই—অন্ততঃ আমার মনে হইতেছে না।

আমি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক হইলে তোমাকে এই ব্যাপারে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। আমার ন্যায় দুর্ব্বল প্রকৃতির নির্ব্বোধ স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিতে যাওয়াই তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। স্ত্রীলোককে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে হইলে যতখানি সুশিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন অনেক স্বামীই তাহাদিগকে ততখানি দেন না। আমিও সুশিক্ষা লাভ করিতে পারি নাই। স্বামীর অত্যধিক আদরের ও সম্ভোগের জিনিসই ছিলাম মাত্র। শিক্ষা পূর্ণ হইয়া বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে এবং হৃদয় সবল হইলে আজ আত্মহত্যা করিয়া পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতাম না। কিন্তু উপায় নাই; তোমাকে মুখ দেখাইতে পারি কিম্বা তোমার মুখের দিকে আদরের প্রত্যাশায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারি সে শক্তি যেন আজ আমার নাই। সুতরাং এ পোড়া মুখ লুকাইবার এ ছাড়া আর অন্য উপায় দেখিলাম না। তাই ইহাই আমার একমাত্র আশ্রয় চিন্তা করিতেছি।

ছেলে দুটীর আমি সুমাতা ছিলাম না—সুতরাং আমার পক্ষে তাহাদের জন্য তোমাকে কিছু বলা আমার মুখে শোভা পায় না। গর্ভে স্থান দিয়া কষ্ট সহিয়াছি, তাই মমতা কাটাইতে পারিতেছি না—প্রাণের টানে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা তোমার উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া চরিত্রবান হউক।

এখন বিদায় হই—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যদি নারী জন্ম গ্রহণ করিতেই হয় তবে জন্মে জন্মে যেন হে আমার আরাধ্য দেবতা তোমাকেই স্বামীরূপে পাই।

রাত্রি দুইটা বাজিল বিদায়—বিদায়।

তোমার ভালবাসা।

পুঃ তোমাকে ছাড়িয়া মরিয়াও সুখ পাইব না নিশ্চিত কিন্তু কি করি এ পোড়া মুখ যে আর কাল দেখাইতে পারিব না। ক্ষমা করিও—তোমার ক্ষমা—আমার স্বর্গ। আর না।

"এই বুঝি হইলাম ভব নদী পার।"

শ্যামসুন্দর।

আজি মোর বিশ্ববৃন্দাবনে কে গো ওই দাঁড়া'ল আসিয়া,
শিশিরের সোণালি প্রভাতে কালোরূপে জগত মোহিয়া!
অরুণের হিরণ কিরণে পীতাম্বর করিয়াছে আলো,
মুখখানি সুকুমার নীলিমায় সাজিয়াছে ভালো!
'অলকা'-তিলক ভালে নবরবি উজলিয়া জ্বলে,
কবিতার সকল সুষমা হাসি-হাসি অধর যুগলে।
ফুলে ফুলে ফুলবন ছেয়ে গেছে উষার নিশ্বাসে,
গলে মরি! বনমালা দোলে ওই মৃদুল বাতাসে।
কোটি কোটি কৌস্তভ রতন শ্যাম বক্ষে করে ঝলমল,
অগুরু চর্চ্চিত তনুবাসে হৃদি মোর হয়েছে বিকল!
নূপুরে অঙ্কিত মরি! শ্যামলিত চরণ কমলে,
শত উষা শোভাময়ী দশদিশি উজলিয়া জ্বলে!
ওই বাজে 'গুণ'! 'গুণ'! মরি! মরি! পরাণ শিহরে,
নিখিলের সকল সঙ্গীত ও নূপুরে গুঞ্জরিয়া ফিরে!
অনঙ্গ-বাঞ্ছিত রূপ যোগীন্দ্রের যোগ ভঙ্গকারী,—
কে গো এ ত্রিভঙ্গঠামে দেখে আঁখি পালটিতে নারি'!
"রাধা, রাধা" বাজায় বাঁশরী এ মানস-যমুনা-কিনারে,
চিত বড় উচাটন রাই গৃহে আজ রহিতে না পারে!

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

গর্ভ-দোহদ।

এতদ্দেশে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের-দোহদ প্রথা প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে আধুনিক কুসংস্কারাপন্ন বঙ্গ পরিবারেই এই প্রথার জন্ম। বাস্তবিক এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেননা এই দোহদ প্রথা অতি প্রাচীন। প্রাচীন কবিদিগের বর্ণিত, যে দোহদ-রীতি আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়, তাহা অতি সুন্দর। অবশ্য এযুগে যে ঐ প্রথা না আছে, এমন নহে; তবে সেকালের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা প্রাচীন কবি 'ভবভূতি' শ্রীকণ্ঠের দৃশ্য-কাব্য, উত্তর রামচরিত নামধেয় নাটকের চিত্র-দর্শন অঙ্কে দেখিতে পাই—অযোধ্যাধিপতি দশরথ তনয় রামচন্দ্র লঙ্কাদ্বীপ হইতে জানকী উদ্ধার করিয়া দ্বাদশ বৎসরান্তে স্বীয় রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজ-পদে অভিষিক্ত হইলে পর, যখন জানকী দোহদ্‌বতী হইলেন, তখনই রাম—ভগিনী পতি ঋষ্য-শৃঙ্গের দ্বাদশ বার্ষিকী যজ্ঞে, সপত্নীক কুল-গুরু বশিষ্ঠ ও কৌশল্যা প্রভৃতি রাম জননীগণ জামাতার অনুরোধে ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই সময় জানকী প্রায় পূর্ণগর্ভা। জামাতৃ-যজ্ঞে রামচন্দ্রও পুরস্ত্রী সকলই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কৌশল্যা প্রভৃতি রাম জননীগণ পূর্ণগর্ভা জানকীকে রামচন্দ্রের নিকট রাখিয়া গেলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়াই স্ত্রীর অনুরোধে আহুত রামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিবার কবির উদ্দেশ্য কি? একটু অভিনিবিষ্ট হইয়া দেখিলেই উপলব্ধি হয় যে, গর্ভবতী স্ত্রীকে স্থানান্তরে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। কিয়দ্দিবসান্তর ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম হইতে অষ্টাবক্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া—কথাপ্রসঙ্গে রামকে বলিয়া ছিলেন যে,—'তোমাদের গুরু-পত্নী—দেবী—অরুন্ধতী ও কৌশল্যা প্রমুখ তোমার জননীগণ, এবং তোমার ভগিনী শান্তা, পুনঃ পুনঃ বলিয়াদিয়াছেন—'যঃ কশ্চিদ্‌গর্ভদোহদো ভবতি অস্যাঃ সোঽবশ্যমচিরাৎ সম্পাদয়িতব্যঃ।' অর্থাৎ জানকীর যে কোনও গর্ভিনী মনোরথ হইবে, অচিরেই যেন তাহা অবশ্য সম্পাদিত হয়। ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারি যে গর্ভ-দোহদ প্রথা নিতান্ত আধুনিক নহে।

কবি, যে সময়ে, যে প্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন তিনি যে কেবল সেই সময়ের সেই প্রদেশের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি—লিপিবদ্ধ করেন, তাহা নহে; কবি যে সময়ের লোক—তাহার স্মরণাতীত কালের সামাজিক—আচার, ব্যবহার রীতি-নীতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভবভূতি বা শ্রীকণ্ঠ—যে সময়ের দোহদ-প্রথা তদীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহার পূর্ব্বে যে ঐ প্রথা ছিলনা, এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

এখন দেখা যাউক, দোহদ শব্দের অর্থ কি? অমর কোষের গ্রন্থকার তদীয় কোষে—'দোহদং ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা স্পৃহেহা' অর্থাৎ গর্ভ সময়ের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহার নাম দোহদ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং গর্ভিনীর গর্ভসময়ের যে কোনও ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহার চরিতার্থের নামই-গর্ভদোহদ। দোহদের আর একনাম 'সাধভক্ষণ।' প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণই মঙ্গল নিহিত ঐ দোহদপ্রথার প্রবর্ত্তক। এই দোহদ প্রথার মূলে মানবের মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐ দোহদও দশকর্ম্মের এককর্ম্ম বলিয়া ক্রিয়া কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর দোহদ সম্পাদিত না হইলে, গর্ভস্থ সন্তান অপূর্ণ কিংবা অঙ্গ বৈকল্য প্রাপ্ত হইতে পারে, তাই মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়া গর্ভ-দোহদ প্রথা সমাজে প্রচলন করিয়াছেন। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ গর্ভ-দোহদের ক্রমানুসঙ্গিক আরও কতকগুলি বিধি নিষেধ করিয়াছেন গর্ভিনীর গর্ভ-দোহদ সম্পাদিত হইলে পর:—

১। কু-দৃশ্য দেখিবেনা।

২। কু-কথা শ্রবণ করিবে না।

৩। অপবিত্র ভাবকে হৃদয়-দুর্গের দ্বারদেশেও আসিতে দিবেনা।

৪। দিবানিদ্রা যাইবেনা।

৫। চেঁচাইয়া কথা বলিবে না।

৬। দ্রুত চলিবেনা।

৭। সর্ব্বদা একস্থানে নির্জ্জনে ব'সিয়া থাকিবেনা।

৮। বানর, কিংবা কানা খোঁড়া দেখিবেনা।

৯। ভয়াবহ দৃশ্য দেখিবে না।

১০। শকট-শিবিকায় কিংবা পদব্রজে স্থানান্তরে গমন করিবে না।

এই গুলি সম্বন্ধে নিষেধ করারও বিশেষ কারণ আছে। একটু অভিনিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

১। কু-দৃশ্য দেখিলে সন্তান কু-ভাবাপন্ন হয়।

২। কু-কথা শ্রবণ করিলে সন্তানও তদ্‌ভাবাপন্ন হয়।

৩। কোনও অপবিত্র ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে গর্ভস্থ সন্তানের হৃদয়ও অপবিত্র ভাবেই গঠিত হয়।

৪। গর্ভিনীর দিবা নিদ্রায় সন্তান অত্যন্ত নিদ্রালু হয়।

৫। গর্ভিনী চেঁচাইয়া কথা বলিলে সন্তানও কর্কশ ভাষী হয়।

৬। গর্ভিনী দ্রুতপদে গমন করিলে হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তান অকালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা।

৭। গর্ভিনী সর্ব্বদা একস্থানে বসিয়া থাকিলে গর্ভিনীর আলস্য—অবসাদের সঞ্চার হইয়া থাকে ও প্রসবকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে হয়, এবং সন্তানও অত্যন্ত আলস্য পরায়ণ হইয়া থাকে।

৮। কাণা, খোঁড়া দেখিলে গর্ভস্থ সন্তানও কাণা খোঁড়া হইবার আশঙ্কা থাকে।

৯। দয়াবহ দৃশ্য দেখিলে সন্তান অত্যন্ত দয়ালু হয়।

১০। শকট শিবিকার অস্বাভাবিক্ অঙ্গ সঞ্চালনে গর্ভস্থ সন্তান অপূর্ণ সময়েই ভূমিষ্ঠ হইতে পারে।

এইগুলি সম্বন্ধে নিষেধ করার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। গর্ভাবস্থায় জননীর মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারা সন্তানের মনোবৃত্তি সমূহ গঠিত হয়; সুতরাং দোহদের পর গর্ভিনীর এইগুলি অবশ্য পালনীয়।

আমরা গর্ভ দোহদ সম্বন্ধে ভবভূতি বা শ্রীকণ্ঠ কথিত আরও ২।৪টী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রাম, রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার সময়, অযোধ্যাগত রাজর্ষি জনক উৎসবান্তে মিথিলায় গমন করিলে পর, পিতৃ-বিরহ ক্লিষ্টা সীতার চিত্তবিনোদনার্থ যেরূপ, 'আলেখ্যে দর্শন' নাটকীয় অঙ্কে সংযুক্ত করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সংসাধন করিয়াছেন, অপর পক্ষে সমাজ তত্ত্বজ্ঞ ভাবুক কবি ভবভূতি গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও তাৎকালীক সামাজিকতা প্রদর্শন করাইয়াছেন। কবি ভবভূতি যখন চিত্র-পট উন্মুক্ত করিয়া লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক দেখাইতে লাগিলেন—"আর্য্যে! দৃশ্যতাং দ্রষ্টব্য মেতৎ—অয়ঞ্চ ভগবান্ ভার্গবঃ।" অর্থাৎ ইহা দেখিবার বিষয় বটে, আর্য্যে, ঐ দেখুন, ভগবান্ ভার্গব—পরশুরাম। লক্ষ্মণ এই কথা বলিতেই তাঁহাকে বাধা দিয়া রাম বলিলেন—"বৎস, বহু দেখিবার বিষয় আছে—অন্যান্য চিত্র প্রদর্শন করাও।" এস্থানে কবির এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। সেই ত্রিসপ্তবার ক্ষত্রান্তক পরশুরামের চিত্র দর্শন করিলে বাস্তবিকই একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গর্ভিনীর হৃদয়ে স্বাভাবিকই ভয়ের সঞ্চার একটু বেশী হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলে গর্ভস্থ সন্তান অত্যন্ত ভীরুতা প্রাপ্ত হয় তাই কবি সে দৃশ্য দেখাইতে রামের মুখ দিয়া নিষেধ করিয়াছেন—এইরূপ বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে—দোহদ বা সাধ ভক্ষণ যদিও বেদ বিধির ন্যায় পালিত হইয়া আসিতেছে—বাস্তবিক পক্ষে উহা গর্ভস্থ সন্তানের ও গর্ভিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই শারীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পরে যখন উপর্য্যুক্ত নিয়মগুলি পালনের মঙ্গলপ্রসূ ফল লাভ হইতে লাগিল তখন তৎকালের গ্রন্থকারগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধা রমণীগণও বলিয়া থাকেন—'দোহদ বা সাধ ভক্ষণ না করাইলে, গর্ভস্থ সন্তান পরিপুষ্ট বা সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয় না।' এইকথা যে ধ্রুব সত্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—'গর্ভাবস্থায়, গর্ভিনীর যে কোনও ইচ্ছার নামই দোহদ বা সাধ।' উত্তর চরিতে দেখিতে পাই জানকীর তপোবন দেখিবার ও ভাগীরথীতে অবগাহন করিবার সাধ হইয়াছিল।

রামচন্দ্র সীতার সেই গর্ভ দোহদ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকালের গর্ভ দোহদের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের গর্ভ দোহদ বা সাধ ভক্ষণের বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। অধুনা স্ত্রী আচার মতে নূতন বস্ত্র মিষ্টান্ন ও নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্য দ্রব্যাদি দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেকালের ন্যায় এখন আর তেমন সমারোহ দেখা যায় না। এই গর্ভ দোহদ সম্বন্ধে 'মালবিকাগ্নি মেত্রের' গ্রন্থকারও বিলক্ষণ বাগ্‌ বিন্যাস করিয়াছেন। গর্ভ দোহদ কেবল মনুষ্যাদিরই হয়— তাহা নহে; বৃক্ষাদিরও গর্ভ দোহদ হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির গর্ভ দোহদ সম্পাদিত হইলে ফল অত্যন্ত পরিপুষ্টি লাভ করে। বৃক্ষাদির গর্ভ দোহদ পরীক্ষা করিলেই আমর কথার যাথার্থ্য সংরক্ষিত হইতে পারে। বৃক্ষের গর্ভ দোহদ তৃণাদি দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। যখন কাঁঠাল গাছের কাঁঠাল (মুচি) হইতে আরম্ভ হয়— তখন যদি তৃণাদি দ্বারা ঐ বৃক্ষমূল উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই ঐ বৃক্ষের ফল খুব পুষ্ট হইবে। গর্ভ দোহদ সম্পন্ন করাই ইহার অন্যতম কারণ। গর্ভ দোহদ যে পূর্ব্বে কোন মাসে সম্পন্ন হইত তাহা সঠিক বলা যায় না। পূর্ব্বে বোধ হয় পঞ্চম মাসই উহার প্রশস্ত কাল ছিল। রামচন্দ্র যখন সীতার গর্ভ দোহদ সম্পন্ন করিয়াছিলেন—তখন জানকী পাঁচ মাসের গর্ভধারণ করিতেন। এক্ষণেও অধিকাংশ স্থলেই পঞ্চম বষ্ঠ মাসে এবং গর্ভাষ্টমেও গর্ভ দোহদ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৺রঙ্গনাগর গায়ক।

রঙ্গনাগর ময়মনসিংহ জেলার একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অবসানকালে টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তঃপাতী বাল্লা গ্রামে শাকদ্বীপির ব্রাহ্মণ-কুলে রঙ্গনাগর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে ধুলা খেলা ছাড়িয়া চিত্তোন্মাদক ও শ্রান্তিহর সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলনে মনোযোগ প্রদান করেন। তখন গ্রামবাসি বহুলোক তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া পরম আনন্দিত হইতেন। এমন কি ক্ষেত্রস্থ কৃষককুল ও পথিকগণ তাঁহার গান শুনিয়া তাঁহার সন্নিকটে গমন করতঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন প্রাণে শ্রান্তি অনুভব করিত। শ্রোতাগণ গমনকালে বালক গায়ককে ধন্যবাদ দিয়া যাইত। তখন পল্লীতে স্কুল পাঠশালা ছিল না। তিনি ৺ ৭ ক, খ, বার ফলা, প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া পিতৃসন্নিধানে সংস্কৃত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি অল্পদিন মধ্যে অভিনিবেশ, অধ্যবসায় প্রভৃতি ছাত্রোচিত গুণে সন্ধি, কারক, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত, ধাতুপ্রত্যয়, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতিতে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। সঙ্গীত ও বিদ্যালোচনা তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল।

কথিত আছে, একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন, ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে বলেন, "রঙ্গনাগর, তুমি রামমঙ্গল গাহিলে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবে।" তদনুসারে তিনি সংস্কৃত টোল ত্যাগ করিয়া সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর জেলার বহুলোক তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া তন্ময় হইতেন। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, ধনী কি নির্ধন, পুরুষ কি স্ত্রী, শিশু কি বৃদ্ধ তাঁহার গান শ্রবণপূর্ব্বক তন্ময় হইয়া সহস্র কণ্ঠে প্রশংসা করিত। তিনি সঙ্গীত প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত ও সরল বাঙ্গালায় নিত্য নূতন গান গাহিতে চিরভ্যস্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে (ব্রাহ্মণ কাণ্ডে) তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রবাদ— একদা তিনি মানড়া (টাঙ্গাইল মহকুমায়) পণ্ডিত মণ্ডলীতে প্রায় মাসাধিক কাল সংস্কৃত ভাষায় রামমঙ্গলের নূতন পালা গাহিয়া প্রভূত সুখ্যাতি লাভ করেন। এরূপ সুখ্যাতি লাভ তাঁহার প্রায়শঃ হইত। অদ্যাপি অনেক গায়ক তাঁহার রচিত গান গাহিয়া সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন।

৺ রঙ্গনাগর গায়কের কীর্ত্তির জন্য লোকে বাল্লা গ্রামকে 'কীর্ত্তনীয়া বাল্লা' বলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন

তত্রস্থ ঘোষ মজুমদার বংশীয় ভূম্যাধিকারিগণের খ্যাতি অনুসারে 'মজুমদার বাঙ্গল্যাও' বলিয়া থাকে। আজ-কাল তদীয় বংশের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাইমোহন আচার্য্য তাঁহার বাস্তভিটায় থাকিয়া তদীয় বংশের লুপ্ততা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৺রঙ্গনাগর গায়কের দলে মৃত স্বরূপ চন্দ্র শীল, ৺গৌরচন্দ্র আচার্য্য, মৃত জয়মঙ্গল কৈবর্ত্তদাস, মৃত কানাই লাল মালী, মৃত রঘুনাথ শীল, ৺ নিত্যানন্দ আচার্য্য প্রভৃতি গায়ক ছিলেন।

৺রঙ্গনাগর গায়ক অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহলীলা ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ময়মনসিংহ একজন গুণবান ও ক্ষমতা সম্পন্ন লোক হারাইয়াছেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী গান নিম্নে দেওয়া গেল।

গান।

(১) রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার পর বিভীষণের উক্তি।

ওহে দশানন, অবিলম্বে লঙ্কাতে রাম আসিবে।
বল প্রকাশিবার তরে, রাম তোমা সবংশে বিনাশিবে।
(তখন) শোণিতে লঙ্কা ভাসিবে, আসিবে শকুনী শিবে,
তোর দশ মুণ্ডে বসিবে, তখন সীতা হাসিবে।

(২) হনুমান সীতার অন্বেষণে যাইয়া সীতার নিকট উক্তি করেন,

আমি দেখেছি মা সীতে, সীতা-নাথকে আসিতে,
(তাঁহার) চক্ষের বারি মুখে বলে হা সীতে, হা সীতে;
সদায় উঠিতে বসিতে সীতে, কেন্দে বলেন, কোথায় সীতে?
নীল কমল যায় দুঃখার্ণবে ভাসিতে ভাসিতে।
(তাঁহার) নিদ্রা নাই দিবা নিশিতে, বসন অঙ্গে নাই, সীতে,
আমি দেখিতে পারি নাই প্রভুর শ্রীমুখ হাসিতে।

(৩) রাবন বধের পূর্ব্বে গৌরী যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন,

ও চেয়ে দেখরে লক্ষ্মণ ভাই, আজ রণে গণেশজননী এসেছে।
ভেবেছিলাম রাবণ মারি, দুঃখ সব পরিহরি,
বিভীষণকে রাজা করি হবে মনে কি ভয় আছে।
মম প্রতি ক্রোধ দৃষ্টে, ভগবতী এক দৃষ্টে
অতি রুষ্টে সিংহ পৃষ্ঠে দেখ রয়েছে।
আর নহে গেল বুঝা, রণ জয় গেল বুঝা,
দশাননে দশভুজা আপনি সদয় হয়েছে।
দেশেতে মরিল পিতা, অরণ্যে হারালেম সীতা
শোকেতে কৌশল্যা মাতা মৈল কি আছে।
জানকীর কারণে রণ, করিলাম অকারণ
সীতার সঙ্গে দরশন বুঝি আমায় যে হয়েছে।

(৪) যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ রামচন্দ্রের ব্রহ্ম অস্ত্রে আহত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে বলেন,

প্রাণত অন্ত হল আজ আমার ও রাম কমল আঁখি।
(এবার) নিদান কালে বন্ধ হ'লে কাল বেটাকে দিতাম ফাঁকি
ঐহিকের ঐশ্বর্য্য সুখ, আর কিছু রাম নাই হে বাকী।
ইন্দ্রবেটা হার যোগাইত, অশ্বশালে কালকে রাখি।
(আজ) কাল পেয়ে কাল বেটায় ধরে, সেই ভয়ে রাম তোমায় ডাকি
আমি হারি নাই, আমি হারি নাই, আমি হারি নাই।
আমি হারিতাম, যদি তোমায় মারিতাম, আমি রণে হারিলাম
ভবে তরিলাম, এখন হারির বলি হারি যাই।

(৫) ভজন বিষয়ক সঙ্গীত।

হরি, মোরে রেখেছে শীতল চরণে
দুর্ম্মতি তপস্যা হীন,
কুতং পাপী অহং দীন,
হেলায় খোয়াইলাম দিন,
গেল দিন অকারণে।
শোন জগৎ গোসাই,
আমি আর জনম নাহি চাই,
যমকে জিনিয়া যাই,
মরি যেন রাম নাম নিয়ে বদনে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ব্যথা—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী—প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। ইহা একখানি গল্প পুস্তক। নূতন লেখকের লেখা হইলেও ইহার গল্পগুলি মানুষের ব্যথায়ই পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের সাধনা সিদ্ধ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উপেক্ষিতা—শ্রীমধুসূদন দে প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। ইহা একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। একটী স্কুলের ছেলে অবৈধপ্রেমে পতিত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কিরূপ অশান্তি আনয়ন করিয়াছিল তাহার বিবৃতিই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভাল হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার লেখনিমুখে তাহা সম্যক্ ফুটিয়া উঠে নাই। ভাষা চলনসই হইলেও আর্টের হিসাবে দরিদ্র।

ছবি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব প্রণীত। মূল্য ৷৹০ আনা।

এই গ্রন্থখানিও কতগুলি গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থকার কল্পনা-রথেই কেবল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। মর্ত্ত্য-মানবের সাংসারিক অভিজ্ঞতা যাহাতে লাভ হইতে পারে লেখক তেমন কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। গ্রন্থের ভাষা পরিমার্জ্জিত। দুই একটী গল্প সুন্দর হইয়াছে।

অ—।

সূচী।

Printed by Satish Chandra Roy At the Jagat Art Press, Dacca.
And
Published by Kedar Nath Mazumdar Research house Mymensingh

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস

সভাপতি—সাহিত্য-শাখা।

শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সভাপতি—সাহিত্য-সম্মিলন।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

সভাপতি—ইতিহাস-শাখা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সভাপতি—দর্শন-শাখা।

[illegible] প্রেস, ঢাকা।
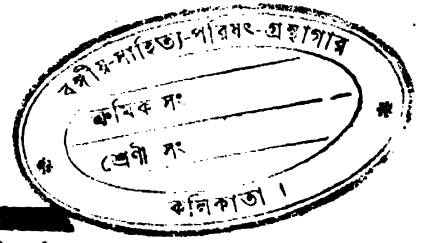
পঞ্চম বর্ষ | ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৩। | চতুর্থ সংখ্যা।

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

(বাঁকিপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ)

"সাজাইতে মাতৃভাষা, সদা যা'র মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর, মুছাতে নয়ননীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ মর-ধরণী' পরে অমর সমান॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া, মাতৃ-ভাষার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, নানা-রোগ-জর্জ্জর বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তানবৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন আপন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট হন, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে, মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতি-যোগিতা-সঙ্কুল, সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জন-গণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী-হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সেবিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন-পর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে আরব্ধ করিতে হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে অনেকে বলেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালা-ভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি?"—ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশশত বৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায় উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা

সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালীজাতির যদি জগতে কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্ব-প্রযত্নে বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বৎসরের একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিক বারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব, একা আমি নহি, আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে পারিলে, নিজেকে ধন্য,—কৃতার্থম্মন্য মনে করিবে, এমন ভাবে আমার মাকে গড়িয়া তুলিব, প্রাচ্য প্রতীচ্য নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রসৃত হইবে, এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তবে, আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যাহাতে বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের প্রীতি প্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

বাঁকিপুর দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ সেই মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যেস্থানে একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বৌদ্ধ-সঙ্গীতির আহ্বানপূর্ব্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—যে পাটলীপুত্রের পুরাচিহ্ন সমূহের সামান্য একটু অংশ-প্রাপ্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ সতত উদ্‌গ্রীব, ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতিপত্রে যে প্রাচীন নগরের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে,—সেই পাটলীপুত্রে আজ বঙ্গের সারস্বতসেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্লাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই দিন,—বঙ্গবাসীর তথা বঙ্গের ভবিষ্যজ্জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় বস্তু। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং বিহারের মানচিত্র পৃথগ্‌ভূত হইলেও অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই উভয় প্রদেশই যে একসূত্রে গ্রথিত, অদ্যকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এই জাতীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মনস্বী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির পরিচয় নূতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিত্যরথিগণের স্পৃহণীয় আসনে আপনারা আমাকে বসাইয়া সেই মহার্হ আসনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইরূপ কার্য্যে, বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে, আমি সভাপতিরূপে কার্য্য করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি, ইহা আমি যতটা জানি এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থ-ভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মাদের কোন কাজে, কোন উপকারে, আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে, চরিতার্থ হই। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে সে সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্য-সাধকগণের সেবা করিতে যাহার অভিলাষ, তাহাকে সাহিত্য-সাধন যজ্ঞের ঋত্বিক্‌রূপে মনোনীত করায় উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে, এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন।

প্রথমে যৌবনে, যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোন মতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে

মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন, আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্যদেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন্ না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয়, যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। একদিকে, দেশের যাহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল; যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থি যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষারও আলোচনা করিতেছেন, আর দু'দিন পরে, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে, তর্জ্জনীহেলনে দেশের লোক-মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে; শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদল বাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে; আর ঐ দেখ, অন্যদিকে, যাহাঁরা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় অগ্রনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্র ক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে আমি জাতীয়-সাহিত্য-গঠন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, "দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্যভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজ-দেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্ব সাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে।" সুতরাং জাতীয় সাহিত্যগঠন সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিতে হইবে। তবেইত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্থ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আরত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়, আবিষ্কার এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয় সমূহ, এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলেই যাহাতে বঙ্গভাষাও অপরাপর ভাষার ন্যায় শিখিতে হয়, না শিখিলে, অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় চির কালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, সুতরাং অন্য শত ভাষার শিক্ষাতেও পূরা মানুষ হওয়া যায় না, যদি এমনই ভাবে

বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট্ সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই, ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক, আমার জননী বঙ্গভাষাকে, অনন্তকালরূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে। বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাক্। একদেশের ভাষা অন্য দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটী, একটি রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য।

রাজার জাতির ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতালাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতরাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, ইংরেজরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজীভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে। যেমন ইংরাজভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এমন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাসিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার বিজয়বৈজয়ন্তী, সংস্কৃতভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীক-ভাষা কোন্ দেশে অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান্? ফরাসী ভাষার যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া কোন আজীবনছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে, সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না। মনে করুন, গণিত এবং রসায়ন শাস্ত্র, রাসিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুলি অবশ্যদ্রষ্টব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়ন শাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে চান, ঐ ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে চান, তবে তাঁহাকে রুসীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন, জগতের গৌরবভাজন মহাকবি সেক্ষপীয়রের অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাসিয়ান্ এবং ইংরাজী ভাষার প্রতি এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, তত্ তত্ ভাষায় ঐ সমুদয় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন বিষয়ে রাসিয়ান্ ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্ষপীয়ার, মিলটন, বাইরণ প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনালোকে, বা নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজি ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুষিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশ সমূহেও এই এই ভাষার কি এত গৌরব কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় সংস্কৃত ভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন, পশ্চিমের প্রত্যেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন না কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিবেন।

কবে, কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি, তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখ, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কান পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া, সকল দেশের জ্ঞান-পিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস, শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষ উদ্‌ভ্রান্ত,—একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী-ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই; ঐ দেখুন, ইউ-রোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসাস্বাদের আশায়, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এদেশীয় শকুন্তলনাটকের বিদেশীয় কৃত অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্মহারা হইয়াছিলেন। জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিষ্টটল প্রভৃতির মনীষাসাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক গ্রীক্ ভাষা এই মরধামে অমরতালাভ করিয়াছে। রাজ-নৈতিক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিৎ-কর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের আধিপত্যে ঐ ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনের চন্দ্র সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণবের বেলাভূমিতে ঐ যে সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তারত্নবিমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক, স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, জগতের ঐহিক-বাদিগণের পরস্পর বাদ বিসংবাদ দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে,—ঐ সকল মনীষামন্দিরের কোন দিন বিলোপ ঘটিবে না। নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও, সেই প্রাচীনকাল হইতে বেদাদি রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত ভারতী একইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা প্রভৃতি উপনিবদ্ধ না হইত, যদি কালিদাস ভবভূতি ভাস প্রভৃতি অমর কবিকুলের সযত্নগ্রথিত মণিময়হারে সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত না হইত তবে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃত ভাষা এমনই অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীটরূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল, সম্পদ্। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত-বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্নসহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি, তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তর কালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গ-ভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপি-বদ্ধ করিয়া যান, —এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাবীণ্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না সত্য, কিন্তু রাসিয়ান্ গ্রীক, লাটিন্ সংস্কৃত ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গ-ভাষাও পৃথিবীর যাবৎ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে।

অবশ্য এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনে বা দুদশবৎসরে সম্ভব নহে বা আরম্ভ মাত্রেই ফল-লাভের আশা নাই, কিন্তু যদি যথার্থ দেশহিতৈষণায়

অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্ত-সাধারণ কমনীয়, নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্য—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয় স্ব স্ব উপার্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যসম্ভার, নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য, ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর বিজয়প্রশস্তি ঘোষণা করিবে। এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তীর্থজলে অভিষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন। বিনা অভিষেকে বা বিনা সংযমে যজ্ঞবেদিতে উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্যমায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেক পূর্ব্বক, কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশী ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম যাহা কিছু সৎ, উদার অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। ঊষার অরুণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার মাতৃভাষার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে, ভাস্বর হইবে। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই, বাঙ্গালার মাটী বড়ই উর্ব্বর। বঙ্গদেশ বড়ই সুজন্মা। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, কচিৎ নদীমাতৃক, আপনা হইতেই বিধাতার কৃপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব হয়। চিরকাল হইয়া আসিতেছেও। কোথাও বা সামান্য সেচনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুফল লাভ সর্ব্বত্রই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রাম প্রসাদ, কৃষ্ণনগরের ভারতচন্দ্র, খানাকুলের রামমোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়াশ্যামল পল্লী বাটেরসুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীলদর্পণের দীনবন্ধু, কপোতাক্ষীর মধুসূদন এই বঙ্গেরই অলঙ্কার। বিদ্যাসাগর হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্র নাথ বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন যে বঙ্গভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও যেদেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেনা। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসেনা। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। মেকলের উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসের বঙ্গে, রামবসু নিধুবাবুর বঙ্গে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না। প্রাণের অভাব হইবে না। উপাদানের অভাব নাই, কেবল উদ্যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এইত, সামান্য উদ্যোগেই ভীরু বাঙ্গালী বীর বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে

চলিয়াছে। যাহাদের ঢক্কায় বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনুরণিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আছে সব, মালমসলা কিছুরই অভাব নাই, এখন কেবল জন কয়েক সুশিক্ষিত, কল্পনাকুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সঙ্কল্পিত বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গভাষা অধিকার করিয়া বসিবে। অনতিবিস্তৃত বঙ্গসাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

এই অসাধ্য সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ সংযমের প্রয়োজন, কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি, আমার ধারণার অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য, কঠোর বলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষের স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া, প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার করা হইবে, তাই, আপাততঃ ঈষদ্ অপ্রিয় হইলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে, যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধি ভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে, কিন্তু মতভেদ হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে ; আত্মীয়তাভেদ হইবে, ইহাত আমি বুঝি না। বঙ্গভাষা এখনও বঙ্গের বাহিরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দ্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধ্বনি সম্যক্‌ভাবে পৌঁছায় নাই। যে ভাবে, যেরূপে আমি বঙ্গভাষাকে গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর, এরূপ অপরিপক্ক বয়সে, তাহাতে অন্তঃকলহের কীট প্রবেশ করিতে দিলে, অচিরাৎ সমস্ত উদ্যম উদ্‌যোগ পণ্ড, ভস্মসাৎ হইবে। হিমাদ্রির চির তুষারস্নিগ্ধ অভ্রভেদী কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাহারা পৌঁছিতে চাহে, উপত্যকার কঙ্করময় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্লান্তি জন্মিলে চলিবে কেন? মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, একটা মহাত্যাগ চাই। বিনা ত্যাগে লাভ হইতে পারে না। আমার ভাবিতেও দুঃখ হয়, যে এই সবে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সানুরাগ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র আর ইহারই মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি আমি সানুনয়ে বলি, সনির্ব্বন্ধে বলি, আমরা সকলেই এক মার সন্তান, বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী, মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহুকোটী বঙ্গবাসী বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে তবে ঐ সংকল্পিত সৌধের মাত্র ভিত্তি প্রোথিত হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন। মায়ের মন্দির-গঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃমন্দিরের দ্রব্যসংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব নিকাশ করিব না, এখন হিসাব নিকাশের সময়ও নহে, করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব, কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে কাহাকে মনঃপীড়া দেওয়া বা সাময়িক মোহের কুহকে অন্ধ হইয়া আত্মাভিমানের চরিতার্থতা বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। কোনপ্রকার অসংযমের আধিক্য হইলেই, এই সঙ্কল্পিত স্বর্ণসৌধের আশা সমূলে ধ্বংস হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষিবৃন্দ, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সৌধের স্থপতিবৃন্দ,—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিরোধ বিস্মৃত হইয়া, একই লক্ষ্যে চিত্তস্থির করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন,

সমস্ত ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মলিন স্বার্থের পুটুলিগুলি দূরে এককোণে সরাইয়া রাখিয়া, একমনে একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মৎস্য চক্র ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতিক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিবেন। ধনি নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন "বান" আসে, তখন অনেক আবর্জ্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে, সত্য, কিন্তু সেই আবর্জ্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া জমিয়া ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জ্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে, সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম সৎ, যাহা নির্ম্মল নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, তদিতর কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই। দেশের সর্ব্বত্র, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পরিয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল উপকথা রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাতা বা মাতৃস্বসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল, গল্প, সেই "সাতভাই চম্পা",—সেই "পক্ষিরাজ ঘোটক", সেই 'শিবঠাকুরের বিয়ে', প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়ন রঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। বটতলায় যে কৃত্তিবাস কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্তার উপলব্ধি না করে ততদিন প্রকৃতমানুষই হইতে পারেনা। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জ্জন এবং কতটুকুইবা বর্জ্জন করিতে হইবে, এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারিনা। বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গ সন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য নির্ম্মাণে স্পৃহা। সেইস্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতির হৃদয়ে দেখা দিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া, হাল ধরিয়া বসিতে হইবে। যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সেপক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত, করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে যে সময়ে এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত, তখন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতামত লইয়া আত্মবিচ্ছেদ শোভা পায়? যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে অঙ্কুরটির মস্তক ভগ্ন করিয়া লাভ কি? আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্তি জন্মে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই, এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া যাহাতে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তত্‌পক্ষে চেষ্টাপর হইতে হইবে। এই সময়েই ভুলিলে চলিবে না, যে যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন

আলেখ্যের পশ্চাদ্ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে, যেমন মূলচিত্র যতই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন মনোরম হয় না, তদ্রূপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান, স্ব স্ব জ্ঞান-গরিমায় যতই বিমণ্ডিত হন্ না কেন, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে, অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটি কোটি বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, উহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে যতদিন শিক্ষিতগণ টানিয়া আনিতে না পারিবেন, ততদিন, বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, স্বীকার করিতে পারিব না। শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ, এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যত দিন না করিতে পারিব, ততদিন, আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে, একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অগ্নিতে অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জ্জনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য— আত্মবিকাশ লাভ করা। হৃদয়ের মার্জ্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা। এই ভাবে যদি মানুষ একবার তৈরি হইয়া উঠে, ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদননির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না, অর্থ ত কোন্ ছার। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই, পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে,—ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে না পারি, যে, আমি কি চাই, কোন্ বস্তুটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। যদি এক বার আমার সেই অভিপ্রেত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই দিকে আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই, যে সে গতিরোধ করিতে পারে। বাঙ্গালাজাতির ইতর ভদ্র সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মদীয়জাতীর অভ্যুদয় গ্রথিত,বঙ্গদেশের অদৃষ্ট,বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ নিনাদিত না হইবে,ইতরভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারাব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে;—একমনে সকলে মধুর বাসন্তীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে একভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননীবঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী-মূর্ত্তির বিমলপ্রভায় বাঙ্গালী জন-সাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে।" বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখ, জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধশ্যামলকাননকুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্যনীল-নবীন নভশ্চন্দ্রাতপতলে শিশিরস্নাত দূর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুককোকিলের মধুর কাকলীতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গবাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা

কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্ব্বল? বেদ উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শগ্রন্থ, সীতা সাবিত্রী অরুন্ধতী লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী, রাম যুধিষ্ঠির শিবি দধীচি, ভীষ্ম অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক, ভরত লক্ষ্মণ ভীম অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা, তাহাদের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও, ঐ দেখ,—তোমাদের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্তশ্রমে, তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্রপুষ্প-পল্লবে, বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপাতী যত্নে রত্ন মণ্ডপের রত্নবেদিতে আমার রত্নহারবিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণ, সদ্ভাবচন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া তোমাদের সাহিত্যমণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। একবার সাতকোটী বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে "মা" বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌঁছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাময়িক স্তুতিনিন্দা, বাদ বিসংবাদ স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি এক-পদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত, যোগীর মত, ব্রত দীক্ষিতের মত, সংযতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদপূজায় প্রবৃত্ত হও, একবার মাতৃ-প্রেমে, জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া, সাতকোটি কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে "মা" বলিয়া ডাক দাও, বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার বল—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাইবে গান॥

দেখিবে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিতে মুখর করিয়া তোমাদের এই আবেগস্খলিত গীতি দিব্যধামে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে, প্রান্তরে কান্তারে বঙ্গভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে, বঙ্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লয়ে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, চিরনবীনা ধরণী রোমাঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাতিয়া বসাইতেছেন।

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। কল্পনার অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীমশক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশা এতদিনে অন্যপ্রকার হইত। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; এই প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের জন্য, যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই অসঙ্কোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর। সিদ্ধি হইবে। কালে অমর হইতে পারিবে। বাঙ্গালীজাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তিতে চমকিয়া উঠ, কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরণ্য কবি হেমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া জলদ-প্রতিম-স্বনে তোমার দেশবাসীকে শুনাইও—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।'

আর সেই সঙ্গে বলিও—হে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যমন্দিরের ভবিষ্যস্থপতিবৃন্দ,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে'
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে',
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ইতিহাস।

[সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ]

প্রাচীন লীলার ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাজিয়া উঠে "বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।" যে পবিত্র ক্ষেত্রে আজ আমাদের এই সম্মিলন ও উৎসব, ইহাই যে বঙ্গ-সভ্যতার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের জন্মভূমি, তাহাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। মিথিলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগের যে প্রদেশ মহাভারতের সভাপর্ব্বে (সভা ৩০অ, ৩) গোপালকক্ষ নাম পাইয়াছিল, বায়ু এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে প্রদেশ গোমন্ত বা গোবিন্দ জাতির আবাস বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল (মার্কণ্ডেয় ৫৭অ; ৪৪; বায়ু ৪৫অ, ১২৩), সেই প্রদেশের এক সময়ের গৌড়নাম আমাদের সমগ্র বঙ্গভূমির অতি আদরের ও গৌরবের নাম। মৎস্যপুরাণকার বলেন (১২অ, ৩০) যে রাজা শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; গৌড়বহো কাব্যে পাই যে কবির সময়ের মগধের অধিপতি ঐ গৌড়দেশ এবং মগধের অধীশ্বর ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল (৪১৩, ৪১৭, ৪১৮ ও ৪১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এলুবেরুনি দেখিয়া গিয়াছিলেন যে কুরুরাজ্যের থানেশ্বর পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে অলঙ্কৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমদিকে সে গৌড়দেশের প্রসারের কথা দূরে থাকুক, কুশনদীর কচ্ছ-প্রদেশেও প্রাচীন গৌড় নাম প্রচলিত নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সহজলভ্য গ্রন্থ পড়িয়া হয়ত বিদ্যালয়ের বালকেরাও শিখিয়াছেন যে যাঁহারা পাল রাজা নামে খ্যাত তাঁহারা মুখ্য ভাবে এই মগধাদিদেশেই বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য বিভাগ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া শাসন করিতেছিলেন। বাক্‌পতির সময়ের মত তখনও এই রাজাদের গৌরবের উপাধি ছিল গৌড়-মগধেশ্বর। নারায়ণ-পালের উত্তরাধিকারীরা যখন আদি গৌড় ও মগধ হারাইয়া বঙ্গের একটি উপবিভাগে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন যে মিথিলা-মগধের জনস্রোত ও সভ্যতাস্রোত বিশেষভাবে বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতেছিল, এবং সমগ্র বিহার প্রদেশ, রাষ্ট্রকূট, গুজর প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মধ্য ভারতীয় জাতির বিশেষত্বে চিহ্নিত হইতেছিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। বলীর বংশের অর্থাৎ দ্রবিড় জাতীয় পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামে পরিচিত লোকেরা যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মগধের ভাষা, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তাহা অতি সুস্পষ্ট। মহীপাল যখন বরিন্দ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন লাভ করিয়াছিলেন, তখন মহানন্দার পশ্চিমপারে পূর্ব্বপুরুষদের আদি ভূমিতে ক্ষমতা প্রসার করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু যাহা ভাঙ্গিয়াছিল তাহা গড়ে নাই। পাশ্চাত্য ও মধ্যদেশের প্রভুতায় বিহার পরিবর্ত্তিত হইল; দেশের লোক মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিল, ভিন্ন অক্ষর লিখিয়া ভিন্ন ভাষা শিখিল, ভোজনের সামগ্রীতেও পরিবর্ত্তন ঘটাইল। আর সমগ্র বাঙ্গলায় মগধের সভ্যতা ও গৌড়ী রীতি সুরক্ষিত হইয়া নূতন বিকাশ লাভ করিল। বিকাশের ধারাবাহিকতা বিচার করিলে আমরাই আজ বঙ্গদেশে প্রাচীন মগধের সভ্যতার বড়ভাগের উত্তরাধিকারী এবং আজ এই বিহার-প্রবাসে প্রাচীন বিহারের পরিস্ফুট প্রতিনিধি। তাই পরিবর্ত্তিত বিহারের লোকেরা আজ আমাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না, এবং আমরাও এই প্রাচীন লীলা ভূমিতে দেশবাসীর সাড়া না পাইয়া প্রাচীন-স্মৃতি বহন করিয়া বলিতেছি—"বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।"

তবে এই উৎসবের নাটমন্দিরে যদি বিশ্বজনীয় নূতন সুর ভাঁজিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বাঁশরী আবার বাজিত; ভারতীয় পূজার মণ্ডপে পুরোহিতেরা যদি বিশ্বজনীন নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সকলেই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিত। কেবল যে এ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাস গাঁথা পড়িয়াছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের সেকাল একালের সকল প্রদেশের ও সকল জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাসের অচ্ছেদ্য মিলন আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতায় যদি বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলি, এবং ঐ দেশের মধ্যেই সকল প্রাচীনতা খুঁজিবার লোভে যদি কালিদাসকে নবদ্বীপে জন্ম লইতে বাধ্য

করি, আর্য্যভট্টের নাম হইতে ভাটপাড়ার উৎপত্তি মনে করি, সুন্দরবনকে বেদের আরণ্যকভাগের জনিত্র বলি, এবং সর্ব্বশেষে বহরমপুরকে ব্রহ্মপুর করিয়া সেখানকার মাটি হইতে স্বয়ং ব্রহ্মার আদি পদ্মাসনের 'ফসিল্' তুলি, তাহা হইলে আওরংজেবের আমলের পালিস্-করা পাথর কিংবা নেপালী মালমসলা আমাদের ইতিহাসের মন্দির গড়িবার সময় কাজে লাগিবে না, এবং আমাদের ক্ষুদ্র মন্দিরে কোন সার্ব্বভৌম পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আসিবেন না। "পাল" কথাটি যাঁহাদের নামে সমাসে যোড়া পাওয়া যায় বলিয়া যাঁহারা পাল নামে কীর্ত্তিত, তাঁহাদের প্রথম আমলের রাজাদের শরীর যদি খাঁটি বাঙ্গলার মাটির গড়ন না হয়, তাহা হইলে আমাদের ইতিহাসকে লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হয় না। পিতৃপুরুষদের ঐতিহাসিক তর্পণে যদি বংশপ্রবর্ত্তক চল্লিশজন ঋষির নামের সঙ্গে সঙ্গে বলীর দ্রবিড়-মেলের পুত্রদিগকে স্মরণ না করি তাহা হইলে কেবল ঐতিহাসিক সিদ্ধির গায়েই জল দেওয়া হইবে।

এখানে বড় বড় ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে আসি নাই,—ক্ষমতাও নাই। আমি ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের পুরোহিত নহি। কথাটা বিনয়ের অভিনয়ের জন্য বলি নাই; এখনও যে দেবীর মন্দির গড়া হয় নাই, সেখানকার কাজের জন্য কেহই এখনও পৌরোহিত্য পায় নাই। কেহ বা মাটি খুঁড়িতেছে, কেহ বা পাথর কুড়াইতেছে, কেহ বা দেশে দেশে বিবিধ জাতির লোকের কাছে উপযুক্ত মালমসলার অনুসন্ধান করিতেছে। যাঁহারা গাড়ি গাড়ি মাল ঢোলাই করিতেছেন তাঁহাদের গাড়িতে কখন কখনও দুই এক টুকরা উপকরণ তুলিয়া দিয়াছি বলিয়াই আজ এই বৃহৎ উৎসবের দিনে আমার প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে; সেজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আজ এই সুবিধায় যাঁহারা ইতিহাসের উপাদানের ভার বহিতেছেন, এবং যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইতে চাহিতেছেন, বিশেষ ভাবে তাঁহাদের উদ্দেশে দুই চারিটি কথা বলিব। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা হইতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পর্য্যন্ত আমাদের সকল মালগুদামে যে সকল উপকরণ রক্ষিত হইতেছে, তাহা বাছাই করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ কারিগরেরা মন্দির গড়িবেন এবং খ্যাতি লাভ করিবেন; মন্দিরের ভবিষ্যৎ-পুরোহিতেরা বিলক্ষণ দক্ষিণা পাইয়া সুখী হইবেন। সেই যশঃ এবং দক্ষিণা এখন লাভ করিবার জন্য যদি কোন ভারবাহক উৎকণ্ঠিত বা উৎসুক হয়েন, তবে তিনি আপনার কর্ত্তব্য করিতে পারিবেন না। সংগৃহীত পাথরের দুচারিখানি সাজাইয়া যদি কেহ ঘর গড়িয়াছেন ভাবেন, তবে তিনি বড়ই ভুল করিবেন। যে সাহিত্য চিত্ত-বিনোদনের জন্য, তাহার পাকা মন্দিরে চণ্ডিদাসের দিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া আসিতেছে, অনেক সুস্বাদু ভোগ নিবেদিত হইতেছে। সে ভোগের লোভে সে মন্দিরের দরজায় আমরা সকলেই হুড়াহুড়ি করিয়া থাকি; এমনকি ইয়োরোপ আমেরিকার লোকেরাও হাত পাতিয়া ভোগ লইয়াছে, এবং আমাদের একালের কবি পুরোহিতকে অনেক দক্ষিণা দিয়াছে। ইতিহাস লইয়া এত গৌরব লাভের দিন এখনও আসে নাই; সেদিন বহুদূরে। এখন ইতিহাসের নামে দেখিতে পাই যে চারিদিকের চালাঘরে কেবলই ইট পাথরের পালা, এবং কোথাও বা প্রত্নতত্ত্বের ঢেঁকিতে, ব্যাকরণের মুষলে খানকতক ইট ভাঙ্গিয়া সুরকি করা হইতেছে। যাঁহারা খ্যাতি ও দক্ষিণা চাহেন, এই কচ্‌কচির ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান নাই। যাঁহারা একথা বুঝিয়া-সুঝিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারবাহক হইতে চাহেন, তাঁহারাই নিষ্কাম ব্রত লইয়া আসুন।

এখানে খ্যাতিও নাই দক্ষিণাও নাই, বরং উল্টা একটুখানি নিগ্রহ লাভের সম্ভাবনা আছে। সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না করিয়া, যে ঘটনা ঠিক যাহা, তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; উহাতে যদি চিরদিনের পোষা সংস্কারের গায়ে আঘাত লাগে, যদি আপনার দলের লোকেরা অন্যদলের লোকের কাছে উপহসিত হয়, যদি ইয়োরোপীয়দের চক্ষে ভারতের কোন রীতি বা অনুষ্ঠান অসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও অসঙ্কোচে সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। ইয়োরোপের বিজ্ঞান ও ইতিহাস-মন্দিরে বড় বড় পুরোহিতেরা

অসঙ্কোচে প্রচার করিতেছেন যে দৈবাৎ যদি তাঁহাদের দেশের লোকের শরীরে আর্য্য নামক কোন জাতির রক্ত থাকে তবে উহা ছিটেফোঁটার অধিক নহে; একটা নিগ্রোপ্রায় জাতির সহিত আল্লাইন জাতির সংস্রবে যে বেশীর ভাগ ইয়োরোপীয় জাতির উৎপত্তি, একথা সুস্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে। কেহ যদি সুপদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন যে সেকালের আর্য্যেরা এবং একালের আমরা খাঁটি কুলীন বংশেই জন্মিয়া আসিয়াছি, সে ত ভাল কথা। কিন্তু যদি একটু উল্টা কথা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি আমরা সত্যকাম জাবালের মত নির্ভীক হইতে পারিব না? কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে আমি ইতিহাসের ধান ভানিতে আসিয়া নৃতত্ত্বের শীবের গীতের দৃষ্টান্ত দিতেছি কেন? নৃতত্ত্ব না হইলে যে ইতিহাস হয় না তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আর্য্য এবং আর্য্যেতর জাতি লইয়াই ভারতবর্ষ এবং সংখ্যায় আর্য্যেতরেরাই অত্যন্ত অধিক। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের ভাষায়, ধর্ম্মে এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে যে আর্য্যেতর জাতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা আর্য্যেতর জাতির তথ্য না জানিলে কেহ ধরিতে পারিবেন না। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে ও মিশ্রণে কেমন করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে এই জাতির শরীর, মন, প্রবৃত্তি, ধর্ম্মবিশ্বাস, ভাষা ও সামাজিক অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, সেই ইতিহাসই দেশের যথার্থ ইতিহাস। যথার্থ ইতিহাস কি তাহা ভুলিয়া যাই বলিয়াই যখন কোন প্রাচীন সময়ের একখানি ক্ষুদ্র দানলিপিতে কোন একটি বিস্মৃত প্রদেশপ্রতী রাজার একখানি গ্রামদানের বিবরণ পড়ি, তখন উহা হইতে ইতিহাসের কোন উপাদান না পাইলেও অনির্দ্দিষ্ট একজন প্রাচীন রাজার বীরত্ব, বদান্যতা প্রভৃতির বর্ণনায় শতাধিক পৃষ্ঠা লিখিবার উদ্যোগ করিয়া থাকি। একজন রাজা নিষ্ঠুর হইতে পারে বা দয়ালু হইতে পারে, বা আর কিছু হইতে পারে; কিন্তু জাতি-সাধারণের অবস্থা বা চরিত্র বুঝিতে হইলে, দেশের লোকের ধাত বুঝিতে হইলে, তিন ছত্রের তাম্রফলকের লুপ্ত রাজার নাড়ি টিপিয়া কিছু বুঝিতে পারা যায় না। রাজাদের নামের তালিকা, ও দেশ জয়ের বিবরণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাহাতে লোক-সাধারণের কোন বিবরণের আভাস পাওয়া যায় না তাহা ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র উপাদান মাত্র। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে, হইবে এবং হওয়া উচিত। কিন্তু আর্য্যেতর জাতি সমূহের শরীর, ভাষা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সুমার্জ্জিত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মত পবিত্র, পূজ্য, এবং জ্ঞাতব্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া চাই। নৃতত্ত্বই যে ইতিহাসের গোড়া, বিভিন্ন অবস্থায় লোক-সাধারণের পরিবর্ত্তনের বিবরণই যে যথার্থ ইতিহাস, ইয়োরোপেও তাহা অল্পদিন পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দের যে প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহার বশবর্ত্তী হইয়াই উহারা বলিতেন, এবং এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে কখনও ইতিহাস লিখিত হয় নাই। নূতন ভাব লইয়া আমরা বলিতে পারি যে কোন দেশেই হয় নাই।

ইয়োরোপের অবস্থা ও প্রকৃতির ফলে সেখানে যাহা ছিল বা আছে, তাহা যদি আমাদের না থাকে, তবে যে অবস্থার ফলে তাহা আমাদের নাই, তাহা বুঝিয়া লইয়া ভারতের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস বুঝিবার পথ পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু লজ্জায় মাথা হেট করিয়া একটা গোঁজা মিল দিয়া ইয়োরোপীয়দের কাছে একটা কা[illegible] অবস্থা খাড়া করা চলে না। আন্তর্জাতিক বি[illegible] মিটিয়া গেলে যেখানে সকলেরই মিলিত বংশধরেরা এক ঐতিহ্য মাথায় বহিয়া চলে, সেখানে বিবাদের দিনের দলবিশেষের গৌরবের কথা লইয়া এক একটা বিশেষ বিশেষ জাতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রচিত হইতে পারে না। বিদেশ হইতে শক, যবন, হূনেরা আসিয়া যখন একেবারে আমাদের সমাজশরীরে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল, তখন বিশেষভাবে দ্বন্দ্বজনিত কোন এক পক্ষের গৌরবের কথা স্বতন্ত্র সাহিত্যে রক্ষিত হইয়া আদৃত হইতে পারে নাই। কোন প্রদেশেই এমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নাই যাহাতে জাতিতে জাতিতে ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পা[illegible]িয়াছিল কিংবা ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইতে পারিয়াছিল। অতি প্রাচীন গল্পে পড়ি যে নির্ব্বাসিত রাজপুত্র প্রচুর বল লাভ করিয়াও প্রাচীন রাজ্য-লাভের উপদেশ উপেক্ষা

করিয়াছেন, এবং বিপুলায়তন ভারতবর্ষের একটি স্থানের বা "অরণ্য ঠানে রজ্জম্ মাপেস্সামি" বলিয়া নূতন রাজ্য গড়িয়াছেন, তখন প্রাচীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। অনেক বুভুক্ষু জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিবার প্রচুর স্থান পাইয়াছিল এবং ভারতবাসী হইয়া গিয়াছিল। সেকালের সকলেই হিদেন ছিল বলিয়া পরস্পরের মিলনে বাধা হয় নাই। পরে যখন অন্য জাতির লোকেরা আসিলেন, এবং নূতন রকমের ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষত্বটুকু ষোল আনা বজায় রাখিবেন, তখনকার দ্বন্দ্বে ইয়োরোপীয় ধরণের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্ত দিব। যাঁহারা দ্রবিড় জাতীয়ের বঙ্গভূমিতে আর্য্য-সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের লোকদিগকে আর্য্য-আদর্শ লইবার জন্য কোন প্রকার পীড়ন করেন নাই; দেশের লোক নূতনত্বের সৌন্দর্য্যে অথবা গৌরবে মুগ্ধ হইয়াই নূতন লোকদিগের মিত্র প্রতিবেশী হইয়াছিল, এবং গুণ এবং ক্ষমতা দেখিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্যই নূতনকে শ্রেষ্ঠ পদবী দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রসারের সময়েও কোনও উৎপীড়ন ঘটে নাই। ব্রাহ্মণদের নামে যতই দুর্ণাম থাকুক, তাঁহারা যাচিয়া যাচিয়া উচ্চশ্রেণীর দ্রবিড় জাতীয়-দিগকে ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য পুরোহিত দিয়াছিলেন, এবং শূদ্রবর্গের প্রসার বাড়াইয়া দিয়া শূদ্রের নবশাখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েরাও যাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া স্পর্শ করিত না, তাহাদিগকে ইহারাও স্পর্শ করেন নাই, অথবা দ্রবিড়ের কাছেও মান মর্য্যাদা রাখিতে হইলে স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে বাঙ্গালায় আর্য্য আগমনের কোন্ গৌরবের কথা সোৎসাহে ও সাগ্রহে পড়িবার মত ছিল যে সেই কথা লইয়া সেই সময়ের ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইবে? যত জ্ঞাতব্য বা শিক্ষাপ্রদ হউক না কেন, যাহাতে রক্ত গরম করিবার মত উদ্দীপনা নাই, তাহাকে কেহ যেন ইতিহাসই বলিতে চাহেন না। এ ভ্রান্তি না গেলে আমাদের ইতিহাস রচিত হইবে না। ভ্রান্তি যে ঘুচিতেছে, ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ যে চিহ্নিত হইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি; কাজেই আশায় ও আনন্দে বলিতে পারি যে আমাদের ইতিহাসের বিপুল ও সুন্দর মন্দির গড়িয়া উঠিবে, এবং সকল ভারবাহীর পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

তীর্থ লীলা।

লুকিয়ে যেতে চাও হে সখা
ছিছি পরাণ বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু?
নাই কি আশা-কুঞ্জে ঘেরা গুপ্ত বৃন্দাবন;
বনের মাঝে ফুলের হাসি অলির গুঞ্জরণ!
আজো শ্যামল দূর্ব্বাদলে ধেনু তোমার গোষ্ঠে চলে
তমাল তলে দুলছে দোলা
বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু!

(২)

কূল হারা নয়ন ধারা
উজান ব'য়ে যায়!
তরি তোমার বাইবে নাকি
প্রেমের যমুনায়?
চিত্তাকাশে তারার মালা, চাঁদের চন্দ্রহার
ভুবন ভরা আলোর মেলা নাইকো অন্ধকার
প্রাণের সুরে আমারহিয়া উঠছে আজো ঝঙ্কারিয়া
বাঁশি তোমার বাজাও, এসে
বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু?
এস আমার রাখাল-রাজা
গিরি গোবর্দ্ধনে,
সোহাগ জলে উজল করা
সোনার সিংহাসনে।
সরম-সরু-সূতায় গাঁথা মায়ার রত্ন-হার
পড়িয়ে দিব তোমায় সখা আমার অহংকার,
সাজিয়ে ষোড়শ উপচার হয় নি দেওয়া উপহার
জীবন দিয়ে মরণ দিয়ে
বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু!

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী।

বুকের বোঝা।

(১)

দাশুয়া যখন লোটা কম্বল হাতে নিখিল বোসের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইল, তখন সবে মাত্র নিখিলের স্ত্রী সুরমা একটী কন্যা প্রসবান্তে আতুর ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। নিখিলের সংসারে বড় কেহ ছিলনা, তখন দাশুয়া বড় একটা কাজে লাগিল। সুরমা তাহার হস্তে নবপ্রসূত মেয়েটীকে তুলিয়া দিয়া যেন বাঁচিল। দাশুয়া শিশুকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল; আহা! তাহারও ত এমন একটী ছিল।

দাশুয়ার দেশে কেহ ছিলনা; তবু একদিন ছিল! সে সব খোয়াইয়া বসিয়াছে। বসন্তে যখন সমস্ত দেশ উজার হইতেছিল তখন তাহার কলিজার ধন মতিয়াকে সে মৃত্যু-যজ্ঞে আহুতি দিল। লছ্‌মী অভাগী ও মেয়েটার শোক সামলাইতে পারিলনা, সেও একদিন চলিয়াগেল। দাশুয়ার চক্ষে একটা ধাঁধাঁ লাগিল। কি যে একটা হইয়া গেল সে বুঝিতে পারিলনা।

সে যেন কেমন হইয়া গেল। সারাদিন কাটাইত, সে বাহিরে বাহিরে! আর রাত্রে যখন ঘরে আসিত তখন তাহার শিরায় শিরায় একটা তাড়িত-প্রবাহ বহিয়া যাইত। তাহার সকল কথা মনে পড়িত আর ইচ্ছা হইত, চীৎকার করিয়া কাঁদে। স্বপ্নে কাহাকে যেন সে হাতড়াইয়া খুঁজিত, শেষে না পাইয়া বুকটা চাপিয়া ধরিত। এমনি করিয়া সারাটী রাত্রি সে কাটাইয়া দিত।

প্রভাতে পাড়ার ছেলে মেয়ে গুলি রঙ্গ-বেরঙ্গের তক্‌মা পড়িয়া বাহির হইত। দাশুয়া পাগলের মত যাইয়া তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিত; আর তখনি তাহাদের মা বাপ আসিয়া তাহার কাছ হইতে তাহাদিগকে লইয়া যাইত। কিজানি, অলক্ষুণে ছুইলে পাছে অমঙ্গল হয়। দাশুয়া একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস বুকে করিয়া ঘরে আসিত। তারপর মতিয়ার বেগুনি রঙ্গের ওড়্‌না খানি বুকে করিয়া মাটীতে এলাইয়া পড়িত। এমনি করিয়া থাকা আর তাহার পোষাইলনা। শেষে একদিন সে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। অনেক যায়গা ঘুরিয়া শেষ নিখিলের বাসায় একটু স্থান করিয়া লইল।

নিখিল মাসেক পরে যখন মাহিয়ানার কথা জিজ্ঞাসা করিল, দাশুয়া কহিল "মাহিনা? মাহিনা দিয়ে আমার কি হবে, বাবু? আমার কে আছে যে, মাহিনা খাবে? তুমি কিছু ভেব না, খুকীর জন্য তুলে রেখে দাও।"

সুরমা কহিল "কেন? তোর কি কেউ নেই?"

দাশুয়া সব কথা তখন কহিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুকে গুমরিয়া উঠিল। সুরমার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। সেই হইতে খুকীরভার দাশুয়ার উপর বেশী করিয়া চাপিল।

দাশুয়া খুকীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিত, আর ভাবিত এই বা বুঝি সেই! তখন সে তাহাকে চুম্বনের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিত। তাহার প্রধান কাজ ছিল, এই ক্ষুদ্র খুকীর মনস্তুষ্টি করা। সে সযত্নে কেরোসিন কাঠের গাড়ীতে খুকীকে বসাইয়া নিজে তাহার ঘোড়া হইত। খুকী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত, আর তাহারও উৎসাহ বাড়িয়া যাইত। এম্‌নি করিয়া নিত্য নূতনতর খেলা দিয়া সে খুকীর হৃদয় একটু একটু করিয়া অধিকার করিয়া লইতেছিল। দুপুরে ঘুমের ঘোরে সে মতিয়াকে দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিত, খুকী তাহার বুকে বসিয়া কুসুমপেলব হাতে তাহার চুল ধরিয়া টানিতেছে। সে কৃত্রিম ক্রোধে বলিত "খুকী আমাকে বুঝি ঘুমাতে দিবি না?" সে যেন কেমন হইয়া যাইত, দাশুয়ার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। তখন দাশুয়া "খুকুমণি" "দিদিমণি" কত কি বলিয়া সান্ত্বনা করিত।

সময় সময় তাহার বুকের বোঝা গুরুভার হইয়া উঠিত। দাশুয়া আর পারিতনা, সে বালিশে মাথা গুজিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। আর অমনি খুকী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিত। তাহার সে কান্নাতে এ একটা মস্ত সুখ ছিল।

জগতে লোকে ভাবে এক, হয় আর। যে চায় সে পায়না, কিন্তু যে চায়না কিছুই, সে পায় অনেক। যে মরিতে চায় সে মরে না, যে বাঁচিতে চায় সেই মরে। দাশুয়ার কপালেও ঠিক এই রকম হইয়াছিল। খুকীর

সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব যতইঘণী ভূত হইতেছিল, বিচ্ছেদের দিন ততই দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল।

সে দিন দাশুয়া নিখিলকে তামাক দিয়া আসিয়া খুকীকে কোলে তুলিয়া নিল, দেখিল তাহার গাটা ছম্ ছম্ করিতেছে। চোখ্ দু'টো জবাফুলের মত রাঙ্গা। দাশুয়ার অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুক ফাটিয়া বাহির হইল। আহা! তাহর মোতিয়ারও ত এমনই একদিন জ্বর হইয়াছিল—তারপর আর সে ভাবিতে পারিলনা, কেমনতর একটা ভয়ে তাহার মুখ খানি সাদা হইয়া গেল। সে সুরমার কাছে বলিল, তারপর ডাক্তারের কাছে ছুটিয়া গেল।

ক্রমে খুকীর বসন্তের লক্ষণ দেখা দিল। তখন কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে শীতলা দেবী আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও দাশুয়া সারাদিন খুকীর শিয়রে বসিয়া সেই কাতর মুখ খানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, আর শিহরিয়া উঠিত।

সুরমা বলিল দাশু, দুটা খেয়ে নে।" "আমার কি খাওয়া আছে, মা! আমার খাওয়াত ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুরমা চমকিয়া উঠিয়া বলিল "ও কি বল্‌ছিস্ দাশুয়া?' তাইত! এটা বলাত ভাল হ'লনা, দাশুয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর—ক্রমাগত কয়েক দিন যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া দাশুয়া পরাস্ত হইল। একদিন সন্ধ্যাবেলা খুকী তাহার ক্ষুদ্র জীবনের খেলা সমাপ্ত করিল। সুরমা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, দাশুয়ার অশ্রুবন্যা তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। সে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর খুকীকে সকলে শ্মশান ঘাটে লইয়া গেল; সে বিছানায় আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সেদিন কেহ আর তাহার খোঁজ লইল না, পরদিন সকলে দেখিল সে ও অভিশপ্ত হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া মহা প্রস্থান করিয়াছে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তখন আমরা ইউগণ্ডায়। তথায় কয়েক দিন অবস্থানের পর একদিন প্রাতঃকালে একজন সাহেব আমাদের কাপ্তেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে ইঁহারা দুজনে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ পরিচিত। এই নূতন সাহেবের নাম রবার্টস্। তিনি কয়েকদিন আমাদের সহিত রহিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর কথায় কথায় আফ্রিকার অলৌকিক ঘটনার বিষয়ে কথা উঠিল। কাপ্তেন সাহেব পরিষ্কার বলিলেন যে, তিনি ঐসব আজগুবি ঘটনা গুলা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিবেন না। আমাদের ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "এই জগৎ অতি প্রকাণ্ড, আর আমরা যতই জ্ঞানের বড়াই করি না কেন, এমন অনেক ঘটনা উপস্থিত হয়, যেখানে আমাদের উচ্চ শিক্ষাকে হার মানিতে হয়। আমি ভারতে এমন কয়েকটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহা আমি কোনও মতে বুঝিতে পারিলাম না।" কাপ্তেন সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। ডাক্তার আমাদের নূতন সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলেন?" তিনি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত আমি সম্পূর্ণ এক মত। সত্যই আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই মাসের ৬ তারিখে আমি নিজে এমন এক ঘটনা দেখিয়াছি, যাহা আমি আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া মীমাংসা করিতে পারি নাই।" ডাক্তার সাহেব অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার বলিতে কোনও আপত্তি নাই। তবে হয়ত আপনারা শুনিয়া মনে মনে আমাকে মিথ্যাবাদী স্থির করিবেন।" কাপ্তেন সাহেব বলিলেন, "আপনি কি আমাদিগকে এতই অসভ্য মনে করেন? আর আপনাকে কি আমি চিনি না? আপনার ন্যায় লোক আমাদিগকে একটা আষাঢ়ে গল্প বলিয়া প্রবঞ্চনা করিবেন ইহা আমি কখনও বিশ্বাস করি না।" তখন সাহেব একটা সিগার ধরাইয়া লইয়া তাঁহার গল্প আরম্ভ করিলেন।

"আমি পাদরি বটে, কিন্তু প্রথম হইতে আফ্রিকা আসিয়া প্রচার করিবার দৃঢ় অভিসন্ধি থাকাতে আমি ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করি এবং যথাসময়ে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হই। আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এগার বৎসর ঘুরিয়া ছয় মাস হইল ইউগণ্ডায় আসি এবং এখানকার উসোগা জেলায় থাকিবার আদেশ পাই। প্রায় ১৩০০ বর্গ মাইল স্থানে আমাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার করিতে হয়। এই মাসের ৪ তারিখে সংবাদ পাই যে আকপুর নামক স্থানে একজন ইংরাজ পুলিশ ইনস্পেক্টার টাইফয়েড জ্বরে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। আমি যেন পত্র পাঠ ঐস্থানে গমন করি। অপরাহ্ণ ৫টার সময় এই সংবাদ পাই। পরদিবস ভোর চারিটার সময় আমি উসোগা ত্যাগ করি। অকপুর ঐস্থান হইতে প্রায় ৮০ মাইল। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৬৩ মাইলের অধিক যাইতে পারিলাম না। ৬ তারিখে প্রাতঃকাল ১০টার সময় ঐস্থানে উপস্থিত হইলাম। ইনস্পেক্টার থানায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমিও ঐ স্থানে থাকিব বলিয়া স্থির করিলাম। রোগীকে দেখিয়া ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া আমি থানার বারান্দায় একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া চুরুট টানিতেছি, এমন সময় ঐ স্থানে একজন গ্রামবাসী উপস্থিত হইল। থানার ছয়জন দেশী কনেষ্টবল ছিল। তাহারা উহাকে দেখিবা মাত্র বিশেষ সম্মান ও ভয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিল। লোকটার যে রকম চেহারা দেখিলাম তাহাতে উহার উপর আমার ভক্তি হওয়া দূরের কথা বরং কতকটা ঘৃণার উদয় হইল। আমার পাশেই একখানা খালি চেয়ার পড়িয়াছিল, লোকটা বিনা আহ্বানে তাহার উপর আসিয়া বসিল। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম এবং তাহাকে কিছু বলিতে যাইতেছি এমন সময় খপ্ করিয়া আমার হাত হইতে সিগারেট লইয়া নিজে টানিতে লাগিল। তাহার এই অদ্ভুত আচরণে আমি এক মুহূর্ত্ত যেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পরই দারুণ ক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিলাম, এবং সিপাহীদিগকে আদেশ দিলাম, "এখনই এই পাজীর দুই কান ধরিয়া থানা হইতে বাহির করিয়া দাও।" আমার এই হুকুমে সিপাহীরা যেন অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন প্রাচীন লোক আমার নিকট আসিয়া কহিল, "বোয়ানা (মহাশয়), ইনি সমন্থু। এই গ্রামের জুজু। পৃথিবীর সমস্ত পিপিলীকা ইহাঁর বশীভূত। ইহাঁকে রাগাইলে আপনি বিপদে পড়িবেন।" আমি অবশ্য উহার কথায় আরো রাগিয়া উঠিলাম। এবং নিজে ঐ সমন্থুকে থানা হইতে তাড়াইয়া দিলাম। লোকটা যাইবার সময় একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর দুইটা হাত মাটীর দিকে করিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বসিয়া আছি। ইনস্পেক্টারের টেরিয়ার কুকুর আমার পায়ের কাছে ঘুমাইয়া আছে। এমন সময় সে হটাৎ লাফাইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই ঘরের মেজের উপর গড়াইতে গড়াইতে অতি করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ একটা হাত লণ্ঠন লইয়া কুকুরটার কাছে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। উহার সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ লক্ষ লাল রংএর পিপিলীকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি চীৎকার করিয়া এক বালতি গরম জল আনিতে বলিলাম। ভাগ্যক্রমে গরম জল প্রস্তুত হইতেছিল। উহা আনীত হইলে আমি কুকুরটাকে উহার মধ্যে ডুবাইয়া ধরিলাম। পিপিলীকা গুলা মরিয়া গেল বটে, কিন্তু কুকুরটাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে মরিয়া গেল!

কুকুরটাকে আমি গরম জলে স্নান করাইতেছি, এমন সময় একজন সিপাহী আসিয়া বলিল, "বোয়ানা! থানার দরজায় কে জুজু করিয়া গিয়াছে।" আমি কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। হাতের কাজ আর একজনকে দিয়া আমি থানার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখি, ঠিক ফটকের সম্মুখে তিনটা ছোট ছোট কাটি ত্রিভুজের আকারে পোঁতা রহিয়াছে। ঐ ত্রিভুজের মধ্যে একটা কাঁচা পাতার উপর একটা মৃত পিপিলীকা। ব্যাপারটা আমি বুঝিতে পারিলাম না। একজন

সিপাহী বলিল, "বোয়ানা! ইহা সমন্নুর কাজ। আজ আপনি তাহাকে রাগাইয়া দিয়াছেন। সেই জন্য আপনাকে কোনও বিপদে ফেলিবার অভিপ্রায়ে সে এই জুজু (তুক্) করিয়া গিয়াছে। আজ রাত্রে আপনি সাবধানে থাকিবেন।" আমি হাসিয়া উঠিলাম। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, "আপনি হয়ত তাহার ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেছেন না। কিন্তু এই কুকুরের ঘটনাটাত স্বচক্ষে দেখিলেন।" সত্য কথা বলিতে কি, এই কথায় আমি প্রকৃতই একটু ভীত হইলাম। কুকুরটা অপরাহ্ণ হইতে আমার নিকট ছিল। কোথাও যায় নাই। তবে অত পিপিলীকা কোথা হইতে আসিল? ঐ ঘটনার ঠিক পরেই আমি বারান্দা, ঘর চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলাম, কিন্তু অন্য কোথাও একটিও পিপিলীকা দেখিতে পাই নাই। ব্যাপারটা রহস্যময় নয় কি?

ইহার পর আমি শয়ন করিতে গেলাম। একখানা ক্যাম্প খাটের উপর বিছানা পাতা হইয়াছিল। আপনারা জানেন আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বত্র মশার বিষম উৎপাত। সেই জন্য খাটের উপর একটা মশারি খাটন হইয়াছিল। আমি শয়ন করিয়া মশারিটা ফেলিয়া দিয়া চারিদিকে খুব ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিলাম। আমি জানিতাম মশারির কোথাও বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে।

কিজানি কেন শয়নের পর রাত্রে শীঘ্র নিদ্রা আসিল না। নানা প্রকার চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। আমি চিরদিন এই সমস্ত কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী। কিন্তু আজিকার ঘটনায় আমাকে যেন বোকা বানাইয়া দিয়াছিল। কত রকম ভাবে ইহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। যখন শয়ন করি তখন লক্ষ্য করিয়াছিলাম ঐ ঘরের এক কোনে একখানা কম্বলের উপর একটা শিকারী বিড়াল অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার পর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম তাহা আর মনে নাই।

হটাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কি এক প্রকার ভয়ে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু কেন যে এমন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শয়নের সময় আলো নিবাইয়া দিয়াছিলাম। পার্শ্বেই দেয়াশলাই ছিল। একটা কাটি জ্বালিলাম। আপনারা জানেন মশারির মধ্যে বসিয়া আলো জ্বালিলে বাহিরের দ্রব্যাদি ভাল করিয়া দেখা যায় না। আমিও দেখিতে পাইলাম না। এই সময় কাটিটা নিবিয়া গেল; আমার সঙ্গে সর্ব্বদা রাত্রি কালে একটা মোম বাতি থাকিত আজও ছিল এবং ভাগ্য ক্রমে বালিসের নীচেই রাখিয়াছিলাম। এইবার উহা জ্বালিয়া দিলাম। দুই এক মুহূর্ত্ত পরে মশারির বারের উপর দৃষ্টি পড়াতে যাহা দেখিলাম তাহাতে বিষম আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। দেখি লক্ষ ২ পিপিলীকা বাহিরে মশারির বাড়ের উপর উঠিতেছে। সন্ধ্যার সময় কুকুরের গায়ে যে জাতীয় পিপিলীকা দেখিয়াছিল ইহারাও তাই। আপনারা বোধ হয় জানেন আফ্রিকার এই অংশে এই পিপিলীকাকে সকলেই ভয় করিয়া চলে। ইহারা প্রায়ই লক্ষ ২ একত্রে বাস করে। যদি কোনও প্রাণী একবার ইহাদের নিকট আসে তবে তাহার রক্ষা পাওয়া প্রায়ই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। চক্ষুর নিমেষে ইহারা ঐ হতভাগ্য প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলে। সে দৌড়াইয়া গড়াগড়ি দিয়া, জলে ডুবদিয়া কোনও মতে উহাদের হাত হইতে রক্ষা পায় না। আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে এই পিপিলীকার ভুক্ত জানোয়ারের অবশিষ্টাংশ আমি কয়েকবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী পর্য্যন্ত ইহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইহারা এমন ভীষণ যে, যে জন্তুকে ইহারা আক্রমণ করে তাহার নাসিকা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি পথে উহারা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নারা প্রভৃতি খাইয়া ফেলে।

দুই এক মুহূর্ত্ত কাল আমি স্তম্ভিত ভাবে মশারির মধ্যে বসিয়া রহিলাম। তাহার পর, মশারিটাকে আবার ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিলাম। ভাবিলাম ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে ইহারা আমার কি অনিষ্ট করিবে? কিন্তু ২।৩ মিনিট পরে যখন মশারি ছাদ ঝুলিয়া পড়িয়া প্রায় আমার মাথায় ঠেকিবার উপক্রম করিল, তখন আমি বিপদের মাত্রা বুঝিলাম। দেখিলাম ছাদের উপর এত জমা হইয়াছে যে তাহাদের ভারে ছাদ প্রায় আধ হাত নামিয়া পড়িয়াছে। তখন মনে হইল যাহারা নারী

কাটিয়া ফেলে তাহাদের পক্ষে এই পাতলা কাপড় কাটা কতক্ষণের কাজ? একবার উহারা ভিতরে আসিলে যে আমার কি অবস্থা হইবে তাহা আমি ভাল করিয়া জানিতাম। কিন্তু বাহির হই কি প্রকারে? একবার ভাবিলাম। মশারিতে আগুণ লাগাইয়া দিই। কিন্তু তাহাতে নিজের কান কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ ভিন্ন আর কোন ও উপকার দেখিলাম না।

তাহার পর আমি অতি সন্তর্পণের সহিত মশারির একদিককার বাড় সামান্য একটু খুলিয়া একলম্ফে খাট হইতে একবারে ঘরের মাঝখানে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে গৃহের দ্বার পার হইতে এক সেকেণ্ডও লাগিল না। আমি সটান একবারে থানার বাহির ফটকে আসিলাম। তথায় প্রহরীকে আমার ঘটনার কথা বলাতে সে বলিল, "বোয়াল! এমন যে হইবে তাহা আমরা জানিতাম। এ সমুদুর কাজ।" সে আমাকে ঐ স্থানে বসিতে বলিয়া আমার শয়ন কক্ষে গমন করিল এবং ৫ মিনিট পরে আর একজন সিপাহীর সঙ্গে ফিরিয়া আসিল ও আমাকে বলিল, "আপনার ঘরে বা মশারিতে বা বিছানায় একটাও পিপিলীকা নাই।" কথাটা আমার বিশ্বাস হইল না। ২।৩ মিনিট আগে যেখানে লক্ষ লক্ষ পিপিলীকা নিজে দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে 'একটিও নাই' ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ঘরে ফিরিয়া গেলাম এবং দেখিলাম প্রকৃতই ঐ স্থানে পিপিলীকার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এত অসংখ্য পিপিলীকা এই অতি সামান্য সময়ের মধ্যে যে কি প্রকারে অদৃশ্য হইতে পারে তাহা বুঝিলাম না। আর একটি আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিড়ালটা এক মিনিটের জন্যও শয্যা ত্যাগ করে নাই। ইহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, পিপিলীকার অত্যাচার সুধু আমার বিছানা ও মশারির উপরই হইয়াছিল। আর কোথাও হয় নাই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি পূর্ব্ব আফ্রিকায় ঘটিয়াছিল। সেদিন আমরা এক জঙ্গলের ধারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবির স্থাপিত করিয়াছিলাম। আমাদের চারিদিকে জঙ্গল ছিল বটে, কিন্তু গাছগুলা নিতান্ত ছোট ছোট। আমাদের নিয়ম ছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁবুর চারিদিকে খুব আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য হিংস্রজন্তুর ভয়ে আমাদিগকে এইরূপ করিতে হইত। সেদিন কিন্তু সংবাদ পাইলাম ভাল কাষ্ঠ পাওয়া যাইতেছে না। আমি তাঁবুর বাহিরে আসিলাম, এবং চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলিল। ছোট ছোট গাছ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। এই সময় ডাক্তার সাহেব বাহিরে আসিলেন এবং সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁবুর ঠিক পাশের দিক দেখাইয়া কহিলেন 'এইত দুইটা বড় বড় গাছ রহিয়াছে। যাও, উহার একটা কাটিয়া লইয়া আইস।" একজন দেশী ঐ সময় নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে অত্যন্ত তীতভাবে কহিল, "বোয়াল! এমন কাজ করিবেন না। দেখিতেছেন না, ঐ গাছে ত্রিশূলের দাগ দেওয়া রহিয়াছে। ঐ গাছে দুইজন প্রেত বাস করে। ও গাছ দুইটি কাটাইবেন না। তাহা হইলে বিপদে পড়িতে হইবে।" সাহেব ঘৃণার হাসি হাসিয়া কহিলেন, পাগল কোথাকার! প্রেত যদি দেখাদেয়, তবে বন্দুকের গুলিতে তাহার মাথ ফাটাইয়া দিব।" লোকটা অবশ্য কোনও উত্তর দিল না বটে কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যে সে ভয় পাইয়াছে। যাহা হউক, ঐ দেশীই কোন ও লোক ঐ গাছ কাটিতে স্বীকার পাইল না। তখন আমি দুইজন ভারতবর্ষীয় সিপাহী লইয়া গাছ কাটিতে গেলাম। সঙ্গে আমাদের একখানা কুঠার ছিল। একজন সিপাহী উহা লইয়া একটা গাছের উপর কোপ দিল। দ্বিতীয় বার কোপ করিতে যাইবে, এমন সময় উহা হাত হইতে ঠিকরাইয়া প্রায় ১৪।১৫ হাত দূরে যাইয়া পড়িল। সিপাহী বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া আবার কুঠার উঠাইয়া লইল এবং আবার কোপ মারিবার জন্য উদ্যত হইল। এবারে কি প্রকারে ঠিক বলিতে পারি না। উহা আসিয়া তাহার মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। হতভাগা তৎক্ষণাৎ ঐ খানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। তখনই উহাকে শিবিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই ব্যাপারে দ্বিতীয় সিপাহী গাছ কাটিতে একবারে অস্বীকার করিল। তখন বাধ্য হইয়া আমাকে অগ্রসর হইতে হইল। কিন্তু একি! কুঠার চালাইতে গিয়া শূন্যের উপর হইতে কেহ যেন আমার হাত সজোরে

চাপিয়া ধরিল। ছাড়াইবার এত চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। হাত হইতে কুঠার পড়িয়া গেল। আমি ফিরিয়া গেলাম এবং ডাক্তার সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলাম। তিনি ত আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না বরং বলিলেন, "তোমরা ভারতের লোক। এ দেশের লোকদের মত তোমরাও বিষম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তোমরাও এক সময়ে ইহাদের মত অসভ্য ছিলে। আমাদের শাসনের গুণে এখন কতকটা মানুষ হইয়াছ। এখন দেখিবে চল, ইংরাজ কি করিয়া এ দেশের ভূত প্রেতকে বুটের চোটে বশ করে।" আমি অবশ্য নীরবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মনে ঐ সময় যাহা হইতেছিল তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিব না।

সাহেব দৃঢ় মুষ্টিতে কুঠার উঠাইয়া লইলেন এবং সজোরে গাছের উপর কোপ মারিতে পারিবেন—কিন্তু একি! সাহেবের হাত শূন্যেই রহিয়া গেল, আর নামিল না। হাত নামাইবার জন্য সাহেব প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মুহূর্ত্তকাল এইরকম হইবার পর সহসা সাহেবের মুখ নীল হইয়া গেল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আমরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া শিবিরে লইয়া আসিলাম। তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর তাঁহাকে কয়েকটা কথা শুনাইবার বড়ই লোভ হইয়াছিল, কিন্তু সাহস হইল না। কিন্তু নিজের দাসত্বের উপর বড় ঘৃণা হইল।

শ্রীঅতুল বিহারী গুপ্ত।

পল্লীপ্রভাত।

উষার যখন তোমার কুঞ্জে ছড়ায়ে কণক রেখা
তরু-দুদুর পূর্ব্ব আকাশে ভানু হেসে দেয় দেখা,
তোমার কানন শীতলচ্ছায়া পত্র রাজির মাঝে
আগমন গীতি বিহগ কণ্ঠে এক সাথে উঠে বেজে।
ওঙ্কারেরি দীপ্ত মহিমা ঝঙ্কারে সেই গানে,
এ ভগ্ন বীণা ধ্বনিয়া উঠেগো বিহগের কল তানে।
ফুটিয়া উঠেগো কুঞ্জ মাঝারে ফুলের মোহন হাসি,
প্রাণের মাঝে বাজিয়া উঠেগো কোন্ সুদূরের বাঁশী,
হাসিয়া তাহারা পড়েগো ঢলিয়া বিতরে মধুর গন্ধ,
পুলকেতে কাপি উঠে মোর প্রাণ জাগে সুমহান ছন্দ।
মর্ত্তে তোমার করুণা জননি, দীপ্ত বরণে রাজে,
আশীর্ব্বচন দগ্ধ হৃদয়ে আরতির সুরে বাজে।
"আয় ভাই আয় বেলা হয়ে গেল" ওকি শুনি দূর মাঠে,
রুনু রুনু রুনু নুপুর বাজায়ে রাখাল চলিছে গোঠে।
জাগিয়া উঠিল মরমের মাঝে কোন্ স্বপনের গীতি,
যশোদা মায়ের কানু যেগে নেওয়া রাখালের নিতি নিতি।
ওগো ও পল্লী জননি আমাব, লহগো প্রণাম মোর,
বাজে যেন মা, নিশি দিন প্রাণে তোমার স্নেহের সুর।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ কর।

পণ্ডিতের মূর্খতা দোষ।

যে পণ্ডিত বিদ্যা কিংবা প্রতিভার বলে দীপ্তিমান তিনিই আলাপ ব্যবহারের বেলায় সম্পূর্ণ আঁধারে চাপা পড়িয়া যান জগতে এদৃশ্য বিরল নহে।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের স্বরূপ জানিতে হইলে তাঁহাদের সহিত নিভৃতে পরিচিত হইতে হয়। ঘসা মাঁজা লৌকিক ব্যবহার অপেক্ষা শান্ত এবং নির্জ্জন প্রদেশেই তাঁহাদের প্রতিভার প্রখর রশ্মি ফুটিয়া বাহির হইয়া দিগন্তে আলোক বিকীর্ণ করে।

পেটার কর্ণেলী সেক্সপিয়ারের সম প্রতিভাভাজন ছিলেন কিন্তু তাঁহার আকৃতি প্রকৃতিতে তদীয় অন্তরের গভীর শক্তির কোনই পরিচয় পাওয়া যাইত না। অপরন্ত আলাপ ব্যবহারে তিনি এমন ভোঁতা ছিলেন যে সেবেলায় লোকে তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়াই পারিত না। যে ভাষার উপর এত অসাধারণ দখল ছিল, কথাবার্ত্তায় তাহাতেই চৌদ্দ গণ্ডা ভুল রহিত। কর্ণেলীর বন্ধুবর্গ অনেক সময় তাঁহাকে এই সামান্য দোষটুকু শোধরাইয়া লইতে বলিতেন। কর্ণেলী তাঁহাদের উত্তরে একটু হাসিয়া বলিতেন যাক্ তবু ত

আমাকে লোকে কর্ণেলী বলিয়াই জানে। নির্জ্জনে এবং ধ্যানে দৈবাৎ এর যে বিশেষত্বের মুখর বিকাশ হইত সামাজিক বৈঠকে তাহা মৌন হইয়া মাতিয়া যাইত। কর্ণেলীর সম্বন্ধে অনেক লেখক লিখিয়াছেন—তিনি তাহার মানসিক সম্পদ প্রকৃতির নিকট হইতে কাঁচা-ভাবে পাইয়াছিলেন সেগুলি ছিল যেন আশু সোণার চাঙড়া—পেটা-ঘসা ছাপামারা মোহর নহে।

ফ্রান্সের পোর্ট রয়াল সোসাইটীর নিকোলী কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন তিনি আমাকে বৈঠকখানায় স্বগুণে অভিভূত করিয়াছিলেন কিন্তু সিড়ির উপরে পা দিয়াই তাঁহাকে ঋণপূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

থেমিষ্টোক্লেশের সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে একদিন তাঁহাকে একটি বাঁশী বাজাইতে বলা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন আমাদ্বারা উহা হইবে না আমাকে বনকে মহানগরী করিয়া ফেলিতে দাও।

এডিসন যে আলাপ প্রলাপে অপটু ছিলেন তাহা সর্ব্বজন বিদিত। অপরিচিত মহলে তিনি একেবারে বোবা বনিয়া যাইতেন। এই যে নীরবতা এ নীরবতা ধ্যানের; নাজানি তিনি এই সময়ে কতবার spectator এর মানস মূর্ত্তি সম্মুখে লইয়া কত যত্নে তাহার সৌষ্ঠব বাড়াইবার জন্য তাহার উপর দিয়া মন চক্ষুর সঞ্চালন করিতেন।

শক্তির ক্ষুদ্রতা মুখরা কিন্তু প্রতিভার পূর্ণতা ধ্যানপরা।

Mandeville এডিসনের সহিত একদিন সন্ধ্যাকালে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পর-চুলা-বাঁধা বোবা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আলাপ ব্যবহারের সময় ভার্জ্জিলকে চিত্তাকর্ষক কবি না বলিয়া জড় প্রকৃতির সাধারণ মনুষ্য বলিলেই বিশেষ মানাইত। লা কটেন বলেন 'লা ব্রুয়েরারকে আলাপ ব্যবহারের সময় একটা নেহাৎ গোমূর্খ বলিয়া মনে হইত। তিনি না পারিতেন একটা কথা গোছাইয়া গোছাইয়া বলিয়া উঠিতে না পারিতেন যে জিনিষটা দেখিয়াছেন দশ জনকে তাহার একটা ধারণা দিতে। কিন্তু হাতে লইলেই তিনি কবিতার মূর্ত্তিমতী রাগিনী। মানুষের পক্ষে হয় চতুর না হয় বোকা এই দুইয়ের একটা হওয়া সহজ; কিন্তু একবারে এই দুই গুণই এবং দুইটিই যোল আনায়—প্রশংসনীয়। কেবল তাহাতেই এই দ্বিধারা পূর্ণাঙ্গ মিলন দেখা যাইত। উপরের মন্তব্যটী গোল্ডস্মিথের সম্বন্ধেও খাঁটে। পেমব্রোকের কাউন্টেস্ স্মারকে বলিয়াছেন দোহাই আপনার আপনি চুপ করুন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া তৃপ্তি পাওয়ার চেয়ে আপনি চুপ করিলে তৃপ্তি পাওয়া যায়।

ইসোক্রিটস্ বাগ্মী রচনার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি এরূপ ভীরু ও দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন যে বক্তৃতা করা দূরস্থান; সাধারণে কথাবার্ত্তা বলিতেই তাঁহার বুকে ধরফড়ি উঠিত। তিনি আপনাকে শাণ পাথরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—তাহা দ্বারা কিছু কাটা যায় না কিন্তু অপরকে কাটিবার শক্তি দেওয়া যায়। তিনি নিজে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না কিন্তু অপরে তাঁহার বক্তৃতা মক্স করিয়া বক্তা হইতে পারিত। ড্রাইডেন লিখিয়াছেন আমার কথা বড়ই হাবড়া জাবড়া। আমার মুখ দিয়া যাহা বাহির হয় তাহা কাকের কাছে বেলের মত মানুষের অযোগ্য। মোট কথা, যাহারা দশ জনকে কথাবার্ত্তায় আমোদ প্রমোদ দিতে পারে আমি একেবারেই সে গোছের লোক না।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র সেন।

কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অবস্থা।

রাজপুরুষগণ শিক্ষা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিরাপদ মনে না করিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী মিসনারিদিগের ন্যায় কেরি প্রভৃতি মিসনারিগণ তদ্বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহারা স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যেই হউক, আর এদেশীয় দিগকে মানুষ করিবার জন্যই হউক—যীশু খৃষ্টের সুসমাচার প্রচারের সুবিধার জন্যই হউক, অথবা অজ্ঞ "বাঙ্গালী মেরদা মেরদীগণের" মধ্যে জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইবার জন্যই—মদনাবতী হইতে শ্রীরামপুর আসিয়া তথায়ও ১৮০০ অব্দে একটী দেশীয় পাঠশালা

স্থাপন করিয়া দেশীয় বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এ জন্য বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য এই মিশনারি মহাত্মাদিগের নিকট যে অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ সে সম্বন্ধে বোধ হয় ভিন্ন মত নাই।

ইহার পর মালদহের নীলকর এলার্টন সাহেব মালদহেও কয়েকটী দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এমন কয়েকজন ইংরেজ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, যাঁহারা এদেশের প্রাচীন ভাষা ও শাস্ত্রে একান্তই ভক্তিমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে এত উচ্চ স্থানীয় মনে করিতেন যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাহারই আলোচনায় সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণেতা হলহেড (N. B. Halhead), ভগবদ্-গীতার ইংরেজী অনুবাদক উইলকিন্স্ (Sir Charles Wilkins), হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রণেতা কোলব্রুক (Sir Henry Thomas Colbrooke), সংস্কৃত শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস, গীতগোবিন্দ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদক উইলিয়াম জোন্স, (Sir William Jones), স্যার ইলাইজাইম্পির আইনের বঙ্গানুবাদক জোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সময় এদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের খুব উচ্চ রীতিতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গদেশের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চতুষ্পাঠী সমূহে কেবল অর্থকরী বিদ্যারই আলোচনা হইত। ব্যাকরণের প্রহেলিকা, স্মৃতির ব্যবস্থা ও ন্যায়ের কূট অর্থ সমাধানে যিনি যত বেশী পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন, তিনিই তত বড় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিপুল সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার এইরূপ সংকীর্ণ পরিণতি চিন্তা করিয়া এই পাশ্চাত্য মহাত্মগণ সংস্কৃত শাস্ত্রের সমগ্র শাখার অধ্যাপনার জন্য কয়েকটী উচ্চশ্রেণীর কলেজ যাহাতে এদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইতে পারে তাহার জন্য সময় সময় চেষ্টা করিতেছিলেন। জোনাথান ডানকান কাশীতে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। ১৭৯৫ অব্দে মিঃ কোলব্রুক মৃজাপুর অবস্থান কালে কাশীর এই সংস্কৃত কলেজের সংশ্রবে আসেন—সে স্থান হইতে তিনি ১৮০১ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান জজ হইয়া আসিয়া কলিকাতায়ও এইরূপ একটী উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত কলেজ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য লর্ড ওয়েলেসলির সহিত পরামর্শ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই সময় চারিদিক হইতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পশ্চিমে মহারাষ্ট্র শক্তি দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তম ও কর্ণাটের বিভীষিকা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, উত্তরে—দেনমার্কের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়—শ্রীরামপুর অধিকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে নিজ গৃহে—কলিকাতার ইংরেজী পত্রিকাগুলি অদম্য ও উশৃঙ্খল হইয়া চারি দিকে অসন্তোষের বীজ বপন করিতেছিল; ইহার উপর ঊর্দ্ধ হইতে বিলাতের ডাইরেক্টার সভা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের জন্য ওয়েলেসলিকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। এইরূপ চারিদিকে বিপদ লইয়া লর্ড ওয়েলেসলি আর কিছুতেই কোন নূতন অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইলেন না। ওয়েলেসলি কোলব্রুককে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের ও হিন্দু আইনের সম্মানিত অধ্যাপক (Honorary) নিযুক্ত করিয়া সেই কলেজের দ্বারাই কিরূপে তাহার কল্পনা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে আপাততঃ তাহারই চিন্তা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার পর ডাইরেক্টার সভা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনুকরণে সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদিগের জন্য বিলাতে হেলিবরি কলেজ স্থাপন করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটী একেবারে তুলিয়া দিতে আদেশ করিলে লর্ড ওয়েলেসলি অকুতোভয়ে তাহা রক্ষা করিতে প্রতিবাদ করেন ও কলেজটীকে রক্ষা করেন।

এই উপলক্ষে ওয়েলেসলিকে যেরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণকেও এইরূপ দ্বিতীয় একটী কার্য্যে অগ্রসর হইতে

উৎসাহিত করে নাই। কাজেই আরও কতিপয় বৎসর নীরবে চলিয়া গেল।

অবশেষে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব বৎসর ইংলণ্ডের ডাইরেক্টার সভা ভারতবর্ষের সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন তুলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের মন্তব্য চাহিয়া পাঠাইলে সকাউন্সেল গবর্ণর জেনারেল ভারতের হিতাহিত প্রশ্নের আলোচনা করেন। এই সময় মহাত্মা কোলব্রুক সুপ্রিম কাউন্সিলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুসময় বুঝিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো দ্বারা এদেশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্যের এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তদনুসারে ১৮১৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় পার্লিয়ামেণ্টে এই মন্তব্য আলোচিত ও গৃহীত হয় এবং ডাইরেক্টার সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অবগত করান যে "That a sum of not less than a lack of Rupees, in each year shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement of the the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the British territories of India."

অর্থাৎ প্রতি বৎসর অন্যূন এক লক্ষ টাকা ভারতীয় সাহিত্যের এবং পণ্ডিতদিগের উন্নতির জন্য এবং ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার জন্য প্রদত্ত হউক।

ডাইরেক্টার সভা এইরূপ অনুকূল আদেশ প্রদান করিলেও ১৮২১ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আদেশ অনুসারে যে কার্য্য হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না অবশেষে ১৮২১ অব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। ১৮২৩ অব্দে কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন্ নামে এক কমিটী স্থাপিত হয়। এই কমিটীর ব্যবস্থায় ১৮২৪ অব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই কলেজ গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

ইতিমধ্যে—১৮১৪ অব্দের জুলাই মাসে চুঁচুড়ার মিশনারি মে সাহেব নিজ কুঠিতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ অব্দে তাঁহার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১৫টী হয় এবং তাহাতে ৯৫১টী ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। ইহার পর ক্রমেই তাঁহার স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই সময় মাকুঁইস অব হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল। তিনি এই সকল বঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে ৬০০৲ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হন। ইহাই বোধ হয় দেশীয় ভাষা শিক্ষা কল্পে গবর্ণমেণ্টের প্রথম সাহায্য দান।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া মিশনারি সমাজ শিক্ষা বিস্তারে পরম উৎসাহিত হন। তাঁহাদের এই উৎসাহে অচিরেই স্কুলগুলি ছাত্র সমাগমে পূর্ণ হইয়া গেল। ১৮১৬ অব্দেই এই সকল স্কুলে ২১৩৬ জন ছাত্র উপস্থিত হয়।

গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ দেখিয়া এই সময় বর্দ্ধমানের চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটী বর্দ্ধমানেও কতকগুলি দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। এইরূপে দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা গেলে দেশীয় গুরুমহাশয় প্রস্তুত করাও প্রয়োজন হইয়া উঠে। সুতরাং চুঁচুড়ার মিশনারি সম্প্রদায় গুরুশিক্ষার জন্যও একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮১৮ অব্দে মে সাহেবের দেশীয় স্কুলের সংখ্যা ৩৬টী ও তাহাতে ছাত্র সংখ্যা তিন হাজারে দাঁড়ায়। এই সময় মে সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় মিঃ পিয়ার্সন তাঁহার স্কুল সমূহের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

১৮১৯ অব্দে কলিকাতার লণ্ডন মিশনারি সোসাইটীও কলিকাতা এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কয়েকটী দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার এই স্কুলগুলির মধ্যে শরবোরণ সাহেব ও আরাটুন পিড্রুস সাহেবের স্কুল বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। এইরূপে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ও জেলা সমূহে দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিলে কোর্ট অব ডাইরেক্টারও দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ দান কল্পে ভাল ভাল স্কুল গুলিতে সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হন।

যখন মিশনারি সম্প্রদায় এদেশে দেশীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বিপুল উদ্যমে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন এদেশীয় শিক্ষিত লোক তাহাতে বড় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেই দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অধ্যাপনার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় ছিলেন এই দলের অগ্রণী।

১৮১৪ অব্দে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক এক ধনবান্ বাঙ্গালী হিন্দু, মৃত্যুকালে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার জন্য ২০ বিশ হাজার টাকা দান করিয়া গেলে, ইংরেজ বাঙ্গালী অনেকেরই মনে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা জাগ্রত হইতে থাকে। এই সময় কলিকাতার ঘড়ি নির্ম্মিতা ডেভিড হেয়ারও একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোক্তা হইয়া রামমোহন রায় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিলে তিনি কলিকাতার অন্যান্য সম্রান্ত লোকদিগের সহিত এ বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর ১৮১৬ অব্দে (মতান্তরে ১৮১৭ ২০শে জানুয়ারী) সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Edward Hyde East, লেপটেনেণ্ট আর্ভিন, রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

মিশনারিদিগের চেষ্টায় ও যত্নে কতকগুলি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইল; কিন্তু তখনও বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত পুস্তকের অভাব রহিয়া গেল। এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল—বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ইসপের গল্প, রাজাবলী প্রভৃতি—এগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন বালকদিগের উপযোগী করিয়া ধারাপাত, জমিদারী হিসাব, ভূগোল, প্রভৃতি লিখিত ও মুদ্রিত হইল। এবং এই পুস্তকগুলির সঙ্গে বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশও বালকগণের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইল।

কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও দেশের আভ্যন্তরীণ পল্লিসমূহে তখনও এই ব্যবস্থা অচিন্তনীয় ছিল। এই সময় পল্লিগ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে পার্শিভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ কোন একটী স্থানে হিন্দু ও মুশলমান পল্লি বালকেরা সমবেত হইয়া পার্শি 'হরপ' লিখিত ও পার্শি 'বয়াত' মুখস্থ পাঠ করিত। স্থানে স্থানে পার্শি ও বাঙ্গালা উভয় বিষয়েই লিখান ও পড়ান হইত।

এডাম সাহেব এই সময়ের পল্লি-শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা এইরূপ:—

পল্লিগ্রামে বালকদিগকে পড়ান অপেক্ষা লিখানতেই অধিক সময় দেওয়া হইত। লিখাইবার নিয়ম ছিল চারি প্রকার। (১) মাটীতে অক্ষর আঁকিয়া তাহার উপর মক্স-করান; এইরূপে এক একটী অক্ষর করিয়া মাটিতে লিখিয়া শিক্ষা হইলে (২) অক্ষরগুলি তাল পাতায় দাগিয়া দিতে হইবে, বালক তাহার উপর খাগের কলম দ্বারা পুনঃ পুনঃ মক্স করিবে। এইরূপে বালকের অক্ষর জ্ঞান হইলে (৩) বালককে নিজে নিজে কলার পাতে লিখিতে দিতে হইবে। (৪) অতঃপর দেশী কাগজে লিখা।

বাঙ্গালা লিখার বিষয় ছিল—স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, এক-দুই, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া ইত্যাদি। মুখে মুখে শিক্ষার বিষয় ছিল—শুভঙ্করের আর্য্যা, এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক গণনা। পাঠের বিষয় ছিল—সরস্বতী বন্দনা ও চাণক্য শ্লোক। একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্থ বালক সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জোড় হস্তে সরস্বতী-বন্দনা আবৃত্তি করিত, তাহার পশ্চাতে ঐরূপ ভাবে বসিয়া অন্যান্য বালকগণ সেই পাঠ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠ করিত। তার পর দাঁড়াইয়া চাণক্য শ্লোক সমস্বরে মুখস্থ বলিত। ইহাই ছিল সেকালের পল্লিগ্রামের লেখা পড়া শিক্ষার রীতি।

মিশনারিগণ প্রথম প্রথম তাঁহাদের স্কুল সমূহেও এই রীতিই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ক্রমে পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত হইলে, সেই দেশীয় রীতির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন লিখিত ছাপার পুঁথি গুলিও বালকদিগের পাঠের জন্য নির্দ্ধারিত হয়।

জমিদারী হিসাব——স্মিথ সাহেব কৃত।

ধারাপাত—————মে সাহেব কৃত।

ভূগোল ——পিয়ার্স সাহেব কৃত।

ইসপের গল্প ——তারিণী চরণ মিত্র কৃত।

খৃষ্টচরিত—রামরাম বসু প্রণীত।

ধর্ম্মগ্রন্থ (বাইবেল)—কেরি সাহেব অনুদিত।

খৃষ্টান মিশনারিগণ স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার জন্য পুস্তকও লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইল। দেশীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা ও যত্ন যতদূর করিতে হয়—তাঁহারা করিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজ সে উপকার নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিলেন না। স্কুল স্থাপনের প্রথমেই বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণ নেতারা একটী আপত্তি উত্থাপন করিলেন। সে আপত্তি—ব্রাহ্মণছেলেরা কি প্রকারে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর বালকদিগের সহিত এক আসনে বসিয়া পড়িবে? প্রথমে মিশনারিরা এই আপত্তির কোন প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু দেশীয় গুরুমহাশয়গণ মাথা কাত করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রতিবাদ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন; সুতরাং এ প্রতিবাদ বিচার-সাপেক্ষ হইয়া রহিল এবং মাঝে মাঝে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। সময়ে স্কুল সমূহে ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পরিচালক খৃষ্টানগণ এ ভেদনীতি উপেক্ষা করিয়া চলিলেন। তখন আপত্তিকারীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের বালকদিগকে অন্য জাতীয় ছেলেদের সঙ্গে বসিয়া পড়িতে দিলেন; যাঁহারা তাহা সম্মান-হানিজনক বলিয়া মনে করিলেন, তাহারা তাহাদের বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন না।

এই সময় আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইল। সেটী—ছাপার পুঁথি পড়া। এদেশে ছাপার পুঁথির প্রচলন না থাকায়—পুথি যে ছাপার অক্ষরে থাকিতে পারে, এ জ্ঞান সাধারণ ভদ্রলোকদিগেরও তখন ছিল না। সরস্বতী বন্দনা, চাণক্য শ্লোক ও শুভঙ্করের আর্য্যা—যাহা বালকদিগকে গৃহে ভদ্র-গৃহস্থ পিতামাতা সন্ধ্যার পরে বিছানায় শুইয়া মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন, তাহাই চূড়ান্ত শিক্ষা বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। তাহার পর খৃষ্টানের স্কুল; তাহাও যে ভয়ের কারণ না হইয়াছিল, তাহা নহে। ইহার পরে হঠাৎ ছাপার পুঁথি দেখিয়া অনেকেই ভয় পাইয়া গেলেন। প্রথম আপত্তিটী উঠিয়াছিল কেবল ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে, এই দ্বিতীয় আপত্তি উঠিল, হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজ হইতে।

এই সময় বর্দ্ধমানের চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীও তথায় কয়েকটী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য মুদ্রিত খ্রীষ্টীয় উপদেশ ও বাইবেল প্রভৃতি পাঠ্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এইরূপ খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ পাঠ্য করায় সে স্থানের লোকেরা তাহাদিগের ছেলেপিলেদিগের জাতিনাশের ভয় করিয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে। এই জাতি নাশের ভয় তথায় এত প্রবল হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তি যখন কিছুতেই তাহার ছেলেকে খ্রীষ্টানি পুঁথি ত্যাগে সম্মত করাইতে পারিল না, তখন তাহাকে শৃগালের মুখে পরিত্যাগ করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হইল না। "এমন ছেলেকে শৃগালে খাওয়া মঙ্গল" বলিয়া সে ব্যক্তি তাহার শিশু পুত্রকে সারারাত্রি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল। রেভারেণ্ড লং সাহেব এই ঘটনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন:—"It was then sufficient objection to a book being read if it contained the name of Jesus and a case occurred near Burdwan where a Hindoo rather than give up his child to be educated by the missionary left it out at night to be devoured by jackals!"

এই ব্যাপারেও যাঁহারা বিষয়টী আপত্তি জনক বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদিগকে খ্রীষ্টানদিগের স্কুলে যাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে দিলেন না; যাঁহারা তাহা আপত্তি জনক মনে করিলেন না, তাঁহারা মিশনারিদিগের বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগের বালকদিগকে পাঠাইলেন।

এই সময় পর্য্যন্তও বাস্তবিকই বালকদিগের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল। মিশনারিরা যদিও তখন "বাইবেল" ও "ইসপের গল্প" কোমলমতি বালকদিগের হস্তে দিয়া তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূরণ করিতেছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু ঐ সকল পুস্তক পাঠ

করিবার ও বুঝিবার শক্তি তখন দেশের অনেক লোকেরই কমছিল; বালকদিগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। সুতরাং ঐ সকল পুস্তক বালকদিগের ব্যবহারে কদাচিৎ আসিত।

এই প্রকৃত অভাব লক্ষ্য করিয়া প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশ জন্য ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় "স্কুল বুক সোসাইটী" নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। এবং তাহা হইতে বালকদিগের পাঠ উপযোগী করিয়া বিবিধ পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই স্কুল বুক সোসাইটীতেও শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮১৮ অব্দে মার্কইস অব হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে কলিকাতা "স্কুল সোসাইটী" স্থাপিত হইলে সেই "স্কুল সোসাইটী"ও বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২১ অব্দে এই সোসাইটীর স্থাপিত স্কুলের সংখ্যা হইয়াছিল ১১৫টী এবং তাহাতে ছাত্র হইয়াছিল ৩৮২৮টী। এখন—"স্কুল বুক সোসাইটী"কে উৎসাহিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িলে, ঐ সনেই গবর্ণমেণ্ট উক্ত "সোসাইটী"কে এক কালীন ৭০০০৲ টাকা দান করেন ও প্রতি মাসে পাঁচ শত টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।

স্কুল বুক সোসাইটী—শিশুবোধক, চাণক্য শ্লোক, বানান শিক্ষা, সচিত্র বর্ণমালা, বর্ণমালা ১ম ও ২য় ভাগ, নীতিকথা প্রভৃতি শিশু ও বালকদিগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্কুল স্থাপনের চেষ্টা লইয়া বহু সমিতি অগ্রসর হইলেও ১৮৩০ হইতে ১৮৩২ অব্দ পর্য্যন্ত এই চেষ্টার ফল কেবল কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জেলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এমন কি কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ও সে চেষ্টা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী পল্লি সমূহের সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী গৃহের চণ্ডীমণ্ডপে তখনও পন্দনামার উচ্চ 'বয়াত, ও সরস্বতী বন্দনা, শুভঙ্করী ও চাণক্য শ্লোক পাঠের উচ্চ ধ্বনি, এবং মাঝে মাঝে নির্দ্দয় গুরুমহাশয়ের ক্রোধকম্পিত উচ্চ-নিনাদ ও সঙ্গে সঙ্গে অসহায় বালকের পরিত্রাহি চীৎকার ব্যতীত অন্য কোন রকমের পাঠের আভাস কর্ণগোচর হইত না। সুদূর মফস্বলের কথা ত দূরের কথা।

এই সময়ের বিদ্যা শিক্ষার চিত্র কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল।

"তদানীন্তন গুরুমহাশয়ের যেরূপ বিগর্হিত আচারণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্য পুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না কেবল ক্রোড়ে তালপত্র, সর্ব্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরু মহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত আর "পড়ে পড়ে লেখ তুই বেটা বড় হারামজাদা" এই রূপ কর্কশ ধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত।

"প্রথমে আমরা সেখ মসলহদ্দিন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশ পুস্তক) নামে নীতিগর্ভ পদ্য পুস্তক একখানি পাঠ করি।...তৎকালে কোন পারস্য পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দনামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না; কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। ......

"আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে ঐ সাদির বিরচিত গোলস্তাঁ অর্থাৎ গোলাব-ফুল-কানন নামক গ্রন্থের পাঠারম্ভ হয়! ... ... প্রথমে আমরা এই গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে এক অধ্যায় পাঠ হইলে পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ্দু ভাষায় ইহার অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি, দুই অধ্যায় পঠিত হইলে ঐ গ্রন্থকর্ত্তার বিরচিত বুঁস্তাঁ (সৌরভাধার নামে একখানি নীতিসার পদ্য পুস্তকের পাঠারম্ভ হয়। ..

"উর্দ্দু-ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতিশিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তুষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের

সুনীতিশিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাঁহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন।

"গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁর কিয়দংশ পাঠ করণান্তর আমি জামেজল কাওয়ালিল, মতলুব এবং জেলেখাঁ নামে গদ্য ও পদ্য পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম।"

এই চিত্র ১৮৩০—৩২ অব্দের। তখন রায় মহাশয়ের বয়স ১০।১২ বৎসর।

এই সময় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা এক রকম ছিলই না। কচিৎ কোথাও ২।১ জন সামান্য বাঙ্গালা জানিতেন; যাঁহারা কিছু কিছু বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন তাঁহারা নিজের কাজ কর্ম্মের বিষয় ব্যতীত যদি অন্য কোন বিষয় লিখিতেন, তবে পুনরায় পাঠকালে তাহাই শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে গলদ্‌-ঘর্ম্ম হইতেন।

বাঙ্গালা ভাষার বিদ্যা যখন বাঙ্গালীর নিকট এই প্রকার ছিল, তখন বাঙ্গালা অধ্যাপনার জন্য গুরু মহাশয় নিযুক্ত হইতেন কাহারা. এইটী একটী প্রহেলিকার বিষয় ছিল সন্দেহ নাই।

মিঃ এডাম তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, এই সময় গুরুমহাশয় ছিল—গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ অথবা জমিদারের গোমস্তা। বাস্তবিক এ কথা ভুল নহে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে পূজারী ব্রাহ্মণ ও জমিদারের গোমস্তাই গুরু মহাশয়ের কার্য্য করিত, তাহা নহে। "রামতনু লাহিড়ী ও তৎসাময়িক বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে লেখা হইয়াছে — "সচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন।" কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ও তাহাই লিখিয়াছেন। ইহা দক্ষিণ বঙ্গের কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের পল্লিসমূহে এখনকার ন্যায় তখনও বিক্রমপুরের আধিপত্য ছিল কিনা জানি না, কিন্তু পদ্মার বিভীষিকা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম বঙ্গের লোক লাউটী বেগুণটীর প্রত্যাশায় সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে বা উত্তর বঙ্গে ছেলে ঠেঙ্গাইবার জন্য যাইতেন না, ইহা সুনিশ্চিত। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের পল্লি সমূহে তখন তথাকার গ্রাম্য অক্ষরজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই গ্রামের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয়ে তাঁহার বাহিরের ঘরে পাটি বা জল চৌকিতে বসিয়া পাঠশালা জমাইতেন। পড়ুয়ারা মাটিতে বা কাঠের লম্বা "আলিসায়" বসিয়াই কর্ত্তব্য সমাপন করিত।

শিক্ষা সম্বন্ধে মফস্বলের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা কোম্পানীর রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৩৭ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ্য ভারগ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ১৮৩৩ অব্দে কোম্পানীর গৃহীত সনন্দের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতশাসন সম্বন্ধীয় পূর্ব্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ভারতবাসীকে উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকে শাসক জাতির সহিত সমান অধিকার প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষাব্যাপার লইয়া এ দেশীয়-দিগের মধ্যে বিষম দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮১৩ অব্দে বিলাতের মহাসভা—দেশীয় শিক্ষাদানে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বর্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া মুক্তহস্তের পরিচয় প্রদান করিতে উপদেশ দিলে—এ দলাদলির সূত্রপাত হয়, সুতরাং তখন দেশীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা স্থগিত থাকে এবং তাহার বার্ষিক দান বিনা ব্যয়ে সঞ্চিত হইতে থাকে। ১৮২১ অব্দে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ খোলা হইলে এ দলাদলি আত্মপ্রকাশ করে। তখন রামমোহন রায় তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহর্ষ্টকে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে অর্থ ব্যয় না করিয়া ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর মহাসভার উপদেশ মতে এই কার্য্যের সূচনা করিয়া যাওয়ায় লর্ড আমহার্ষ্ট রামমোহন রায়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে দলাদলি চরম সীমায় পঁহুছিল। ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী দল দেশীয় শিক্ষার সমর্থন করিতে লাগিলেন; উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজপুরু-ষগণও এই দলাদলি মীমাংসার জন্য তাহাতে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারেল। তিনি দেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন তাহার সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার জন্য দেশের এই অবস্থা

মহাসভায় লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৩৫ অব্দে মহাসভা শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সহিত এক যোগে মিলিত হইয়া দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার করিবার উপদেশ প্রদান করিলে গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মিঃ ট্রেভিলিয়ানকে এই শিক্ষা সমস্যা মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করেন।

দেশীয় শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা লইয়া দলাদলি যখন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে সেই মহাকলেজের বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়া কলিকাতার অবস্থাপন্ন লোক ও মিশনারিদিগের দ্বারা আরও কয়েকটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করাইয়াছিলন; তাহাতেও ছাত্র সংখ্যা প্রচুর হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাও এই সময় একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন সুতরাং এই সময় কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী দেশীয় লোকের অভাব ছিল না।

যথা সময়ে সুপ্রিম কাউন্সিলে এই শিক্ষা সমস্যার শেষ মীমাংসা হইয়া যায়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, সার চার্লস মেটকাফ্ ও মিঃ মেকলে দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষা সমিতিকে (General Committee of Public Instruction) তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ করেন। এবং প্রাচীন মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ নূতন বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন।

এই আদেশ অনুসারে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে নিম্নলিখিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গুলি স্থাপিত হইয়া গেল।

ঢাকা কলেজ—	১৮৩৫
পুরী কলেজ—	১৮৩৫
মেদিনীপুর কলেজ—	১৮৩৫
গৌহাটী কলেজ—	১৮৩৫
পাটনা কলেজ—	১৮৩৫
ভাগলপুর কলেজ—	১৮২৩
ঐ ইনষ্টিটিউসন—	১৮৩৭
কলিকাতা মেডিকেল কলেজ—	১৮৩৫
হুগলী মহম্মদ মহসিন কলেজ—	১৮৩৬
বোয়ালিয়া কলেজ—	১৮৩৬
কুমিল্লা কলেজ ২০শে জুলাই—	১৮৩৭
চট্টগ্রাম কলেজ (জানুয়ারী)—	১৮৩৭
যশোহর স্কুল (জুন)—	১৮৩৮
দিনাজপুর স্কুল (২৭ জুন)—	১৮৩৮

কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী লোকের অভাব না থাকিলেও সুদুর মফস্বলে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনকারী দূরে থাকুক, কোন শিক্ষারই সংস্কার-সমর্থনকারী লোক বড় অধিক ছিলেন না। তাহার কারণ জীবন সংগ্রাম রাজধানীর সংশ্রবে তথায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু রাজধানী হইতে সুদূরবর্ত্তী পল্লিগ্রামের হিন্দু মুসলমান ভদ্রসমাজ তখনও জমিদারী মহাজনী শিক্ষা অপেক্ষা অধিক শিক্ষার আবশ্যকতা অন্তরের সহিত অনুভব করিতেন না। তাঁহারা ক্ষেতের ধান, গরুর দুধ ও পুকুরের মাছ খাইয়া এবং শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে বুঝ-প্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্তে দিনপাত করিতেন, শিক্ষার হেরেফেরে জাত খোয়ান অপেক্ষা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মূর্খ থাকা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। সুতরাং দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলে, তাহা যে দেশীয় লোকেরা খুব কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নয়।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন শিক্ষা সংস্কারের বিষয় লইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার চিন্তার ফলে যখন ইংরেজী শিক্ষার স্রোত বাঙ্গালার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঢেউ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সংস্কারের যুগেও বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ পল্লিসমূহে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পাঠ—সেই "সরস্বতী বন্দনা" ও "চাণক্য শ্লোকে"ই আবদ্ধ রহিয়াছিল। পল্লিগ্রাম সমূহে শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মিঃ এডাম (W. Adam) বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্তন জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে অনুরোধ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক মিঃ এডামকে তাহার এ প্রস্তাব যথারীতি আলোচনার জন্য লিখিয়া উপস্থিত করিতে

উপদেশ দেন। তদনুসারে ১৮৩৫ অব্দের ২রা জানুয়ারী মিঃ এডাম গবর্ণর জেনারেলের নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মিঃ এডামের এই প্রস্তাব আলোচনা করিয়া সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল ঐ অব্দের ২০শে জানুয়ারী এক মন্তব্য (minute) লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত মিঃ এডামকেই বাঙ্গালার পল্লিসমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বর্ত্তমান দেশীয় শিক্ষা প্রণালীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতে ও তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ প্রদান করেন।

১৮৩৫ অব্দের জানুয়ারী হইতেই মিঃ এডাম এই অনুসন্ধান কার্য্যে বঙ্গ ও বিহারের নানা জেলা ভ্রমণ করিতে থাকেন। এবং বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় শোচনীয় অবস্থার বিবরণ ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্টে প্রদান করিতে থাকেন। ১৮৩৮ অব্দের ২৮শে এপ্রিল তাঁহার শেষ রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। তাঁহার এ রিপোর্টে সকল প্রাদেশিক শিক্ষারই আলোচনা করা হইয়াছিল।

এডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্তও পূর্ব্ববঙ্গের কোন গ্রাম্য পাঠশালায় কোন মুদ্রিত পুস্তক পাঠ হইত না। ঐ সময় ঢাকায় ও তাহার চতুর্দ্দিকে মিসনারিদিগের ৮টী দেশীয় স্কুল ছিল, প্রথম প্রথম এই খৃষ্টান-স্কুলগুলির প্রতি দেশীয় লোকের একেবারেই শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু এখন এগুলিতে মোট ৬৯৭ জন বালক পাঠ করিতেছিল। কেবল এই মিশনারি স্কুলের বালকেরাই বাঙ্গালা ভাষায় খৃষ্টীয় উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেছিল।

উত্তর বঙ্গের রাজসাহী জেলা পরিদর্শন করিয়া এডাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন—'এ জেলার পাঠশালা গুলিতে ছাপার পুঁথি পড়ান দূরে থাকুক, আমি যে পুস্তকগুলি উপহার স্বরূপ স্কুলে দিয়াছিলাম,সে পুস্তক কয়েকখানা দেখিয়াই গুরুমহাশয়েরা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের বিস্ময়ের কারণ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহারা আর কখনও ছাপার পুঁথি দেখেন নাই। আমি এ অঞ্চলে কোথাও ছাপার পুঁথি দেখি নাই। কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাড়ীতে দুই এক খানা মুদ্রিত পঞ্জিকা দেখিয়াছি। এক স্থানে এক খানা মুদ্রিত খৃষ্টীয় উপদেশও দেখিয়াছি। বোধ হয় তাহা মুর্শিদাবাদ হইতে কোন প্রকারে পদ্মা পার হইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে মুদ্রিত পুস্তকই শুধু অপরিচিত তাহা নহে, প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যেও এই সকল পাঠশালায় পাঠ দেওয়া হয় না। মুখে মুখে সরস্বতী বন্দনাও শুভঙ্করীই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিষয়ে কলিকাতার সংশ্রবে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিল। এই দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গেরও অনেক স্থানে এডাম সাহেব মুদ্রিত পুস্তকের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার এক গুরু মহাশয়কে তিনি হস্তলিখিত গ্রন্থের সাহায্যে বালকদিগের পাঠ দিতে দেখিয়াছিলেন। এই পুঁথি—শুভঙ্করী, সরস্বতী বন্দনা, আরাধন দাসের প্রণীত "মানভঞ্জন" ও "রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন" প্রভৃতি। দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে স্কুলবুক সোসাইটীর প্রকাশিত 'চাণক্য শ্লোক,' "হিতোপদেশ", "নীতিকথা", "দিগ্দর্শন" মাসিক পত্র প্রভৃতিও পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে দেখিয়াছিলেন।

মোটের উপর এই সময় শিক্ষণীয় বিষয় পূর্ব্ব অপেক্ষা কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শতাব্দীর প্রথমভাগে কেবল সরস্বতীবন্দনা ও চাণক্য শ্লোকই পড়ান হইত, এখন মাঝে মাঝে দলিল, পাট্টা, তমঃশুক প্রভৃতির পাঠ, চিঠি পত্র লিখা, কাঠাকিয়া গণ্ডাকিয়া, ইত্যাদি লেখান ও মুখস্থ পড়ান হইত। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—জমিদারী তালুকদারী অথবা মহাজনী বুঝিয়া স্বাধীন ভাবে কারবার করা, অথবা জমিদার তালুকদার বা মহাজনের অধীন গোমস্তাগিরি করা। এগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিলেই পড়ুয়া উপযুক্ত বলিয়া বিদায় পাইত।

সে কালের গুরুমহাশয়দিগের উপযুক্ততা অনেক সময়েই তাঁহাদের দণ্ডের কঠোরতার উপর নির্ভর করিত। যে শিক্ষকের নামে ছাত্রের ভীতির সঞ্চার যত অধিক হইত, সে শিক্ষক ততখানি উপযুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতেন।

এই সময় ছাত্রদিগের প্রতি অমানুষিক দণ্ডের ব্যবস্থা

ছিল। আমরা লং সাহেবের সংগ্রহ হইতে তাঁহার সংগৃহীত পনরটী দণ্ডের পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

১ম দণ্ড—সম্মুখের দিকে হেলিয়া অবনত হইয়া দাঁড়ান। এই অবস্থায় পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে দুইটী মাটির চাকা রাখিতে হইবে। এই চাকা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে পড়িয়া গেলে অতিরিক্ত দণ্ড বেত্রাঘাত।

২য় দণ্ড—এক পদে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা নড়িলে, কাঁপিলে বা পা নামাইলে অতিরিক্ত দণ্ড।

৩য় দণ্ড—একটী পা ঘাড়ে তুলিয়া বসিয়া থাকা। বা ঘুঘু হাঁটা।

৪র্থ দণ্ড—মাটির দুইটী চাকার উপর বসিয়া মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে নোয়াইয়া দুই পায়ের নীচে দিয়া হাত নিয়া কাণ ধরিয়া রাখা।

৫ম দণ্ড—উপরে দড়ি বাঁধিয়া বালকের পদদ্বয় ঐ দড়িতে আবদ্ধ করিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া রাখা।

৬ষ্ঠ দণ্ড—হাত ও পা বাঁধিয়া বাঁধা হাতের দীর্ঘ দড়ি ধরণার (Beam) উপর দিয়া নৌকার পাল তুলিবার মত বালককে বদ্ধাবস্থায় টানিয়া উপরে উঠান।

৭ম দণ্ড—বিছুটী লাগান। বিছুটীর যন্ত্রণায় শরীর চুলকাইতে চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত দণ্ড।

৮ম দণ্ড—বিছুটী অথবা বিড়ালের সহিত একত্র ছালাতে বাঁধিয়া গড়াইয়া দেওয়া। ইহাদ্বারা বিছুটীর জ্বালা সহ্য করা এবং বিড়ালের কামড় ও আচর খাওয়া।

৯ম দণ্ড—উভয় হস্তের অঙ্গুলী একটীর মধ্যে আর একটী প্রবেশ করাইয়া দুইদিক দিয়া বাঁশের কঞ্চিদ্বারা বাঁধিয়া কষ্ট দেওয়া।

১০ম দণ্ড—নাকে খত্ অর্থাৎ বারংবার হাতে স্থান মাপিয়া নাকে চিহ্ন দিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যাওয়া।

১১শ দণ্ড—দোল খাওয়া। চারিজনে একটী বালককে চারি হাতে পায়ে ধরিয়া তার পর তাহাকে ঝুলাইয়া হঠাৎ দূরে নিক্ষেপ করা।

১২শ দণ্ড—সাক্ষী গোপাল। ২ জন বালক অপরাধীকে দুই কাণে ধরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া আনা।

১৩শ দণ্ড—নিজ হস্তে কর্ণদ্বয়কে টানিয়া প্রচুর লম্বা করা। লম্বা অপ্রচুর হইলে অতিরিক্ত দণ্ড।

১৪শ দণ্ড—নারিকেল ভাঙ্গা। দুই অপরাধীর মস্তকে মস্তকে সজোরে আঘাত।

১৫শ দণ্ড—সংখ্যা গণনা। সকলের প্রথমে যে বালক স্কুলে আসিবে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের বহনী হইবে। অর্থাৎ সে একটী বেত্রাঘাত লাভ করিবে। যে ২য় আসিবে সে দুইটী, যে ৩য় আসিবে সে তিনটী। এইরূপ যে যখন স্কুলে আসিবে তখন যতটী ছাত্র উপস্থিত হইয়াছে, ততটী বেত্রাঘাতের আস্বাদ পাইবে। বেত্রাঘাত প্রাপ্ত বালকই পরবর্ত্তী বালকের বেত্রাঘাতের সংখ্যা বলিয়া দিবে।

এইরূপে গুরুমহাশয়ের বেত্র তখন অবিরাম চলিতে থাকিত।

এতদ্ব্যতীত লাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ, অসুর ইত্যাদি হাস্যকর দণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল।

ক্রমশঃ—

সাহিত্য সম্মিলন।

(১)

এবার বাঙ্গালার বাহিরে, বিহারের বাঁকীপুরে বঙ্গের সারস্বত সন্তানেরা সমবেত হইয়া সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক যজ্ঞ সমাধা করিয়া আসিয়াছেন। অনেকে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে আজকাল এদেশে আর পরস্পরে তেমন সৌহার্দ্দ সম্প্রীতি, আদর সহানুভূতি নাই। তাঁহারা বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর কত প্রাণের টান, কত গভীর প্রেমানুরাগ তাহা এবার বাঁকীপুরে দেখিয়া আসলে তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহা নিশ্চয় স্বীকার করিতেন। মাতৃপূজা-মণ্ডপের প্রধান পুরোহিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবার মোহন কণ্ঠে যে আশার বাণী শুনাইয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, মাতৃভক্ত মনীষী যে ভাবে বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

এই সম্মিলন সবে দশম বর্ষে প্রদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু ইতি মধ্যেই এ তর্কও উত্থিত হইয়াছে যে এই

সম্মিলনের সর্থকতা কি? গত দশ বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষাধিক মুদ্রা যাহার জন্য ব্যয় হইয়াছে, তাহার সাফল্য সে হিসাবে কতটুকু? এ সংসারের সকল কার্য্যেই যাঁহারা শুধু টাকা আনা পয়সার সম্পর্ক রাখিয়া সফলতার সামঞ্জস্য দেখিতে চান আমরা অনেক সময় তাঁহাদের সহিত এক মতাবলম্বী হইতে পারি না। অনেক সাধু সংকল্পের সম্যক্ নিস্ফলতাও এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের এই এত সাধের ও স্নেহের সাহিত্য সম্মিলন শুধু কি নিস্ফলতারই নিদর্শন? যাঁহারা এরূপ কথা বলিতে সাহসী হন, তাঁহারা সম্মিলনে যোগদান করিলেও তাহার অভ্যন্তরে কোন দিন প্রবেশ করেন নাই, এবং প্রবেশ করিতেও প্রয়াসী হন নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় ভাষাকে সর্ব্বপ্রকারে সমুন্নত করিতে হইলে, জাতিকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মাতৃভাষার প্রতি সমগ্র দেশবাসীকে অনুরক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত করিতে হইলে এরূপ অনুষ্ঠান একান্তই আবশ্যক। সুধীবর স্যার আশুতোষও একথাই বলিয়াছেন। আর একথাও স্মরণ-যোগ্য যে এই সম্মিলন সম্পর্কেই আমরা স্যার আশুতোষ, ডাক্তার জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বিশ্ব-বিশ্রুত মনিষী বর্গকে মাতৃপূজার মণ্ডপে স্বস্ত্যয়নকারী পুরোহিতরূপে পাইয়া উপকৃত ও ও পুলকিত হইতেছি। তবে এই সম্মিলনের সূচনায় যাঁহারা ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে ইহার অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়াছিলেন সম্মিলন এখন সেই সংকল্পিত পন্থা হইতে যে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আজ পুরাতন অনেক কথাই মনে হইতেছে। বাঙ্গালা ১৩১০ সালে এই ময়মনসিংহে প্রথম সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণকে অহ্বান করা হইয়াছিল। তখন সাহিত্য পরিষদের প্রাণ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ লিখিয়াছিলেন "সারস্বত সম্মিলনের নিমন্ত্রণ পাইয়াছি। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রদর্শনী সামগ্রী-সহ যথাসময়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করিব। কি উদ্দেশ্য লইয়া সারস্বত সম্মিলন ও সাহিত্য প্রদর্শনী করিতেছেন, তাহার একটু আভাস প্রদান করিলে ও ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির গত ছাব্বিশ বৎসরের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ পাঠাইলে আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য অবগত হইতে পারি।" (সে বৎসর ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি সপ্ত বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল।)

এই পত্রের উত্তরে ব্যোমকেশ বাবুকে লিখা হইয়াছিল (১) স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, (২) স্থানীয় সাহিত্যসেবকগণের প্রণীত মুদ্রিত ও হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রদর্শন ও তদ্দ্বারা নব্য সাহিত্যসেবীগণকে উৎসাহ দান, (৩) এ জেলার পল্লিগ্রাম হইতে প্রাচীন পুথি ও প্রবাদ সংগ্রহ, (৪) দেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রীতি স্থাপন, (৫) সাহিত্য সেবার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন ও মাতৃভাষার গৌরব বর্দ্ধনই এই সারস্বত সম্মিলন ও সাহিত্য প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ আকস্মিক অসুস্থতা প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই সুতরাং সেবার ময়মনসিংহে শুধু সাহিত্য প্রদর্শনীরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এবং ময়মনসিংহের মৃত ও জীবিত লেখকগণের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তক নানা পল্লীগ্রাম হইতে সংগৃহীত প্রাচীন কবিদিগের হস্তলিখিত গ্রন্থ, নানা স্থানের ঐতিহাসিক চিত্র ও তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং যথাসময়ে ঐ সকল দ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল।

তাৎপর ১৩১১ সনে খুলনার ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ময়মনসিংহে আসিয়া এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান পত্রাদি লইয়া যান। তাহার উদ্যোগে খুলনাতেও এইরূপ একটী সাহিত্য প্রদর্শনী হয়। ইহার পর ময়মনসিংহের ন্যায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শিল্প প্রদর্শনীক্ষেত্রে একটী সাহিত্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

সাহিত্য প্রদর্শনীর সাফল্যে বঙ্গের সাহিত্যিক সমাজ সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু ময়মনসিংহের সারস্বতগণের সংকল্পিত সাহিত্য সম্মিলন পরিশেষে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৩১৪ সালে সর্ব্ব প্রথম কাশিমবাজারেই আহুত হয়। কাশিমবাজারের সম্মিলনের নির্দ্ধারিত

প্রস্তাবাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দ্বয়ই সম্মিলনের মূল লক্ষ্য বলিয়া অবধারিত হয়।

(১) বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান দ্বারা বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের ও ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ।

(২) বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার করা এবং প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থ ও লৌকিক সাহিত্য সংগ্রহ করা।

পরবর্ত্তী বৎসর রাজসাহীর সম্মিলনে আরও দুইটী প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

(১) বাঙ্গালার মানব তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবসায় ভুক্ত জনগণের বংশ হানি ও বংশ বৃদ্ধির গতি পর্য্যবেক্ষণ।

(২) বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ।

সাহিত্য সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন ক্রমে ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, চুচুড়া এবং চট্টগ্রামে মিলিত হয়। সুখের বিষয় সর্ব্বত্রই উপর্য্যুক্ত লক্ষ্যানুসরণ করিয়া সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। অতঃপর সম্মিলন বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায় কেন্দ্রস্থ হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজধানীর রজোবাহুল্যে সম্মিলনের সার কথা পরিত্যাগ করিয়া ভেদবুদ্ধির প্রাবল্যে সাহিত্যিকগণ সেখানে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। মিলনই যাহার মূলমন্ত্র ছিল ভেদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাহা বিলীন হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বোল্লিখিত প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলিও একেবারে পরিত্যক্ত হয়।

সম্মিলনের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বর্ত্তমান সময়ে অনেকের নিকট সম্মিলনের প্রকৃত সফলতা এই কয়টীর উপর নির্ভর করে বলিয়া বোধ হইতেছে—(১) অভ্যর্থনার আতিশয্য (২) আহার্য্যের প্রাচুর্য্য (৩) নিমন্ত্রিত ব্যক্তবর্গের মনোরঞ্জন (৪) অভ্যাগতের সংখ্যাধিক্য (৫) সভাপতির নাম গৌরব (৬) অধিবেশনে জন বাহুল্য (৭) প্রাপ্ত প্রবন্ধের প্রাচুর্য্য। সাহিত্য সম্মিলনের সূচনায় যাহা মূল উদ্দেশ্য ছিল, আজ তাহা সম্মিলনের আলোচনার অযোগ্য এবং অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি?

মাংস মিষ্টান্ন এবং গীত বাদ্য অপেক্ষাও সাহিত্যিকদিগের মধ্যে পরস্পর পরিচয় প্রসঙ্গ, প্রীতি সৌহার্দ্দ সংস্থাপন এবং ভাব বিনিময়ই সাহিত্য সম্মিলনের অধিকতর প্রলোভনের সামগ্রী। দুঃখের সহিত এ কথা না বলিয়া পারিতেছি না যে সুপরিচিত সাহিত্যিকেরা অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সাহিত্যিকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। মফস্বলের সাহিত্যিকগণ পরিচিত হইবার প্রত্যাশা করিয়া নামজাদা সাহিত্যিকদিগের সম্মুখীন হইলে তাহারা অকস্মাৎ এত অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বসেন যে তাহা সে বেচারাদিগকে "ঘরের পয়সা খরচ করিয়া বনের মহিষ তাড়াইবার" পণ্ডশ্রমের কথা পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেয়।

অহঙ্কার বা তথা কথিত আত্মমর্য্যদাভিমানে আজকাল অনেক সাহিত্যিক মোহান্ধ বলিয়া দেশে যে একটা অপবাদ রহিয়াছে তাহা যে অমূলক, কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা স্বদেশ ভক্ত, সমাজহিতৈষী, বয়োবৃদ্ধ সংস্কারক তাহাদের চরিত্র ও ব্যবহারে এরূপ বালবুদ্ধির পরিচয় পাইলে বিস্মিত ও ব্যথিত না হইয়া গত্যন্তর নাই।

অত্যধিক আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তদনুযায়ী পরনিন্দা এখন আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের আর এক মহাশত্রু হইয়া দাড়াইয়াছে। কতিপয় ব্যক্তির ঔদ্ধত্য এবং উৎকট আত্মাভিমান সাহিত্য সমাজে যে অনল উৎপন্ন করিয়াছে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে কালে এই অনল শিখা বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সুখ শান্তি, স্বস্তি, শুদ্ধ, পুষ্টি-প্রসার, সবই বুঝি ভস্মসাৎ হইবে। যাঁহারা শান্তি বারি সেচন করিয়া সাহিত্য সমাজকে শীতল ও সুরভি পূর্ণ করিবেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বঙ্গ বিভাগে বাঙ্গালা জাতি বড়ই বিচলিত হইয়া বুদ্ধিভ্রান্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিকেরা যে ভাবে বঙ্গ সাহিত্য জননীর অমলাঙ্গে অস্ত্রোপচার চেষ্টা করিয়া রক্ত রেখার বিকট বর্ণে তাহাকে চিত্রিত করিতেছেন তাহা দেশের অবস্থাভিজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন। আমরা সে জন্য অত্যন্ত মর্ম্মাহত। এ ব্যাধির আশুপ্রতিকার অত্যাবশ্যক।

সাহিত্য সম্মিলনকে আমরা প্রাণের প্রিয় বলিয়াই প্রীতির চক্ষে দেখি এবং তাহার সর্ব্বদাই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। বিধাতার কৃপায় সর্ব্বপ্রকার ঈর্ষা বিদ্বেষ অযথা আত্মপ্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস এবং আত্মম্ভরিতার অশুভ সংস্পর্শ হইতে সর্ব্ব প্রকারে দূরে থাকিয়া রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় সাহিত্য সম্মিলন সুপরিচালিত এবং সার্থকনামা হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শ্রী :—
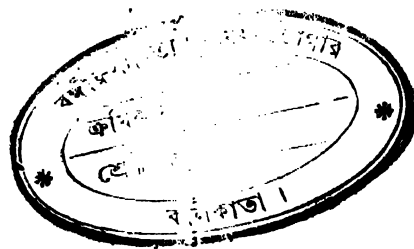
বাঁকিপুর সাহিত্য সম্মিলনে সমাগত সাহিত্য-সেবকগণ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২৩। পঞ্চম সংখ্যা।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মাসোন্ গণোনিতে আমাদিগকে ৯ দিবস থাকিতে হইয়াছিল। এই স্থান ইউগণ্ডা সীমান্ত হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা সংবাদ পাইলাম যে, ব্রিটিশ্ পূর্ব্ব আফ্রিকা ও ইউগণ্ডার সীমান্তের নিকট এক অসভ্য জাতি বিদ্রোহভাব অবলম্বন করিয়াছে। ঠিক কি জন্য এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম যে, তাহারা মেদি নামক এক প্রকাণ্ড গ্রাম লুট করিয়াছে এবং সেখানকার চারি জন য়ুরোপীয় পাদরী ও দুইজন ইংরাজ ব্যবসায়ীকে হত্যা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কয়েক জন দেশীয় খ্রীষ্টানকেও মারিয়া ফেলিয়াছে। মেদিতে একজন সাহেব সামরিক কর্ম্মচারী (সার্জ্জেণ্ট) ও ২২ জন দেশী সিপাহী ছিল। তাহাদের যে কি পরিণাম হইল, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল না। তবে আমাদের অনুমান, তাহারা হয় সকলে হত হইয়াছে, নতুবা কতক হত ও কতক বন্দী হইয়াছে। ঐ স্থানে একজন ইংরাজ রমণী ছিলেন; তাঁহারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আমাদের সঙ্গের সাহেব দুইজন রাজার সাহায্যে মাসোন্ হইতে একদল সৈন্য গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৩ দিনের মধ্যে উঁহারা ১৩০ জন দেশী লোককে ড্রিল শিখাইয়া এক রকম কার্য্যক্ষম করিয়া লইলেন। আমার বোধ হইতেছে এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াই কাপ্তেন ও ডাক্তার সাহেব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে ইউগণ্ডা অভিমুখে যাইতেছিলেন। তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, "যদি বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেছিলেন, তবে সঙ্গে সৈন্যাদি লন নাই কেন?" ইহার উত্তর এই যে, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন সীমান্তের লোকেরা বিদ্রোহী হইবার যোগাড় করিতেছে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেই, সমস্ত জায়গায় শান্তি স্থাপিত হইবে। এত শীঘ্র যে উহারা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহী হইবে তাহা তাঁহারা ভাবেন নাই।

তাঁহারা যে এই অশান্তির কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতেন তাহার এক প্রধান প্রমাণ এই যে, আমরা মাসোনে উপস্থিত হইবার ৩ দিন পরে মোম্বাসা হইতে ১৫০ সিপাহীর উপযুক্ত ইউনিফরম, বন্দুক প্রভৃতি ঐস্থানে আসিল। আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত দ্রব্য আসাতে বেশ স্পষ্টই জানা গেল যে, এ সকল বন্দোবস্ত করিয়াই তাঁহারা মোম্বাসা ছাড়িয়া ছিলেন।

যাহা হউক, সাহেবেরা যখন এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন আমি ও রতিকান্ত মাসোন হইতে ৭ মাইল দূরে এক অদ্ভুত কূপ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই কূপের অস্তিত্ব কেবল এই গ্রামের মধ্যে-রাজা, তাঁহার প্রধান পুরোহিত, পুরোহিতের দুইজন সহকারী ও রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। এতদিন পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের কথা বিশেষ সাবধানের সহিত গোপন রাখা হয়। প্রধান পুরোহিত মহাশয় কোনও কারণ বশতঃ আমার উপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া উহার কথা আমার নিকট প্রকাশ করেন। তদনুসারে তাহার পর দিবস পুরোহিত, তাঁহার একজন সহকারী, রতিকান্ত ও

আমি উহা দর্শন করিতে যাত্রা করি। পথি মধ্যে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে আমরা প্রত্যেকে একটা করিয়া রিভলভার গোপনে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম।

বেলা ১১টার সময় আমরা গ্রাম ত্যাগ করিলাম। প্রায় ৩৫ মাইল জঙ্গলের ভিতর দিয়া গমন করিয়া এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। ঐখানে ঝোপের মধ্যে একখানা বড় পাথর ছিল, কি কৌশলে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, প্রধান পুরোহিত ঐ পাথর খানা সরাইয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, মৃত্তিকার মধ্যে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে পাথর খানা আবার সরাইয়া দেওয়া হইল। সমস্ত পথ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন পুরোহিত একটা আলো জ্বালিয়া দিলেন। উহার ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে আমরা অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। খানিক দূর গমনের পর আমরা পুনরায় সূর্য্যালোকে উপস্থিত হইলাম। তখন আমাদের পথের দুইদিকে উচ্চ পাহাড়ের মধ্যস্থলে খুব সঙ্কীর্ণ পথ।

খানিক দূর গিয়া আমরা একটা ছোট স্রোতস্বিনী দেখিতে পাইলাম। উহার দক্ষিণ কিনারা দিয়া প্রায় এক মাইল গমনের পর আমরা এক নাতি বিস্তৃত হ্রদ দেখিতে পাইলাম। সহসা দেখিলে মনে হয় ইহা যেন একটি কূপের মধ্যে অবস্থিত। তাহার কারণ এই যে, যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম, সেদিক ছাড়া ঐ হ্রদের চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বতের প্রাকার। উহার জল খুব গভীর বলিয়া মনে হইল। পুরোহিত বলিলেন মধ্যস্থলে উহার গভীরতা প্রায় ৬০।৭০ হাত। জলের মধ্যে বড় বড় কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। সমস্ত হ্রদটা নানাপ্রকার মৎস্যে পরিপূর্ণ। উহাদিগকে কেহ হিংসা করে না বলিয়া উহারা আমাদের হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্য বিনা সঙ্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিল।

ইহার গভীর অংশে বহুতর জল সর্প বাস করে। দেখিলাম, হ্রদের একদিকে ঠিক জলের উপর একটা প্রকাণ্ড অজগর সর্প কুণ্ডলি পাকাইয়া শয়ন করিয়া আছে। আমরা যখন ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন সে একবার মাথা তুলিয়া আমাদিগকে দেখিল, তাহার পর আবার শয়ন করিল। অনুমানে বোধ হইল সর্পরাজ দৈর্ঘ্যে ৩০ হাতের কম হইবে না। শুনিলাম, হ্রদের মৎস্যাদি খাইয়াই ইহা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

হ্রদের আর একদিকে দেখিলাম, ঐ প্রকার আর একটা পাথরের উপর এক বৃহৎ চিতাবাঘ শয়ন করিয়া আছে। সেও একবার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল। পুরোহিত বলিলেন যে এটাই হ্রদের রক্ষক। যদি কোনও অনধিকারী লোক এই স্থানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহারা তাহার প্রাণনাশ করে কিন্তু যাহাদের আসিবার অধিকার আছে, তাহাদিগকে কিছু করে না।

যে স্থানে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম উহার এক পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র গোলাকার মধ্যস্থলে ছিদ্র করা প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত ছিল। উহা সিঁদূর ও নানাপ্রকার পুষ্পমণ্ডিত। শুনিলাম, ইহার নাম "ঈমুমা" অথবা জীবনের বা জননীর মুখ। এতক্ষণ বলি নাই, এই হ্রদের নাম "জীবনের হ্রদ"। কেন ইহার এমন নাম হইল, তাহা পরে বলিতেছি।

এই অঞ্চলের লোকদের নিয়ম, বিবাহের ঠিক পরে বর ও কন্যাকে পুরোহিত মহাশয়ের সহিত এই হ্রদে আসিয়া এই গোলাকার পাথরের সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইতে হয়। তাহার পর উহারা প্রার্থনা করে যেন উহাদের দুইটী পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে রমণীর পুত্র না হওয়া এক বিষম দুর্ঘটনার ও বিপদের কথা। সকলে স্থির করে যে, ঐ স্ত্রীলোকের উপর হয় দেবতার কোপ পড়িয়াছে, নতুবা কোনও অপদেবতা উহাকে আশ্রয় করিয়াছে। সেইজন্য ঐ হতভাগিনীকে গোপনে কেহ বিষপ্রয়োগে হত্যা করে না। প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে আর একটি প্রথার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আফ্রিকার অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, পুত্রবধুর উপর শাশুড়ির অপ্রতিহত ক্ষমতা। শাশুড়ির অবাধ্য হওয়া এদেশে অত্যন্ত ভীষণ অপরাধ। ইহার জন্য শাশুড়ি বধুকে যে ভাবে ইচ্ছা সাজা দিতে পারে, এমন কি ইহার জন্য যদি সে বধুকে হত্যাও করিয়া ফেলে তাহার জন্য সমাজের কেহ একটি কথাও বলিবে না।

কখন ২ শাশুড়ি বধুর উপর কুপিত হইয়া তাহাকে অপুত্রক হইবার অভিশাপ দেয়। এদেশে রমণীর পক্ষে

ইহার তুল্য অভিশাপ আর নাই। এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইলে স্বামী-স্ত্রী পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া এই হ্রদে উপস্থিত হয় ও দেবীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সন্তান প্রার্থনা করে। কিন্তু দেবীর সন্তোষের জন্য ছাগ, মুরগী প্রভৃতি বলি না দিলে দেবী তাহাদের উপর প্রসন্ন হন না। বলির পর পুরোহিত হ্রদ হইতে খানিকটা জল লইয়া রমণীর অর্দ্ধাঙ্গে ছড়াইয়া দেন। আমাদের দেশের ষষ্ঠী পূজার পর ঠিক যেন শান্তি বারি সেচন।

এইখানে বলিয়া রাখি যে, পূজা প্রদানের পর যদি সন্তানের মুখ দেখে, তাহা হইলে উহার মস্তকের প্রথম চুল কাটিয়া আনিয়া দেবীকে উপহার দিয়া থাকে। আমাদের দেশেও দেব দেবীকে সন্তানের চুল দিবার প্রথা আছে। এই সমস্ত ব্যাপারে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমি ও রতিকান্ত দুইজনেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। রতিকান্ত আমাকে বলিল যে, তাহাদের দেশে (বঙ্গ দেশে) ষষ্ঠীদেবীর সহিত এই হ্রদের ঈসুমার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ রমণী সন্তান হইবার জন্য এবং সন্তান হইলে তাহার মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীদেবীকে বিবিধ প্রকারে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। এদেশের রমণীরাও ঠিক ঐ অভিপ্রায়ে ঈসুমার পূজা করিয়া থাকে।

ইহার পর আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার সময় পুরোহিত মহাশয়ের নিকট এই হ্রদ ও দেবীর উক্তির সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনিলাম তাহা এই :—

অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে একবার আম্বাসী অবুমো। (এই শব্দের প্রকৃত অর্থ 'বজ্রধারী দেবতা' অর্থাৎ ইন্দ্র) আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এইস্থানে আহ্বান করিয়া এই হ্রদ ও প্রস্তর খণ্ড দেখাইয়া দিয়া কহিলেন "এইস্থান তোমাদের সন্তানদের রক্ষার জন্য আমি করিয়াছি। এখানকার দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তোমাদের বংশ অক্ষয় হইবে এবং তাহার কেহ কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমাকে যদি তোমরা সন্তুষ্ট করিতে চাও, তবে প্রথমে এই দেবীকে পূজা করিবে। এই হ্রদে যে মৎস্য দেখিতেছ ইহারা তোমাদের জীবন। যতদিন ইহারা থাকিবে ততদিন তোমাদের বংশ ক্ষয় পাইবে না। এইজন্য ইহাদিগকে কখনও নষ্ট করিও না।"

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি কয়েকজন বিশিষ্ট লোকব্যতীত ইহার অস্তিত্বের কথা কেহই জানে না। এখানে যাহারা পূজা দিতে আসে, তাহাদিগকে চক্ষু বন্ধ করিয়া আনা হয়। এখানে আসিবার পথ, হ্রদ প্রভৃতি তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

মহাপুরুষদের মৃত্যু।

মহম্মদের মরণে ব্যথিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া পরমভক্ত আবু বকর বলিয়াছিলেন—'তোমরা কি কোরাণের সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ—মহম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ মৃত্যুর অধীন ছিলেন; মহম্মদ তোমাকেও একদিন দেহ-ত্যাগ করিতে হইবে!" মরণটা এমন একটা নিত্য অপরিহার্য্য ধ্রুব জিনিষ হইলেও মানুষ ঠিক সাম্না সাম্নি ভাবে তাহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে পছন্দ করে না; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে এই নিত্য সঙ্গীর সহিত আদান প্রদান না করিয়া চলিবার উপায় নাই। মৃত্যুর নামটা পর্য্যন্ত মোলায়েম করিয়া মিঠ'লো ভাষায় উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা শত মুখে বলিতেছেন মরণকে ভয় করিও না।

মৃত্যোর্বিভেষি কিংবাল।
　　ন স ভীতো বিমুঞ্চতি।
অদ্য বাব্দ শতান্তে বা
　　মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।

মরণের পরপারে ধ্রুবলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক ও সূর্য্যাদি লোক শত সুখের হাট বসাইয়া বসিয়া আছে। মরণের পারে এমন উদ্যান মানুষের জন্য আছে, যাহার উর্ব্বর শস্য শ্যামল বক্ষঃ দিয়া মৃদু গামিনী কল্লোলিনী সুধা স্রোত ঢালিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেখানে যে সুখ তাহার তুলনায় এ মর্ত্ত্য সুখ অতি নগণ্য অতি মাত্র নশ্বর। মৃত্যুকে কোন ক্রমে অতিক্রম করিতে পারিলেই মানুষ এমন দেশে যাইবে, যেখানে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ

জনিত মর্ম্মদাহী দুঃখ তাপে দগ্ধ মানবের করুণ আর্ত্তনাদে সে অমর ভূমির অধর সঞ্চারী সমীরণবক্ষ: বিকম্পিত হয় না। ঈদৃশ শাস্ত্রবাক্য নানা মুখে পুষ্পিত, নানা ছন্দোবন্ধে অবিরত মানবের কর্ণে নীত হইতেছে। কিন্তু মানুষ হিসাবী পুরুষের মত হাতের পাখী ছাড়িয়া ঝোপের পাখীর জোড়া ধরিতে ব্যস্ত নহে। সে এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, দুঃখ জ্বালা জড়িত ও বিয়োগ বেদনা-বন্ধুর বসুমতীর উষর বক্ষ: আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার জন্যই ব্যাকুল।

"মরণ আমার মরণ তুমি কও আমারে কথা' কিংবা 'প্রস্তুত সতৃষ্ণ আছি তোমার কারণ। এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন" ॥ এমন মধুর এবং সাদর সম্ভাষণ মানুষের তরফ হইতে যমরাজ খুব কমই পাইয়া থাকেন।

যে অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্ম-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, আত্মা অচ্ছেদ্য-অদাহ্য-অক্লিষ্ট এবং জরা মরণ রহিত মধুসূদনের মুখ-মারুতে প্রপূরিত হইয়া পাঞ্চ-জন্য সুগভীরে উক্ত সুমহান্ সত্য যাঁহার হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুনই শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দ্বারাবতী হইতে ফিরিয়া আসিয়া—'মহারাজ! আমরা বন্ধু-রূপী ভগবান্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি' এই কথা বলিতে ২ যুধিষ্ঠিরের চরণ মূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যে পরে কা কথা। সুতরাং মহাপুরুষগণের শিষ্যেরা যাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তাঁহার বিয়োগ কাহিনী বলিতে যাহারা যে দ্বিধা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

মহাপুরুষদের অনেকেরই অপঘাত মৃত্যুতে দেহান্তর ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহারা নবীনতার যে বর্ত্তিকা লইয়া অবতীর্ণ হন, তাহার প্রখর শিখা সংস্কারান্ধ সমাজের ক্ষীণ চক্ষু আঘাতিত করে। সে আলোক তাহাদের চক্ষুর পক্ষে হিতকর হইলেও শিশু যেমন চিকিৎ-সকের ঔষধ পথ্যাদি সঞ্চারকে শত্রুবোধে সন্ত্রস্ত করিতে চায় তেমন অন্ধ মানব সমাজও মহাপুরুষগণের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। অপঘাত মৃত্যু সর্ব্ব শাস্ত্রেই নিন্দিত হইয়াছে; মহাপুরুষগণের ভক্তেরা সম্ভবতঃ তজ্জন্যই নানা কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের ইষ্টদেবের মৃত্যুকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা ছাড়া মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য সমধিক বর্দ্ধিত হইবে এই বোধেও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ তাঁহাদের মৃত্যুকে অতি মানুষিক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ-বিদ্ধ-শরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি কেহ স্বেচ্ছায় কি ভ্রম ক্রমে শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। শাস্ত্রকারগণের মতে লতা মণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে মৃগমনে করিয়া ব্যাধের সেই গুরুঘাতী অস্ত্র তৎপ্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে কাহারো কাহারো মত, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালীন বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড বহুল ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে আভিজাত্য ও অতি মাত্র পৌরহিত্যপ্রভাব বিবর্জ্জিত নবীন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সংস্থাপন করাই তাঁহার মহৎ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় হয়ত তাঁহারও মত ছিল "পার্শ্বেই যখন জীবন এবং সত্যের নদী বয়েযাচ্ছে, তখন আর তৃষ্ণার্ত্ত লোকগুলোকে নর্দ্দমার পচাজল খাওয়ান কেন! ইহা মনুষ্যোচিত স্বার্থপরতা ব্যতীত অপর কিছুই নয়।" এজন্য তাঁহার শত্রু জুটিয়াছিল যথেষ্ট। সম্ভবতঃ তাহাদের কাহারো প্ররোচনায় পড়িয়া কেহ উক্ত মহাপুরুষকে গুপ্ত ভাবে হত্যা করিয়া স্বীয় জঘন্য মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছিল।

পুরাণে ইহাও আছে, লোক শিক্ষার জন্যই ভগবানের অবতার। ভগবান ত্রেতাযুগে রাম অবতারে বালীকে গুপ্ত ভাবে শরদ্বারা নিধন করিয়াছিলেন। পর অবতারে তিনি নিজেও শরবিদ্ধ অবস্থায় মরণের ছলা করিয়া মানুষকে দেখাইলেন—স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ নিতান্ত অপরিহার্য্য। বালীর পুত্র অঙ্গদই নাকি পর জন্মে ব্যাধ হইয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ হইয়াছিল। সুরথ লক্ষ বলি দিয়াছিলেন—দেবীর আরাধনার্থে। মৃত্যু কালে সেই লক্ষ জানোয়ার খাঁড়া ধরিয়া তাঁহাকে কাটিতে আসিয়াছিল। দেবী তাহা রোধ করিতে পারিলেন না, কেবল ভক্তের কষ্টের যাহাতে লাঘব হয়, তাহার জন্য প্রায়-শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা একটু পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন মাত্র। ভক্ত কীর্ত্তনীয়া রসিক একদিন গাহিয়াছিলেন—

'ব্যাধের বাণ ছলা করি মিশ্‌লো
নীলজ্যোতিঃ নভোস্থলে
পূর্ণ ব্রহ্ম তাঁরে সাধে কি বধে ?'

শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যুটাও রহস্য বিশেষ। কালপুরুষের নিকট রামচন্দ্র যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী তাঁহাকে প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণকে বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। অগ্রজ-প্রাণ-সৌমিত্রী রাঘব কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া সরযূর তট দেশে গিয়া প্রাণ-বায়ু রোধ করতঃ দেহত্যাগ করিলেন। তারপর, পড়িয়া গেল, দলে দলে মরণের পালা। শ্রীরামচন্দ্র ভরত শত্রুঘ্ন সহকারে লক্ষ্মণের অনুগামী হইলেন। তাঁহার সহচর অনুচর যেখানে যত ছিল, তাহারাও কাতারে কাতারে আসিয়া সেই সাথের সাথী হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুকেও সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক বলা যায় না। যদি তিনি চণ্ডের উপরোধে পড়িয়া তৎপ্রদত্ত শুষ্ক শূকর-মাংস ভোজন না করিতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। মহাত্মা কবীরের মৃত্যুও কিছু বিশেষত্ব যুক্ত হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে কবীরের দেহান্তর ঘটিলে তাঁহার শব লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবে কাহারা? কবীর নাকি তখন দেহ ধারণ পূর্ব্বক বিবদমানগণের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া বলেন 'তোমরা শব আবরণ উঠাও'! তাহারা মৃতদেহের আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া দেখে, তাহার নিম্নে গুচ্ছে গুচ্ছে সুগন্ধ কুসুম বিন্যস্ত রহিয়াছে! পরিশেষে হিন্দু এবং মুসলমানেরা তথা হইতে কিছু কিছু পুষ্প লইয়া গিয়া স্ব স্ব শাস্ত্রানুযায়ী মহাপুরুষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিল।

খ্রীষ্টের তিরোভাব ব্যাপারও স্বল্প বিস্তর পরিকল্পনার সংশ্রবযুক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে আছে, খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে ইহুদী রাজের আদেশানুযায়ী ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই প্রশান্তাত্মা বিগতভী শিব-সমাধিস্থ মহাপুরুষের অমর-মরণ-বরণ-চিত্র বড়ই সুন্দর এবং উজ্জ্বল। মহানারকীর চিত্তও তাহার কাছে দ্রব হইয়া যায়, পাষাণও বুঝি স্পন্দিত হইয়া উঠে। খ্রীষ্টের দেহ ত্যাগের পর তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ও তদীয় মাতা মেরী বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া মৃত দেহটী অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিবার জন্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। সমাধিস্থল হইতে বিদ্যুদ্দাম-স্ফূর্ত্তি তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর খ্রীষ্ট-সমুত্থিত হইয়া তদীয় পিতা ঈশ্বরের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়েন। শিষ্যগণ সমাধিস্থলে গিয়া দেখিতে পান সমাধিস্থল উন্মুক্ত, তদ্দর্শনে তাঁহারা নিতান্ত চিন্তাকুল এবং দুঃখিত হইয়া আক্ষেপাদি করিতেছেন ইতোমধ্যে যীশুখ্রীষ্ট তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিলেন। তিনি তদীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ শিষ্যবর্গকে নানা উপদেশ দিয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কোরাণে আছে — ইহুদীরা পয়গম্বর ঈশাকে চাতুর্য্য বলে বিড়ম্বিত করিতে গিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বিড়ম্বিত করিলেন। মুসলমানগণের বিশ্বাস ঈশ্বর ঈশাকে কৌশল করিয়া স্বর্গে তুলিয়াছিলেন। অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার আকৃতি যুক্ত হইয়াছিল, ইহুদীরা তাহাকেই নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়া হত্যা করিয়াছিল। কেহ বলেন ঈশা যখন অলিভ পর্ব্বতে ছিলেন, তখন একটা ঘূর্ণিবায়ু উঠিয়া তাঁহাকে স্বর্গে তুলিয়া লয়। কাহারও মতে যে ব্যক্তি ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছিল সে—ঈশাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য যে সকল গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে একজন। কেহ বলেন যুদাসের নির্দেশ ক্রমে যে ব্যক্তি যীশুকে গবাক্ষ দ্বার দিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারই ভাগ্যে উক্ত দণ্ড ভোগ ঘটিয়াছিল। আবার কাহারও মতে দণ্ডিত ব্যক্তি অপর কেহই নহে; ত্রিংশৎ খণ্ড রৌপ্যমুদ্রার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া যে যীশুর বধের উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিল সে ভ্রষ্টাচার যুদাস নিজেই।

তাঁহারা ইহাও বলেন, পয়গম্বর ঈশা—তাঁহাকে ভ্রমে অন্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়া গেলে—তদীয় বিয়োগ বিমূঢ় স্বজনগণকে প্রবোধনার্থ পুনরায় মর্ত্ত্যভূমে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'দেখ' ইহুদীরা কেমন বিড়ম্বিত হইয়াছে!" তৎপরে পুনরায় তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোরাণের ইংরেজী অনুবাদক সেল্ বলেন, অনেকের ধারণা মহম্মদই সর্ব্বাগ্রে যীশুর দেহান্তর সম্বন্ধে উক্ত মত প্রকাশ করেন কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। মহম্মদের বহুপূর্ব্ব হইতেই দেশ বিশেষে যীশুর মৃত্যু সম্বন্ধে উক্ত মত পোষিত হইয়া আসিতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত

প্রাগ্ ভাগেই লোকের এই ধারণা ছিল যে সিরেনিয়া প্রদেশবাসী সিমন যীশুর পরিবর্ত্তে দণ্ডিত হইয়াছিল। ফোটিয়াসের লেখা হইতে জানা যায়, যে তিনি 'শিষ্যবর্গের ভ্রমণ' নামক একখানা পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উহাতে পিটার, জন এনড্রু, টমাস, এবং পলের সম্বন্ধে নানা বিষয় উল্লেখ আছে,—তন্মধ্যে এই কথাটিও আছে—যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল না——সে হইয়াছিল অন্য ব্যক্তিকে। যিশু দণ্ড-বিধাতৃগণের এই বিষম ভ্রান্তি দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই'।

তিনি আরও বলেন——Gospel of Barnabas নামক একখানা কোন অজ্ঞাত নামা খ্রীষ্টানের লিখিত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়; তাহার আদ্যোপান্ত ভ্রমসঙ্কুল অবিশ্বাস্য ঘটনায় পূর্ণ। কোন কোন মুসলমান শাস্ত্রভাষ্যকারেরা সম্ভবতঃ তাহা হইতে বিড়ম্বিত হইয়াছেন। উক্ত পুস্তকে আছে—যখন ইহুদীরা উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া যীশুকে ধরিবে এরূপ অভিসন্ধি করিতেছিল, যীশুকে তন্মুহূর্ত্তে জিব্রায়েল, মাইকেল, র‍্যাফেল এবং ইউরিয়েল এই চারিজন দেবদূতের সাহায্যে তৃতীয় স্বর্গে তুলিয়া লওয়া হয়। পৃথিবীর ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহান্তর ঘটিবে না। যুদাসই যীশুর পরিবর্ত্তে ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। ঈশ্বরের প্রভাবে ইহুদীরা যুদাসকেই যীশু মনে করিয়া বিচারার্থ পাইলেটের নিকট লইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা তাহাকেই হত্যা করিয়া দগ্ধ করিয়াছিল। যুদাসের আকৃতি এরূপভাবে যীশুর সহিত মিলিয়া গিয়াছিল যে যীশুর শিষ্যবর্গও সে রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এমন কি খ্রীষ্টমাতা মেরীও পুত্রশোকাতুরা হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে যীশু ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মর্ত্ত্য ভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের ভ্রান্তির নিরসন করিয়াছিলেন।

যীশু মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইলে উক্ত শাস্ত্রকার বারনাবাস [illegible] তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন 'ভগবন্, আপনার ন্যায় [illegible] শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের জননী ও শিষ্যবর্গের [illegible] আপনার এরূপ কষ্টদায়ক মৃত্যু হইতে পারে—ক্ষণেকের [illegible] ধারণা হওয়া বিসদৃশ। কথিত আছে যীশু [illegible] বলিয়াছিলেন 'দেখ, ঈশ্বর পাপে বিরক্ত হন। আমার শিষ্যবর্গ ও জননী আমাকে পার্থিব মায়িক ভাবে ভাল বাসিয়াছিলেন। ঈশ্বর কঠোর পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীতেই যে আসক্তির দণ্ড বিধান করিলেন সুতরাং তাহাদিগকে আর দেহান্তরে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে না।"

আমার পক্ষে আমি স্বয়ং নিষ্পাপ এবং জাগতিক শুভাশুভে নির্লিপ্ত; কিন্তু অপরে আমাকে অযথা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরপুত্র এই সকল আখ্যাদান করিয়াছে, তজ্জন্য আমাকে শেষ বিচারের দিন সয়তানের বিদ্রূপ ভাজন হইতে হইত। দয়ালু ঈশ্বর মর্ত্ত্যধামেই লৌকিক শাস্তির ছলে ইহুদীগণের দ্বারা আমাকে বিদ্রূপিত করিয়াছেন; তাহাতে আমার উপর তাঁহার যে প্রগাঢ় স্নেহ আছে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরদূত মহম্মদ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বর বিশ্বাসীগণের ভ্রমান্ধতা দূর করিবেন, তাবৎ লোকে আমি যে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছি, এ ধারণা মূলতঃ নিতান্ত ভ্রান্ত হইলেও বিশ্বাস করিবেই।

শ্রীচৈতন্য দেবের জীবনী লেখকগণ গৌর-বিরহের গুরু দুঃখভার ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। সেখানে আসিয়া তাঁহাদের ভাবময়ী লেখনী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এজন্য মহাপ্রভু কোথায় এবং কি ভাবে যে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গেরগণে॥

অতঃপর জালিয়ার জালে গৌরের দেহ উত্তোলিত হইয়াছিল। তিনি পুনর্ব্বার সংবীত হন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রভুর অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু নাই। ঠাকুর লোচনদাস লিখিয়াছেন—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে;
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর,
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার।
কৃপাকর জগন্নাথ পতিত পাবন!

কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ।
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়,
বাহুভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়।
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে,
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।

কাশী মিশ্রের গৃহত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু সিংহদ্বার পথে শ্রীমন্দির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন। সেইখানেই তদীয় প্রাণারামের মনোমোহন মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রপটে স্ফূরিত হইয়া উঠে। ভাবোন্মাদ গৌর মহাভাব-সমাধিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়া গেলেন। পরম ভাগবতের উজ্জল প্রেমাবেগময় চরিত্র-চিত্র জগতে জীবন্ত আদর্শ হইয়া রহিল।

মহাত্মাদের মৃত্যু-দৃশ্য বড়ই সুন্দর এবং সুমহান্। ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাসী মহাসাধক শান্ত এবং স্থিরচিত্তে আপনার জীবন বিশ্বদেবতার পদে অর্ঘ্যস্বরূপে সপিয়া দিতেছেন। সে অবদান ভঙ্গী কি সুগভীর শ্রদ্ধাভারে ভূষিত ও সংশয় শূন্যতার ভাস্বর জ্যোতিতে মধুর। ভাবিলে চিত্তের গ্লানি দূর হয়। আর্জ্জবের আবেশে অন্তরাত্মা পুলকে স্পন্দিত হইয়া উঠে। মহাপুরুষগণের স্বভাব, সুন্দর মৃত্যু-চিত্র মানবের পাপ তাপাপহারী; তাহাকে আর কৃত্রিমতার ভারে ভূষিত করিতে যাইবার কোনই প্রয়োজন হয় না; বরং তাহাতে তাহার স্বতঃ সৌন্দর্য্যের হানি হয়। কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনংনাকৃতীনাম্।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

কবি সদাশিব মজুমদার।

ময়মনসিংহ জিলার গফরগাঁও হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে উথি গ্রাম। এই গ্রামের সদাশিব মজুমদার মহাশয় একজন উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলেন। সদাশিব মজুমদার যে একজন পাঠক ছিলেন, একদিন এই ধারণাই আমাদের ছিল। সম্প্রতি তাঁহার লিখিত কবিতা পাইয়া বুঝিয়াছি তিনি একজন কবিও ছিলেন। পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহে মজুমদার বাড়ীর প্রাচীন জিনিস পত্র ধ্বংস না হইলে মজুমদার কবির কবিত্ব নিদর্শন বোধ হয় আরও অনেক বর্ত্তমান থাকিত।

আপাততঃ আমরা কবি সদাশিবের নিম্ন লিখিত কয়েকখানি পুস্তকের ও কবিতার নিদর্শন পাইয়াছি।

১। আদিপুরাণ, ২। উমা পরিণয়, ৩। চণ্ডী মঙ্গল ও ৪। মনসার মঙ্গল আরতি।

এতদ্ব্যতীত একখানি পুথির যে কয়েক লাইনের ছিন্নাংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কোন গ্রন্থেরই পত্র বলিয়া মনে হয়। সে পত্রের লেখা এইরূপ :—

লাচাড়ী

যমুনার কূলে যায়া, মুরলী বাজায়া,
রাধা রাধা বলি ডাকে।
চড়িয়া নিজ বাহন যত দেবতাগণ,
বসে আসি অন্তরীক্ষে।
যমুনা উজানে চলে, গোপিনীরা দলে দলে,
পথপানে না চাহিয়া যায়।
প্রাণ যে গিয়াছে তথি, ছাড়িয়াছে পুত্রপতি,
নাহি দিশা সাপে যদি খায়।
কোনো গাভী মুখে ঘাস ....
....
হরে কৃষ্ণ হরি বলি, সদাশিব যায়ে চলি,
কালী যাঁর মাতা দয়াময়ী।
কালী কৃষ্ণ শিব রাম, জপে যেহি অবিরাম,
কোনকালে যমভয় নাহি।

এখন কবি সদাশিবের অন্যান্য পুস্তকগুলির পরিচয় প্রদান করিব।

১। উমা পরিণয়—

ইহার প্রথমাংশ পাওয়া যায় নাই।

"বিংশৎ বৎসর গর্ভে থাকি ভগবতী।
জন্ম লইলেন ভবে ভাবি পশুপতি।
................কহিলেম মঙ্গল।
মহাভাগবতের ইহ কহিব মঙ্গল।

..............সঙ্গে পরিবার সহিতে।
দাঁড়াইয়া রহিল গিরি দর্শন নিমিত্তে॥
একদৃষ্টে হিমালয় নিরীক্ষণ করে।
কৃতাঞ্জলি হৈয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
কেবা জন্মিলা মাও অতি সুলক্ষণা।
দেখিবারে চাহি আমি কিঞ্চিৎ মহিমা॥
তখন দৈববানী হইল "শুন মহারাজ।
মনের বাসনা আর সিদ্ধি হবে কাজ॥
দেবতা মনুষ্য রক্ষা করিবার তরে।
জন্ম লইলা মাও মেনকা উদরে॥
শুবে ভগবতী কহেন শুন মোর বাপ।
দিব্য চক্ষু দিল দূর হবে মনস্তাপ॥

হিমালয় গিরি দিব্য চক্ষু পাইয়া মায়ের বিভূতি দর্শন করিতে লাগিলেন।

শিবারূপে প্রথমে হইলা মহামায়া।
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ দেখি লাগে দয়া॥
অর্দ্ধ চন্দ্র মাথে শুভে অতি বিলক্ষণ।
মস্তকের জটাজুট ত্রিশূল ধারণ॥
মহা অগ্নি সমরূপা অতি ভয়ঙ্করী।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিলা শঙ্করী॥
পঞ্চমুখ তিন চক্ষু নাগ আভরণ।
সর্পের লগুণ গলে শুভে বিলক্ষণ॥
এইরূপ দেখি গিরি আনন্দ হৃদয়।
অন্যরূপ দেখিবারে মনেতে আছয়॥

কন্যার রূপ দর্শন করিয়া হিমালয় মুগ্ধ হইলেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিলেন—অমরগণ শূন্য হইতে কন্যার স্তুতিগান করিতেছেন। হিমালয় ভাবিলেন—

"ধন্য হইল আমি ধন্য হইল পুরী।"

আনন্দাশ্রু অভিষিক্ত গিরিরাজ হিমালয়ের আজ কি আনন্দ! স্বয়ং জগন্মাতা যাঁর দুহিতা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁর মত ভাগ্যবান কে? পুলকিত চিত্তে হিমালয় কহিলেন—

"অন্যরূপ দেখাও মোরে জগত ঈশ্বরী।"

জগন্মাতা মহামায়া ভক্ত পিতার অনুরোধ রক্ষা করিলেন [illegible] কৌতুকে।

হইলা বৈষ্ণবী রূপা সর্ব্বলোকে দেখে॥
নীল উৎপলের প্রায় শরীরের কান্তি।
বনমালা গলে শোভে রূপের মূরতি॥
চন্দনে সর্ব্বাঙ্গ তান করিছে লেপন।
হস্ত পদের তালা রক্ত বরণ॥
রক্ত আভরণ তান শোভে সর্ব্ব অঙ্গে।
দেখে গিরিরাজ অতিশয় রঙ্গে॥

গিরিরাজ কন্যার বৈষ্ণবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত, আনন্দে বাক্যহীন হইয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেখানে প্রার্থনার পরিসমাপ্তি হয়, সেইখানেই ভক্ত ভূমানন্দে নির্ব্বাক হইয়া যান। তখন আর বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া থাকে না। হৃদয়ের ক্রিয়া অবরুদ্ধ স্রোতের মত একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। এই অবস্থার পরই ভক্ত বলিয়া উঠেন—

"ততোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"।

কবি সদাশিব অতঃপর নিজ পরিচয় এইরূপে প্রদান করিয়াছেন—

"দ্বিজ দুর্গারাম সুত অতি দীন হীন।
দয়াকর দয়াময়ী আজি শুভদিন॥
বিপ্র সদাশিবে বন্দে ভবানীর পাও।
রচিব লাচাড়ী কিছু দয়াকর মাও॥

লাচারী গাহিয়া সদাশিব জগজ্জননীর নাম করণ করিতেছেন।

প্রণমহ জগত জননী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি হরে, সর্ব্বদায় স্তুতি করে,
আদ্যারূপা ব্রহ্ম-সনাতনী॥ ১॥
তুমি সে সকল কর্ত্তা, বিধির বিধাতা,
নমো নমশ্চরণ কমলে।
জগৎ পূজক তুমি, কিরূপে স্তুতিব আমি
মরিলে রাখিও পদতলে॥ ২॥
কি কারণে গিরিরাজ মনের অভীষ্ট কাজ
নাম রাখ শুনি যে শ্রবণে॥
উমা কাত্যায়নী গৌরী সর্ব্বাণী যে ঈশ্বরী
রাখে নাম হরষিত মনে॥ ৩॥
কালী দুর্গা মহামায়া চণ্ডিকা অপরাজিতা,

জয় দুর্গা জগত জননী ॥
ভুবনেশ্বরী সৌদামিনী অম্বিকা ....
রাখে নাম জয় মা তারিণী ॥ ৪ ॥
এহি মতে শত নাম রাখিলেক অনুপাম,
ভবানী ভৈরবী দয়াময়ী :
জয়ন্তী অপরাজিতা মোহিনী করুণা লতা
রাখে নাম দেবী নারায়ণী ॥ ৫ ॥
ভব দুঃখ নিবারণী শুন মাগো ব্রহ্মাণী।
নিবেদন করি পদতলে।
আমি অতি হীন মতি না জানি স্তুতি ভকতি,
নিকটে রাখিও অন্তকালে ॥ ৬ ॥
দ্বিজ সদাশিবে কয় বিষম শমন ভয়
দূর কর গিরিরাজ সুতা।
তুমি দয়া কর যারে, তারে কি করিতে পারে,
তুমি মাও বিধির বিধাতা ॥

উমা পরিণয়ের আর দুই তিনখানি ছিন্ন পত্রাংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় বহিখানি প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠার ছিল। বহিখানার সর্ব্বাংশ পাইলে কত না সুখের বিষয় হইত।

কবি সদাশিব যে অপূর্ব্ব সম্পদ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার দুর্ভাগা উত্তরাধিকারিগণ কি পাপে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন কে বলিবে? তাঁহাদের ওয়ারিশী প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি অপেক্ষা এই সম্পত্তির সম্মান অধিক ছিল, তাহা নিশ্চিত।

২। সদাশিবের দ্বিতীয় গ্রন্থ "আদিপুরাণ"। ইহাও সুললিত ছন্দোবন্ধে বিরচিত। এই গ্রন্থেরও অতি সামান্য অংশই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ বর্ণনাই এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা যেটুকু পাইয়াছি তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

মৃগয়াকে * * * *
সৈন্যসামন্ত সঙ্গে করিল গমন ॥
হস্তিনা নগরে আসি সিংহাসনে বসি।
* * অনেক রূপসী ॥
নৃত্য * * ভাট নানা নৃত্যকর।
নৃত্যগীত কুতূহল রাজার গোচর ॥
দিব্য তুলসীর মালা গলেতে ধারণ।
কস্তুরি কুঙ্কুম গন্ধ আবির চন্দন ॥
রাজা বলে কুলগুরু ধৌম্য পুরোহিত।
করিলাম কুৎসিত কর্ম্ম অতি বিপরীত ॥
অন্ধমুনি বিড়ম্বনা অরণ্য ভিতর।
বিধির বিপাকে দুষ্টবুদ্ধি হৈল মোর ॥
ব্রহ্মহিংসা মহাপাপ হৈল আমা হৈতে।
ব্রাহ্মণ না মানিবে কেহ আজি দিন হৈতে ॥
আমি রাজা চন্দ্রবংশে অতি কুলাঙ্গার।
পূর্ব্বপুরুষ যত ছিল প্রতাপে দুর্ব্বার ॥
ব্রাহ্মণ স্থাপন রক্ষা করিল পূজন।
শিষ্ট পালন দুষ্ট করিল দমন ॥

এই ভাবে মহারাজ পরীক্ষিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপ শুনিয়া মহারাণী কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে—

হস্তিনা জুড়িয়া হৈল হাহাকারধ্বনি।
রাজাকে বেড়িয়া কান্দে লোটাইয়া ধরণী ॥"

কবি পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

সদাশিব দ্বিজে কহে শুন মহারাজা।
ভজ কৃষ্ণ ভজ কালী ভজ দশভুজা ॥

রাণীর বিলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

কান্দে রাণী রাজার চরণে।
আউলাইয়া মাথার কেশ হইয়া পাগলিনী বেশ
বিধি দুঃখ দিল কি কারণে ॥
না ছিল কিঞ্চিৎ পাপ, কেনে হৈল ব্রহ্মশাপ,
শুনি প্রাণ উড়িল আমার।
শুন রাজা প্রাণপতি কি হবে আমার গতি,
বজ্রাঘাত হৃদয় মাঝার।

রাণীর বিলাপ শেষেও কবি আপন পরিচয় দিয়া কহিয়াছেন—

দুঃখের সময় কালে, সদাশিব দ্বিজে বলে
ভজ রাজা গোবিন্দ চরণ।

৩। সদাশিবের চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্যই জানিতে পারিয়াছি। বহু চেষ্টায় যে পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটি বোধ হয়, কবি সংস্কৃত চণ্ডী বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল কিনা জানিবার উপায় নাই।

৪। কবি সদাশিবের অপর কবিতা "মনসার মঙ্গল-আরতি।" উস্থি মজুমদার বাড়ীতে বহুকাল যাবত পাষাণময়ী অতি সুগঠিতা মনসা মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। তাঁহাদের বাড়ীর পশ্চিমে এক জমিতে এই মূর্ত্তি পাওয়া যায়। উক্ত স্থান আজিও "বিষহরি ক্ষেত" নামে পরিচিত। এই মনসামূর্ত্তি অতি চমৎকার। ভাস্করের নৈপুণ্য ইহাতে অত্যন্ত পরিস্ফুট। কৃষ্ণপ্রস্তরে অষ্টনাগযুক্ত চতুর্ভুজা মনসা মূর্ত্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া মজুমদার বাড়ীতে বিরাজিতা। কবি সদাশিব বোধ হয় এই মনসামূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মনসার মঙ্গল-আরতি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

আমরা নিম্নে মনসার মঙ্গল-আরতি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

মনসার মঙ্গল-আরতি।

মনসার মঙ্গল-আরতি। জয় জয় সর্ব্বলোক আনন্দ
যে কৌতুক, নাচে গায় হরষিত মতি ॥ ১ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, গৌরী লক্ষ্মী দিবাকর
যম শশী দেব পুরন্দর ॥ ২ ॥
জরৎকারু মহামুনি অনন্তাদি যত ফনী,
গণনাথ গণেশ ঈশ্বর।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে পুনী, জয় জয় শব্দ শুনি,
নূপুর মন্দিরা পাখুয়াজ।
আস্তিক কুমার সঙ্গে, সুগন্ধা নিতাই রঙ্গে,
আর যত নাগের সমাজ।
সর্ব্বদেব বন্দি শিরে, মনসার চরণ নীরে,
আরতি মঙ্গল বাদ্য শুনি।
গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপে, নানা গন্ধ সমীপে,
তাল ছন্দে মৃদঙ্গেত ধ্বনি।
বাম হস্তে ঘণ্টা ধরি, পঞ্চ প্রদীপ সঙ্গে করি,
দক্ষিণ হস্তে করি নির্মঞ্ছন।
আদিদেব সপ্তবার, মঙ্গল জোকার,
জয় জয় এ তিন ভুবন।
কিরীটরূপ শোভা করি, চন্দ্র জিনি বিষহরি
কোটী সূর্য্য জিনি মুখখান।
চামরে করিয়া বাও, নিছিলেক সর্ব্ব গাও
চান্দ জিনি চান্দ বয়ান।
জগন্নাথ কলিযুগে, কালিকা, অম্বিকা জাগে,
জয় দেবী জগত জননী।
দেব দেবী আর যত, আছে সব নিদ্রাগত,
ভক্ত লোক জয় ব্রহ্মাণী।
মহিমা কে জানে তার, সর্ব্বলোক কম্পমান,
ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, সর্ব্বদায় স্তুতি করে।
যম, শশী, আর হুতাশন।
কনক কমল দলে, নানা গন্ধ ফল ফুলে,
রক্তজবা আর বিল্বদলে।
চরণে দিবার সাধ, ক্ষেম মোর অপরাধ,
দিয়া পুষ্প চরণ কমলে।
উস্থি গ্রামেতে বাস, মনসার নিজ দাস,
চরণ ধরিয়াছি দড়মনে।
সদাশিব দ্বিজে বলে, ভাবিয়া চরণ তলে,
তরাও মোর সঙ্কট সময়ে ॥ * ॥

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অবস্থা

(৩)

এইরূপে অহরহ আপ্যায়িত হইয়া ছাত্রগণ যে কেবল গুরুমহাশয়ের মঙ্গল কামনাই করিত, তাহা নহে। গুরুমহাশয়কেও নির্য্যাতন করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য তাহারাও নানা উপায় আবিষ্কার করিত।

১ম—গুরুমহাশয়ের জন্য তামাক সাজিতে গিয়া তাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে লঙ্কা মরিচ মিশ্রিত করিয়া আনিত। গুরুমহাশয় তামাক টানিয়া কাশিতে আরম্ভ করিলে ছেলেরা সকলে মিলিয়া হাস্য করিত।

২য়—গুরুমহাশয় যে মাদুরে বসিতেন তাহার নীচে তাঁহার অজ্ঞাতে কাঁটা ফেলিয়া রাখিত।

৩য়—রাত্রিতে লুকাইয়া সময় সময় গুরুমহাশয়ের উপর ঢিল নিক্ষেপ করিত।

৪র্থ—কালী দুর্গার নিকট গুরুমহাশয়ের মৃত্যুকামনা অথবা চিন্নির লুট মানসিক করিত।

এই সময় রীতিমত স্কুলে যাইবার কোন বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। ছাত্রের স্কুলে যাইবার ইচ্ছা না হইলেই সে স্কুল কামাই করিত। পূজা পার্ব্বণেও স্কুল কামাই হইত। ছাত্র স্কুলে না গেলে গুরুমহাশয় অপেক্ষাকৃত বলবান্ ছাত্র পাঠাইয়া পলায়িত ছাত্রকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেন। সে ছাত্রও তখন উচ্ছিষ্ট ছুঁইয়া বসিয়া থাকিত। কেহ তাহাকে স্পর্শ করিত না। পলায়িত ছাত্র কখন কখন গাছে উঠিয়া গুরুমহাশয়ের প্রেরিত দূতগণের দৃষ্টি এড়াইতেও চেষ্টা করিত।

অনেক চতুর বালক দণ্ডের ভয়ে সকাল-বিকাল গুরু-মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া যথেষ্ট খাটিত,—তাঁহার রান্নার কাঠ সংগ্রহ করা, বাগান প্রস্তুত করা, হাট বাজার করা, তামাক সাজা প্রভৃতি কার্য্য প্রচুর মনোযোগের সহিত সম্পাদন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হইতে চেষ্টা করিত। কেহ কেহ নিজ গৃহ হইতে পিতা মাতার অজ্ঞাতে তামাক টীকা, চাউল, দাইল, তরিতরকারি, এমন কি টাকা পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া গুরুমহাশয়কে উপঢৌকন দিয়া তাঁহার দণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় করিত।

এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁহার আত্মজীবন চরিতে লিখিয়াছেন :—

"আমার সমবয়স্ক সমশ্রেণীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণ-নগরে চৌধুরীদিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। ঐ পাঠশালার গুরু মহাশয় বর্দ্ধমান অঞ্চল নিবাসী এবং কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। তাঁহাকে যে বালক কিছু খাদ্যদ্রব্য দিতে পারিত, তাহার প্রতি সদয় থাকিতেন, এবং তাহার অনুপস্থিতি বা শিক্ষায় অমনোযোগ জন্য কোন শাস্তি হইত না। আমার এক সুচতুর বাল্যসখা তাঁহার পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। তিনি কখন কখন তাহার মাতুলালয়ে আসিয়া ২।৪ দিন থাকিতেন। প্রতিগমন কালে আমাদের এক প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট বিল্ববৃক্ষ হইতে দুই একটী বেল পাড়িয়া গুরু মহাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিতেন, 'মহাশয়! আপনার নিমিত্ত দুইটি উত্তম বেল আনিয়াছি'। তিনি আহ্লাদ প্রকাশিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি এ কয়দিন কেন আইস নাই'। বালক উত্তর করিতেন, 'মামার বাড়ী যাইয়া আমার জ্বর হইয়াছিল'। ইনি যখনই অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনই এইরূপে গুরু মহাশয়ের রাগের শান্তি করিতেন। কখন তিরস্কৃত বা প্রহারিত হন নাই। এই পাঠশালায় আমার এক পিশ্‌তুত ভ্রাতা ভালরূপে শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমাদের বাটীতে আসিতেন। কিন্তু গুরু মহাশয়ের দূতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অনুপায় দেখিয়া একদা এক বারোয়ারী ঘরের মাচার উপর অনা-হারে এক দিবা ও রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে রজনী যাপন করেন। ঐ গুরু মহাশয় চৌধুরী বাটীর এক বালকের গণ্ডদেশে এরূপ বেত্রা-ঘাত করেন যে তাহার চিহ্ন তাঁহার যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।"

অন্যত্র—"আমাদের গুরু মহাশয় আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারিটাকা বেতন পাইতেন। এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, এ কারণ তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম। নিবারণ রায় নামক একটী প্রতিবেশী বালক আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার উপনয়ন উপস্থিত হইলে আমার অজ্ঞাতসারে মধ্যম দাদার ও ঐ বালকের সহিত পরামর্শ স্থির হয় যে উপনয়নের লব্ধ ভিক্ষার টাকা হইতে মধ্যম দাদার দ্বারা ৫৲ টাকা ওস্তাদের নিকট পাঠাইবেন। নির্দ্ধারিত দিবসে মধ্যম দাদা উপস্থিত হইলে নিবারণ কহিল যে বাক্সের চাবি পিতার নিকট আছে। দাদা মহাশয় আপন চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া ওস্তাদকে দিলেন।

"আমাদের পঞ্চম ওস্তাদের সময় আমার অগ্রজের বিবাহ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ওস্তাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। মধ্যম দাদা ভাণ্ডার গৃহের জানালা দিয়া খাদ্য দ্রব্য আমার হস্তে দিতেন, আমি তাহা ওস্তাদের গৃহে পৌঁছিয়া দিতাম। বিবাহের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে এক রাত্রিতে

ভাণ্ডার হইতে কোন কোন দ্রব্য চুরি করিয়া আনিবার নিমিত্ত আমি প্রেরিত হইলাম। আমি দ্রব্যজাত সহিত প্রত্যাগত হইলে দেখিলাম, ওস্তাদজি মহা আনন্দে মধ্যম দাদার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিবা মাত্র কহিলেন, অদ্য আর পড়িতে হইবে না।”

এই সময় গুরু মহাশয়দিগের পারিশ্রমিক সর্ব্বত্র এক-রূপ ছিল না। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে গুরু মহাশয়কে অর্থ দিয়া বড় কেহ লেখা পড়া করিতে পারিত না, ধান দিয়াই লেখা পড়া শিখিত। অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহের বালকেরা অর্থদ্বারা গুরুর পারিশ্রামিক দিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে ১॥০ টাকা দুই টাকা হইতে চার পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত গুরু-দিগের মাসিক বেতন ছিল। নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক ব্যতীত পূজাপার্ব্বণেও গুরু মহাশয়দিগের কিছু কিছু প্রাপ্য ছিল।

বাঙ্গালা দেশের এই শোচনীয় অজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এডাম সাহেব উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

"I am not acquainted with any facts which permit me to suppose that, in any other country subject to an enlightened Government, and brought into direct and immediate contact with European civilization in an equal population, there is an equal amount of ignorance with that which has been shewn to exist in this District."

অর্থাৎ "যেরূপ অজ্ঞতা এই প্রদেশে সাক্ষাৎভাবে বিরাজমান, ইয়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্রবে থাকিয়া অথবা কোন সভ্য জাতির শাসনাধীন আসিয়া এই পরিমাণে লোক সংখ্যা বিশিষ্ট একটা দেশ যে এরূপ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এমন কি অনুমানও করিতে পারি না।"

দুঃখের বিষয়, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক মিঃ এডামের প্রস্তাব অনুসারে মফঃস্বলের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কারকল্পে আপাততঃ কোন অর্থব্যয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং পল্লি পাঠশালাগুলি সেইরূপ "ছেলে ঠেঙ্গান গুরু মহাশয়ের পাঠশালা"ই রহিয়া গেল। মনোদুঃখে মিঃ এডাম কার্য্য ত্যাগ করিলেন।

পল্লিগ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইলেও মফঃস্বলের কলেজ সমূহে ও কলিকাতার স্কুল ও কলেজ সমূহে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষাদান ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহাতে যে খুব যত্নের সহিত পড়ান হইত, তেমন বোধ হয় না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই সময় হিন্দুকলেজে পড়িতেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে তাঁহাদের হিন্দু কলেজের বাঙ্গালা পণ্ডিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গালা পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময় রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম।'

রাজধানীর হিন্দু কলেজের সহিত তুলনা করিয়া পাঠকগণ সহজেই পল্লিগ্রামের গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যার দৌড় কল্পনা করিতে পারেন।

যাহাহউক বঙ্গভাষার এই দুর্দ্দিন অধিক দিন রহিল না। ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের বিধানমতে পার্শি ভাষার স্থানে বাঙ্গালা ভাষা সরকারী আদালতসমূহে প্রচলিত হইবার আদেশ হইলে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর দেখা যাইতে লাগিল। অতঃপর ১৮৩৯ সালের [illegible]ারী হইতে পার্শিভাষা আদালত সমূহ হইতে একেবারে উঠিয়া গেলে, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রত্যেকেরই পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন সকলেই নিজ নিজ বালকদিগকে বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করাইতে আরম্ভ করিলেন। পল্লি পাঠশালাগুলিরও আপনা হইতে সংস্কার হইতে লাগিল।

সময় বুঝিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া ১০১টি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় শিক্ষা বিস্তারে ও দেশীয় শিক্ষার উন্নত-রীতি প্রবর্ত্তনে সহায়তা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। এই ১০১টি বিদ্যালয় হার্ডিঞ্জস্কুল নামে সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এইরূপে বাঙ্গালী মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিপ্লব-বিলুপ্ত বৈভবের পুনরুদ্ধার ও মৃত ভাষার জীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রতিশোধ।

(১)

জয়পুরের যোগেশ চৌধুরীর মত প্রবল প্রতাপ ও অত্যাচারী জমিদার তখন সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেও নাকি তাঁহার প্রতাপ ছিল বেশী এবং জনসাধারণ এমনও বিশ্বাস করিত যে দুই দশটা খুন হজম করার হেকমত যোগেশ বাবুর আছে। সুতরাং তাঁহাকে সকলেই খুব ভয় করিয়া চলিত।

এতটা নাম ডাক থাকিলেও যোগেশ বাবু কোনও দিন কাহারো উপর জুলুম জবরদস্তি করিয়াছেন, এ কথার প্রমাণ কেহ দিতে পারে নাই। তথাপি তাঁহার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত; যোগেশ বাবুর পিয়াদা দেখিলে দুই দশ মাইলের মধ্যে কেহ মাথা না নোয়াইয়া পারিত না।

যোগেশ বাবুর বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন ছিল। দোল, দুর্গোৎসবে, রাসযাত্রায় ও তাঁহার মাতা পিতার শ্রাদ্ধে বিস্তৃত আঙ্গিনা ও পুকুরের প্রকাণ্ড আয়ত পাড়ে বসিয়া হাজার হাজার লোক আহার করিত। স্বয়ং কর্ত্তা ছোট বড় সকলকে বিনয়ে ও মিষ্টি কথায় তুষ্ট করিতেন। কাহার কি দরকার, কে খায় নাই, কে আসে নাই—স্বয়ং তিনি সে সকল তত্ত্ব লইতেন। যে ভোলা চঙ্গ 'কর্ত্তা মহারাজের' নাম শুনিলে অজ্ঞাতসারে আপন মাথায় হাত দিয়া তাহার অস্তিত্বের সন্দেহ মীমাংসা করিত, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ যখন যোগেশ বাবু কহিলেন, "হাঁরে ভোলা আর কিছু চাই না?"

ভোলা সম্প্রতি দিস্তা পাঁচেক লুচি, একটা পাঁঠার ষোল আনা মাংস, দধি, ক্ষীর, মিঠাই, প্রভৃতি উদরস্থ করিয়াছিল। কর্ত্তার আদরে সে পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে—হয় কর্‌তা মহারাজ, আর পাঁচ ছয় সের মাল কোন্ না সাম্‌লান যায়।"

(২)

যোগেশ বাবুর একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশন। এই উপলক্ষে একটা বিরাট ধুমধাম হইতেছিল। কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সে অঞ্চলের লোকের তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। খরচের পরিমাণ লইয়া স্থানে স্থানে মহা তর্ক বিতর্ক; দুই এক স্থলে মত বিরোধের ফলে হাতাহাতির আশঙ্কা না হইয়াছিল এমন নহে।

মাথায় পানের পাগড়ী, গায়ে পাতলা মেরজাই, বাম হাতে হরিদ্রা রঞ্জিত গামছা লইয়া যোগেশ বাবু খালি পায়ে চারি দিকে তত্ত্ব-তারাস করিতেছেন। ছোট বড় সকলকেই হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিতেছেন। যাহারা তাঁহাকে বাঘের চেয়েও বেশী ভয় করিত, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে পথ চলিতে তাঁহার সম্মুখে পড়িলে যাহারা পূর্ব্ব জন্মের কোনো গুরুতর পাপের কথা স্মরণ করিত,—আজ উৎসব উপলক্ষে যোগেশ বাবু তাহাদের পিঠ চাপড়াইয়া দিতেছেন। তাহারা হাতে যেন স্বর্গ ধরিতে পাইতেছে। আজ তাঁহার সম্মুখে কেহবা নৃত্য করিতেছে, কেহ 'মরি হায় হায় রে' বলিয়া মহড়ায় গান ধরিতেছে; কোনো খানে বা একদল বাহ্বা স্ফোটন পূর্ব্বক কুস্তি লড়িতেছে! আজ মহোৎসব—সকলের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা!

(৩)

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় এই বিরাট কোলাহল থামিয়া গেল। যোগেশ বাবু উপরের বারান্দার মেঝের উপর বসিয়া ওঃ আঃ প্রভৃতি দুই একটা আয়েস সূচক ধ্বনি করিতে করিতে পা ছড়াইয়া বসিলেন। ধনু নদীর শীতল বাতাসে তাঁহার কর্ম্ম ক্লান্ত দেহ ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল।

খানিক পরে বিন্ধিকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ্ তরে বিন্দি নয়াবৌ কৈ?—ডাক্‌ত।" বিন্দি ঘুরিয়া আসিয়া জানাইল 'মাকে ত দেখ্‌লাম না।' "দেখ্‌লি না কেমন? এখন ত আর বাড়ীতে ভিড় নাই—খোকা কোথায়?"

"খোকা মাসীমার বুকে—ঘুমে" বিন্দি আবার চলিয়া গেল। আবার আসিয়া জানাইল 'মাকে পাওয়া গেল না।'

বিরক্ত হইয়া যোগেশ বাবু কহিলেন, তোদের কর্ত্তা মা কি করেন?

কর্ত্তা মা অর্থে যোগেশ বাবুর বড় ভাই রমেশের অপত্যহীনা বিধবা পত্নী। তাঁহারই হাতে এত বড় সংসারটার পাঁজিপুঁথি ছিল। ইনিই যোগেশ বাবুর পালয়িত্রী, ইনিই সব। বিন্ধি তাঁহাকে ডাকিতে গেল।

(৪)

"হাঁ বৌদি, এত বড় একটা রাহাজানি হইয়া গেল, তুমি বাড়ীর কর্ত্তা—একটা খোঁজ খবর পর্য্যন্ত—"

"কি হইল ঠাকুরপো, আমিত বাইরের খবর কিছুই পাই নাই!"

"বাইরের নয় গো—ঘরের—তোমার পুঁটলীর ভিতরের খবর—এ বাড়ীর নয়া বৌকে নাকি পাওয়া যাইতেছে না—নিরুদ্দেশ!"

তোমরা ভাই সুখের পায়রা—সুখ নিয়াই থাক। বেচারী আজ দুইতিন দিন অনিদ্রায় অনাহারে—তারপর খাটুনী কত! হয় ত বেহুঁস ঘুমে কোনখানে পড়িয়া আছে। কেন—তাকে কেন?"

"আর কিছু নয়,—তবে কিনা লোকটার যে অস্তিত্ব আছে—সেইটা জানা দরকার—"

"আচ্ছা আমি খুঁজিয়া দেখি। কিন্তু ঘুমে মরা মানুষটাকে আমি তুলতে পারিব না।"

বড় বউ চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে বিন্দি আসিয়া জানাইল নয়া বউর সন্ধান মিলিতেছে না।

যোগেশ বাবু ব্যস্ত হইয়া হারিকেন হাতে বাহির হইলেন। তখন বাড়ীময় একটা সুর গোল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল—তাঁহাকে অপরাহ্নে পুকুর-তীরে দেখিয়াছি। অমনি বড় বউ চীৎকার করিয়া কহিলেন "হায় হায় বুঝি মাথা ঘুরিয়া জলে পড়িয়াছে গো!"

দশ পাঁচজন জলে নামিয়া পড়িল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

তখন যোগেশ বাবু বড় অনাথের মত, বড় নিরীহের মত গৃহ দেবতা মদন গোপালের ঘরে গেলেন। বিস্মিত যোগেশ বাবু দেখিলেন—বাল-নখরচ্ছিন্ন কমল কলিকার মত, তাঁহার মানসী প্রতিমা উপুড় হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন। আলুলায়িত কুন্তলরাজী সারা পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া দুই ধারে মাটিতে লুটাইয়া রহিয়াছে। রমাসুন্দরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া যোগেশ বাবু যেন বড় শান্তি পাইলেন। তিনি একটু রসিকতার ছলে কহিলেন—

"বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।"

আরে ও তুমি, দেখ—নয়া বৌ—ও নয়া বৌ—রমা—ও রমা—

ঘুমের ঘোরে রমাসুন্দরী হুঁ করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভরসা পাইয়া যোগেশ বাবু হারিকেনের আলো রমার মুখের উপর ফেলিয়া দেখিলেন মুখ বড় মলিন। রঙ্গ করিয়া যোগেশ বাবু কহিলেন—

"মোর মাধবী রাতিরে কাঙ্গালিনী করি
গ্রহণ লেগেছে চাঁদে।"

কথাটা রমার কাণে পৌছিল। তিনি অকস্মাৎ স্বপ্নোত্থিতার মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"ওগো, তোমরা আমাকে মারিয়া ফেল,—ওগো—আমি আর সহিতে পারি না—আমার বুকটা গুঁড়া হইয়া গেল গো—"

ভীত বিস্মিত যোগেশ বাবু তাড়াতাড়ি ভূতলে বসিয়া রমার মাথাটী কোলে তুলিয়া লইলেন। চীৎকার শুনিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল। বড় বৌ পাগলের মত আসিয়া রমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলেন "রমা, দিদি আমার! কি হইয়াছে শুনি!"

রমা কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড় বৌএর সাধ্য সাধনা, স্বামীর কাকুতিতেও রমার মুখে কথা ফুটিল না। গলার শব্দে দম আটকাইয়া যাওয়ার যো হইল।

শেষটা রমা কহিলেন "যাও দিদি—ওঁকে স্নান আহার, করিতে বল—পরে—"

"যোগেশ বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন—রমার কথা না শুনিলে আমি জল স্পর্শ করিব না। আজ দশ বৎসর ধরিয়া যে প্রশান্ত মহাসাগরে চাঞ্চল্য দেখি নাই—আজ তাহা বড় সহজে অধীর হইয়া উঠে নাই। বিশেষ আজ আমার ছেলের অন্নপ্রাশন।"

(৫)

দারুণ পিটুনীতে শরাফতের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। বুকে পিঠে বাঁশের ডলনী দিয়া তাহার অস্থি চূর্ণ করা হইয়াছিল। অজ্ঞান শরাফত কাছারী ঘরের

একধারে ভূতলে পড়িয়া আছে। পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্র রহিম দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। ফরাসের উপর আরক্ত চক্ষু যোগেশ বাবু কম্পিত করে নল ধরিয়া তামাক টানিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। দুইজন ভৃত্য দুইটা প্রকাণ্ড তালের পাখায় বাতাস করিতেছিল।

লজ্জাত্যাগ করিয়া আজ শরাফতের স্ত্রী কাছারী ঘরে আসিয়াছিল। অভাগিনী যোড় হাতে কাঁদিয়া তাহার মৃতপ্রায় স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেছিল।

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার পিতার অপরাধের যে কৈফিয়ত দিতেছিল তাহা এই—কর্ত্তা, মহারাজ, বাপজান সরকারী চাকর হরিচরণের পাছে দৌড়িয়া আসিয়াছিল সত্য, হরিচরণ যাইয়া আমার ভাই সাহেবের বড় পিয়ারের পাঁঠাটা লইয়া আসিতেছিল, তখন বাপজান বলিয়াছিল যে আবদুল মুরমাই (মৌলমেন) গেছে—এই পাঁঠাটা তা'র বড়ই আদরের। হরি কিন্তু বাপজানের কথা না শুনিয়া জোর করিয়া সেটা লইয়া আসিল। বাবা রাগী মানুষ—সামলাইতে পারে নাই। হরিচরণের পাছে পাছে দৌড়াইয়া আসিয়া—দোহাই কর্ত্তা মহারাজ, বাবা খিড়কীতে ঢুকে নাই। কার এমন মাথার উপর মাথা যে মহারাজের খিড়কীতে ঢুকিয়া কর্ত্তা মার সুমুখ হইতে পাঁঠাটা কাড়িয়া নেয়।

শরাফতের স্ত্রী পুনরায় কাঁদিয়া কহিল—"দোহাই কর্ত্তা, উনারে ছাড়িয়া দেন। আমরা আইজই দেশ ছাড়িয়া যাই।"

হুঙ্কার করিয়া যোগেশ বাবু কহিলেন—কাল সকালে যদি তোদের কাউকে দেখি—গর্দ্দান থাকবে না।"

প্রাতঃকালে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল শরাফতের বাড়ীর চিহ্নমাত্রও নাই। সেখানে সদ্যকর্ষিত জমির চারিদিকে অসংখ্য বাঁশের খুঁটার বেড়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

(৬)

তালার হাওরের দিগন্তপ্রসারি বক্ষ ভেদ করিয়া কত তরণী নানাদিকে যাতায়াত করিতেছে। সম্মুখে পূজা, দেশ বিদেশের জনগণের বাড়ী যাওয়ার ধুম। আর নৌকায় নৌকায় মাঝিদের রং বেরঙ্গের পাল—রকমওয়ারী গান—যেন পূজা একান্ত নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছে। কেউ ভাটিয়ালে সুর চড়াইয়াছে—কেহ বা ঘাঁটুগানের অতীত মহরার স্মৃতি সজাগ করিতেছে; কেহ 'আমার কানাইরে না নিও দূর বনে—রাখোয়াল' গাহিতেছে—কোন মাঝি হাইলের উপর অলস মস্তক স্থাপন করিয়া সুর ধরিয়াছে—

"বারোত্তর বচ্ছরের পাড়ি, বেলা আছে দণ্ডচারি।"

কেউ বা "বিদেশেতে রইলা বন্ধু" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে।

একখানি নৌকায় তিনটী মাত্র আরোহী। বৃদ্ধ ভৃত্য আর এক অনিন্দ্য সুন্দর যুবক ও তাহার ষোড়শী পত্নী। নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় যুবতী তাহার স্বামীর হাত ধরিয়া কহিল—ঐ দেখ মেঘের সাজ কি বিষম দেখা যায়—শীগগীর নৌকা ভিড়াইতে বল।"

বাস্তবিকই আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল। মাঝিরা পাল উড়াইয়া যাইতেছিল। তালার হাওরের বিস্তৃত জলরাশি কালি হইয়া উঠিয়াছিল। ভয়ে যুবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। যুবকেরও মনটা কেমন কেমন করিতেছিল। সে মাঝিকে নৌকা ভিড়াইতে আদেশ দিল।

বৃদ্ধ ভৃত্য কহিল "দাদা ভয় কি—রঘু মাঝি কত তুফান মাথায় করিয়া তালা, জালিয়া, গণেশ পাড়ি দিয়াছে—একটু পরেই পাড়ি দিয়া উঠিব আর কি?"

যুবতীর অস্ফুট রোদনধ্বনি কাণে যাওয়া মাত্র বৃদ্ধ কহিল—"রঘু নৌকাটা একটু রাখ তবে।"

"দাদা, এই জায়গাটাত ভাল না। সুন্দরগঞ্জ বড় খারাপ মানুষের আড্ডা—আর আর নাও পাড়ি ধরিয়াছে আর আমরা থাকব, তা কি হইতে পারে?"

কিন্তু তাহাই হইল। মাঝি নৌকা কিনারায় ভিড়াইতে বাধ্য হইল।

(৭)

"মাঝি ও মাঝি এক ছিলুম তামাক দেনা বেটা—"

"এই দেই ভাই, একটু সবুর।"

আরে ও পন্যারবাপ, আরে এক ছিলুম তামাক খাইয়া যা।"

ক্রমে ক্রমে নৌকার ধারে আট দশজন লোক জমায়েৎ হইল। রঘুর গা কাঁটা দিতেছিল। আজ না জানি কি কপালে আছে?

"ভাই—ও ভাইয়া—বড়শী—বড়শী—"। একজন

উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া গ্রামে কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কহিল।

"যা আছে কপালে"—রঘু নৌকা ছাড়িয়া গভীর জলে ঠেলিয়া—পাছের কাছি টানিল। তখন বাতাস বড় সামান্য, জোর ধরিল না।

"বাইবে কইয়ে শালারা, এবার আ'র যাওয়া যাওই নাই।"

রঘু কহিল, 'দাদা উপায় নাই গো, উপায় নাই। চার পাঁচখানা ডিঙ্গি ঐ তীরের মতন—' বলিয়া ডিঙ্গিগুলির দিক নির্দ্দেশ করিল।

বৃদ্ধ কহিল—"দাদা, উপায় ? বন্দুকটা যদি আনিতে--"

যুবক কহিল "আমার জন্য ভাব্‌বার কিছু নাই। কিন্তু—তোমায় নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি ননি!"

ননী কপোতীর মত কাঁপিতেছিল। কাঁদিয়া কহিল—"চল পাড়ে উঠি—কাহারো বাড়ীতে—"

"এ ডাকাতের মুলুকে কে আশ্রয় দিবে ননি!"

"কেউ কি দয়া করবে না—চল যাই—চেষ্টা করি।"

তাহাই পরামর্শ হইল। নৌকা ভিড়াইয়া অতি ত্রস্ত সকলে তীরে উঠিল।

যুবক কহিল—অলঙ্কার নৌকায় পড়িয়া থাক্—ডাকাতেরা লুঠিয়া লইবে।

(৮)

"বাবা বাবা তুমি আমাদের ধর্ম্মপিতা, আমাদের প্রাণ, আমাদের ইজ্জত রক্ষা কর।"

এক বৃদ্ধ মুসলমান বহির্ব্বাটীতে বসিয়া দা হাতে বাঁশের বাখারী চাঁছিতে ছিল; যুবক যুবতী তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

"তোমাদের কি হইয়াছে গো শুনি"।

"বাবা, আমাদের নৌকার পেছনে চার পাঁচখানা নৌকায় কতকগুলি ডাকাত আসিয়াছে। বাবা রক্ষা কর--"

যুবতী মূর্চ্ছিতা হইল। যুবক তাহাকে কোলে লইয়া বসিয়া বৃদ্ধের হাতে ধরিল।

"একটু শায়েস্তা হও বাবা, বুঝি আগে—"

তাহার যুবক পুত্র দুই তিনটী এই গণ্ডগোল শুনিয়া এখানে আসিয়াছিল—তাহারা 'কহিল না বাপজান, পরে ঠেকা যাইবে। [illegible] হাতে কি বাঁচান যাইব ? শেষে [illegible] চক্ষুশূল হইব।'

বৃদ্ধ বড়ই মুস্কিলে পড়িল। এমন সময় দূরে বদমাইশদের বিকট চীৎকার শুনিয়া যুবকের ভৃত্য কাঁদিয়া কহিল—"হায় হায়রে, যে যোগেশ বাবু হাজার লোকের ইজ্জত রাখে—আজ তার পুত্র পুত্রবধুর বুঝি উপায় নাই রে—"

বৃদ্ধ মুসলমান সহসা দাঁড়াইয়া কহিল,—'কোন চিন্তা নাই', আমার সাথে আইস। আমার এই মাটীর দেওয়ারের ঘরে তোমরা গিয়া থাক। যাও বাবা, আমি থাকিতে তোমাদের একটা চুলও ধরিতে পারিবে না কেউ।"

বৃদ্ধের ছেলেরা ও চাকর বাকর সকলেই লাঠা, বাঁশ, হলঙ্গা লইয়া হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইল।

(৯)

একখানি সুসজ্জিত বজরা সুন্দরগঞ্জের ঘাটে আসিয়া নঙ্গর করিল। বজরার উপর ভীমাকৃতি দারোয়ান সকল হলদে পাগড়ী বাঁধিয়া দাঁড়িতে তা দিতেছিল। তাহাদের দুই পাশে দশ পনরটা বন্দুক! বজরার উপর লাল নিশান উড়িতেছিল।

এক পরিণত বয়স্ক উন্নত বপু, গৌরকান্তি পুরুষ বজরা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া সেই বৃদ্ধ মুসলমানের বহির্ব্বাটীর আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন।

লোকজনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। যোগেশ বাবু সহসা মুসলমানটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন—

"শরাফত, তুমি আমার জাতকুল বাঁচাইয়াছ। আমি আজ তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

শরাফত আভূমি নত হইয়া সেলাম করিতে করিতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ব্রহ্মে দিন কয়েক প্রবাস।

৭ই ডিসেম্বর ডাক জাহাজে কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের ষ্টীমার দিবা সাড়ে আটটার সময় জেটি হইতে সাগরাভিমুখে চলিয়া, ১২টার সময় ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিহিত স্থানে নঙ্গর ফেলিল, দেখিয়া আরোহীগণ সক [illegible]

কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা ষ্টিমারের কর্ম্মচারীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এখানে বিলাতি ডাক লওয়া হইবে, কারণ কলিকাতা হইতে তাহা না নিয়াই ষ্টিমার ছাড়িয়াছিল। মেল বেগ তুলিতে ২টা বাজিয়া গেল, সুতরাং সে দিন ষ্টিমার সমুদ্রে পড়িতে পারিবে না বলিয়া সমস্ত রাত্রিই এখানে রহিল।

পরদিন বেলা ৮ টার সময় ডায়মণ্ড হারবার হইতে জাহাজ ছাড়িল। এখান হইতেই গঙ্গা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গোপসাগরকে আলিঙ্গন করিতে চলিয়াছে। বেলা ১০ টার সময় গঙ্গাসাগরের আলোকস্তম্ভ অতিক্রম করিয়া সাগরে পড়িলাম। সাগরের হরিদ্বর্ণ জল ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া নীলবর্ণে পরিণত হইতে লাগিল এবং নীলবর্ণ জল ক্রমে কালজলে পরিণত হইল। যখন পর্য্যন্ত নীলজল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যায় নাই তখন পর্য্যন্ত গাঙ্গচিল (seagull) দুই একটী আমাদের নয়নপথে পতিত হইতেছিল। কালজলে দুই একটী উড্ডীয়মান মৎস্য (flying fish) ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল অনন্ত সাগর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন বিশাল গগনমণ্ডল, যেন অনন্তে অনন্ত মিলিয়াছে; এদৃশ্য অতিশয় মনোহর। ইতিমধ্যে কএকখানা মালের জাহাজ আমাদের এপাশ ওপাশ দিয়া চলিয়া গেল। শীতকাল বলিয়া কেহই সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। ক্রমে বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন হইতে সমুদ্রের অতলজলে ডুবিয়া গেলেন। তাহার পানে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, ক্রমে চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল, আকাশে একটী একটী করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল। আমরা নীচে নামিয়া আসিয়া আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম। এইরূপে আমাদের ৩ দিন কাটিয়া গেল।

১০ই ডিসেম্বর প্রভাতে বেসিনের পর্ব্বতশ্রেণী অতি মনোহর মেঘমালার ন্যায় আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাত্রি ৫ টার সময় আমাদের বেশ শীত লাগিতেছিল, উঠিয়া দেখিলাম ষ্টিমার অত্যন্ত ধীরেধীরে চলিতেছে এবং সহরতলীস্থিত মিলের আলো ইরাবতীর জলে প্রতিফলিত হইতেছে, দেখিয়াই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, ষ্টিমারের আরোহীগণ সকলেই উঠিয়া পড়িলেন, খাড়ি হইতে ষ্টিমার ইরাবতীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল, সকলেই জিনিষপত্র বিছানা ইত্যাদি গুছাইয়া লইলেন, নামিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া দাড়াইয়া সকলেই চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদেশ ধানের জন্য চির বিখ্যাত, অগ্রহায়ণ মাস এখনও ধান কাটা হয় নাই। নদীর দুইধারে মাঠভরা ধান, মাঝে মাঝে এক-আধটী ফায়া (pagoda) দেখা যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে ষ্টিমার রেঙ্গুনে পঁহুছিল। ষ্টিমারে তিনটি আরোহী কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাই ডাক্তার আসিলেন, পুলিশ ডাক্তারের অনুসরণ করিল। তখন ষ্টিমার জেটিতে লাগান হয় নাই, ডাক্তার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের চলন সই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লইলেন। পুলিশ ইত্যবসরে নাম, ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন, ডেকের যাত্রীদিগকে নীচে নামিলে পরীক্ষা করা হইল। আমাদের জেটিতে নামিতে ১১টা বাজিয়া গেল, কাষ্টম অফিসার আসিয়া আবকারী বিভাগের জিনিষপত্র আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন, আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

আমরা জেটি হইতেই এক বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহারাদি সমাপন করিয়া নগর পরিদর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম। রেঙ্গুনের পথগুলি প্রশস্ত ও সরল এমন কি কলিকাতার চৌরঙ্গী রাস্তার চেয়েও সুন্দর ও বিস্তৃত। গৃহ সমুদায় বৃহৎ সুগঠিত, দেওয়ালগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত, প্রকোষ্ঠ ও ছাদ কাষ্ঠ রচিত। আমরা প্রথম কৃত্রিম হ্রদ (Royal Lake) দেখিতে গেলাম, হ্রদটী বড়ই মনোরম। ইহার মধ্যভাগে যাইবার জন্য পথ আছে, তথায় বহুসংখ্যক বিশ্রামাগার, ফুলের বাগান এবং হ্রদ মধ্যে নৌকা নিয়া বেড়াইবার জন্য নৌকার আড্ডা, আছে। বিকালে রেঙ্গুনের অধিবাসী বড়লোক প্রায় সকলেই হ্রদের পাড়ে বেড়াইতে যাইয়া থাকেন। হ্রদ দেখিয়া আমরা সোয়েডেগন (Shwedagan) ফায়া দেখিতে গেলাম। বড় ফায়াটী চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ছোট ফায়াদ্বারা বেষ্টিত, তাহা ছাড়া অনাবৃত স্থান মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত। ছোট ফায়াগুলিতে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানস্থ ও শায়িত বুদ্ধ-মূর্ত্তি সকল বিরাজ

করিতেছে। যে দিকেই নয়ন ফিরান যায় সেই দিকেই কেবল কারুকার্য্যখচিত কীর্ত্তি-মঠ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ফায়ার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিবার সিড়ির দুই ধারে অসংখ্য ফুলওয়ালী কেশ বিন্যাস করিয়া, মাথায় ফুল গুঁজিয়া এবং রেশমের জামা ও লুঙ্গি পরিধান করিয়া ফুল বিক্রয় করিতেছে। যে সকল নরনারী বুদ্ধ মূর্ত্তি দর্শন করিতে যায় সকলেই বুদ্ধ-মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ফুল, ধূপ ও প্রদীপ দিয়া থাকে, প্রদীপের উদ্দেশ্যে মোমবাতি (candle) জ্বালাইয়া দিয়া থাকে। ঐ মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে, তাহা বৃহত্বে পৃথিবীর তৃতীয় ঘণ্টা বলিয়া পরিচিত, ঐ ঘণ্টায় যে যতবার আঘাত করিবে তাহার ততবার ঐ মন্দির দর্শন করিতে হইবে, এরূপ রীতি আছে। রেঙ্গুনে উল্লেখযোগ্য অতি পুরাতন আর একটী ফায়া আছে, তাহার নাম সুলে ফায়া ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ নগরের অধিকাংশ অধিবাসীই ভারতবাসী এজন্য সহরটীকে সময় সময় ব্রহ্মদেশের রাজধানী বলিয়া মনে করা কঠিন হইয়া উঠে।

এখান হইতে আমরা রেলপথে মান্দালয় দেখিতে যাই, পথিমধ্যে বহু সংখ্যক সেগুন কাষ্ঠের জঙ্গল দেখিতে পাই-লাম। মান্দালয় সহরটী উচ্চ ও ধূলিপূর্ণ দেখিলেই হতাশ হইতে হয়। এক সময় ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানে দেখিলাম রাজবাড়ী, রাণীর চাউঙ, সাঙ্গু ফায়া এবং মান্দালয় পর্ব্বত। এখানকার পথগুলি সকলই প্রস্তরময়, সরল ও প্রশস্ত। রাজবাড়ী কাঠদ্বারা নির্ম্মিত, রাজবাড়ীতে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। পূর্ব্বে শিখ ও পাঠান সৈন্য সকল রাজবাড়িতেই থাকিত, লর্ড কার্জ্জন ইহা রহিত করিয়া দিয়াছেন, তদবধি শূন্য রাজ-বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল একজন দারোয়ান সর্ব্বদা পাহারা দিয়া থাকে। এক্ষণে কোন দরবার হইলে তাহা রাজবাড়ীতেই সম্পন্ন হয়, ইহার নিকটেই সৈন্য থাকিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী ঘর তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, রাজ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে দেওয়াল (moat) আছে। তাহার পর পরিখার দ্বারা বেষ্টিত চারিধারে চারিটী গেট্ আছে, ঐ দেওয়ালের ভিতরেই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ তৈয়ার [illegible] মোট (moat) ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মান্দালয় সহরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ই মান্দালয় পর্ব্বত বলিয়া পরিচিত। মান্দালয় পর্ব্বত দেখিবার স্থান, পর্ব্বতের চারিধারে চারিটী উঠিবার পথ, পর্ব্বতের উপরি-ভাগে ছয়টী ফায়া আছে, এই সকল ফায়া মান্দালয়ের ঐশ্বর্য্যশালী লোকেরাই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, উঠিবার পথগুলিতে পাথরের সিড়ি; মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত না হইতে হয় তজ্জন্য সিড়ির উপর দিয়া টিনের ছাউনি আছে। লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রিতে অন্ততঃপক্ষে লক্ষাধিক নরনারী পর্ব্বতের পাদদেশে সমবেত হইয়া থাকে; ঐ রাত্রি অতিশয় পবিত্র, ঐ রাত্রিতে বুদ্ধাস্থি পর্ব্বতের উপরিভাগের ফায়ায় নীত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের নিম্নদেশে অসংখ্য ধর্ম্মশালা আছে। তাহাতে যাত্রিগণ রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। মান্দালয়ের জেজুবাজার কলিকাতার হগ্ সাহেবের বাজারেরই অনুরূপ সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। এখানকার দোকানদার সকলেই স্ত্রীলোক। পরিবারে যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী সেই দোকানে বসে, এ দেশের পুরুষ জাতি অত্যন্ত বিলাসী ও অলস।

সাঙ্গু ফায়ার বুদ্ধমূর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বৃহৎ। রাণীর চাউঙও দর্শনীয় স্থান। ব্রহ্মের রাজাদের প্রধানা মহিষী ব্যতীত অন্যান্য মহিষীরা এই চাউঙে বাস করিতেন। কালের স্রোতে ইহার অনেক বিলোপ সাধিত হইয়াছে এবং কতক অংশ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে; তবুও ইহার কারুকার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

এক মান্দালয় সহরে যে সকল চাউলের কল (rice mill) আছে তাহাতে দৈনিক ২০ হাজার মণ চাউল তৈয়ার হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অসংখ্য কাঠফাঁড়া কল (sawmill) আছে। চাউলের কল ধানের তুষদ্বারা ও কাঠ-ফাঁড়া কল কাঠের গুড়াদ্বারা ষ্টীম্ করিয়া থাকে।

এ দেশে আমাদের দেশের মতন স্ত্রীজাতি পরাধীন নয় এবং পুরুষ জাতির উপর জীবিকার্জ্জনের জন্য নির্ভর করে না। নরনারী সকলেই রেশমের জামা, লুঙ্গি ও চটিজুতা (Burmise slipper) পরিধান করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরু-ষের পরিচ্ছদের ভিতরে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, পুরুষ মাথায় রেশমের পাগড়ী ব্যবহার করে, স্ত্রীজাতি ব্যবহার করে না, ইহাই কেবল পার্থক্য। বর্ত্তমানে ইংরেজজাতির সংস্রবে পুরুষেরা বুট জুতা ধরিয়াছে, এমন কি ছোট বড়

সকলেরই এক জোড়া বুট আছে। ইহারা কোন অবস্থাতেই জাতীয় পোষাক ছাড়িতে চায় না। স্ত্রীলোকেরা হাট বাজার করে এবং সকল কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে। পুরুষগুলি বিলাসিতার প্রতি যথেষ্ট আসক্ত, উচ্চ শিক্ষার প্রতি তেমনই অনাদর প্রদর্শন করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সিগার টানিতে অভ্যস্ত।

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রবল। আজকাল ভারতীয়ের সংমিশ্রনে "জেরবাদী" নামে এক মুসলমান সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, ইহাদের সংখ্যাও কম নয়, বেশভূষায় ইহারাও বর্ম্মাদের অনুরূপ। জেরবাদীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ অত্যন্ত ঘৃণা করে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের বিবাহ বর ও কন্যার মতেই সম্পন্ন হয়। ইহারা জীব হত্যা করা অত্যন্ত পাপ মনে করে। কিন্তু বাজার হইতে মাংস খরিদ করিয়া ভোজন করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না, আজকাল সকল প্রকার মাংসই খায় কিন্তু রাজা থিবোর সময় কেহই গোবধ করিতে পারিত না, করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। বর্ম্মাবাসীরা আমাদের মতন একবারে ১২ ঘণ্টার জন্য উদর পূরণ করিয়া লয় না, তাহারা দিন রাত্রিতে ৭।৮ বার খায়। ভাত যদিও ইহাদের প্রধান খাদ্য তবুও শাক সব্জিই অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে, সাধারণতঃ বাজার হইতে ভাত, ডাল খরিদ করিয়া আনে, অনেকেরই বাড়ীতে রান্নার বন্দোবস্ত নাই। বর্ম্মারা মৃত্যুর পর শবের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে, ফুলের তোড়া ও মালা দিয়া শব সাজ্জিত করিয়া সমাধি স্থানে নিয়া থাকে। কোন কোন ফুঙ্গির (monk & nun) মৃত্যুতে লক্ষ টাকা পরিমাণ ব্যয়িত হইয়া যায়। শব বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা ভস্মীভূত করা হয়, সুগন্ধি পুষ্পসার দ্বারা ভস্মীভূত অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। মান্দালয়ে অনুন ১০ হাজার ফুঙ্গি আছে, ইহারা সকলেই গৈরিকধারী এবং বিবাহ করিতে পারে না। ফুঙ্গিরা রান্নাও করিতে পারে না। প্রভাত হইতে সকল ফুঙ্গিই ভিক্ষা করিতে বাহির হয়, গৃহস্থেরা তাহাদের গৃহে ভাল আহারীয় যাহা থাকে তাহাই ফুঙ্গিদিগকে দিয়া থাকে; এবং এইরূপেই তাহারা উদর পূরণ করিয়া থাকে। ইহাদের থাকিবার জন্য ফুঙ্গি চাউঙ আছে, তাহাতেই বাস করে। ফুঙ্গি চাউঙ সর্ব্বসাধারণের টাকা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বর্ম্মারা অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। তানাখা এক প্রকার চন্দন জাতীয় কাঠ, পেষণ করিয়া সকল স্ত্রীলোকই মুখে ও হাতে লেপন করিয়া থাকে, ইহা অনেকটা পাউডারের ন্যায় শুভ্র দেখায়। আমরা মান্দালয় হইতে রেলপথে সেগাইন যাই, সেগাইন একটী সহর; যাইবার পথে দুইধারে অসংখ্য মরিয়ামের বাগান দেখিতে পাইলাম। মরিয়াম শৃগাল-দংশনের মহৌষধ। ব্রহ্মদেশে মরিয়াম বৃক্ষ থাকায় তথায় শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায় না। মরিয়ামের গন্ধ নাকি শৃগালের পক্ষে অসহ্য। ইরাবতী নদী পাড় হইয়া সেগাইন টাউনে যাইতে হয়, এখানে ইরাবতী পর্ব্বতের পাদ ধৌত করিয়া ইরাবতী বহিয়া যাইতেছে, নদীর পশ্চিম তীর হইতেই পর্ব্বত উচু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঐ পর্ব্বতোপরি অসংখ্য ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মন্দির সকল অবস্থিত, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মন আনন্দে বিমোহিত হয়।

সেগাইন হইতে রেলপথে মেমিও সহর দেখিতে গেলাম। এ সহরটী পর্ব্বতোপরি অবস্থিত, দেখিলেই মনে হয় ইহা যেন পর্ব্বতের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিবার জন্যই ভগবানকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে; ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকল স্থানকে পরাজিত করিয়াছে। এখানে অসহনীয় শীত, প্রায়ই রবিকর কোয়াসায় সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। মেমিওর অনতিদূরে এনিসেকান নামধেয় জলপ্রপাত আছে। এনিসেকানে এক হাজার ফিট উচ্চস্থান হইতে জল পড়িতেছে, শেষোক্ত জল প্রপাতে নামিবার জন্য পথ আছে। দূর হইতেই শব্দ ও শুভ্র ফেনরাজি দেখিতে পাওয়া যায় এবং মনে হয় যেন ধূম উঠিতেছে। মেমিওতে ব্রহ্মের ছোট লাটের শৈলাবাস। এখানে বিস্তর কমলালেবু ও শাকসব্জি পাওয়া যায়। এবং ঐ সকল দ্রব্য এখান হইতে অন্যত্র সরবরাহ হইয়া থাকে। কফি এখানে বারমাসই পাওয়া যায়, নাশপাতিরও অসংখ্য বাগান আছে। এখানকার নাশপাতিগুলি অপকৃষ্ট জাতীয়। মেমিও টাউন সমুদ্রতল হইতে ৩৪৮১ ফিট উচ্চে অবস্থিত।

শ্রীকালীশঙ্কর দত্ত।

লুকোচুরি।

কেন যে এসেছিলে নাহি তা' জানা,
কেন যে ভোর বেলা
দুয়ারে দিলে ঠেলা
পাখীরা না মেলিতে আকাশে ডানা—
কিছুই যান নাক
কেমনে কোথা থাকো,
কেমনে কোথা হতে দাও হে হানা।

কেন যে এসেছিলে বলেনি কেহ
কেবল তৃণদলে
শিশির শীত জলে
রয়েছে আঁকা ওগো তোমারি স্নেহ।
কেবল আলোকেতে
আঁধার পীঠপেতে
যেখানে বসিয়াছে সারাটা গেহ।

কেন যে এসেছিলে কে মোরে বলে
নয়ন ঝরে যায়
সলিল সুষমায়
তরুরা ভাসে নিতি শিশির জলে।
আঁধার আলোকেতে
একলা দিনে রেতে
এমনি চলিয়াছে এমনি চলে।

কেন যে এসেছিলে কেমনে এলে,
আজিকে তরুলতা
সে মূক ব্যাকুলতা,
বুকেতে আকাশের দিতেছে মেলে।
তোমার পদধূলি
বুকেতে নিতে তুলি
তটিনী তটে লয়ে প্রলয় খেলে।

তুমি যে এসেছিলে সে কি গো ভুল?
বুঝি না কার শোকে
তবু ও কেন চোখে
দুখানি জল কণা দোদুল দুল।
পড়িয়া আছে কাজ
বসেনি মন আজ
সিঁদুর পরি নাই বাঁধিনি চুল!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

আলোচনা ও মন্তব্য।

শিক্ষায় দেশীয় ভাষা—বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইতেছে তাহার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ের আলোচনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটা অতি গুরু বিষয়ের সম্প্রতি অবতারণা করা হইয়াছে। দিল্লীতে সেদিন ভারতবর্ষীয় শিক্ষা বিভাগের সমস্ত ডিরেক্টারদিগের যে এক সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে মাননীয় বড় লাট মহোদয় এক প্রশ্ন তুলিয়াছেন—শিক্ষায় বিশেষতঃ কলেজের বাহিরে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ইংরেজী ভাষার বদলে দেশী ভাষার ব্যবহার সম্ভব এবং উচিত কিনা? বড়লাট স্বয়ং নিজের দেশে শিক্ষা-বিষয়ক অনেক প্রশ্নের বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যে মত গঠন করিয়াছেন, তাহা দেশী ভাষার সপক্ষে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শিক্ষার বাস্তবিক বিষয়—বস্তুর জ্ঞান; কোন্ ভাষায় কোন বস্তুকে কি বলে তাহাও জ্ঞাতব্য বিষয় বটে, কিন্তু তাহা শিক্ষার প্রধান বিষয় নহে। ধুতুরাফুলকে ইংরেজী বা ল্যাটিন ভাষায় কি বলে তাহার খবর আমরা রাখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে ধুতুরার গুণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইবে না, এবং তাহার গুণ জানা না থাকিলে, ধুতুরা যে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে, এ সংবাদও আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে। শুধু তাই নয়, যাঁহারা দেশী পাচন ও মুষ্টিযোগ দ্বারা কখনও উপকৃত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, অনেক সময় এমন সব গাছগাছড়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়, যাহাদের সাধুভাষার নাম চিকিৎসকের অজ্ঞাত, কিন্তু তাহাতে চিকিৎসার কোন হানি হয় না। ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার (Moliere) তখনকার দিনের ডাক্তার দিগকে এই বলিয়াই উপহাস করিয়াছিলেন যে তাঁহারা কতক গুলি ল্যাটিন ও গ্রীক নামই শুধু আওড়াইতে পারেন, বাস্তবিক দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে সুতরাং প্রকৃত চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অত্যন্ত কম। আর ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, শুধু চিকিৎসার নয়, সর্ব্বত্রই প্রকৃত পক্ষে মূল্যবান্ জ্ঞান—শব্দ জ্ঞান নহে, বস্তু জ্ঞান।

তাই যদি হয় তবে, আমাদের ছেলেরা যে প্রথম হইতেই

কতকগুলি বিজাতীয় শব্দ মুখস্থ করিয়া শক্তিক্ষয় করে, তাহা কি প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় নহে? শিক্ষক মাত্রেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, যে সমস্ত বিদ্যায় স্মৃতিশক্তির চেয়ে বুদ্ধির প্রয়োজন বেশী সে বিদ্যায় বাঙ্গালীর ছেলে সহজে হটে না। কিন্তু সে যাহা জানে ও বুঝে তাহা যখন একটা অসম্যক-জ্ঞাত ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিতে বলা হয়, তখনই সে একটু মুস্কিলে পড়ে। সুতরাং দেশী ভাষায় শিক্ষা হইলে যে তাহার প্রকৃত শিক্ষা বেশী হইত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অবশ্যই ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যও একটী অতি আদরণীয় বস্তু, বিশেষতঃ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়। ইংরেজীর সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকার, এমন কি চীন জাপানেরও সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের অধিগম্য হয়। এমন জিনিসের আদর কখনও কম হইতে পারে না। কিন্তু যে রসায়ন শিখিবে কিংবা ইংঞ্জিনিয়ারিং শিখিবে তাহার পক্ষে ওয়ার্ডসওয়ার্থ টেনিসনের কাব্যকলার সহিত অপরিচয় যে একটা গুরুতর অন্তরায়, এমন নহে। তেমনই, ইংরেজী একেবারে না জানিয়াও ইতিহাস বা দর্শনের জ্ঞান সম্ভব। যদি এই সমস্ত বিষয়ের প্রচুর জ্ঞান কোনও বিদেশী ভাষার সাহায্য না নিয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে দেশী ভাষার কি শ্রীই না হইত!

কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন দেশী ভাষা ও সাহিত্যের হিত চিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই উহা ধীর ভাবে আলোচনা করা উচিত; এবং যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কর্ণধার তাঁহাদের এই সুবর্ণ-সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তাঁহাদের দেখান উচিত, যে অতি গুরু ও গভীর বিষয়ের আলোচনাও দেশী ভাষার সাহায্যে হইতে পারে। গ্রীক ভাষায় ঈশ্বরকে কি বলে, কিংবা জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা বায়ুকে কি বলেন, তাহা না জানিয়াও দর্শন রসায়ন প্রভৃতি গুরু বিষয়ে মনীষা-সম্পন্ন বিচার আমরা করিতে পারি। বাঙ্গালা ভাষা যে শুধু উপন্যাস ও গানের ভাষা নহে, সাময়িক সাহিত্যে যদি ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় পাইতে আরম্ভ করি, তবে জাতির ভবিষ্যতের যবনিকা কতক অপনীত হইবে এবং আশার আলোকের সুবর্ণ-রেখা আমাদিগকে পুলকিত করিবে সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের ভাষা—বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষাটা কি হইবে, তাই নিয়া বিচার এখনও মন্দীভূত হয় নাই। সেদিনও 'সবুজ-পত্র' সম্পাদক 'ভারতী' ও 'সবুজপত্রে'—বলিয়াছেন যে, তিনি এক শ জনকে এক শ কথা বলিয়াছেন কিন্তু এই এক শ জনই একই কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া নূতন কিছুই বলেন নাই। কিন্তু ঐ যে "একটী কথা," তার উত্তর হইয়াছে কি? একটা কথা রহিয়াছে, ভাষার কোনও একটা শব্দের—ব্যক্তি বিশেষের বা স্থান বিশেষের উচ্চারণ অনুসারে বানান হওয়া উচিত কিনা? একটি লোক ছিল, সে লবণ উচ্চারণ করিতে পারিত না, বলিত 'নবণ'; তাহাকে কি আমরা এ কথা বলিতে পারিতাম, "তুমি ভাল ভাল গল্প লিখিয়া যাও, লবণে'র জায়গায় নবণ' লিখিও, মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব?"

অথচ, ভাষার তর্কের বার আনা যে এই উচ্চারণ বৈষম্য নিয়া, একথাটা স্বীকৃত হইয়াছে কি? আর উচ্চারণ বৈষম্য নিয়া বানান হইলে কিরূপ শব্দের খিচুড়ি হয়, তাহা 'সবুজ পত্রের' ও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায়ই দেখা যায়।

বালক ও বৃদ্ধ মহাপ্রাণ বর্ণের নিকট হার মানেন, কিন্তু তেজোদীপ্ত যুবকের কাছে তাহা আটকায় না। ভাষা-দেবী যদি বর্ণবিন্যাস দ্বারা উভয়েরই মনরক্ষা করিতে চান, তবে তিনি যে রাক্ষসীর আকার ধারণ করিবেন! প্রমথবাবু লেখেন 'হয়েছে' 'করেছে' কিংবা 'কোরেছে' 'গেছে' ইত্যাদি ছ-কার তাঁর অপছন্দ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখেন 'নিয়েচে' 'করেচে' 'করেচি' ইত্যাদি। আমরা যদি এই বামাচারে দীক্ষিত হইতে যাই, তবে কাহাকে গুরু মান্য করিব?

* * * *

সমরে সাহিত্য—এখনও তিন বৎসর পূরে নাই, ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এরই মধ্যে এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া সে দেশে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। 'সাহিত্য' কথাটায় যেন কেহ আপত্তি না করেন, কারণ, ভগ্ন প্রস্তর ও নগ্ন মূর্ত্তি যদি সাহিত্য হয়, তবে ছাপার অক্ষরে এবং চামড়ায় বাধান কাগজে যে সব চিন্তা শরীর ধারণ করিয়া আছে, সে গুলি সাহিত্য নয় কেন? যাহা হউক, এত সব বই এই একই বিষয় নিয়া

সে দেশে লিখিত হইয়াছে যে, সে গুলির সহিত তুলনায় বাংলার শতাধিক বৎসরের সাহিত্য-চেষ্টা তৃণবৎ মনে হয়। আমাদের এই দৈন্য কেন?

এই প্রশ্নের একটা উত্তর আপাততঃ আমাদের মনে হইতেছে; জানি না, তাহা ঠিক কিনা। আমাদের দেশে যাঁরা সাহিত্য-চেষ্টায় অগ্রসর হন, তাঁহারা সকলই চির-স্মরণীয় হইতে চান। এটা বড় জুলুম দাবী। এই দুরাশার ফলে হয় এই যে, একটা ছাপার ৮ পৃষ্ঠার সাময়িক প্রবন্ধ লিখিতেও— অনেকে বৎসরাধিক সময় নিয়া থাকেন তাঁহারা হয়ত ভাবেন যে, এত দীর্ঘকাল রোমন্থন করিয়া যে জিনিষ সৃষ্টি করিবেন, তাহা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই পাঠক সমাজ লুফিয়া ধরিবে। কিন্তু তাহা হয় কি?

যে কোন মজলিসে তর্কচ্ছলে আমরা কত কথা বলিয়া যাই; সব কথাই কি বেকুবের মত বলি? এইরূপ আলোচনা, বিচার-গবেষণা মুদ্রিত ভাষার ভিতর দিয়া করিলে দেশের লাভ বই লোকসান হইবে না; এবং যিনি বাক্‌যুদ্ধ করেন, তিনিও একটু সংযত হইতে শিখিবেন। সাময়িক আলোচনারও একটা মূল্য আছে।

এই যুদ্ধ নিয়া যে হাজার হাজার বই বাহির হইতেছে তাহার কোনটাই প্রকৃত ইতিহাস নহে, কারণ নিরাপেক্ষ বিচার এখন হইতেছে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যে ইতিহাস লিখিত হইবে, তাহার উপাদান এগুলিতে সঞ্চিত হইতেছে। কিছু দিন পরে, এদের অনেক গুলিরই নামও অনেকে জানিবে না; লেখক এবং প্রকাশকও ইহা বুঝেন। বুয়র যুদ্ধ কিংবা রুষ-জাপানের যুদ্ধের সময় কি বই কম লেখা হইয়াছিল? কিন্তু তার অনেকগুলি এখন বিস্মৃত-প্রায়। তথাপি লোকের চেষ্টার বিরতি নাই। এই চেষ্টার কথায় মনে হয়, ইহা মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। একটু বেড়াইয়া আসিলে তাহা দ্বারা আপাততঃ কোন স্থায়ী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া যদি কেহ তাহাকে শারীরিক শক্তির অপব্যয় মনে করেন, কিংবা এক সময় না এক সময় বিস্মৃত হইবেন মনে করিয়া যদি কেহ আগন্তুকের নামটী জানিতে অনিচ্ছুক হন, তবে মনে করিতে হইবে, সে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল নহে।

সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনই যাহারা অনবরত ছুটাছুটি করিতে পারে, তাহাদের বল ও স্বাস্থ্য আছে। ইহাদের সব কাজই চিরস্মরণীয় হইবে না। কিন্তু চিরস্মরণীয় কাজও ইহাদের মত লোকেই করে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি এইরূপ একটা অশান্ত, বিবিধ, বিচিত্র চেষ্টা দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে, আনন্দেরই কথা হইত।

* * * * *

"চীনের পাগলামির সাক্ষ্য"— জর্ম্মাণীর জিঘাংসাবৃত্তি জগতের মনোরাজ্যে একটা ভয়ানক উলট-পালট উপস্থিত করিয়াছে। মানুষের চিন্তা, শান্তির অমৃত-রস আস্বাদনের পরিবর্ত্তে কঠোর নির্ম্মম-জিঘাংসার চিন্তায় ব্যস্ত। কি ভয়ানক শোচনীয় পরিবর্ত্তন! আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য সুহৃদ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় চীনের মহাপ্রাচীর দেখিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন "চীনের বিরাট প্রাচীর চীনের বিরাট পাগলামির সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেওয়াল প্রস্তুত করিতে এবং রক্ষা করিতে যত খরচা পড়িয়াছিল তাহাতে কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হইতে পারিত না কি?" বিনয় বাবু ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ার প্রবল ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়া করিয়া হৃদয়ে সেই চিন্তাই প্রবল করিয়া তুলিয়াছিলেন— এইবার চীনের এই বিরাট বাজে খরচ দেখিয়া তাহার প্রাণের কথা লেখনিতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দেশ-কাল পাত্র ভেদে এই চিন্তা স্বাভাবিক হইলেও বিনয় বাবুর মত চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে, এরূপ উক্তি বোধ হয় ঠিক হয় নাই। আজ তিনি এইরূপ বলিলেন, আর একদিন আর একজন বলিবেন—শ্রীচৈতন্য দেব তাঁহার শক্তির এইরূপ অপব্যবহার না করিয়া দেশের লোককে যদি স্বরাজ ও স্বাধীনতারদিকে অনুপ্রাণিত করিয়া যাইতেন, তবে আজ আমাদের কি সুখের দিনই না হইত! শক্তির কি বাজে-খরচই না তিনি করিয়া গেলেন।

চীন সভ্যতা—ফো, কনফিউসিয়াস ও গৌতম-বুদ্ধের 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' নীতির অনুসরণে যখন চীনকে ঋষির তপোবনে পরিণত করিয়াছিল, তখন সেই তপোবনের শান্তিরক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, চীনসম্রাটগণ তখন তাহাই করিয়াছিলেন। তখন হুইটজার কামানও ছিল না, মেক্সিম বন্দুকও বাহির হয় নাই, সুতরাং আত্মরক্ষার তেমন চিন্তা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। আজ

জর্ম্মণীর শক্তিবাদী নিট্‌সের ধ্বংশনীতি সেই প্রাচীন শান্তি নিকেতনের বক্ষস্থলে কেন কতগুলি জীব হত্যার আড্ডা প্রস্তুত হইয়াছিল না—তাহারই কথা স্মরণ করাইয়া চীনের সেই শান্তিবাদকে ধিক্কার দিতেছে। বর্ত্তমান হিংসা, স্বার্থ শোণিত স্পৃহার দোকানদারীর দিনে, শান্তি প্রীতি মাধুর্য্যের খরিদ বিক্রী যে ঐরূপ পাল্লাতেই ওজন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষ'তো অতি প্রাচীন সভ্যদেশ। ভারতের নিজস্ব তেমন প্রাচীন নিদর্শন কিছু আছে কি? চীনের বিরাট পাগলামির নিদর্শনটা তবুত দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহিঃশত্রু দমন রাখিয়া চীনকে রক্ষা করিয়া গিয়াছে। এবং বোধহয় বর্ত্তমান আমদানী পাগলামির হস্তে নষ্ট না হইলে ইজিপ্টের বৃথা-জীবন পিরামিড্‌গুলির ন্যায় চীনের এই প্রাচীরও চীনের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ লক্ষ লক্ষ ভ্রমণকারীর দর্শনের ও আলোচনার বিষয় হইয়া আরও শত শত বর্ষ দণ্ডায়মান থাকিবে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ধ্রুব—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। মূল্য চারি আনা। পদ্যে লেখা হইয়াছে। এই সকল পৌরাণিক উপখ্যান পুরাতন হইলেও নিত্যনূতন। লেখকের রচনা মন্দ নহে।

The English Tense—By Suresh Chandra Chakraborty গ্রন্থকার একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক; তিনি বালকদিগের উপযোগী করিয়াই পুস্তকখানা সংকলন করিয়াছেন।

উমা ও রমা—"গোধন" প্রণেতা শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত মূল্য দুই টাকা মাত্র।

"উমা ও রমা" একখানা সামাজিক উপন্যাস। এই গ্রন্থে আমাদের সমাজ-তথ্য, গৃহ-তথ্য, শিক্ষা সমস্যা, সংসর্গ সঙ্কট প্রভৃতি নানা জটিল বিষয়ের গুরুতর প্রশ্ন যেমন উত্থাপিত হইয়াছে, বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং বিভিন্ন নরনারীর চরিত্র চিত্রনে ঐ সকল গুরুতর প্রশ্নের সমাধান ও সেইরূপ সুন্দর রূপে সমাহিত হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এরূপ উপন্যাস আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে অত্যন্ত বিরল। যদি উপন্যাসই দিতে হয় তবে "উমা ও রমার ন্যায় উপন্যাসই বঙ্গীয় যুবক যুবতীর হাতে দেওয়া উচিত। গ্রন্থকার বঙ্গীয় রমণী সমাজের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং তাহা পাঠ করিলে রমণী সমাজ যে উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গে "উমা ও রমার" ন্যায় গ্রন্থ যতই প্রকাশিত হইবে ততই সমাজের মঙ্গল। আমরা গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি উমার ন্যায় আদর্শ রমণী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া শোক তাপ দগ্ধ বাঙ্গালীকে তাহার পুণ্য-স্পর্শে পুলকিত করুন।

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পঞ্জিকা—(প্রথম বৎসর) শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, ও শ্রীরাখালরাজ রায় বি, এ, সম্পাদিত। ইংরেজী ভাষায় এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার থাকিলেও, বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ প্রচারের উদ্যম অভিনব। এজন্য সম্পাদকদ্বয় সাহিত্য সেবক মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এইরূপ গ্রন্থে নানা প্রকারের ত্রুটী ও ভ্রম-প্রমাদ অপরিহার্য্য—এ গ্রন্থে ও তাহার অভাব নাই। যাহা হউক গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের আশা হইতেছে, ইহার ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমরা ইহাকে "ভ্রম ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতা" হইতে মুক্ত দেখিতে পাইব।

বর্ত্তমান সংস্করণের ১ম ভাগে ঐতিহাসিক ঘটনা পঞ্জি, প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের নাম, আধুনিক যুগের স্বর্গীয় গ্রন্থকারগণ, বাঙ্গালার বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ ও তাঁহাদের পুস্তকাবলী, মুসলমান লেখকগণের তালিকা, সংবাদ পত্র, সভা সমিতি ও পুস্তকালয়, মুদ্রন বিষয়ক তথ্য এবং দ্বিতীয় ভাগে—১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ, ঐ সালে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা, বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা, বিগত বর্ষের মাসিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে।

সম্পাদকদ্বয় যখন চেষ্টা-চরিত্র করিয়াই এতটা করিয়া-

ছিলেন, তখন আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে লিখিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পক্ষপাতিত্ব-দোষ দুষ্ট ও বন্ধুপ্রীতি-পরিচায়ক "১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গ সাহিত্যের অসম্পূর্ণ বিবরণ" কেন এই গ্রন্থে স্থান দিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এখন কোন্দলের হাট বসাইয়া সময় ও অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা দেখিতেছেন। তাহার ফলে আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে—"বর্দ্ধমানের ইতি কথা" শুনিতে হইতেছে—দলাদলির বীভৎস চিৎকার; পড়িতে হইতেছে—এই বিদ্যাভূষণী জয় ডঙ্কা—'আমাদের আর আমাদের'। আশা করি আমরা ভবিষ্যতে সম্পাদকদ্বয়কে কোন এক দশদর্শী লেখকের মতের সমর্থন করিতে দেখিব না।

স্বাস্থ্য-নীতি—স্বাস্থ্যসমাচার সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম, বি, সম্পাদিত। ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট 'স্বাস্থ্য-সমাচার' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ব্যাধি-প্রপীড়িত বাঙ্গালার নরনারীকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বলিয়া দিয়া ডাক্তার বসু সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এখন তিনি তাহার স্বাস্থ্য সমাচারে প্রকাশিত আলোচনা গুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া জন সাধারণের মধ্যে আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আমরা এই স্বাস্থ্যসমাচার পুস্তকাবলীর ১ম সংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যা (স্বাস্থ্যনীতি ও গার্হস্থ্যনীতি) প্রাপ্ত হইয়াছি। ১ম সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা ও ২য় সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। ১ম সংখ্যায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে, প্রাতঃ-ক্রিয়া, স্নান, আহার, জলপান, পরিধান, পরিশ্রম ও ব্যায়াম, বিশ্রাম এবং সংযম প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় গার্হস্থ্যনীতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথা গৃহ, বায়ু, জল, খাদ্য রোগ প্রভৃতি বিষয় অতি সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ যতই প্রচারিত হইবে ততই সমাজের মঙ্গল। আমরা বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধ বনিতাকে এই পুস্তকাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সাবিত্রী—শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত। কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

এই নৈতিক অধঃপতনের দিনে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে এরূপ গ্রন্থের আদর যতই বাড়িবে ততই সমাজের মঙ্গল। গ্রন্থকার সাবিত্রীর চিত্র বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল ও চিত্তাকর্ষক। ছাপা কাগজ ও বাধাই উৎকৃষ্ট।

সাগর পথে।

(১)

উজান বেয়ে যারে মাঝি,
উজান বেয়ে চল;
ক্ষুদ্র যে তোর তরী খানি,
অল্প যে তোর বল।
স্রোতের পথে সাগর মুখে,
পারবি নাত রাখতে রুখে,
সুখের তরী ভাঙ্গবে দুখে,
উঠবে লোনা জল।
উজান বেয়ে যারে মাঝি,
উজান বেয়ে চল!

(২)

দখিন বায়ে তাড়াতাড়ি,
উড়িয়ে দেনা পাল!
সুযোগ সদা আসে না রে,
ঘুরিয়ে দেরে হাল।
আর যদিরে সাগর তীরে,
যায় ত, তরী ডুবিয়ে দেরে,
ডুব দে আগে হৃদয় নীরে,
দেখতে রসাতল।
উজান বেয়ে যারে মাঝি,
উজান বেয়ে চল!

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

ময়মনসিংহ লিপিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৩। | ষষ্ঠ সংখ্যা।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঊনিশ দিনের পর আমরা মাসোন্ ত্যাগ করিলাম। সঙ্গে আমাদের ১১৫ জন সিপাহী চলিল। বারদিন পূর্ব্বে সীমান্তে ২৫ জন সিপাহী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একজন শিখ সিপাহীকে উহাদের জমাদার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সহজ ভাবে গমন করিলে ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকার পশ্চিম সীমান্তে ৬।৭ দিনে উপস্থিত হওয়া যায়। আমরা কিন্তু ১১৫ জন সিপাহী সঙ্গে করিয়া ঐ পথ ৪ দিনে গমন করিলাম। চতুর্থ দিন বেলা দুইটার সময় আমরা টোপো গ্রামে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত মিলি নামক স্থান টোপো হইতে প্রায় ৩॥ মাইল দূরে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যস্থলে টোপো নামে এক ক্ষুদ্র নদী। টোপো ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রদেশের একবারে পশ্চিম সীমান্তে ও মিলি ইউগণ্ডার পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত; মধ্যস্থলে ঐ নদী।

টোপোতে আমরা শুনিলাম যে নাগা নামক একজন স্থানীয় সর্দ্দার বিদ্রোহী দলের নেতা হইয়াছে। উহার অধীনে প্রায় ৬০০ লোক জড় হইয়াছে। ঐ সময়ে নাগা স্বয়ং মিলিতে অবস্থান করিতেছিল এবং উহার সহিত অনধিক ৩০০।৩৫০ লোক ছিল। ঐ নদী পার হইবার জন্য ইংরাজ এক কাঠের পুল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা কিন্তু এখন উহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। টোপোতে উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রধান চিন্তা হইল, কি করিয়া নদী পার হইব। পুল থাকা সত্বেও পূর্ব্বে অনেক গুলি দেশী নৌকা ও ডোঙ্গা পারাপার হইবার জন্য নদীতে থাকিত। আজ কিন্তু টোপোর দিকে একখানিও দেখা গেল না। শুনিলাম, উহার সমস্ত গুলি বিদ্রোহীরা মিলির পারে লইয়া গিয়াছে। দুই একখানা কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে, বাকীগুলার তলায় ছিদ্র করিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দিয়াছে।

ঐ দিন আমরা নদী পার হইবার আর চেষ্টা করিলাম না। স্থির থাকিল কল্য প্রাতঃকালে আমরা নদী পার হইয়া মিলি আক্রমণ করিব। সন্ধ্যার পর আমি কাপ্তেন সাহেবের শিবিরের দ্বারে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। লোকটা বেজায় লম্বা। তবে সে স্থানে আলো ছিল না বলিয়া উহার চেহারা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। লোকটা ভাঙ্গা হিন্দিতে আমায় বলিল যে সাহেবের সহিত তাহার দেখা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমি বলিলাম, "তোমার কি প্রয়োজন?" সে কিন্তু তাহা বলিল না। আমি বলিলাম, "তাহা হইলে সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না।" এই ব্যাপার লইয়া আমাদের সহিত তর্ক বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় কাপ্তেন ও ডাক্তার সাহেব তাঁবুর বাহিরে উপস্থিত হইলেন। লোকটা তখন বেশ পরিষ্কার ইংরাজি ভাষায় সাহেবদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমি সার্জ্জেন্ট হে। আপনারা হয় ত আমার কথা শুনিয়াছেন?" সাহেব দুইজন মুহূর্ত্ত কাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর কাপ্তেন সাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিলাম, একদিন রাত্রি প্রায় দুইটার সময় হে সাহেব প্রায় ৫০০ বিদ্রোহী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার সঙ্গে ২৫ জন সিপাহী ছিল।

বিদ্রোহীরা যে এতদূর প্রবল হইয়াছে, তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। এইজন্য তিনি এই প্রকার ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। সিপাহীরা অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর চারি দিকে পলাইতে আরম্ভ করে। তখন হে সাহেব বাধ্য হইয়া পলায়ন করেন। আজ ৫ দিবস ক্রমান্বয়ে তিনি গোপনে গোপনে ঘুরিয়া অনেক কষ্টে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করেন। মিলিতে যে কয়েকজন সাহেব ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই বাঁচিয়া নাই। তিনি শুনিয়াছেন মিসেস্ লেথার্ট নাকি এখনও বাঁচিয়া আছেন। তবে প্রকৃত খবর তিনি জানেন না।

পর দিবস প্রত্যূষে আমরা সদলবলে নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। দেখি, অপরপারে প্রায় ৫০০ শত লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের প্রায় সকলের হাতেই এক একটা বন্দুক। কয়েকজন লোকের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা দেখিলাম—বোধ হয়, উহাদের বন্দুক জোটে নাই। আজ আবার নদী পার হইবার কথা উঠিল। কিন্তু এ কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা কেহই করিতে পারিলেন না। তখন কাপ্তেন সাহেব উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, 'তোমরা সকলেই দেখিতেছ, নদী পার হওয়া আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক। পুল যাহা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। নৌকাগুলা বিদ্রোহীরা সব ওপারে লইয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমি কেবল মাত্র একটী উপায় দেখিতেছি। কিন্তু তাহাও অত্যন্ত কঠিন। যদি কেহ আমাদের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া অপর পারে উপস্থিত হয় এবং ঐস্থান হইতে দুই একখানি নৌকা এই পারে লইয়া আসিতে পারে, তবেই আমরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখিও, যে কেহ এই কাজে অগ্রসর হইবে তাহাকে দুইটী অতি ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে—এক—শত্রুপক্ষের বন্দুকের গুলি, আর নদীর কুমীর। তোমরা সকলেই জান এই নদী শত শত কুমীরের আবাস স্থান।

আমিও সাহেবের কথা শুনিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এ ভাবে নৌকা আনিবার চেষ্টা আর আত্মহত্যা করা সমান। নিতান্ত পাগল না হইলে আর কেহ এ ভীষণ কার্য্যে হাত দিবে না। সাহেবের কথা শেষ হইবার পর দুই মিনিট পর্য্যন্ত কেহ কথা কহিল না। তাহার পর দুইদিক হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া প্রত্যেকে কাপ্তেন সাহেবকে স্থির ভাবে কহিল, "আমি যাইতে প্রস্তুত।" একজন সার্জ্জেণ্ট হে ও অপর—আমাদের রতিকান্ত! রতিকান্ত উপস্থিত হওয়াতে সাহেবেরা পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার সাহেব স্পষ্টই বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা দেশের লোক নয়?" রতিকান্ত যখন ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, তখন তিনি সুধু বলিলেন, "Strange! But you are an exception. (বড়ই অদ্ভুত। কিন্তু তুমি সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত)। কাপ্তেন সাহেব কিন্তু রতির দুই হস্ত ধরিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কহিলেন, "সাবাস! তোমার এই সাহসে আমি বাস্তবিক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা দুই জনেই যাও। ভগবানের দয়ায় যদি দুইজনেই ওপারে যাইতে পার তাহা হইলে হয় ত দুই খানা নৌকা আসিতে পারে। তাহা না হইলেও তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতে পার।"

উহাদের প্রত্যেকের হাতে প্রায় ১০০ গজ লম্বা এক গাছা করিয়া দড়ি দেওয়া হইল। উহার এক প্রান্ত আমাদের সঙ্গে রহিল। অপর প্রান্ত উহাদের কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমাদের সঙ্গের ৩০ জন লোক বন্দুক হাতে করিয়া একবারে জলের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। বিদ্রোহীরা যদি ঐ দুই বীরের উপর গুলি চালায়, তাহা হইলে উহারাও গুলি চালাইবে। উহাদের রক্ষার জন্য আমরা সাধ্যমত বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করিলাম না। এখন রতিকান্ত ও হে সাহেবের কথা—রতির জবানী বলিতেছি।

"আমরা যখন নদীতে ঝাঁপ দিলাম, তখন সাহেবের মনের কথা বলিতে পারি না; আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় বোধ হইতেছিল না। আমরা যখন প্রায় সিকি ভাগ পার হইয়াছি, তখন আমার দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩০ হাত দূরে কি একটা ভাসিতেছে দেখিলাম, বোধ হইল যেন একখানা তক্তা। কিন্তু হে সাহেব যেন খুব চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "বন্ধু! কুমীর ভাসিতেছে। সাবধান!" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে উহা জলের মধ্যে অদৃশ্য হইল। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের বন্ধুরাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

যেখানে উহা ডুব দিল, সেইখান হইতে আমাদের দক্ষিণে ৮।১০ হাত দূর পর্য্যন্ত স্থানের উপর তাঁহারা গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমার বোধ হয় সেইজন্য উহা আর মস্তক উঠাইল না। যখন আমরা নদীর মাঝখানে, তখন বিদ্রোহীরা তীরের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ প্রভৃতির আড়ালে দাঁড়াইয়া আমাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা প্রাচীন আমলের বন্দুক ব্যবহার করিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় সে যাত্রা আমরা রক্ষা পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, তাহারা কিন্তু ২।৩ মিনিটের অধিক সময় বন্দুক চালাইবার অবসর পায় নাই। কারণ, আমাদের লোকেরা তাহাদের উপর এ ভাবে বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিল যে বিদ্রোহীরা অবিলম্বে শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল।

তাহার পর আমরা দুইজনে বুকগুলে উপস্থিত হইলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই আমরা কয়েকখানা ডুবান নৌকা দেখিলাম। দুইজনে খুব খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর একখানা নৌকার ছিদ্রাদি বন্ধ করিয়া ভাসাইয়া দিলাম। তাহার পর আরও তিনখানাকে উদ্ধার করিলাম। চারিখানা নৌকা একসঙ্গে বাঁধিয়া আমরা দুইজনে উহার উপর চাপিয়া বসিলাম ও অপর পার হইতে টানিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত করিলাম।

বিদ্রোহীরা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। এইবার তাহারা (বোধ হয় ১০০ লোক) দলবদ্ধ ভাবে তীরের দিকে দৌড়াইতে লাগিল ও আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। সাহেব কহিলেন, "নৌকার তলায় শুইয়া পড়।" বলা বাহুল্য ইহাতে উহাদের গুলি আমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না। আমি বিপদ কাটিয়া গেল ভাবিয়া মনেং ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি, এমন সময় সটাক্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং বোধ হইল যেন আমাদের গতি বন্ধ হইল আমি ব্যাপার খানা বুঝিতে না পারিয়া হে সাহেবকে: কারণ জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধু! আমাদের একখানা নৌকা বোধ হয় ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। তুমি উঠিও না, আমি এখনি আসিতেছি"। এই বলিয়া সাহেব অদৃশ্য হইলেন এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর আমরা নিরাপদে ৩ খানা নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য একখানা নৌকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সাহেব উহার বাঁধন কাটিয়া দিয়াছিলেন।"

যখন উহারা দুইজনে ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল যে, হে সাহেবের একটা পা জখম হইয়াছে। যখন তিনি নৌকার বাঁধন কাটিয়া দিবার জন্য নৌকার তলা হইতে বাহিরে আসেন, ঐ সময়ে তিনি আহত হয়েন। কিন্তু লোকটার এমন সহ্য গুণ যে এ কথা তিনি রতিকে আদৌ বলেন নাই। এই বিদ্রোহ দমন হইবার পর এই অসম সাহসিক কাজের জন্য ইঁহারা প্রত্যেকে একটা করিয়া মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। গভর্ণমেণ্ট রতিকে ফৌজে একবারে জমাদার করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে পুলিশে যাইতে চাওয়াতে তাহাকে একবারে ইন্‌স্পেক্টার করিয়া দেওয়া হয়। সত্য কথা বলিতে কি, বাল্যকাল হইতে আমি বাঙ্গালা দেশের লোককে বড় ভীরু বলিয়া মনে করিতাম। আমার ধারণা ছিল যে, ইহারা লেক্‌চার দেওয়া ও পরীক্ষা পাশ করা ভিন্ন আর কোনও কাজ করিতে পারে না। কিন্তু রতির কাজ দেখিয়া আমাকে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সব দেশেই ভাল মন্দ দুই প্রকারের লোক থাকে। রতি কিন্তু আমায় প্রায়ই বলিত যে, তাহার দেশে এমন হাজারং ছেলে আছে, যাহারা সুযোগ পাইলেই তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সাহসের কাজ করিতে পারে।

যাহা হউক, ইহার পর আমরা ১৫।১৬ দিনের মধ্যে ঐ প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিলাম। মেস্‌স্ লেম্বার্টের কিন্তু কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। এইখানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে রতি অনেকবার বিলক্ষণ সাহসের কাজ করিয়াছিল। শেষে এমন হইয়াছিল যে, কাপ্তেন সাহেব রতিকে না লইয়া কোথাও যাইতেন না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

করা যায় না। ইঁহারা আমোদের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নন। সুতরাং যাঁহারা শুধু পৃথিবীর সংস্কারের জন্য সাহিত্য রচনা করেন না, 'মনোরঞ্জনকল্পে' যাঁহাদের চেষ্টা, তাঁহারা জানেন শেষোক্ত জিনিষটা কোথায় মিলে। দুই একজন কঠোর সমালোচকের নিন্দা-স্তুতিতে ইঁহাদের কিছু আসে যায় না; দীর্ঘ অর্থের ঝুলি উন্মুক্ত করাইতে পারিলেই ইঁহারা কৃতার্থন্মন্য। এইরূপে অলস ধনীশ্রেণীর চিত্ত-বিনোদমার্গে যে কিরূপ সাহিত্য রচিত হইতে পারে, ফরেন্স ষ্টার্ণ তার উদাহরণ। এবং এই শ্রেণীর লেখকের সংখ্যা ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্যেও কম নহে। ইহাদের মধ্যে ফ্রান্সের য়্যানাটোল ফ্রান্সও বোধ হয় একজন।

বর্ত্তমানে একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই যে, সাহিত্যের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য তাহার বক্তব্য বিষয় নহে, তাহার বর্ণনা-চাতুর্য্য, তাহার প্রকাশ-ভঙ্গি, এক কথায়, তাহার শিল্প। যে কোন বিষয় নিয়াই লেখা হউক না কেন, লেখন-ভঙ্গি যদি পরিপাটী হয়, তাহা হইলেই তাহা প্রশংসা ভাজন হইবে। দেবাসুরের দ্বন্দ্বই আলোচ্য বিষয় হউক, আর সহরের কোন জঘন্যস্থানের চিত্রই অঙ্কিত হউক সাহিত্যের প্রশংসা উভয়েই লাভ করিতে পারে, যদি তাহাতে শিল্প-চাতুর্য্য থাকে। এই শিল্প-চাতুর্য্যের কি মানে তাহা আমরা ঠিক জানি কিনা সন্দেহ। তবে মনে হয়, সাহিত্যিকেরা যেন আজকাল বলিতে চান, "কি লিখিয়াছি তাহার বিচার করিও না কেমন লিখিয়াছি তাই দেখ।" কিন্তু 'কি' ছাড়া কি কেমনের 'বিচার' হয়? আর, যে কোন উপায়ে শক্তির পরিচয় দিলেই কি আমরা শক্তিমান্‌কে প্রশংসা করিতে পারি? শারীরিক শক্তির প্রমাণ ত কত রকমেই দেওয়া যায়, কিন্তু সকল গুলিকেই আমরা ভাল মনে করি কি? অথচ, সাহিত্যে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিচারের সময় কেন যে আমরা বক্তব্য বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিব না, কেন যে আমরা শুধু ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির কথাই ভাবিব, তাহা বুঝা কঠিন। তথাপি, আমরা ইহা স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে, বর্ত্তমানে অনেকেই সাহিত্য সমালোচনা অর্থে শুধু ভাষা ও তার অলঙ্কারের সমালোচনা মাত্র বুঝিতে চান।

এই ধারণার ফলে, বর্ত্তমানে ইউরোপে দেখিতে পাই, অনেক সাহিত্যিকই এমন সব বিষয় নির্ব্বাচিত করেন, যাহা বিষয় হিসাবে নিতান্তই হেয়। জর্ম্মাণ ঔপন্যাসিক স্যুডারম্যানের একখানা উপন্যাসের অনুবাদ প্রথম যখন বিলাতে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা হয়, তখন পুলিশ একটু আপত্তি উত্থাপন করে। প্রকাশক জন্ লেন্ তখন একটা বেশ নূতন উপায় অবলম্বন করেন; তিনি প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকদের নিকট গ্রন্থের এক এক খণ্ড পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের মত চাহিয়া পাঠান। অনেকেই ইহাকে অশ্লীল মনে করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশের মতেই ইহা প্রকাশ করার কোন আপত্তির কারণ লক্ষিত হয় নাই। এই উপলক্ষে 'বার্ণার্ড শ' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বইখানার রকম কতক বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন "স্যুডারম্যান এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, সমাজের বিহিত মতে সচ্চরিত্র থাকার চেয়ে অসচ্চরিত্র হওয়াই সুশ্রী বালিকাদের পক্ষে অধিক লাভ জনক।" অর্থাৎ গ্রন্থখানা আর কিছু নহে, একটী রমণীর পতন ও তাহার পতিত-জীবনের ইতিহাসই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। জন্ লেন্ এই সকল মত সম্বলিত করিয়া গ্রন্থখানা প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা সকলেই সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কারণ, যাঁহারা জর্ম্মাণ ভাষা জানেন না তাঁহারাও এখন এমন অমূল্য সম্পদের রসাস্বাদে বঞ্চিত হইবেন না!

তথাপি বইখানি প্রশংসিত। স্যুডারম্যান নিজে ইহাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের অন্যতম মনে করেন। ইহার বর্ণনীয় বিষয় এত পরিচিত যে, যে কোন ব্যক্তি এরূপ দুই একটা কাহিনী বলিতে পারে। তবে যে ইহার প্রশংসা করা হয়, তাহার কারণ নাকি—ইহার শিল্প-চাতুর্য্য। বলা বাহুল্য, ভারতীয় "চিত্রকলাপদ্ধতিতে" অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় ইহার চাতুর্য্য সকলের চক্ষে ধরা দিবে কিনা সন্দেহ।

য়্যানাটোল্ ফ্রান্সও একজন বিখ্যাত এবং প্রশংসিত লেখক। ফরাসীদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে বোধ হয় তাঁহাকেই আমরা বেশী চিনি। এবং তাঁহারও প্রশংসার কারণ বোধ হয় এই শিল্প-চাতুর্য্য। কিন্তু এই শিল্প-চাতুর্য্যের একটা বিশিষ্টতা আমাদের চোখে বড় লাগিয়াছে, তাহারই কথা এখানে বলিতে চাই।

'কচকিমি' বলিলে বোধ হয় একটু কঠোর ভাষা

প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু ফরাসী লেখকেরা অনেক সময় অতি গুরু বিষয়-নিয়াও এমন হাসি ঠাট্টা করিতে পারেন যে, ভাবিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন কেবল বড় ঘরের মেয়েদের আলস্যের কাল নিবারণ করিবার জন্যই বই লেখেন। ভলটেয়ার ঠাট্টা করেন নাই, এমন জিনিস বোধ হয় দুনিয়াতে নাই। তথাপি ভলটেয়ারকে আমরা প্রশংসা করি, কারণ তাঁহার সংস্কারের উদ্দেশ্য সুষ্ঠ; শুধু ইয়ারকি করাই তাঁর উদ্দেশ্য নহে। তখনকার দিনে প্রচলিত কদাচারের উপর তিনি যে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস অনেক কাল মনে রাখিবে। য়্যানাটোল ফ্রান্সের সেরূপ উদ্দেশ্য নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা তত স্পষ্ট কিনা সন্দেহ।

আর তিনি স্থানে অস্থানে অনাবশ্যক অশ্লীল চিত্র যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপেও অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা হয় না। 'ফেরেস্তাদের বিদ্রোহ' (The Revolt of the Angels) নামক গ্রন্থে বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য বিষয় এই যে, নূতন দর্শন-বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া মানুষ পুরাতন সরল বিশ্বাস সমূহ হারাইতে বসিয়াছে; এবং ফলে অপকর্ম্ম করিতে মানুষ এখন আর ধর্ম্মের বাধা আগেকার মত অনুভব করে না। এই গ্রন্থে মরিস্ নামক এক যুবক একটী বিবাহিত রমণীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; উভয়ের মিলনের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে সেখানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

মনে হয়, ইহার বেশী না বলিলে তাঁহার মূল বক্তব্যের কোনই হানি হইত না। তথাপি একাধিক বার এই সকল মিলনের গূঢ় ব্যাপারের বর্ণনায় তিনি 'রায় গুণাকর'কেও যে কেন অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, এই সকল বর্ণনায় ঘটনা সংস্থান ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা একটু কম বলিলে দোষ হইত কি?

'দেবগণ পিপাসু' (The Gods are Athirst.) নামক গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিদ্রোহ নিয়া। উপন্যাসের আকারে তখনকার সামাজিক অবস্থা তিনি আঁকিতে চাহিয়াছেন। এমন একটা সময়ে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ-বন্ধন যে অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য; বিশেষত তার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের সময় হইতেই ফরাসী সমাজে পাপের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং এমন একটা সময়ের চিত্র আঁকিতে যাইয়া য়্যানাটোল দুই একটা পাপেরচিত্র আঁকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরই নেপোলিয়নের দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়; এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে রুষিয়া পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়, রুষিয়ার এই পরাজয়ের কারণ খুঁজিতে গিয়া টলষ্টয় দ্বিসহস্রাধিক পৃষ্ঠার এক উপন্যাসে তখনকার রুষিয়ার সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন; এবং অনেক অনাচার, অনেক ভোগ-বিলাসের বর্ণনা ও তিনি করিয়াছেন। কিন্তু য়্যানাটোল ফ্রান্সের চিত্রের মত এমত রং ফলাইবার চেষ্টা ত টলষ্টয়ে নাই।

একটা জাতি ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে স্বাধীনতার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ চিত্র য়্যানাটোল ফ্রান্সের বই খানায় মিলে না; সেখানে মিলে, কোন ও একটী যুবতী কেমন করিয়া একটী যুবকের মন ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; এবং যুবতীরই নিরপরাধ পিতার ফাঁসির ব্যবস্থা দিয়া যুবক যখন তাহার নিকট আসিল, তখন যুবতী তাহাকে পিতৃ-হন্তা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া বরং কেমন সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিল; আর মিলে কেমন করিয়া একটী প্রেমিকা তাহার দয়িতকে আইনের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গোপনে বিচারকের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কেমন অম্লান বদনে কিছুক্ষণের জন্য বিচারকটীর চরণে স্বদেহ উপঢৌকন দিয়াছিল, আর কেমন করিয়া এমন দান গ্রহণ করিয়াও বিচারক বিচারে কিছু মাত্র দয়া প্রকাশ করিতে রাজী হয় নাই!

আর দৃষ্টান্তের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। শুনিতে পাই এ সব গ্রন্থে খুব শিল্প-চাতুর্য্য রহিয়াছে। তা কি আর নাই? তা না হইলে আসর জমিবে কেন? বইয়ের কাটতিইবা হইবে কেন? কিন্তু এমন শিল্প এদেশের ও যে কোন কোন বাজারে মিলে দেখিতেছি।

কোথায় ইউরোপের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক য়্যানাটোল ফ্রান্স, আর কোথায় অর্দ্ধ এশিয়ার, ততোঽধিক অজ্ঞ ভারতের এক কোণে বসিয়া আমরা তাঁহার সমালোচনা

করিতেছি। আমাদের কথা ত তাঁহার লক্ষ লক্ষ পাঠকদের একজনের কাণেও পৌছিবে না! তাহা জানি; কিন্তু আমরা য়্যানাটোল ফ্রান্সের জন্য লিখিতেছি না; তাঁহার পাঠকদের জন্য ও লিখিতেছি না; এ দেশে যাঁহারা তাঁহার অনুকারী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরই নিকট আমাদের এই নিবেদন—পশ্চিমের রঙ্গীন আলোকে মাতিয়া উঠা কিছু নয়; ইহা যে উষার নবীন জাগরণের চিহ্ন নহে; ইহা যে উত্থানের উৎসাহ-দীপ্তি নহে; ইহা ঝড়ের চিহ্ন; কিম্বা ভোগ ক্লান্ত জীবনের হয়বাণির লক্ষণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিধবা।

সকলিত ছিল তার কিছু যেন নাই,
অতীত হইয়াগেছে বর্ত্তমানে লীন;
বিশ্বের সকল সাধে পড়িয়াছে ছাই,
পরাণ হয়েছে জড় চেতনা বিহীন।
আছে রূপ, নাহি তাতে লাবণ্য তেমন;
শ্রীঅঙ্গ শ্রীপতি বিনা হয়েছে শ্রীহীনা।
এ মহা জীবন যাগে, মহা উদ্বোধন
অপূর্ণ রহিল হায়! যজ্ঞেশ্বর বিনা!
সীমন্ত-সিন্দুর সাথে গিয়াছে সকল,
পড়ে আছে বাসি ফুল দেব উপেক্ষিত।
শান্তির দুয়ারে তার পড়েছে অর্গল,
নয়নে বহিছে ধারা দর বিগলিত।
না ফুটিতে ভাল করে প্রভাতের হাসি
মুকুলে ঝরিয়া গেছে রূপের অতসী।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত

ঐতিহাসিক সম্পদ।

নলুয়ার রাজা বসন্ত রায়।

এক সময় চাকলা পেড়ুয়া অতি বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। উহা এখন ময়মনসিংহ পাবনা ও বগুড়া এই তিন জেলা ভুক্ত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যমুনা নদী উৎপন্ন হইয়া চাকলা পেড়ুয়ার অধিকাংশ ভূমি বিনষ্ট করিয়াছে। এই সঙ্গে চাকলা পেড়ুয়ার অধিশ্বর রাজা বসন্ত রায়ের রাজধানী নলুয়ার কতকাংশ ও যমুনার গর্ভশায়ী হইয়াছে। রাজ-গৃহের ধ্বংশের পর যমুনায় যে সমস্ত চর উদ্ভূত হইয়াছে ঐ সকল চরের মধ্যে রাজা বাড়ীর চর, হাতী বান্ধার চর, সান বান্ধা যুক্তি গাছা (মন্ত্রণা গারের স্মৃতি স্বরূপ) প্রভৃতি চর গুলি যমুনার জল প্রবাহে পুনঃ পুনঃ ভগ্ন ও রূপান্তরিত হইয়াও আজ রাজা বসন্ত রায়ের নাম ও সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রবাদ আছে যে রাজা বসন্ত রায়ের এক অতি রূপবতী কন্যা ছিল। লোক পরম্পরায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা, মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্ণগোচর হয়। নবাব বসন্ত রায়কে কন্যাসহ নবাব দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য পরোয়ানা বাহির করেন। বসন্ত রায় কন্যা সহ রাজধানীতে পৌছিতে অসম্মতি প্রকাশ করায়, নবাব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। এই অবস্থায় বহুদিন অতি বাহিত হয় এবং কারাগারেই বসন্ত রায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। যখন বসন্ত রায় কারারুদ্ধ অবস্থায় রাজবাড়ী নলুয়া হইতে মুর্শিদাবাদ গমন করেন তখন তিনি তাঁহার কতকগুলি শিক্ষিত কপোত সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে বলিয়া গিয়াছিলেন, যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে তিনি উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন; কবুতর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পরিবারবর্গ সময়োচিত ব্যবস্থা করিবেন। রাজা বসন্ত রায় মৃত্যুর সময় ঐ সকল কবুতরকে যথারীতি মুক্ত করিয়া দেন। কবুতর গুলি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পরিবার বর্গ জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজা বসন্ত রায়ের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির অনেক দিন পর্য্যন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত হয় নাই; পরে উহা কাগমারী পরগণার সামিল হইয়া গিয়াছে।

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সেকালের ডাকের ব্যবস্থা।

(১)

মুদ্রাযন্ত্র যেমন পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উপায়, ডাকের ব্যবস্থাও তেমনি পত্রিকা প্রচারের শ্রেষ্ঠ সহায়। বাঙ্গালাভাষা দ্বিতীয় রাজভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থান হইতে কোনও পত্রিকা বাহির হইত না। কলিকাতা হইতে যে সকল পত্রিকা বাহির হইত, তাহারও প্রায় পনর আনাই স্থানীয় গ্রাহকের নিকট নগদ মূল্যে বিক্রয় হইত। হকারেরা অলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করিত। ডাকঘরের মারফতে পত্রিকা পাঠাইতে ব্যয় অতিশয় অধিক লাগিত। প্রতি জেলার প্রধান নগর ব্যতীত দূরবর্ত্তী মফস্বলে তখন ডাকঘর স্থাপিত হয় নাই। কাযেই কলিকাতার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ও জেলার সদর ষ্টেসনের জমিদারগণ ও সুপরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট ব্যতীত মফস্বলে কাহারও নিকট ডাকে পত্রিকা প্রেরিত হইত না।

সেকালে মফস্বলের ডাকের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশে কোন রাস্তা-ঘাট ছিল না। গরু চলাচলের গোপাট দ্বারাই লোক চলাচল করিত। বস্তি অতিক্রম করিলেই বিজন বন ভূমি। সেই বনভূমিতে লোক যাতায়াতের সামান্য চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া মসাল সাহায্যে অথবা ভীষণ শব্দ উৎপাদনকারী কোন যন্ত্র বাদন করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপ অবস্থায় ডাকের বন্দোবস্ত যতদূর সম্ভব রক্ষা করা যাইতে পারে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ তাহা করিতে যথা সাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ডাকের প্রথা ইয়োরোপীয় সভ্যতার আর একটী প্রধান অঙ্গ। সুতরাং তাহা ইংরজের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৭৪৮ অব্দের একখানা গবর্ণমেন্টের চিঠিতে অবগত হওয়া যায় যে, সে বৎসর মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭ মাস কলিকাতা হইতে কোন ডাক মান্দ্রাজ যায় নাই। এই দীর্ঘকাল ডাক চলাচল বন্ধ থাকার কারণ উল্লেখ করিয়া কলিকাতার গবর্ণর লিখিয়াছেন "it is not worthwhile to put the Company to the expense of *kasids* when we have nothing to advice." অর্থাৎ প্রেরণ যোগ্য সংবাদ কিছু না থাকায় অনর্থক ডাক বাহকের খরচ বহাল রাখা সঙ্গত মনে করা গেল না।

ঐ সময় কটক ও গঞ্জামে ডাক যাতায়াত করিতেছিল। গবর্ণমেন্টের আর এক খানা চিঠিতে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ ডাকবাহকগণ পথশ্রমে অপটু হেতু তাহাদিগের স্থলে অশ্বারোহী হরকরা (mounted postman) নিযুক্ত করা হইল। (১)

পলাসির যুদ্ধের পর হইতে রীতিমত ডাক চলিবার বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সনেই কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ এবং তাহার অব্যবহিত পরে ঢাকা, রাজমহাল প্রভৃতি স্থানে রীতিমত সরকারী দৈনিক-ডাক গমনাগমনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। (২)

এই ডাকে সরকারী চিঠি পত্রই প্রেরিত হইত। সাধারণের কোন চিঠি গৃহীত হইত না। ইহাতে দেশীয় লোকের না হউক, কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ের ভয়ানক অসুবিধা হইত। তাঁহাদের বিভিন্ন স্থানের আরৎ সমূহ হইতে সংবাদ পাইবার এবং মফস্বলের বাণিজ্য কুঠি সমূহে সংবাদ প্রেরণ করিবার কোন উপায় ছিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া বণিক সম্প্রদায়ও গবর্ণমেন্টের অনুকরণে বেসরকারী (private) ডাক-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। (৩) সুদূর মফস্বলের জমিদারেরা তাঁহাদের কলিকাতার উকীলের উপর কার্য্যের ভার ন্যস্ত রাখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইলে উক্ত উকীল চিঠি সহ লোক পাঠাইয়া সংবাদ প্রেরণ অথবা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা সেকালের রাজা জমিদারদিগের চিঠি পত্র আদান প্রদানের দুই একটী ব্যবস্থার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

(১) Selections from Unpublished Records of Govt. Vol I Page lii.

(২) Do. Record Nos. 325,667,704,774.

(৩) The History of India (J. C. Marshman) II. Page 778.

জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান সাহেবদিগের ও সুসঙ্গের রাজাদিগের বাসস্থান রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রায় চারিশত মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত দেওয়ান সাহেবেরা ও রাজারা তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য সেকালে মুর্শিদাবাদে ও ঢাকায় এবং পরে কলিকাতায় ও ঢাকায় উকীল নিযুক্ত রাখিতেন। কলিকাতার উকীল জমিদার সরকারের প্রয়োজনীয় চিঠি "আরিন্দা" সহ তাঁহাদের ঢাকার উকীলের নিকট পাঠাইতেন এবং ঢাকার উকীল ঐ চিঠি নির্দ্দিষ্ট পাইক দ্বারা জঙ্গলবাড়ী ও সুসঙ্গ প্রেরণ করিতেন।

কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা হইলে এবং বঙ্গদেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে জেলা স্থাপিত হইলে ডাকের সুব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন জেলার প্রধান নগরে ডাকঘর স্থাপিত হয়।

গবর্ণমেণ্টের ডাক যখন রীতিমত চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার সেই বিরাট ব্যয় সংকুলন জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগের প্রবর্ত্তিত বেসরকারী ডাক চলাচল প্রথা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবং তাহার প্রবর্ত্তকদিগকে দণ্ডিত করিয়া তাহা উঠাইয়া দিয়া সরকারী ডাকে জনসাধারণের চিঠি গ্রহণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন। (১)

এই সময় গবর্ণমেণ্ট যে হারে ডাক মাশুল ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এত অধিক হইয়াছিল যে, সাধারণের কথা দূরে থাকুক বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেই সেই হারে মাশুল দিয়া সংবাদ আদান প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। এই উচ্চ হারের উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক মার্সম্যান লিখিয়াছেন——সরকারী ডাকে পত্র প্রেরণ—ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে এক রকম অসাধ্য ব্যাপার ছিল; এমন কি বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত তাহা একটা গুরুতর ভার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। (২)

(১) Private posts had long been established in India by the merchantile community, but Government had thought fit to abolish them under heavy penalties. —J. C. Marshman.

(২) "The postage by the public mail was, for a poor population like that of India, prohibitory and it was felt to be a severe tax even by the merchants."—History of India.

এত অধিক ডাক মাশুলে পত্রিকা চালান অসম্ভব মনে করিয়া অনেক পত্রিকা পরিচালক ডাকের মাশুল কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস নিকট প্রার্থনা করেন।

১৭৮৪ অব্দের ২রা ডিসেম্বর পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কলিকাতা হইতে ডাকের চিঠি পত্রের নিম্নলিখিতরূপ মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

২॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—কলিকাতা হইতে—বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর—এক আনা। বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজাপুর, কুলপী, মেদিনীপুর, বালেশ্বর—দুই আনা। রাজমহল, ভাগলপুর, ঢাকা, কটক—তিন আনা। দিনাজপুর, মুঙ্গের,—চারি আনা। পাটনা ও গঞ্জাম—পাঁচ আনা। চট্টগ্রাম * ও বক্সার—ছয় আনা। কাশী—সাত আনা।

৩॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর—দুই আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—চারি আনা। রাজমহল প্রভৃতি—ছয় আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি আট আনা। পাটনা প্রভৃতি—দশ আনা। চট্টগ্রাম বক্সার—বার আনা। কাশী—চৌদ্দ আনা।

৪॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর, হুগলী, চন্দননগর—তিন আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—ছয় আনা, রাজমহল প্রভৃতি ॥৵৹। দিনাজপুর প্রভৃতি—বার আনা। পাটনা প্রভৃতি—পনর আনা। চট্টগ্রাম ও বক্সার—আঠার আনা। কাশী—এক টাকা পাঁচ আনা।

৫॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর প্রভৃতি—চারি আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—আট আনা। রাজমহাল প্রভৃতি বার আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি এক টাকা। পাটনা প্রভৃতি—পাঁচ সিকা। চট্টগ্রাম প্রভৃতি—দেড় টাকা। কাশী—পৌনে দুই টাকা।

৬॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর পর্য্যন্ত—পাঁচ আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—

* ১৭৯৫ অব্দে ডায়মণ্ড হারবার হইতে কক্সবাজার পর্য্যন্ত সমুদ্র পথে ষ্টীমার-ডাক প্রচলিত হয়। অতপর এই পথে যাহারা ডাক পাঠাইতেন, তাহাদিগকে মাশুল—চিঠি প্রতি দুই আনা অতিরিক্ত দিতে হইত।

দশ আনা। রাজমহাল প্রভৃতি পনর আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি পাঁচ শিকা। পাটনা প্রভৃতি এক টাকা ·য় আনা। চট্টগ্রাম প্রভৃতি এক টাকা চৌদ্দ আনা। এবং কাশী পর্য্যন্ত দুই টাকা তিন আনা।

চিঠির ডাকে ৪ ইঞ্চি × ৯॥ ইঞ্চি আয়তনের অপেক্ষা বড় চিঠি পাঠান যাইত না। ইহা অপেক্ষা বড় আয়তনের ও অধিক ওজনের দ্রব্য বা কাগজ পত্র সপ্তাহে দুইবার (সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে) বাঙ্গি ডাকরূপে জেনারেল পোষ্ট আফিসে গৃহীত হইত।

এই সময় ডাকের টিকেট প্রচলিত ছিল না। প্রেরক ডাকঘরে চিটি-পত্র দিলে, তাহা ওজন করিয়া স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাশুল ধার্য্য হইত। অতঃপর প্রাপকের নিকট হইতে মাশুল লইয়া চিটি-পত্র বা পত্রিকা প্রাপককে দেওয়া হইত। *

বঙ্গদেশের বহির্ভাগে ডাকের মাশুল আরও অধিক ছিল। ‡ ১৭৯০ অব্দের ১৪ই জানুয়ারী বোম্বে হইতে ডাক প্রেরণের যে মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা নিম্নে কলিকাতা গেজেট হইতে উদ্ধৃত হইল।

বোম্বাই হইতে—পুনা পর্য্যন্ত একখানা চিঠির মাশুল ২৲। ফুলজাপুর প্রভৃতি পর্য্যন্ত—তিন টাকা পাঁচ পাই। হায়দরাবাদ—তিন টাকা আট পাই। মছলিপট্টম—চারি টাকা এক আনা। মাদ্রাজ—ছয় টাকা এক আনা দুই পাই। গঞ্জাম প্রভৃতি—আট টাকা এক আনা চারি পাই। কলিকাতা—পাঁচ টাকা এক আনা নয় পাই।

এই মাশুল ডাকঘরে চিঠি পোষ্ট করিবার সময়ই দিতে হইত। ডাক কলিকাতা হইতে পাঁচ সপ্তাহে বোম্বাই যাইত।

১৭৯১ অব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বরের গেজেটে এই হার কমাইয়া নিম্নলিখিত হার ধার্য্য হয়।

২॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি।

কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদ ১৵০, পুনা—১৸৵০, বোম্বাই ১॥৵০।

৩॥ তোলা ওজনের চিঠির মাশুল—২॥ তোলা ওজনের চিঠির মাশুল অপেক্ষা দ্বিগুণ। ৪॥ তোলা চিঠির—ত্রিগুণ, ৫॥ তোলা—চারি গুণ ইত্যাদি।

১৭৯৩ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের রেগুলেশন অনুসারে এক আনা মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার প্রস্তাব হওয়ায়, এক আনার উর্দ্ধ ডাক মাশুল তামার পয়সা দ্বারা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল। ঐ অব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বরের গেজেটে ঐ আদেশ রহিত করিয়া এক টাকার অনধিক মাশুল নগদ পয়সা দ্বারা লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

বাঙ্গালার ডাক বর্ষার সময় নৌকায় প্রেরিত হইত। ডাকের নৌকায় যাত্রিকও লওয়া হইত। যাত্রিকদিগকে পৃথক ভাড়া দিয়া টীকেট ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া নামিতে হইত। এই সময় যাতায়াতের খরচ অত্যন্ত অধিক ছিল, সেই জন্য ডাকমাশুলের হারও এত অধিক ছিল। লোক যাতায়াতের জন্য ডাক-পাল্কিরও বন্দোবস্ত ছিল।

১৭৮৫ অব্দের ৬ই জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে ডাকপাল্কীর যে ব্যয় বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উক্ত গেজেট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কলিকাতা হইতে চন্দন নগর ১৮ মাইল পথ, এক বাঙ্গি * সহ একজন আরোহির ভাড়া মোট ২২॥০। অতিরিক্ত প্রতি মোটে দুই টাকা অধিক দিতে হইত।

চুঁচুড়া, হুগলি অথবা বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল, এক বাঙ্গিসহ ৪২।০। অতিরিক্ত প্রতি বাঙ্গি ৩৸০।

মৃজাপুর—৫৬ মাইল—৭০৲ অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি বাঙ্গিতে ৬৲।

বহরমপুর, কালকাপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ১১৮ মাইল—১৪৭॥০; অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি বাঙ্গিতে ১২৲

রাজমহাল ১৯১ মাইল—২৩৮৸০ অতিরিক্ত ১৯৲

ভাগলপুর ২৬৩ মাইল—৩২৮৸০ " ২৬৲

* এই নিয়মে মাশুল আদায় করা কঠিন হইয়া উঠিলে ১৭৮৫ অব্দের ১৭ই মে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ডাক মাশুলের পয়সা পিয়নের হস্তে না দিলে প্রাপককে চিঠি দিবার নিয়ম রহিত করিয়া দেন।

‡ ১৭৮৯ অব্দে কলিকাতা হইতে বোম্বাই ডাক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে, প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্ট ডাকের সঙ্গে বিনা মাশুলে সাধারণের চিঠি প্রেরিত হইত। ডাক প্রতি সোমবার মছলীপট্টম ও পুনা হইয়া এক মাসে অথবা পাঁচ সপ্তাহে বোম্বাই যাইত।

মুঙ্গের —৩০১ মাইল ৩৭৬, অতিরিক্ত প্রতি মোট ৩০৲
পাটনা, বাঁকিপুর প্রভৃতি ৪০০ মাইল ৫০০৲; অরিতিক্ত ৪০৲
দিনাপুর—৪১০ মাইল ৫১২৷৷০; অতিরিক্ত ৪১৲
বক্সার ৪৯২ মাইল ৬১৫৸০, অতিরিক্ত ৪৯৲
কাশী ৫৬৬ মাইল ৭০৭৷৷০; অতিরিক্ত ৫৬৷৷০

কলিকাতা হইতে নৌকায় কাশী ৭৫ দিনে ও ঢাকায় ৩৭৷৷ দিনে যাওয়া যাইত।

বিলাতে প্রেরিত চিঠি পত্রের মাশুলও এই সময় অত্যন্ত অধিক ছিল। ১৭৯৭ অব্দে কোম্পানীর জাহাজে যে সকল বেসরকারী (Private) চিঠি পত্র ও পুলিন্দা (Package) যাইত তাহার মাশুল নিম্নলিখিত হারে ছিল।

২ আউন্সের অনধিক ওজনের চিঠির মাশুল-চারি সিক্কা টাকা।
৩ " " " " " নয় সিক্কা টাকা
৪ " " " " " যোল " "

ইহার পর যত আউন্স ওজন হইত তাহার চারি গুণ সিক্কা টাকা মাশুল ধার্য্য হইত।

মিঃ রিচার্ড আমুটী (Richard Ahmuty) নামক পাবলিক ডিপার্টমেন্টের হেড এসিষ্টাণ্ট মাশুল ধার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কাউন্সিল হাউসের নিম্নতলস্থ একটী কুঠুরিতে তাঁহার কার্য্যালয় ছিল। বিলাতি ডাক রওয়ানা হইবার দশ দিন পূর্ব্বে রবিবার ব্যতীত অন্যান্য বারে ১০টা হইত ৪টার মধ্যে এবং রাত্রে ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে এই সকল চিঠি পত্র গৃহীত হইত। *

ইয়ুরোপ হইতে যে সকল চিঠি আসিত তাহা কলিকাতায় বিলি হইতে—বার তোলার অনধিক ওজনের মাশুল আট আনা এবং তদতিরিক্ত হইলে এক টাকা ধার্য্য ছিল। এই মাশুল অবশ্য প্রেরকের অগ্রিম প্রদত্ত বিলাত হইতে বোম্বাই বন্দরে আসিবার মাশুলের অতিরিক্ত ছিল।

১৭৯৫ অব্দের সরকারী এক ইস্তাহারে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময় কোম্পানীর নোট (promissory notes) ডাকে পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ঐ নোট প্রথমতঃ খোলা খামে ভরিয়া তাহার উপর প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া ডাক ঘরের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত করিতে হইত। ঐ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহা পরীক্ষা করিয়া তাঁহার খাতায় উহা জমা করিয়া প্রেরককে তাহার রসিদ প্রদান করিতেন। ইহাই বোধ হয় বর্ত্তমান রেজেষ্ট্রারী প্রথার আদিম ব্যবস্থা। *

এই সময়ের (১৭৯৫—২১শে মে) আর একটী বিজ্ঞাপনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আগ্রা এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানের ডাক চলাচলের রাস্তা জ্ঞাপক একখানা মানচিত্র প্রস্তুত হইয়া প্রতিখণ্ড ৮৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল।

এই সময় ফরাসিদিগের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ চলিতে থাকায়, ডাক মারা যাইবার অনেক কারণ ছিল; সে জন্য সরকারী চিঠি তিন পথে তিন খানা করিয়া বিলাতে পাঠাইতে হইত। সাধারণের চিঠি জলে ও স্থলে দুই পথে দুই খানা লওয়া হইত।

এই সময় বিলাতে যাইবার জলে ও স্থলে তিনটী পথ প্রচলিত ছিল। জলপথ—বোম্বাই হইতে মহাসমুদ্র ঘুরিয়া এবং স্থলপথ বোসারা হইয়া ও এলেপ্পো হইয়া। পলাসি যুদ্ধের সংবাদ শেষোক্ত পথে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। (৩)

১৭৯৪ অব্দের ৪ঠা জানুয়ারীর "বোম্বে কুরিয়ারে" বিলাতে চিঠি পাঠাইবার মাশুল নিম্নলিখিতরূপ বৃদ্ধিহারে বিজ্ঞাপিত হয়।

সিকি তোলা ওজনের চিঠি বোম্বাই হইতে বোসারা হইয়া দশ টাকা, অর্দ্ধ তোলা ওজনের চিঠি পনর টাকা এবং একতোলা ওজনের চিঠি কুড়ি টাকা। বিলাতি চিঠির মাশুল প্রাপককে চিঠিখানা প্রাপ্ত হইয়া দিতে হইত। (১) এই সময় চিঠি পত্র জল পথে মহাসমুদ্র ঘুরিয়া ছয় মাস হইতে আট মাসে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিত। (২)

* The Good Old Days of John Company Vol 1.

* Ibid. ‡ Ibid.

(৩) Selections from Unpublished Records.

(১) Selections from Calcutta Gazette 111. Page 1.

(২) ১৭৮৭ সনে Syren নামে একখানা স্লুপ চারি মাসেরও নাকি কম সময়ে বিলাত হইতে আসিয়াছিল। এই স্লুপ কি উপায়ে কোন পথে আসিয়াছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না।

বৎসর মধ্যে যিনি চিঠির উত্তর পাইতেন, তিনিও নিজকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন।

ডাকের মাশুল এইরূপ উচ্চ হারে নির্দ্দিষ্ট থাকায় বিলাতি সংবাদ পত্র বড় অধিক এ দেশে আসিত না। এ দেশের পত্রিকাও মফস্বলে বড় অধিক যাইত না। কলিকাতার প্রধান প্রধান দুই এক জনের নিকট বিলাতি পত্রিকা দুই একখানা মাত্র আসিত। ১৭৯৮ অব্দে কোম্পানীর সরকারী কর্ম্মচারিগণের নিকট বিলাতের চিঠিপত্র ও এখান হইতে তাহাদের বিলাতে প্রেরিত চিঠিপত্র বিনা মাশুলে যাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে, চিঠিপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

মাশুলের হার এদেশেও এইরূপ উচ্চ থাকায় কলিকাতা হইতে বাঙ্গালার বাহিরে বা ভিতরেই যে খুব বেশী সংখ্যক চিঠি বা পত্রিকা যাতায়াত করিত তাহা নহে। ১৭৯৫ অব্দের ৮ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে প্রেরিত ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ডাক গঙ্গায় নৌকা ডুবি হইয়া মারা গেলে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল, সেই অনুসন্ধানের ফল হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তখন অতি সামান্য কয়েকখানা করিয়া চিঠি ও পত্রিকা বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সেইদিন ভাগলপুরের ডাকে সরকারী চিঠি ছিল চারিখানা, অন্যান্য লোকের চিঠি ছিল চারিখানা, একখানা ছিল "মর্নিংপোষ্ট" এবং বার খানা ছিল অন্যান্য সাময়িক পত্র। মুঙ্গেরের ডাকে ছিল দুইখানা সরকারী চিঠি, তিনখানা বাজেলোকের চিঠি এবং আটখানা সাময়িক পত্র। *

ডাকের এই উচ্চহারের বিষয় লইয়া অনেক পত্রিকা পরিচালকই গবর্ণর জেনারেলের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিলেন। অনেকে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ২।১ জন ভাগ্যবান সম্পাদক ব্যতীত অন্য কেহ যে সেরূপ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ অবগত হওয়া যায় নাই।

ইহার পর ক্রমে ডাকের ব্যবস্থা বিস্তৃত হইতে থাকে। সংবাদপত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে দূরবর্ত্তী মফস্বল হইতেও সংবাদপত্র বাহির হইতে আরম্ভ হয়। মফস্বলের প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র—"সমাচার দর্পণ"। ১৮১৮ অব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস সমাচারদর্পণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহা অর্দ্ধ মাশুলে ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে অন্যান্য পত্রিকা পরিচালকগণও লর্ড হেষ্টিংসের নিকট সংবাদ পত্রিকার জন্য ডাকমাশুলের বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে মেমোরিয়েল প্রেরণ করেন। ফলে ১৮২১ অব্দের ৩০শে জানুয়ারি স-কাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল সংবাদ পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম ও মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

১ম—যে সকল সংবাদ পত্র সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইয়া বিলি হইবে তাহা তিন সিক্কা তোলার অনধিক ওজনের হইলে, এক খানা চিঠির মাশুলে যাইবে।

২য়—যে সকল সংবাদ পত্র সপ্তাহে দুই বা তিন বার প্রকাশিত হইয়া বিলি হইবে তাহা ২॥ সিক্কা তোলার অনধিক হইলে একখানা চিঠির মাশুলের ¼ অংশ মাশুলে গৃহীত হইবে।

৩য়—যে সকল সংবাদ পত্র সপ্তাহে তিন বারের অধিক প্রকাশিত হইয়া ডাকে বিলি হইবে, তাহা সিক্কা দুই তোলার অনধিক হইলে এক খানা চিঠির অর্দ্ধ মাশুলে বিলি হইবে।

৪র্থ—পত্রিকার ওজন অতিরিক্ত হইলে চিঠির নিয়মে ডাক মাশুল বর্দ্ধিত হারে ধরা হইবে।"

মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে তখনও কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

এই সময় ডাকের কার্য্যে যে খুব সতর্কতা অবলম্বিত হইত, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সরকারী বিজ্ঞাপনী হইতেই একটী গুরুতর ক্রটীর কথা উল্লেখ করিতেছি। ঐ সরকারী বিজ্ঞাপনিতে প্রকাশ—১৮১২ অব্দের একটী ডাকের চিঠি পূর্ণ বেগ কেরাণীর অনবধানতা বশতঃ ১৮২৮ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত ডাকঘরের একটী বাক্সের কোণে পড়িয়া রহিয়াছিল॥ *

এই সময়ও ব্যারিং ডাকের প্রথাই প্রচলিত ছিল। ডাকের চিঠিকে সেকালের লোক দেবতার বিশেষ দান বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন সমাজের চিত্র প্রদর্শন করিতে যাইয়া জনৈক সেকালের লেখক ঢাকা হইতে

* The good old days of Hon'ble John Com. 1.

* The good old Days. &c. 1. 486.

লিখিয়াছিলেন—"আমাদের প্রাতর্ভোজনের সময় (৯টা ১০টা) দৈনিক ডাক আসিত। এবং তাহাই আমাদিগকে বাহিরের খবর প্রদান করিত। পত্র তখন প্রকৃত পক্ষেই পত্র (পত্রিকা) ছিল। তাহা বর্ত্তমান ।১০ পয়সার চিঠি নহে; দুই আনা, কখন কখন বা চারি আনা মাশুলের চিঠি ছিল। এই সকল চিঠি সেকালের বৃদ্ধ লোকেরা পাড়া-গাঁ হইতে লিখিত। সেকালে চিঠিতে তাগিদদারের তাগিদ বা ব্যবসায়ীর বিল পরিষ্কার করিবার অনুরোধ থাকিত না। সুতরাং তাহা কেহই ভয়ের চক্ষে দেখিত না; বরং পরম সমাদরে গ্রহণ করিত। কোন চিঠির উপর কাল রেখা চিহ্নিত থাকিলে, তাহাই শোকসূচক বলিয়া গৃহীত হইত। সেকালের ডাকের চাল ধীর মন্থর ও বিরক্তি জনক হইলেও বর্ত্তমান সময় ডাকে যে গোলমাল হয়, সেকালে ডাকের চিঠি পত্রে সেরূপ গোলমাল হইবার আশঙ্কা ছিল না। ডাক-টীকেটের প্রচলন না থাকায় চিঠিপত্র ব্যারিং যাইত। প্রত্যেকখানা চিঠিই ডাক ঘরে জমা হইত এবং প্রেরক তাহার রসিদ পাইতেন। এবং বিলির সময়ও জমা পুস্তকে গ্রাহকের রসিদ লইয়া পত্র পত্রিকা গ্রাহককে প্রদান করিতে হইত। পিয়ন গৃহে আসিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইত তাহার কাছেই পত্র ফেলিয়া যাইত না, মালিক উপস্থিত না থাকিলে বাড়ীর ভিতরে রসিদ পুস্তক সহ ডাক পাঠাইয়া অপেক্ষা করিত। বর্ত্তমান সময়ের রেজেষ্টরী চিঠী পত্র সেই প্রাচীন রীতির অনুসরণে চলিতেছে।"

১৮৩৭ অব্দের পোষ্টেল আইন অনুসারে সংবাদ পত্রের মাশুল নিম্নলিখিত হারে ধার্য্য হয়।

২০ মাইল দূর পর্য্যন্ত দুই দিকে খোলা সংবাদ পত্র, পুস্তিকা, ছাপার কাগজ প্রভৃতি ৩॥ তোলা ওজনের পর্য্যন্ত এক আনা। ছয় তোলা পর্য্যন্ত দুই আনা। ৪০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত—ঐরূপ প্যাকেট ৩॥ তোলা ওজনের দুই আনা। ছয় তোলা ওজনের পর্য্যন্ত চারি আনা। চারি শত মাইলের উর্দ্ধে উপর্য্যুক্ত হারে তিন আনা ও ছয় আনা। অতিরিক্ত ওজনে প্রতি তিন তোলায় এক আনা হারে অধিক গৃহীত হইত।

সাধারণ চিঠি পত্রের মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল—

এক তোলা ওজনের চিঠি ২০ মাইল পর্য্যন্ত—এক আনা। ৫০ মাইল দুই আনা। এক শত মাইল তিন আনা। দেড় শত মাইল চারি আনা। দুই শত মাইল পাঁচ আনা। আড়াই শত মাইল ছয় আনা। তিন শত মাইল সাত আনা। চারি শত মাইল আট আনা। পাঁচ শত মাইলে নয় আনা। ছয় শত মাইলে দশ আনা। সাত শত মাইলে এগার আনা। আট শত মাইলে বার আনা। নয় শত মাইলে তের আনা। হাজার মাইলে চৌদ্দ আনা। বার শত মাইলে পনর আনা। চৌদ্দ শত মাইলে এক টাকা।

চিঠির ওজন এক তোলার উর্দ্ধ হইলে প্রতি তোলায় এক আনা অধিক গৃহীত হইত।

৬০০ তোলার অনধিক এবং ১৫ × ১২ × ১২ অর্থাৎ ২১৬০ ঘন ইঞ্চি আকারের অনধিক বাঙ্গি প্যাকেটের মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল—

৫০ মাইলে প্রতি ৫০ তোলায় ছয় আনা। এক শত মাইলে প্রতি ৫০ তোলায় নয় আনা। তারপর প্রতি ৫০ মাইলে প্রতি ৫০ তোলায় তিন আনা করিয়া বৃদ্ধি। ইত্যাদি।

সংবাদ পত্র ও পুস্তক ইত্যাদি মুদ্রিত কাগজ পত্র বাঙ্গিতে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত যাইত। ১০০ মাইলে প্রতি ২০ তোলা পর্য্যন্ত—দুই আনা। তৎপর প্রতি শত মাইলে প্রতি বিশ তোলায় এক আনা করিয়া অধিক। চল্লিশ তোলায় ডবল গৃহীত হইত।

বিলাতে চিঠি যাইবার ও বিলাত হইতে চিঠি আসিবার মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল—প্রতি অর্দ্ধ আউন্স ওজনের চিঠির জন্য এক শিলিং। ডবল চিঠির জন্য (For every double letter.) দুই শিলিং। তিনখানা চিঠির জন্য (For every treble letter.) তিন শিলিং। একখানা এক আউন্স ওজনের হইলে এক খানাতেই চারি শিলিং মাশুল। এই চারি শিলিংএ তিনখানা পর্য্যন্ত যাইত। এক আউন্সের অতিরিক্ত অর্দ্ধ আউন্স ওজনের জন্য একশিলিং করিয়া অতিরিক্ত গৃহীত হইত।

"বিদেশের চিঠির জন্য অতিরিক্ত জাহাজ মাশুল (Ship Postage) ১॥০ তোলা চিঠির জন্য দুই আনা ও ৬ তোলা

মুদ্রিত পত্রিকাদির জন্য এক আনা ধার্য্য হইয়াছিল। এই মাশুল তাহাদের কমেণ্ডারের প্রাপ্য ছিল।

ডাক টিকেট প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রাপককে মাশুল দিয়া পত্র পত্রিকা গ্রহণ করিতে হইত। সুতরাং কলিকাতার সংবাদ পত্রিকা ও মাসিক পত্রিকা গুলির অব্যাহত গতিতে মফস্বল ভ্রমণ করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু যাহারা পত্রিকার বৎসরের ডাক মাশুল অগ্রিম জমা দিতে পারিতেন, তাহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তাহাদের পত্রিকা গ্রাহকের নিকট বিনা মাশুলেই যাইত। কিন্তু এরূপ ব্যাপার সামান্য ব্যয় ও বিড়ম্বনা সাধ্য ছিল না।

পত্রিকা পরিচালন সেই সময় কিরূপ গুরুতর ব্যয় সাধ্য ব্যাপার ছিল, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আমরা এই স্থানে প্রদর্শন করিতেছি।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা "কলিকাতা জার্ণালের" বিবরণ প্রদান করিয়া আসিয়াছি। এই পত্রিকাখানা ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে প্রেরণ করা যাইতে পারে, তজ্জন্য ইহার পরিচালকগণকে ডাক ঘরে অগ্রিম টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই সময় কলিকাতা হইতে নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানের ডাক মাশুল এক আনা হইতে ছয় টাকা পর্য্যন্ত ছিল। এইরূপ বিভিন্ন হারের অনুপাত ধরিয়া কলিকাতা জার্ণালের পরিচালকগণকে চল্লিশ হাজার টাকা এক বৎসরের অগ্রিম মাশুল স্বরূপ কলিকাতা ডাক ঘরে জমা দিতে হইয়াছিল। এই টাকা জমা দেওয়ায় 'কলিকাতা জার্ণালের' গ্রাহকগণকে পত্রিকা গ্রহণ করিতে আর মাশুল দিতে হইত না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যেই কলিকাতা জার্ণালের গ্রাহক সংখ্যা আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই অর্থ ব্যয় করিয়াও "কলিকাতা জার্ণাল" শান্তিতে পরিচালিত হইতে পারিল না। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত কলিকাতা জার্ণালের বিরোধ বাধিয়া গেলে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার শাসনাধীন স্থানে—অগ্রিম মাশুল জমা থাকা সত্বেও—জার্ণাল বিনামাশুলে বিলি হইতে দিলেন না। সুতরাং মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশে জার্ণালের কোন পুলিন্দা বা ব্যারিং দাবি করিয়া গ্রাহকের নিকট উপস্থিত করা হইল, কোনটা বা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রবেশ দ্বার গঞ্জাম হইতে ব্যারিং করিয়া প্রেরকের নিকট হইতে পুনরায় ডাক মাশুল আদায় জন্য কলিকাতায় ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এইরূপ ছিল—সে কালের ডাক ঘরের ব্যয় ও পত্রিকা পরিচালনে বিড়ম্বনা।

খুড়ী মা।

মুমূর্ষু সীতানাথ অস্ফুটস্বরে কহিলেন "কে?" ব্যস্তসমস্ত হইয়া হরনাথ কহিলেন "দাদা।" সীতানাথ কহিলেন "নিমুকে একবার ডাকিয়া দাও, তাকে জন্মের শোধ একবার দেখিয়া যাই"। নিকটে উপবিষ্টা এক রমণী নিদ্রিত বালককে জাগাইলেন। বালক পিতার মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল "বাবা! বাবা!" শীর্ণ দুইখানি বাহু বালককে জড়াইয়া ধরিল। একটু গলা ঝাড়িয়া সীতানাথ কহিলেন "বৌমা এদিকে এস"। রমণী সসঙ্কোচে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সীতানাথ বলিতে লাগিলেন "বৌমা, মা কাকে বলে, তা ও জানে না। এতদিন আমার কাছেই মানুষ হইয়াছে, আমি ত চলিলাম; যাইবার সময় তোমার হাতে ওকে দিয়া গেলাম। বিপিন মণিদের সঙ্গে ওকেও মানুষ করিও। হরনাথ, তোমায় আর কি বলিব, নিমু রইল; তাকে——বাবা নিমু—" এইটুকু বলিবার জন্যই যেন এতক্ষণ বৃদ্ধের রোগশীর্ণ দেহে প্রাণ ছিল। ইহার পর আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল। ক্রমে রাত্রিশেষে সব ফুরাইল; সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্নার রোল পড়িয়া গেল।

(২)

"খুড়িমা, মণিদার কেমন সুন্দর ছবির বই, আমাকে একখান' দিবে?" বলিতে বলিতে মাতৃপিতৃহীন বালক নির্ম্মল খুড়ীমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। "আচ্ছা তোমায় তার চেয়ে সুন্দর বই দিব।" বালকের মুখ হাস্যচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন সময় মণি ও বিপিন আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "মা দেখ আমাদের কেমন সুন্দর ছবির বই। নির্ম্মলের জন্য বাবা বই আনে নাই। দেখ কেমন পাতায় পাতায় ছবি।" বলিয়াই মণি বই খুলিয়া মাকে ছবি দেখাইতে আরম্ভ করিল। মায়ের দৃষ্টি তখন

সেই মাতৃপিতৃহীন বালকের অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন যুগলের দিকে নিবদ্ধ; বালকের এই ভাব প্রভা সহ্য করিতে পারিলেন না। "হয়েছে তোদের আর ছবি দেখাইতে হবে না, খাইতে চল।" বলিয়া ছেলেদিগকে লইয়া তিনি রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

হরনাথ বাবুর শরীর দিন দিনই বড় খারাপ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার সে হাসিমুখ আর নাই। সর্ব্বদাই আপন মনে শূন্যপানে তাকাইয়া কি যেন ভাবেন। পাড়া প্রতিবাসীরা ভাবিল, হরনাথ জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মৃত্যুতে স্বাভাবিকই বড় দমিয়া গিয়াছে। তা'ত হইবারই কথা। এমন ভাই কি কাহারও হয়? কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হরনাথ বলিতেন "আর ভাই আমার এই সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না, দাদা উপরে ছিলেন, তিনি ত চলিয়া গেলেন, আমি এখন ছেলেপেলে নিয়ে বিশেষতঃ নিমুকে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়িয়াছি। দাদাত আমার হাতেই ওকে দিয়ে গেলেন এখন ওকে আমারই মানুষ করিতে হইবে। এইসব ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীরটাই গেল।' তাহারা ভাবিতেন আহা এমন না হ'লে ভাই।' কিন্তু নব্য উকীল প্রসন্নবাবু হঠাৎ কি করিয়া হরনাথ বাবুর এত অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। প্রায়ই দেখা যাইত তাঁহারা দুইজনে কি পরামর্শ করিতেন। কি পরামর্শ করিতেন, তাহা তাঁহারাই ভাল জানেন। তবে কিছুদিনপর যখন এক একখানি করিয়া করিয়া সীতানাথের সকল সম্পত্তি ঋণের দায়ে নিলাম হইয়া গেল, তখন আর ব্যাপারটা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

কথাটা ক্রমে প্রভার কাণে উঠিল। একদিন ভোজন নিরত স্বামীর পাতের কাছে বসিয়া প্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন "বড় ঠাকুরের সম্পত্তি নাকি নিলাম হইয়া গিয়াছে?" হরনাথ গম্ভীর ভাবে কহিলেন "সংসারের কথা ভাবতে গেলে আর চলে না। সংসারটা কেবলই ফাঁকি। হঠাৎ একদিন প্রসন্নবাবু উকীলের কাছে শুনিলাম, সম্পত্তি নিলাম হবে। রামচন্দ্রপুরের রাজারাম সাহা ডিক্রী জারি করিয়াছেন। আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। দাদা যে এত ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন, দুণাক্ষরেও আমি জানিতাম না। কি জানি, ইহা ছাড়া আরও ঋণ আছে কিনা, তাই অনেক চেষ্টায় তোমার নামে সম্পত্তি কিনিয়া রাখিয়াছি।"

(৪)

একদিন দুপুরবেলা মণি ও বিপিন হরনাথ বাবুর শুইবার ঘরে তক্তার উপর, দুইটী কমলা দেখিয়া তাহা লইবার জন্য যেমনি তক্তার নারা দিল, অমনি তক্তা টানিয়া গিয়া একটা চিমনী মাটিতে পড়িয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। মণি ও বিপিন কমলা লইয়া পলাইল। পাছে ভাঙ্গা কাচে কাহারও পা কাটিয়া যায় তাই নির্ম্মল ছোট টুকরাগুলি কুড়াইয়া একত্র করিতে লাগিল। এমন সময় হরনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন "দুষ্ট, পাজি, তোর এই কাজ?" কাঁদ কাঁদ স্বরে নির্ম্মল কহিল "আমি করি নাই কাকাবাবু, মণিদা আর বিপিন—" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই হরনাথ তাহাকে ধরিয়া নির্দ্দয় প্রহারে জর্জ্জরিত করিলেন। তাহার কান্না শুনিয়া প্রভা দৌড়িয়া আসিল। হরনাথ বাবু কহিলেন 'তুমিই আদরে আদরে ওকে মাটী করিলে।' উত্তর দিবার মত তখন প্রভার মনের অবস্থা ছিল না। তিনি নিঃশব্দে নির্ম্মলকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এমন প্রায়ই হইত। কোনও বিষয়ে একটু কিছু উনিশ বিশ হইলেই—পান হইতে চুন খসিলে—কার্য্যাকারণ কিছু না শুনিয়াই হরনাথ "সামারিট্রায়েল" করিয়া ফেলিতেন। ফলে নির্ম্মলকে প্রায়ই দণ্ড পাইতে হইত। আর তার খুড়িমাকে সেই আহত হৃদয়ের বেদনা মুছাইতে হইত।

(৫)

দুইজন দুই বিপরীত পথে চলিলে ক্রমেই দূরে যাইয়া পড়ে। নির্ম্মলের প্রতি প্রভার স্নেহ ও হরনাথের বিসদৃশ আচরণ তাঁহাদের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। হরনাথ তাহাকে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, প্রভা তাহাকে ততই স্নেহের বাঁধনে দৃঢ় করিয়া বাঁধেন। আর খুড়ী মার ভালবাসায় নির্ম্মল তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, সংসারে সে খুড়ীমা ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না। তাহার পিতৃমাতৃহীন হৃদয়ে যদি কেহ কিছু সুখ শান্তি দিতে পারিত, তবে সেই খুড়ী মা। খুড়া

স্বভাবতঃই নির্ম্মলকে খুব স্নেহ করিতেন। তারপর হরনাথের ব্যবহার নির্ম্মলকে তাঁহার অসীম স্নেহের অধিকারী করিয়াছিল। কারণে অকারণে যখন নির্ম্মলকে হরনাথ ভর্ৎসনা করিতেন—প্রহার করিতেন, তখন প্রভা এমনি করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইতেন যে তাহাতেই তাহার আহত হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া যাইত।

(৬)

নির্ম্মল পাড়ার ছেলেপেলেদের সঙ্গে মিশিতে পাইত না। কারণ তাহার খুড়ার আশঙ্কা হইত, পাছে সে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বিগড়াইয়া যায়। মণি ও বিপিন খেলা করিতে যায়; তাহাদের যে বিগড়াইবার আশঙ্কা মোটেই ছিল না তা নয়; তবে তাহাদের ভালমন্দের জন্য হরনাথকে কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। আর নির্ম্মলের ভাল মন্দের জন্য যে তিনিই দায়ী। তাই তাঁহার মনে হইত, একটু সুবিধা পাইলেই নির্ম্মল বিগড়াইয়া যাইবে।

সে দিন কি একটা কাজে হরনাথ কোথায় গিয়াছিলেন। নির্ম্মল খুড়িমাকে বলিয়া বিপিন ও মণিদের সঙ্গে খেলা করিতে গেল। তাহারা তাহাকে লইতে নারাজ-কিন্তু মায়ের ভয়ে 'না' বলিতে পারিল না। বাহিরে গিয়া নির্ম্মল দাঁড়াইয়া মণি ও বিপিনের খেলা দেখিতেছিল। কেননা মণি ও বিপিন তাহাকে খেলাতে লইল না। তাহাদের এতটা সাহসের কারণ এই যে খেলার জায়গাটা ছিল তাহাদের মায়ের দৃষ্টির বাহিরে। নির্ম্মল কিন্তু খেলা দেখিয়াই বেশ একটু আমোদ পাইতে ছিল। এমন সময় জলদ গম্ভীর স্বরে শব্দ হইল—"নিমে!" নির্ম্মলের মুখ শুকাইয়া গেল; বলির পাঁঠার মত সে কাঁপিতে লাগল। তারপর হরনাথ যখন তাহাকে কাণে ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখন এই দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ প্রভা দরজার নিকট কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তারপর তিনি সেই রোরুদ্যমান বালককে স্বামীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া কহিলেন "এমন করিয়া একে খুন করাই যদি তোমার ইচ্ছা তবে বল, না হয় আমরা একদিকে চলিয়া যাই। বাপের বাড়ী গেলে তারাও কিছু ফেলিতে পারিবে না। তুমিও জুড়াও আমিও জুড়াই। এ সব আমার আর সহ্য হয় না।"

(৭)

সে দিন প্রভার বাপের বাড়ীর চাকর রামচরণ তাঁহার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিল। রাগের ঝোকে প্রভা নির্ম্মলকে তাহার সঙ্গে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। নির্ম্মলকে পাঠাইয়া দিয়া প্রভা বড়ই অসুখ বোধ করিতে লাগিলেন। যাহাকে এক মুহূর্ত্তও না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, তাহাকে দূরে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি কি করিয়াই বা থাকিতে পারিবেন। প্রভার সকল রাগ পড়িল স্বামীর উপর।

সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া যখন হরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "নিমে কোথায়?" তখন প্রভা বেশ একটু ঝাঁজের সহিত কহিলেন "কোথায় সে তুমিই জান, তুমিই তাকে মারিয়াছ, আমি জানি কি?" "মরুকগে, হতভাগা লক্ষীছাড়াটা; এই রাত্রে কে আবার তাকে খুঁজিতে যাইরে।" বলিয়া হরনাথ হাত পা ধুইয়া আহারাদি শেষ করিলেন। তারপর তামাক খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন "মহামুস্কিল, মহাবিপদ হারামজাদার খোঁজে এখন আমি যাই কোথা, বল দেখি? প্রভা ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। 'একটু শাসন করিয়াছি, তাতেই বাবুর অভিমান, তা হোক আমাদ্বারা এই রাত্রে খোঁজাখুজি কিছু হবে না'। বলিয়াই একটা হারিকেন হাতে লইয়া হরনাথ বাহির হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিরক্তির সহিত কহিলেন "গেছে হতভাগাটা,—একটা আপদ গেল—যাক।"

তৃতীয় দিন ডাকপিয়ন হরনাথ বাবুর নিকট একখানা কার্ড দিয়া গেল। হরনাথ বাবু তাহা পড়িলেন—

কল্যাণীয়াসু—

এখানে আসিয়া নির্ম্মল ভালই আছে। আমাদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে বেশ আমোদেই আছে। সর্ব্বদাই তোমার কথা বলে। ইতি

আং যোগেশ।

হরনাথ পত্রখানা প্রভার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"আমাকে এতটা হয়রাণ করার দরকার ছিল কি?" প্রভা কহিলেন "তোমার লোক দেখান খোজা; সে ত ৫ মিনিটই। তেমন কিছু হইলে আমিই কি

তোমাকে বসাইয়া রাখিতাম? তাহলে তোমাকে আর নিমুর কথা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইত না!"

(৮)

প্রভার বড় জ্বর। শরীর শুকাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ বড় একটা ভরসা দিতে পারে না, প্রভার সংবাদ পাইয়া প্রভার ভাই যোগেশবাবু ও যোগেন্দ্র বাবু নির্ম্মলকে লইয়া দেখিতে আসিলেন। প্রভার অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলের মুখ শুকাইয়া গেল। সংসারে তাহার শেষ অবলম্বন খুড়িমাও বুঝি তাহাকে ফাঁকি দেয়।

সে দিন প্রভা তাহার দাদাকে বলিল "দাদা আমার একটা উইল করিতে হইবে। আমার ভাসুরের সম্পত্তি নিলাম হওয়ায় আমার নামে কিনিয়া রাখা হয়। তার একটা হেস্তনেস্ত করিতে পারিলেই আমি সুখে মরিতে পারি। যোগেন্দ্র বাবু উকীল তিনি কহিলেন 'সে হবে এখন'।

পরদিন প্রভা স্বামীকে ধরিয়া পড়িল—"আমার একটা শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে"।

হরনাথ কহিলেন "কি"? প্রভা কহিলেন "জন্মের শোধ তোমাকে একটা দান করে যাব, তোমার হাত দেও।" শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া প্রভা কহিতে লাগিলেন "তুমি যাকে কোনও দিন দেখিতে পার নাই সেই নির্ম্মলই আমার শেষ দান। তার আর জুড়াইবার জায়গা নাই। বল তাকে নিবে—আমার হাতে ধরে বল—কোনও দিন তোমাকে কিছু দেই নাই। কেবলই নিয়াছি—আজ জন্মের শোধ তোমায় একটা দান করিলাম। হতভাগিনীর দান বলিয়া উপেক্ষা করিও না, আমার আত্মা তাহাতে বড় কষ্ট পাইবে।

প্রভার কথা গুলি হরনাথের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। কত উদার তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়, আর তাঁহার নিজের কত সঙ্কীর্ণ। অশ্রুজলে হরনাথের চক্ষু ভরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "তোমার এই দান গ্রহণ করিলাম প্রভা। নির্ম্মলের জন্য তুমি আর চিন্তা করিও না।" প্রভার রোগপাণ্ডুর মুখে একটা হাসির জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন উইল লেখা হইয়া গেল। উইলে প্রভা তাঁহার নিজ নামে ক্রীত সমস্ত সম্পত্তি নির্ম্মলকে দান করিলেন। তারপর স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা ও মন্তব্য।

রাষ্ট্রনীতির কথা।

আমাদের মনে হয়, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এই কথা দুইটীর মধ্যে একটু পার্থক্য করা উচিত। রাজনীতি কথাটা বাংলা সাহিত্যে অতি ক্ষিপ্র ব্যবহার লাভ করিয়াছে, সংস্কৃতে কোথাও ইহার প্রয়োগ আছে কিনা মনে হইতেছে না। তবে মনে পড়ে সেই প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকটীর একছত্র—'বেশ্যাঙ্গনেব নৃপনীতি রনেকরূপা।" যদি নৃপনীতি ও রাজনীতি একার্থ বাচকই হয়—এবং বোধ হয় ইহাদের একার্থ বাচকই হওয়া উচিত—তাহা হইলে রাজনীতি অর্থে 'diplomacy' কিংবা প্রজার প্রতি রাজার ব্যবহারের যে গূঢ়, কুটিলনীতি আছে, তাহাই বুঝা উচিত। সুতরাং politics অর্থে 'রাজনীতি' না বলিয়া 'রাষ্ট্রনীতি' বলাই অধিক সমীচীন। মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য ভাষায়ও এইরূপ প্রয়োগেই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজা ও রাষ্ট্র এক নহে—সুতরাং নীতি-শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ হইলে উভয়ে একার্থ দ্যোতক হইতে পারে না।

রাজার নীতি ও রাষ্ট্রের নীতি যদি এক না হয়, তাহা হইলে একটীর আলোচনা কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও অপরটীর আলোচনা নিষিদ্ধ হইবে না। রাজা বা শাসন কর্ত্তারা যে সব আইন কানুন প্রণয়ন করেন, যে সব কর ধার্য্য করেন, কিংবা অন্য সব বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করেন, তাহার আলোচনায় সব দেশেই মত ভেদ হইতে পারে, এবং অনেক সময় এই মতভেদ অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাব ধারণ করিতে পারে। এবং এই মতভেদের কারণ প্রায় সর্ব্বত্রই স্বার্থের তফাৎ। টাইমস্'—পত্রিকা যদি বিলাতী গবর্ণমেন্টের কোন বিধানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বিধান যাহাদের উপকার করিবে, টাইমস্' তাহাদের প্রতিনিধি নয়। এবং সে যাহাদের প্রতিনিধি তাহাদের স্বার্থ ঐ বিধান দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

এইরূপ স্বার্থের বিরোধ যেখানে রহিয়াছে সেখানে রাজার নীতির আলোচনাও অবস্থা বিশেষে অনেকের

প্রবেশ না করাই উচিত। রাজনীতি আলোচনা একটা শাস্ত্র নহে, ইহা একটী বিজ্ঞান নহে; নিজের স্বার্থ যাহারা বুঝে এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য যাঁহারা সমবেত হইতে পারে, তাহারাই ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং তাহাদেরই ইহাতে প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইউরোপের শ্রম জীবিরাও এই আন্দোলন বুঝে, এবং কয়লার খনি হইতে কিংবা পাটের কারখানা হইতে বাহির হইয়া হাত মুখ ধুইয়া সকলে একত্র হইয়া সভা করিতে জানে; এবং ইহা জানে বলিয়াই ক্রমে সে সব দেশের রাজাদের নীতি ইহাদের স্বার্থের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেছে। এ সকল আন্দোলনে যে বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, তাহা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের চেয়ে অনেক সময় ব্যবসায়ীদেরই বেশী থাকিতে দেখা যায়। সেই জন্য এ সকল আন্দোলনে পণ্ডিত ব্যক্তিদের চেয়ে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য প্রায় সব দেশেই বেশী।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতি জিনিষটা সাময়িক আন্দোলন নহে; ইহা দেশ বিশেষের রাজার বিধান বিশেষের আলোচনা নহে;—ইহা একটী শাস্ত্র, ইহা বিজ্ঞান। ভারতবর্ষে, লবণের উপর কর থাকা উচিত কি না, কিংবা ইংলণ্ডে আয় কর কত আয়ের উপর ধার্য্য হওয়া উচিত, কিংবা আমেরিকায় শ্বেতেতর জাতির প্রবেশ প্রতিষেধক আইনের সমালোচনা প্রভৃতি ইহার আলোচ্য বিষয় নহে। দেশ-বিশেষে কোনও এক বিশিষ্ট সময়ে কোনও এক বিশিষ্ট পথ যে বিধান প্রণয়ন করে, এবং যাহা হয় ত দশ বৎসরেই আবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—এরূপ সব সাময়িক বিষয় কোনও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। যাহাদের স্বার্থ সংসৃষ্ট, তাহারা ইহার প্রচুর আলোচনা করুক, তুমুল বাদ প্রতিবাদে দেশ মুখরিত করিয়া তুলুক, কিন্তু বিজ্ঞান তাহাতে নির্ব্বিকার থাকিবে। বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সাধারণ সত্য;—যাহা সব দেশে সব সময়ে সত্য, তাহাই বিজ্ঞানের বিষয়। রাষ্ট্র-নীতি-বিজ্ঞান কোনও সাময়িক আন্দোলনের ধার ধারে না। রাজশক্তির প্রকার ভেদ, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের নিয়ম, রাজা প্রজার সাধারণ সম্বন্ধ এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রভৃতি বিষয়ই ইহার আলোচ্য। অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান দেশ সমূহের শাসন-শক্তির বিভিন্ন প্রকার গঠন প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাষ্ট্র-নীতি তাহার সাধারণ সত্য সংগ্রহ করে। দেশ বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ ইহার বিষয়ীভূত নহে। সুতরাং রাজনীতি যাহাদের নিষিদ্ধ খাদ্য তাহারাও জাতি নাশ না করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে পারে। এবং বুদ্ধির পক্ষে ইহা যে একটী পুষ্টিকর খাদ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে বাঙ্গালী ইহার প্রতি এত বিরক্ত কেন? বাঙ্গালার সাহিত্যে ইহার একেবারেই ছায়াপাত নাই কেন? আমাদের পর্য্যটকেরা ইহার প্রতি এত উদাসীন কেন? জাপানীরা যে স্ত্রী পুরুষে একত্র উলঙ্গ হইয়া স্নান করে তাহা আমরা জানি; কিংবা বেঙের লাফ বলিলেই যে চীন দেশী উৎকৃষ্ট কবিতার একটী চরণ হইয়া যায়, তাহা আমাদের পর্য্যটকেরা আমাদিগকে জানান; কিন্তু চীনের যে বিপ্লব নিয়া আমেরিকা ও ইউরোপের চিন্তাশীল লেখকেরা মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন, আমাদের পর্য্যটকদের কাছে কি তাহা বেঙের লাফের চেয়েও হীন? জাপানী রাজশক্তির গঠন প্রভৃতির পরিচয় ইউরোপের পর্য্যটকেরা দেন; আমাদের পর্য্যটকেরা দেখিতে আসেন, মেয়েরা কোথায় উলঙ্গ হইয়া স্নান করে! ফ্রান্সের হোটেলে পরিচারিকারা যে মৃদুহাস্যে আমাদের ভ্রমণকারীদের চিত্তে তাহার দাগ থাকিয়া যায়; কিন্তু ফ্রান্সের সাধারণ-তন্ত্র কেমন করিয়া চলিতেছে, যাঁহারা দেখিয়া আসেন তাঁহারা যদি তাহা আমাদিগকে জানাইতেন তবে আমরা কতই না উপকৃত হইতাম।

বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্ব সংগৃহীত হইলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উপাদান হইত। রাজনীতির আন্দোলনে দেশ মুখরিত কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দিকে যে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, তাহাতে আমাদের হাল্কা ভাবেরই প্রমাণ হয়।

আমাদের শিক্ষা—অর্দ্ধ শতাব্দীর উর্দ্ধকাল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ভারতে শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছে; ক্রমে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার এত অধিক হইয়াছে যে, এখন উপাধিধারীদের নামের তালিকা ছাপিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতি বৎসর একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থই প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু দেশের এতগুলি লোককে সেক্সপীয়র মিলটন মুখস্থ করাইয়া কি লাভ হইল? কিছু দিন আগে

জন্যত আমরা মনে করিতাম যে, ঐ সকল কেতাবে কি লেখে তাহা জানাই বুঝি একটা মহৎ কাজ; এখন বুঝিতেছি, ইহাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নহে; এ সকলের ভিতর দিয়া আর একটা কিছু লাভ করিতে হয়; দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য সেই "একটা কিছু" পাইবার উপায় মাত্র।

কিন্তু সেই জিনিসটা কি? বুদ্ধির বল ও চরিত্রের বল। দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা আমরা এই দুইটাই লাভ করিতে চাই। কেমন করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হয়, কেমন করিয়া কোনও একটা বিষয়ে ভাবিতে হয়, এবং কেমন করিয়া কোনও একটা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয়, তাই যদি আমরা না শিখিলাম তবে আলোক সম্বন্ধে নিউটনের মতটা কি ছিল, তাই শুধু মুখস্থ করিয়া কিংবা হেগেলের দর্শনের মূলসূত্র কি, তাই শুধু কপচাইয়া হইবে কি? আর এ সকলের চর্চ্চার সঙ্গে সাহিত্য-রসের ভাবনা দিয়া আমরা যে নিত্য নিত্য ইয়োরোপীয় পিষ্টক ভক্ষণ করিতেছি, তাহাতে যদি চিত্তে সদ্‌বৃত্তির সঞ্চার না হইল, যদি সেই হিংসা-দ্বেষকেই ইয়োরোপীয় গাউনে সাজাইয়া উপাসনা করিতে থাকিলাম, যদি চিত্তের ও চিন্তার সঙ্কীর্ণতা আমাদের একটুও না কমিল,—তবে এই যে, এত এত টাকা খরচ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইটা চারটা অক্ষর কিনিয়া লইতেছি, তাহাতে জাতির কি এমন মহান্ উপকার হইতেছে? প্রশ্নটা যে আজ উঠিয়াছে মনে হয় ইহা শুভ লক্ষণ। এবং ভরসা করিতেও ইচ্ছা হয় যে, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ বিষয়ে একটু তলাইয়া ভাবিবেন, এবং একটু নিঃস্বার্থ ভাবে ভাবিবেন। স্বার্থের কথাটাও তুলিতে হইল, কারণ আমরা জানি, স্কুল কলেজের সংস্কার প্রভৃতির কথা তুলিলেই ঐ সব কারবারের অধ্যক্ষেরা ভাবেন নিজেদের লাভের কথা; অন্যত্র দেশের নায়ক হইলেও এ সময়ে দেশের ও দশের কথা ভাবিবার সময়াভাব।

আর, উচ্চ শিক্ষা যাঁহারা এ বাবৎ লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদেরও এই সময় একটু স্বার্থ ত্যাগ এবং একটু অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বীকার করা উচিত যে, তাঁরা স্বাধীনভাবে ভাবিতে শিখেন নাই এবং চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধন করিবার সুযোগও তাঁহাদের ঘটে নাই।

আমরা একজন বড় পাণিনীর পণ্ডিতের গল্প জানি, তিনি কৈয়ট-কাত্যায়ন-নাগেশ-ভট্টোজি ছত্রে ছত্রে মুখস্থ বলিতে পারিতেন, কিন্তু এক সময় তাঁহাকে এমন একটা প্রশ্ন করা হইয়াছিল যাহার বিচার কৈয়ট প্রভৃতি করেন নাই; তিনি স্তব্ধ হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "এমন প্রশ্ন ত কোন টীকায়ই নাই!" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশ্বের বিদ্যা গ্রহণ করিয়া যাঁহারা বাহির হন, তাহাদের অবস্থাও কি এইরূপই নহে? একটা ছাপান পুঁথিতে, বিশেষ করিয়া ইউরোপের কেতাবে একটা নজীর না পাইলে কোন্ কথাটা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি? একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি।—সৌন্দর্য্যবোধ সকল জাতির এক রকম নহে, সকলেই একই জিনিসকে সুন্দর বলে না; এবং সাহিত্যের সমালোচনায় যে একটা সৌন্দর্য্যবোধ আছে, তাহাও স্বীকৃত; অথচ এই সাহিত্য সমালোচনায় পূর্ব্ব পশ্চিম ঠিক এক হয় কি করিয়া? নির্লজ্জভাবে মুখস্থ করা অভিমতগুলিকে আমরা নিজের বলিয়া মনে করি, সেই জন্য।

শুধু সাহিত্যে, বিজ্ঞানে নয়; বারশালের চাউল সস্তা হইলে তাই ক্রয় করা উচিত কি না, জিজ্ঞাসা করিলেও আমরা একটা নজীর ছাড়া উত্তর দিতে পারি না। যে শিক্ষায় এমন মানুষ তৈয়ার করে, উপাধিটা যত বড়ই হউক না কেন, ইহা অন্তঃসার শূন্য!

হৃদয় বাণী।

৬,১২,১৬

রাত্রি ৭টা।

ঘরে বাইরে।

রবীন্দ্রনাথের নব প্রকাশিত গ্রন্থ 'ঘরে বাইরে' শেষ করা গেল। অবশ্য ইহা উপন্যাস-আখ্যা প্রাপ্ত কিন্তু ইহাকে উপন্যাস বলিব, না মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বিষয়ক দার্শনিক গ্রন্থরূপে অভিহিত করিলে সঠিক হয়, ইহাই বিবেচ্য। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায়তো এমন কোনও গ্রন্থ পড়ি নাই, অন্য ভাষায়ও নয়—Grand book.

লিখিতে হইলে এমন বইই লেখা উচিত। কাল পাঠ শেষ হইয়াছে, কিন্তু প্রথম হইতে প্রাণের ভিতর যে তরঙ্গের আন্দোলন অনুভব করিতেছিলাম, এখনও তাহা থামে নাই। এতদিন বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই স্ত্রীলোকের পাঠেরই অধিকতর উপযোগী। সতীধর্ম্ম, প্রেমের হাহুতাশ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পতিপ্রেম, কান্নাকাটি ইত্যাদিই তাহাদের অধিকাংশের মামুলি ধরণের আখ্যান বস্তু। 'ঘরে বাইরে' সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গ্রন্থ। ইহার বলিবার বিষয় বিভিন্ন, নিয়মও বিভিন্ন।

সাধারণ লোকের, অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের বুঝিবার বা উপভোগ করিবার বই ইহা নহে। এমন কি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যাহারা বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন, তাহারাও ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা কতদূর বুঝিবেন সন্দেহ। এই ত্রিংশ বৎসরেও আমরা রবীন্দ্রনাথের সম্যক আদর করিতে শিখিলাম না, ইহা আমাদের সমাজের জ্ঞানচর্চ্চার অপ্রতুলতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই গ্রন্থ বুঝিতেই বা না জানি কত দিন যায়? রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' লিখিয়া জগৎবরেণ্য কবি কিন্তু ইহার লেখকের তুলনায় 'গীতাঞ্জলির' কবিকেও ছোট বলিয়া মনে হয়।

ইহার সৌন্দর্য্য ও মহত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম কবিবরের নিজচরিত্র ও বঙ্গবিভাগের আন্দোলন উপলক্ষে তিনি যে অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা ভুলিতে হইবে। সে সম্পর্কে কালের কষ্টিপাথরে তাঁহার যে চরিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেশবাসীর চক্ষে তেমন চিত্তাকর্ষক নয়। সেই সময়কার ঘটনাবলী লইয়াই গ্রন্থ বিরচিত। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত মতামতের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত মতের অনেক সময় পার্থক্য দৃষ্ট হয়,—যাহা কাণে বড় বাজে। সে যাক্—তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে যে নিত্য নূতন ভাবের ডালি ধরিয়া দিতেছেন, তাহা উপভোগ করিয়াই আমরা কৃতার্থ।

একটী কথা—গ্রন্থের ঠিক প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা গেল না। কবিবর 'ঘরে বাইরে' অর্থে কি বুঝাইতে চান, তাহা মাঝে ২ অস্পষ্ট আবছায়ার মত চোখের কাছে ধরা দিলেও, গ্রন্থ শেষ করিতেই সব যেন গোলাইয়া গেল। 'সোণার তরীর' ন্যায় 'ঘরে বাইরের' অর্থ ও বুঝি অনিশ্চিত থাকিয়া যায়।

মাসিক পত্রিকাদিতে গ্রন্থে অশ্লীলতার অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া দোষারূপ করা হইয়াছে। কই, তেমন কিছুই তো দেখিলাম না। এক স্থানে রাবণের সম্পর্কে সীতার উল্লেখ আছে। স্থানটীতে আমিতো দোষের কিছু পাইলাম না। যে লোকের মুখে কথা কয়টী বিবৃত হইয়াছে তাহাতে সীতার কোনও গৌরব ক্ষুন্ন হয় নাই। হায়! বাঙ্গালার শিক্ষিতাভিমানী পাঠক!

গ্রন্থের ভাষা অপূর্ব্ব। লেখা এক এক স্থানে এমনই ভাবে ভরা, এমনই জমাট বাঁধা, এমনই অন্তর্নিহিত নীরব শক্তিতে পরিপূর্ণ, সতেজ রসে অভিষিক্ত, যে পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাইতে হয় ইহা কবিতা নহে, গদ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতারই ন্যায় ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীর সমাহিতচিত্তে পড়িবার জিনিষ। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও ভাবুক হইতে হইবে, তাহা না হইলে ইহার অপরূপ মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। ফরাসী লেখক Joubert যাহাকে adorned brevity বলিয়াছেন এই গ্রন্থ তাহার পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ।

অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় ইহা ঘটনাবহুল নহে। রবীন্দ্রনাথ lyric poet গীতি কবিতা লেখক। খুব বড় গল্প তিনি কখনও জমাইয়া উঠাইতে পারেন নাই। মধুসূদন কিম্বা নবীনচন্দ্রের ন্যায় তিনি কোনও মহাকাব্য লেখেন নাই, সে শক্তি তাঁহার আছে কি না সন্দেহ। অল্পপরিসর গীতি কবিতা বা ছোট গল্পের ভিতরই তাঁহার শক্তি ক্রীড়া করে, সে শক্তির বিকাশ—ভাবের গভীরতায় ও নির্ম্মলতায়, সৌন্দর্য্যের অপরূপ বিশ্লেষণে, মানবহৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহের অনিন্দ্য পরিস্ফুটনে এবং ভাষার মনোহরণ লালিত্য, মাধুর্য্য ও ভাবব্যঞ্জকতায়। 'ঘরে বাইরে' বহিখানা তেমন বৃহদাকার নহে, তাহা হইলে বোধ হয় এমন সরস ও সতেজ লাগিত না।

মোটামুটী তিনটি চরিত্র চিত্রন লইয়া গ্রন্থ বিরচিত—নিখিলেশ, তাহার স্ত্রী বিমলা, বন্ধু সন্দীপচন্দ্র। তাহাদের পার্শ্বে আরও দুইটি চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—নিখিলেশের বৃদ্ধ মাষ্টার চন্দ্রনাথ, সন্দীপের শিষ্য অমূল্য। প্রত্যেকটীই এক একটী Type আদর্শ বিশেষ।

নিখিলেশ রাজপুত্র—রাজা। বিদ্বান্, ধীর, স্থির। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কম, সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশা-মিশা কম, সকল কথাও কাজের ভিতর যেন একটা অবাস্তবতার ভাব মিশ্রিত। দেহের তুলনায় মাথাটা বড়, বিশেষ না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কোনও কাজে হাত দিতে ইচ্ছুক নহে। অনেকটা দার্শনিকের মত—'আইডিয়া বিহারী'। খাঁটি লোক, কিন্তু কাজের সময় বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার বন্ধুবর শক্তিপ্রয়াসী, সে মুক্তি অভিলাষী। 'মুক্তিই হচ্ছে মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ--তার কাছে আর কিছুই না, কিছুই না"। স্ত্রীকে সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা দিয়াছে, পরকে কোনও কার্য্যে বাধা দিতে অনিচ্ছুক। সত্যান্বেষীকে রত 'সত্য' যাহা শুধু তাহারই উপর দেশের ভবিষ্য মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক—এই 'সত্য' কথাটা তাহার মুখে সর্ব্বক্ষণই লাগিয়া আছে। কিন্তু হায়! সে জানে না, জগতে 'ধীর সত্য' কিছুই নাই—ইহা কবির কল্পনা, জড়াম্বরণভীতিগ্রস্ত ভাবুকের সম্মুখে মায়া মরীচিকা বিশেষ। যদিই বা থাকিয়া থাকে,—কাহারও হাতে ধরা দেয় নাই, দিবে কি না সন্দেহ। সে জানে না Expediency সময় বুঝিয়া চলাই অনেক ব্যাপারের মূলমন্ত্র। কবির সহানুভূতি, অন্ততঃ বাহিরে যতটা বোঝা যায়—এই নিখি-লেশের প্রতি কিন্তু পাঠক তাহাকে অকর্ম্মণ্য ভাবুক জ্ঞানে হৃদয়ের পূর্ণ প্রীতি-অর্ঘ্য দিবে না। 'আজন্ম স্কুল-বয়'—এ সকল অতি বুদ্ধিমান্ লোকদ্বারা—যারা Realityকে ছাড়িয়া কেবল Ideaকেই ধরিয়া আছে সংসারে কোনও কাজ হয় না, বরং সময়ে অসময়ে খোলা (Naked) নীতি ও ধর্ম্মের বচন উদ্ধৃত করিয়া অন্যের কার্য্যে বাধা দিয়া তাহা নষ্ট করে।

বিমলা কল্পনাপ্রধানা বঙ্গরমণী, সুশিক্ষিতা মাধুর্য্যময়ী। চরিত্রটী অনুপম সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, প্রতি পদেই ভয় হয় সন্দীপের দৃঢ় কবলে পড়িয়া সর্ব্বস্ব না বিসর্জ্জন দিয়া বসে। এতদিন সে 'ঘরের' অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবধূ ছিল। স্বামীর উদারতা গুণে ও সন্দীপচন্দ্রের সম্পর্কে সে যখন স্বগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া 'বাইরের' বৃহত্তর জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং সন্দীপচন্দ্র যখন তাহাকে বঙ্গের ভাগ্য বিধাত্রী দেবীরূপে অভিহিত করিল, তখন সে সত্য সত্যই আপনাকে অসীম শক্তিসম্পন্না বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। তখন হইতে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত সে এক মোহের ভিতরই যেন ডুবিয়া রহিয়াছে—স্বামী, ধন, জীবন সবই তুচ্ছ, দেশের কাজে নিজকে যে নিঃশেষিত করিতে পারিতেছে না—ইহাই একমাত্র দুঃখ। চরিত্র গৌরবে, নিঃস্বার্থপরতায়, শক্তিতে, দুর্ব্বলতায়, সর্ব্বোপরি ভগ্নী হৃদয়ের ভালবাসায় বিমলা দেবীই বটে। যাহারা সতীশিরোমণি জনকনন্দিনীকেই রমণী জীবনের একমাত্র আদর্শ বলিয়া মনে করেন, তাহাদের কাছে এ চরিত্র তেমন ভাল লাগিবে না। বিমলা ফরাসী বিরাঙ্গনা জিয়ান ডি আর্কের অনেকটা অনুরূপা, ভাবে বিভোরা, তন্ময়া। ইহারা ভাবের সেবায় সবই দিতে পারে কিন্তু পুরুষের নীচাশয়তার স্পর্শে ম্লান ও সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে।

চন্দ্রনাথ নিখিলেশের বৃদ্ধ মাষ্টার। গ্রন্থ প্রারম্ভে এই শান্তশিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি মিতভাষী লোকটী হৃদয়ের কত না শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শেষে দেখা যায়, ইনি প্রকৃত মাষ্টারই বটেন, সংসার অনভিজ্ঞ, নিস্ফল বুদ্ধি দিতেই প্রস্তুত, কাজে কিছু নয়। নিখিলেশ যতই কেন প্রশংসা করুক না, ইনি শ্রদ্ধা অপেক্ষা ঘৃণাই অধিকতর উৎপাদন করেন।

অমূল্য নব্যবঙ্গের দোষে-গুণে পূর্ণ কিশোর বালক। সরল, সুন্দর, সাহসী--চরিত্র সৌরভে ইহার দোষ, ও গুণ, বোধ হয়।

সন্দীপচন্দ্র (কি বিদঘুঁটে নাম—অর্থ কি?) গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র, 'গোরার' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এমন চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই, অন্য কোথায়ও আছে কিনা জানি না। ইনি ইচ্ছা শক্তির পূর্ণ অবতার—ইহার এক একটী কথা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, নিতান্ত যে কাপুরুষ তাহার মনেও সাহস এবং উৎসাহ জাগিয়া উঠে। জার্ম্মেন দার্শনিক Nietzsche যাহাকে Superman অতিমানুষ আখ্যা দিয়াছেন ইনি তাহাই। তাঁহার মতে তিনিই Superman, যিনি দৈহিক বলে শক্তিমান, মানসিক বলে শক্তিমান্, শক্তিপ্রয়াসী, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, প্রয়োজন হইলে যে নির্দ্দয়তা ও শঠতার

আশ্রয় গ্রহণ করিতে ও পরাঙ্মুখ নহে। আত্মাভিমান তাহার চরিত্রাংশ,—জীবন আনন্দময়, উপভোগ্য, ইহাই তাহার মটো motto তাঁহার মতে বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা মানুষকে দুর্ব্বল, ক্ষীণাঙ্গ, সর্ব্ববিষয়ে শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে। তাই তিনি বলিয়াছেন, যাহাতে শক্তির উন্মেষ হয়, সমাজে Superman সমূহের আবির্ভাব হয়, আমি তাহারই প্রচার করি। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ Nietzscheর দর্শন হইতে সন্দীপচন্দ্রের চরিত্রের আভাস পাইয়াছেন। ইনি তাহার Will to Powerর পূর্ণ অবতার। যাহা সে চায়, প্রাণের সহিত চায়, কোন বাধা বিঘ্ন মানিবে না, পরের দুঃখ কষ্টে তাহার মন গলে না, নিজের স্বার্থসাধন করিতে যাইয়া সৎ অসৎ কোনও কার্য্যেই পরাঙ্মুখ নহে। Nietzscheর নিনিই যত বিদ্বেষী হোন,—বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে তাহার শিষ্যানুশিষ্যের অভাব নাই। ইহারা শক্তি মন্ত্রের উপাসক। সন্দীপের ও চরিত্র নাই, শক্তি আছে। সে প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে জানে, তাই সে প্রভু,—তাহার ইচ্ছার বেগ সামলান কঠিন। সত্যের কথা উঠিতে সে নিখিলেশকে বলিতেছে, 'সত্য জিনিষটা ওর মনে একটা প্রেজুডিসের মত দাঁড়িয়ে গেছে। আমি ওকে কতবার বলচি যেখানে মিথ্যাটা সত্য, সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমি এই ধর্ম্মনীতিকেই জেনেছি, যে সত্য মানুষের লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।'

Nietzscheর মতে মানব সমাজে কতকগুলা নীতি নিয়ম ইত্যাদি অন্যায়রূপে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে, যেমন দয়া (Pity), ধৈর্য্য (patience) ইত্যাদি। ইহারা কতদূর মূল্যবান তাহা বিবেচনার বিষয় Transvaluation of valuesর, এ সকলের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের প্রয়োজন। বর্ত্তমান মানব সমাজে ও সাহিত্যে, গুণের বেশে অনেক মহাদোষ বিচরণ করিতেছে, যাহাদিগকে বন্ধু ভাবিতেছি ভাবিয়া দেখিতে গেলে তাহারা শত্রু। যাহাকে আমরা দয়া বলি, তাহা অনেক সময়ই দৌর্ব্বল্য, ধৈর্য্য অলসতার রূপান্তর। সন্দীপের কথায়, 'আমরা যাকে দয়া বলি, সে কেবল নিজের পরেই দয়া, পাছে নিজের দুর্ব্বল মনে ব্যথা লাগে সেই জন্যেই অন্যকে আঘাত করিতে পারি না—এই ত হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত।'

আমাদের দান অনেক সময়েই লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে, রমণীর সতীত্বকে এত উচ্চাসন দিয়াছি যে এক মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া তাহাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী করিয়া রাখিয়াছি, অপদার্থ অশিক্ষিত কুলপুরোহিতসমূহ পালনে আমাদের সমাজ গুরুভারে প্রপীড়িত, 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' নীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া একপ্রকার নগ্নতা ও অনশনকে আমরা বরণ করিয়া নিয়াছি—ইত্যাদি কত কি বলিব? সকল সমাজেরই, বিশেষতঃ আমাদের সমাজের অনেক বিষয়ে Transvaluation of valuesর দরকার। এই ভাব হইতে দেখিতে গেলে, সন্দীপের অনেক কথা যাহা প্রথমতঃ নিতান্তই বিসদৃশ মনে হয়, তাহা পরিষ্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হইবে। তাহার সঙ্গে একমত হওয়া অসম্ভব কিন্তু যেমন Nietzsche দর্শনে তেমন তাহার কথার ভিতর মাঝে মাঝে এমন খুব সত্য নিহিত রহিয়াছে যে ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যে অভিভূত হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখে Nietzscheর দর্শন প্রকারান্তরে প্রচার করিয়াছেন। রুশিয়ার সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডোষ্টয়েভ্স্কী তাহার Crime and Punishment নামক গ্রন্থের নায়ক Roskollnikoffর মুখেও সন্দীপের ন্যায় অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয়, চরিত্রসমূহ আমাদের সমাজের ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই যেন চিত্রিত॥ চেষ্টা করিলে সন্দীপকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, অমূল্যকেও, এমন কি বিমলা, বুঝি নিখিলেশকেও। বোধ হয়, একটু Natural স্বাভাবিক করিতে যাইয়া সন্দীপ চরিত্রের শেষভাগে কাপুরুষতার ঈষৎ কলঙ্ক অর্পিত হইয়াছে। হৌক, তাও এ চরিত্র ভীষণে মধুরে অপূর্ব্ব, অভিনব।

বঙ্গমাতার সুসন্তান রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে আর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরত্নে বঙ্গভাষা শোভিত হইল।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ঠাকুরমার চিঠি—শ্রীফণিভূষণ রায় বিরচিত।

প্রকাশক—সিটিলাইব্রেরী, ঢাকা,—মূল্য ১।০ আনা।

এই গ্রন্থে ঠাকুরমা এবং নাতিনীর সহিত পত্রালাপে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী, সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান স্ত্রীলোকের দায়িত্ব, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিবাহ পণপ্রথা, পোষাক আচার প্রভৃতি মেয়েদের এবং অভিভাবকদেরও অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার পদ্ধতি অতি সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক। এই গ্রন্থের ঠাকুরমা বৃদ্ধা হইলেও সেকেলে নহেন। তিনি বিংশ-শতাব্দীর ঠাকুরমা। তাঁহার পত্রে সেই মান্ধাতা আমলের রসিকতা নাই এবং সেই "কানুর গীতি"ও নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলকেই জানেন। সকলেরই ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থা এবং তদানুযায়ী নাতিনীকে উপদেশ দিতেও সঙ্কোচিতা নহেন। নাতিনীও আধুনিক সমাজের 'নাটক পড়া নবেল পড়া পালিশ করা' মেয়ে। তিনি যাহা ঠাকুরমার নিকট হইতে আদায় করিয়াছেন তাহা বিনা বিচারে হাবার মত হজম করিতে রাজি হন নাই। বিশেষ যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিয়া আজ-কালকার নব্যা নাতিনীদিগের ন্যায় জিনিসের কদর বুঝিয়া তারপর তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল বাদানুবাদ লেখকের হাতে সুন্দর জমিয়াছে। আমরা এই গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থকার কালে বঙ্গবাণীর কণ্ঠোপযোগী কোন স্থায়ী আভরণ গড়িতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা আছে। গ্রন্থের বহিরাবরণও বেশ মনোরম হইয়াছে। যাঁহারা ঠাকুরমা এবং নাতিনী তাঁহারা 'চিঠি'র রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হউন।

আলোক-কণা।

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

ইহা একখানি কবিতা পুস্তক। ইহার অনেক গুলি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে! ভাষা দুর্ব্বোধ্য বা অনন্বয় নহে। ছন্দের একটা অনাবিল গতি আছে। নবীন গ্রন্থকার বীণাপাণির চরণপঙ্কজে যে "অঞ্জলি" প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা সার্থক হউক।

সে কোথায়?

কতবার, কত মাস কত তিথি গত হায়।
তবুও পাই না তারে রহিয়াছে সে কোথায়?
হৃদয়-সাগর-নীর, কেমনে থাকিবে স্থির?
নিরাশার ঢেউগুলি কত কথা কয়ে যায়!
কত বার, কত মাস, কত তিথি গত হায়!

(২)

চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে, মলয় মধুর গায়!
পরাণ কাঁদিয়ে উঠে কি যেন কাহারে চায়?
প্রাণের দারুণ ব্যথা, হৃদিভরা যত কথা—
আকুলি ব্যাকুলি কবে নীরবে জানাব তায়!
আমি শুধু তারে চাই সে কিগো আমারে চায়!

(৩)

গভীর বিষাদে ঢাকা আজি এ মরম তল,
ঝরিয়ে গিয়েছে যত হৃদয়ের ফুলদল!
গগনে চাঁদিমা হাসে, আমারি এ হৃদাকাশে
হা হতাশে আসে শুধু আঁধার কেবল?
তার তরে ঝর্‌ঝরে ঝরে আঁখি-জল!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

ময়মনসিংহ সিটিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গের বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২৪ সন। | সপ্তম সংখ্যা।

আলেকজণ্ডারের ভারত আক্রমন।

(৩২৭—৩২৫ খৃঃ পূঃ)

আলেকজণ্ডারের ভারত বিজয় ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। বিংশতি সংখ্যক গ্রীক লেখক তাঁহার এই অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকে তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ছিলেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে আইসেন নাই; তাঁহারাও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। এই সকল লেখকদের সমস্ত রচনাই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পাঁচ জন গ্রীক লেখক ঐ সমস্ত রচনা অবলম্বনে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইঁহাদের গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই পাঁচ জন লেখকের মধ্যে এরিয়ান এবং কুরিটাস প্রধান।

আলেকজণ্ডার গ্রীসের অন্তর্গত মাকিডেন প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। আলেকজণ্ডারকে শৌর্য্য বীর্য্যের অবতার রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। আলেকজণ্ডার বাল্যকালে সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষ দর্শন জন্য তাঁহার হৃদয়ে বালসুলভ কৌতূহল উত্থিত হইয়াছিল, যৌবনে ও তাঁহার এই কৌতূহল নিবৃত্তি লাভ করে নাই। এই কারণ তিনি রাজপদ লাভ করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং পারস্য জয় করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হন।

আলেকজণ্ডার ৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দের বসন্তকালে ৫০।৬০ হাজার রণদক্ষ গ্রীক সৈন্যসহ ভারত সীমায় প্রবেশ করেন। তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে কাবুল এবং সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী কতিপয় ক্ষুদ্র জনপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। তৎসমুদয়ে বহুসংখ্যক বীর জাতির বাস ছিল। তাহারা সর্ব্বক্ষণ আত্ম কলহে নিরত থাকিত। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল জনপদের বর্ত্তমান নাম নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; এতৎ সমুদয়ে যে সকল অধিবাসী বাস করিত, বর্ত্তমান কালে তাহাদের পরিণতি কিরূপ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই। অধিকাংশ রাজ্যের অধিবাসীই আলেকজণ্ডারের ভয়ে ভীত হইয়া ধন, মান, প্রাণ রক্ষার্থ পল্লী ও নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা গ্রীক বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিরাপদ হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল; তত্রত্য অধিবাসীরা প্রচণ্ড তেজে গ্রীক বীরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অকাতরে যুদ্ধ করিয়া গ্রীক সৈন্যের হৃদয়ে বিভীষিকা উৎপাদন পূর্ব্বক অবশেষে শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল রাজ্যের একটির রাজধানী অতিক্রম করিবার সময় শত্রু হস্ত নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে আলেকজণ্ডার স্কন্ধদেশে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সৈন্যের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; তাহারা ঐ স্থানের বন্দীকৃত সমস্ত লোককে নিহত এবং ঐ রাজধানী ধূলিসাৎ করিয়া আপনাদের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করে।

এতদপেক্ষাও অমানুষিক কাণ্ড মাসগার অধিবাসী অশ্বকালীর সহিত যুদ্ধকালে সংঘটিত হইয়াছিল। অশ্বকালীরা বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং ত্রিশটি রণ হস্তী লইয়া আলেকজণ্ডারের বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হয়। মাসগা উক্ত অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীরূপে গণ্য ছিল। ইহা প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত এবং সুদৃঢ় দুর্গ কর্ত্তৃক রক্ষিত ছিল। আলেকজণ্ডার উৎকৃষ্ট সৈন্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মাসগা আক্রমণ করেন। এই সময় আলেকজণ্ডার পুনর্ব্বার শত্রু হস্ত নিক্ষিপ্ত শরে আহত হন। কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া অবিচলিত ভাবে সৈন্য পরিচালনা করিতে থাকেন। আলেকজণ্ডারের অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে উৎসাহিত হইয়া তদীয় সৈন্য অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। নয় দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর অশ্বকালী সৈন্য শত্রু সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাহাদের অধিপতি কালগ্রাসে পতিত হন, তাঁহার মহিষী ও শিশু রাজকুমার বন্দী হন। অতঃপর আলেকজণ্ডার বিজয়শ্রী লাভ করিয়া অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সাধন পূর্ব্বক স্বীয় নাম কলঙ্কিত করেন। সাত হাজার অন্য প্রদেশীয় বেতন ভোগী সৈন্য অশ্বকালী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। আলেকজণ্ডার জয়লাভ অন্তে এই সকল সৈন্য স্বীয়পক্ষ ভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। তাহারা প্রথমতঃ সম্মত হয়। কিন্তু পরে একজন বৈদেশিক রাজার পক্ষাবলম্বী হইয়া স্বদেশীয়দের রক্তপাত করা অধর্ম্ম জনক বলিয়া বিবেচনা করে। এজন্য তাহারা রাত্রি যোগে পলায়ন পূর্ব্বক আপনাদের বাস ভূমির অভিমুখে যাত্রা করে। আলেকজণ্ডার এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। আক্রান্ত সৈন্যদল আপনাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে মধ্যস্থলে রক্ষা করিয়া চক্রাকারে দণ্ডায়মান হয় এবং অধিক পরাক্রমে আততায়ী সৈন্যের প্রতিরোধ করিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে তাহারা শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে এবং অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা পূর্ব্বক শত্রুর তরবারিতে জীবন সমর্পণ করিয়া কীর্ত্তি মন্দিরে স্থান লাভ করে। প্লুটার্কের মতে আলেকজণ্ডারের এই কার্য্য তাঁহার বিমল যশোরাশিতে কলঙ্ক চিহ্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলেকজণ্ডার প্রথম এক বৎসর কাল প্রাগুক্ত ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহে অতিবাহিত করিয়া সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তক্ষশিলার অধিপতি অম্ভির সঙ্গে পূর্ব্বেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, এই কারণ তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আলেকজণ্ডার অম্ভিকে সে রাজ্যের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অম্ভি বিজেতার প্রসাদ লাভে প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগকে স্বর্ণ মুকুট উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। গ্রীক সৈন্যের জন্য প্রচুর আহার্য্য প্রদত্ত হইল। ফলতঃ রাজা অম্ভি আলেকজণ্ডারের অনুগ্রহ ভাজন হইবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট বদান্যতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু কৌশলজ্ঞ আলেকজণ্ডার তাঁহাকে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে তদপেক্ষা অধিক বদান্যতা প্রদর্শন আবশ্যক বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদর্থে তিনি অম্ভির সমস্ত উপহার দ্রব্য প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য ভোজন পাত্র, পারস্য জাত অগণিত পরিচ্ছদ, ত্রিংশৎ সংখ্যক সুসজ্জিত অশ্ব এবং সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দিলেন। আলেকজণ্ডারের কর্ম্মাধ্যক্ষ বৃন্দ তাঁহার তাদৃশ বদান্যতা দর্শনে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু এই উপায়ে পঞ্চ সহস্র রণ নিপুণ যোদ্ধা লব্ধ হইল। অম্ভি রাজার বশ্যতা চির সৌহৃদ্যে পরিণত হইল, ভারত অভিযান কালে বহু সহায়তা লাভের পথ পরিস্কৃত হইল। সেকালে তক্ষশিলা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজ্যরূপে গণ্য ছিল। তাদৃশ পরাক্রান্ত রাজ্যের অধিপতি অম্ভি সহজে গ্রীক বীরের নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্ময় জন্মিতে পারে; কিন্তু ঈর্ষ্যা এবং পররাজ্য লালসা তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়াছিল। তিনি প্রখ্যাত নামা বীরের সাহায্যে আপনার শত্রু পুরু রাজা এবং অভিসারাধিপতির বিনাশ সাধন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন।

আলেকজণ্ডার অম্ভি রাজার বশ্যতা দর্শনে পুরু রাজারও তদনুকরণ সম্বন্ধে আশান্বিত হন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বশ্যতা জ্ঞাপনার্থে আগমন করিতে আহ্বান করেন। এতদুত্তরে পুরু * সদর্পে লিখিয়া পাঠান, আমি আপনার

* পুরু সম্ভবতঃ পৌরব শব্দের অপভ্রংশ। পৌরব বংশীয় নরপতি বলিয়া এই উপাধি ছিল। ইহা নাম নহে।

দর্শন লাভ জন্য আমার রাজ্যের সীমান্তে গমন করিতেছি, তবে আমার সঙ্গে সৈন্য থাকিবে এবং তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে।

মহাবীর আলেকজণ্ডার এই তেজোগর্ব্ব উত্তর প্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজপুরুষ রাজ্য (বর্ত্তমান ঝিলাম গুজরাট ও সাপুর জেলা) অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিক্রম কেশরী পুরুবিজয় বা মৃত্যুর জন্য কৃতসংকল্প ৫০ হাজার সৈন্য, ৩ শত রথ এবং ২ শত রণহস্তী সমভিব্যাহারে গ্রীক সৈন্যের গতিরোধ জন্য বিতস্তার তীরে আগমন করিলেন। আলেকজণ্ডার তাদৃশ বিপুল সৈন্য সমারোহ দেখিয়া ভীত হইলেন; কিন্তু অচিরে আশ্বস্ত হইয়া সুকৌশলে শত্রুসৈন্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নদী অতিক্রম করিলেন। মহারাজ পুরু ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অসংখ্য সৈন্য, হস্তী ও রথ সহ গ্রীকবাহিনীর সম্মুখে আসিয়া বীরদর্পে দণ্ডায়মান হন। বর্ত্তমান চিনিয়া-বালার অদূরে গ্রীক ও হিন্দু সৈন্যে প্রবল যুদ্ধ ঘটে। মহারাজ পুরু ২০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, তিনশত রথ, দুইশত রণহস্তী এবং ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্য সহ আলেকজণ্ডারের গতিরোধ জন্য অভিযান করিলেন। তারপর একটি কর্দ্দমশূন্য বালুকাবিশিষ্ট সুদৃঢ় প্রান্তরে উপনীত হইলেন। মহারাজ পুরু ঐস্থান অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালন জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই কারণ সেখানে হিন্দু সৈন্যের ব্যূহ রচিত হইল। প্রথম শ্রেণীতে পদাতিক সৈন্য স্থাপিত হইল, এই শ্রেণীর অগ্রভাগে মাঝে মাঝে রণহস্তী দণ্ডায়মান রহিল। গ্রীক অশ্বারোহী সৈন্যের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যেই রণহস্তী সকল সম্মুখভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। পুরুর বিশ্বাস ছিল যে, রণহস্তীর ভয়ে কি পদাতিক, কি অশ্বারোহী, গ্রীক সৈন্য মাত্রেই হিন্দু সৈন্যের উপর পতিত হইতে সাহসী হইবে না। রণহস্তী সকলের পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া পদাতিক সৈন্য স্থাপিত হইল, পদাতিক সৈন্যের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মুখ ভাগে রথসমূহ সজ্জিত হইল। মহারাজ পুরু রণহস্তীর সাহায্যেই গ্রীক সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরিয়ান লিখিয়াছেন যে, রণহস্তীর দোষেই পুরুর সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং গ্রীক সৈন্য জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমরা এরিয়ান প্রদত্ত বিবরণের সার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

রণহস্তী সকল অল্পপরিসর স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হওয়াতে তাহাদের পদমর্দ্দনে শত্রু মিত্র সকলেই বিধ্বস্ত হইতেছিল। ইহার ফলে বহুসংখ্যক হিন্দু সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক হস্তী পরিচালক শত্রু নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, অনেক হস্তীও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অনেক হস্তী সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; এই কারণ রণহস্তীর শ্রেণী ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহারা শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই মর্দ্দন করিতেছিল, গ্রীক সৈন্য অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থানে অবস্থান করিতেছিল; এই কারণ তাহারা হস্তীর আক্রমণ কালে দূরে সরিয়া যাইতে পারিতেছিল, কিন্তু হিন্দু সৈন্যের মাঝে মাঝে রণহস্তীর দল স্থাপিত থাকায় তাহারা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। এই ভাবে বহু হিন্দু সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারপর রণহস্তী সকল সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া শক্তিহীন হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে; তখন রণকৌশলজ্ঞ আলেকজণ্ডার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা হতাবশিষ্ট হিন্দু সৈন্য পরিবেষ্টন করিলেন। ইহার ফলে তাহারা বায়ুমুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় উড়িয়া যায়। রণক্ষেত্রে বীরশ্রেষ্ঠ পুরু এবং তদীয় সেনানীবৃন্দ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই বিজয় লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। পুরু পরাজিত হইয়া বন্দী হন, তাঁহার দুই পুত্র রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন এবং বার হাজার হিন্দু সৈন্য অসিহস্তে রণশায়ী এবং নয় হাজার শত্রুহস্তে ধৃত হয়। গ্রীক সেনাপতি বন্দীকৃত পুরুরাজকে আলেকজণ্ডারের সমীপে আনয়ন করেন। গ্রীকাধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এক্ষণ আমার নিকট কি প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিতেছেন? মহারাজ পুরু উত্তর করেন, রাজার মত। আলেকজণ্ডার পূর্ব্বেই তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশল দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার তাদৃশ তেজোগর্ব্ব বাক্যে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। তিনি মহারাজ পুরুর ন্যায় পুরুষসিংহের সহিত শত্রুতা রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া

তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন পূর্ব্বক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেন। মহারাজ পুরুর সহিত মিত্রতা স্থাপন এবং আপনার জয় চিহ্নস্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে নিকা নামক একটি সহরের প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেকজণ্ডার পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হন।

অতঃপর তিনি পুরুর রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী গ্লউসাই নামক রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক চন্দ্রভাগা অতিক্রম করিলেন এবং পুরুর ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঈদৃশ বিপদপাতে দেশাধিপতি দূরতর স্থানে প্রস্থান করিলেন। আলেকজণ্ডার আহার্য্যাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া দেশাধিপতিকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে ইরাবতী তটে উপনীত হইলেন এবং ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া অদর-ইস-তাই জাতির রাজধানী পিমপ্রমা নগরী অধিকার করিলেন। এইস্থানে একদিন সসৈন্যে বিশ্রাম করিয়া সাংগানা নামক স্থানে গমন করিলেন এবং সেখানে প্রবল যুদ্ধে পরাক্রমশালী কাথাই জাতিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। আলেকজণ্ডার সাংগানা পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং শতদ্রু তীরে উপনীত হইলেন।

এই সময় তদীয় সৈন্য অনবরত যুদ্ধ ও পরিভ্রমণ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি মগধ ও গঙ্গারাঢ়ি রাজ্যের বিপুল সৈন্য বলের জনশ্রুতি তাহাদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। এ কারণ তাহারা আর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইল এবং অশ্রুসিক্তলোচনে বিলাপ করিতে করিতে আলেকজণ্ডারকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিল। আলেকজণ্ডার গ্রীক সৈন্যের অবসন্ন প্রাণে তেজ ও উৎসাহের সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে অপূর্ব্ব বাগ্মীতার অবতারণা করিয়া জয়শ্রী লাভে তাহাদের জীবন কিরূপ গৌরবোজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিলেন, সমগ্র এসিয়ার ধনসম্পদ তাহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইবে বলিয়া প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার সে অপূর্ব্ব বাগ্মীতা ব্যর্থ হইল, গ্রীক সৈন্য নীরব রহিল। তারপর অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনেতা কইনস সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সাহস সহকারে ধীর বচনে বলিতে লাগিল, পরিশ্রম করিবার এবং বিপদের সম্মুখীন হইবার শক্তি সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক, যে সকল গ্রীক সৈন্য আট বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নববিজিত দেশের অধিবাসী হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা রোগ শয্যায় কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আপনার রণপতাকার অনুসরণ জন্য যাহারা এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহারা পরিশ্রান্ত, রুগ্নদেহ এবং অবসন্ন। বিজয়শ্রীর প্রসন্নতা লাভ কালে সংযম প্রদর্শন অতীব প্রশংসনীয়; আপনি এইরূপ শৌর্য্য বীর্য্যশালী সৈন্যের অধিপতি, এজন্য আপনার শত্রু ভয় নাই; কিন্তু পরমেশ্বরের অসন্তোষের গতি মানব বুদ্ধির অগম্য, তাহার অবরোধ অসাধ্য। কইনসের বাক্যে সমবেত সৈন্যমণ্ডলী হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। বিজয়শ্রীর তাদৃশ অপরিমেয় প্রসন্নতা লাভেও আলেকজণ্ডারের লালসা পরিতৃপ্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল; এজন্য তিনি সৈনিক বৃন্দের ঐরূপ মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং অনন্যোপায় হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

আলেকজণ্ডার শতদ্রু নদীর তীরে দ্বাদশটি প্রকাণ্ডকায় স্তম্ভ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপন আগমন চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করেন, এই দ্বাদশটি স্তম্ভ দ্বাদশ জন গ্রীক দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সে উৎসর্গ ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পাদিত হয়। ঐ সকল স্তম্ভ বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মনে মহাবীর আলেকজণ্ডারের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছিল, তাহাদের হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিত। অনেক লোক সেখানে পূজা ও বলিদান করিয়া আপনাদের হৃদগত ভয় ও বিস্ময়ের পরিচয় দিত।

আলেকজণ্ডার ভারত পরিত্যাগ করিবার জন্য সংকল্প করিয়া আপন অধিকৃত অংশের শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের শাসনভার মহারাজ পুরুর হস্তে অর্পিত হয়। এই প্রদেশ সাতটি স্বতন্ত্র জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এবং দুই হাজার নগরে পূর্ণ ছিল। সিন্ধু এবং বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের শাসন ভার তক্ষশিলার অধিপতি অম্ভি প্রাপ্ত হন। পুরু এবং

অস্তির মধ্যে যে ঘোর মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল, আলেকজণ্ডার তাহা দূরীভূত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে সখ্য স্থাপন করেন এবং সে সখ্য সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। গ্রীক সেনাপতি পিথিয়ান পঞ্চনদের মুখস্থিত ভূমির প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার পদ লাভ করেন। সিন্ধুনদের পশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশের জন্য সিলিকস নামক একজন গ্রীক সেনাপতি নিযুক্ত হন।

আলেকজণ্ডার এই ভাবে বিজিত স্থান সমূহের শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া বিতস্তার তীরে উপনীত হন এবং এখান হইতে জলপথে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে অভিলাষী হইয়া বিপুল নৌবহর সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি নৌবহর রক্ষার্থ বিতস্তার দুই পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া সৈন্য গমনের আদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে জলযানে আরোহণ করিয়া যাত্রা করেন। তাঁহার এই যাত্রার দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল; বিতস্তার দুই তীরের পথ অবলম্বন করিয়া সুসজ্জিত গ্রীক সৈন্য গমন করিতেছিল। নাবিকদের মধুর গীতি ধ্বনিতে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিতেছিল, অসংখ্য দর্শকের আগমনে চারিদিক আন্দোলিত হইতেছিল, সমস্ত মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই মনোহর দৃশ্য স্থায়ী হইতে পারে নাই; ভারতবর্ষীয়গণ কর্ত্তৃক তাঁহার নৌযাত্রার গতি পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আলেকজণ্ডারের নৌ-বহর বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগার সঙ্গম স্থলে উপনীত হইলে তিনি সিবি এবং আগলাইস জাতিদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, তাহারা বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে। অতঃপর আলেকজণ্ডার চন্দ্রভাগা এবং ইরাবতীর তীরে আগমন করেন, এই স্থানে স্থলপথগামী সমস্ত সৈন্য আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়। এই সময় ঐ প্রদেশের অধিবাসী মালই জাতি আরো কতিপয় জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রচণ্ড পরাক্রমে আলেকজণ্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের সহিত আহবে তিনি আহত হইয়াছিলেন। এই আঘাত এতদূর গুরুতর হইয়াছিল যে তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর জনরব পর্য্যন্ত ঘোষিত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বাহুবলে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করেন, সিন্ধুনদে তাঁহার নৌ-বহর উপনীত হয়। এখানে তিনি মৌসিকানস রাজার রাজ্য অধিকার করিলেন। মৌসিকানস আলেকজণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেই মৌসিকানস তাঁহার অধীনতা পাশ উন্মোচন জন্য উত্থিত হন। আলেকজণ্ডার অচিরে তাঁহার দমন করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। অতঃপর অক্সিকোনস এবং সাম্বোস নামক অধিপতিদ্বয় তাঁহার নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন করেন। এই সময় আলেকজণ্ডার তদীয় সৈন্যের একাংশ সেনাপতি ক্রেটারসের নেতৃত্বে স্বদেশ প্রেরণ করিয়া নিজে অপরাংশসহ পাটালা নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থান হইতে তিনি জল-যানে আরোহণ পূর্ব্বক পশ্চিম শাখা অবলম্বন করিয়া সিন্ধু সাগর সঙ্গমে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার পাটালায় উপনীত হন। এইবার তিনি পূর্ব্বশাখা পরিদর্শনার্থ যাত্রা করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দের অক্টোবর মাসে স্বদেশে গমন জন্য উদ্যোগী হন। আলেকজণ্ডার সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরের প্রতিনিধি ফিলিফসের হস্তে নব বিজিত প্রদেশের ভারও অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষের সীমা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বেলুচিস্থানের মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে গিয়াছিলেন; অবশিষ্ট সৈন্য সেনাপতি নিয়ারকসের নেতৃত্বে সিন্ধুনদের মোহানা হইতে সমুদ্র পথ অবলম্বন করিয়াছিল। *

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

* 1. Ancient India, Its Invasion by Alexander the Great (Mc. Crindle)
2. Ancient India [R. C. Dutt.]
3. Ancient India [Vincent A Smith]
4. Ancient India [Rapson]
5. Intercourse Between the Western World and India. [Rawlinson]
6. ভারতে অলিক সন্দর (শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী)
7. Antiquities of India (L. D. Barnett)

সৌরভ।

১

সৌরভে ডুবিল বঙ্গ,—আবার সৌরভ ?
আর অই ভস্ম ছাই, চাহিনা চাহিনা ভাই,
চাহিনা ধ্বংসের আর পথ অভিনব !
জেস্‌মিন যূথী বেলা, বাজারে রয়েছে মেলা,
নন্দনের পারিজাত গন্ধ পরাভব,
আতর এসেন্স কত, গন্ধ তেল শত শত,
গোলাপ চম্পক জবা পুষ্পসার সব।
কত আছে খস্ খস্ প্রাণতোষ মনোতোষ।
তথাপি কি আপশোষ পূরেনি বান্ধব ?
সৌরভে ডুবিল বঙ্গ,—আবার সৌরভ ?

২

বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে,—অধঃপাতে যায় !
ঘরে নাহি মুষ্টি অন্ন, অনশনে অবসন্ন,
বিকাইয়া ভিটামাটী গেছে ঋণ দায়
তথাপি অট-ডি-রোজ, মাথা চাই রোজ রোজ,
পিয়ারের প্রিয় সোপ মাখা চাই গায়।
কেশ শূন্য গ্রীবামূল, ভালে শোভে দীর্ঘ চুল,
পশু বুদ্ধি বঙ্গ-যুবা পশুরাজ প্রায়,
বেড়াইছে মহানন্দে, কেশরের তৈলগন্ধে,
পুষ্পবন দ'ল এল এমনি বুঝায় !
বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে—অধঃপাতে যায় !

৩

বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে—রসাতলে যায়।
পথের মজুর কুলি, অভুক্ত সন্তান ভুলি,
চায়ের পেয়ালা পিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় !
কোথা গয়া বিষ্ণুপুর, কোন্ দিকে কতদূর,
অম্বুরী তামাক তার চাষা কিনে খায়,
সুগন্ধি জর্দা সুর্ত্তি, না হলে হয় না স্ফূর্ত্তি,
সোণার তবকে—মাখা মৃগ মদিরায় !
হাভেনা মেনিলা কই, জানিনি ত নাম বই,
কোথা বা সে আমেরিকা স্বপনের প্রায়,
তার সিগারেট ছাড়া, ধূম নাহি পিয়ে তারা,
কে জানে ইহার বাড়া পতন কোথায় ?

৪

সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল।
ভিখারীর ভাঙ্গা ঘরে, লেস্‌পেড়ে শাড়ী পরে,
সেমিজে কামিজে গাউনে উড়ে পরিমল !
সুগন্ধি সিন্দুর ভালে, সুগন্ধি পাউডার গালে,
সুগন্ধি বর্ণকে রাঙ্গে অধর যুগল,
সুগন্ধি আল্‌তা পায়, ফোটে যেন আঙ্গিনায়,
শরত প্রভাতে হায় রক্ত শতদল !
এ পরী পোষিতে গিয়া, কত ঘর দেউলিয়া,
নীরবে নিশীথে ঝরে কত অশ্রুজল !
সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল !

৫

বিলাসে ব্যাকুল বঙ্গ যায় রসাতল,
নাহি সেই ব্রহ্মচর্য্য, নাহি সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য,
স্কুলের বালক-বাবু অধিক পাগল !
সোণার চস্‌মা নাকে, এসেন্সে ডুবিয়া থাকে,
ফুলবন-ফেরা যেন প্রজাপতি দল !
শান্তনু রাজার মত, দিবাস্বপ্ন দেখে কত,
জড়াইয়া ধরে যেতে গঙ্গার অঞ্চল !
স্কুলের বালিকা ছাত্রী, পূর্ণিমা রজত রাত্রি
উছলিয়া ছুটে যেন চকোরী চঞ্চল,
হার্ম্মোনিয়মের গানে, পিয়ানোর তানে তানে,
কুটীরে কাঁপায়ে তোলে পিক কোলাহল !
তারাও স্বপন গড়ে, কেহ দীঘি, সরোবরে,
সাঁতারে প্রতাপ সহ—কাঁপে নীল জল,
ও নীল জলের ঢেউ, দেখেছে, বুঝেছে কেউ ?
তরঙ্গে কলঙ্ক কত হাসে খলখল !
এ পাখী পিঞ্জরে হায়, আর না কি রাখা যায় ?
সে নাকি পরিতে চায় চরণে শৃঙ্খল ?
শীতে কুক্কুরের মত, প্রহরে প্রহরে কত,
ফুকারে ফতুর পতি—আঁখি ভরা জল !
বিলাসে ব্যাকুল বঙ্গ—যায় রসাতল !

৬

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহ মুগ্ধ মন,
গ্রীষ্মের পানীয় তার, সোডা লেমন্ ওয়াটার,
হয়না বরফ বিনা পিপাসা বারণ !

সুগন্ধি সিরাপ্ নানা, কুলপী ও দধিপানা,
আরো কত নাহি জানা, সুধা অতুলন
চা ও চকোলেট্ কফি, তাও চলে পুনরপি,
বিস্কুট ব্রেড্ টোষ্ট্ মাখিয়া মাখন!
মোটা কোট সদা গায়, পশমের মোজা পায়,
শীত গ্রীষ্ম বুঝা দায় দেখি আচরণ,
মেরু কিম্বা মরুবাসী—অতি দুঃখে পায় হাসি!
কে চিনে এ নব জীব দেখিয়া লক্ষণ!
সদা মত্ত উপন্যাসে, নানা গল্পে—সর্ব্বনাশে,
"ভিতরে বাহিরে" ভাসে পাপের প্লাবন,
অবাধ মিলনে আজ, ধর্ম্মের সে পেশোয়াজ,
উড়াইছে অঙ্গনার মত্ত সমীরণ!

৭

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহে অচেতন,
চাহিয়া দেখেনা পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন!
কোথা ধর্ম্মে অনুরক্তি, কোথা সে বিশ্বাস ভক্তি,
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন,
কোথা সেই শমদম, সকল সহনক্ষম,
কোথা সেই জ্ঞান বীর্য্য ইন্দ্রিয় দমন!
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, কোথা সেই নরনারী,
কোথা সেই কর্ম্মশক্তি কোথা দৃঢ়পণ,
কোথা সেই একাগ্রতা, কোথা সেই নির্ভীকতা,
উদ্যম উৎসাহ কোথা দীপ্ত হুতাশন!
কোথা সে প্রচণ্ড রাহু, প্রসারিয়া বজ্র বাহু,
নাশিতে গ্রাসিতে পারে জ্বলন্ত তপণ,
কোথা আছে সে মহত্ব, কার আছে পুরুষত্ব,
ক্লীবত্ব পেয়েছে পার্থ কুন্তীর নন্দন!
সকলি বিলাসে ভোর, নাহি কারো গায়ে জোর,
প'ড়িলে বিপদে ঘোর কাঁপে কলেবর,
ব্যাপিয়া সারাটা বঙ্গ, কেবল-ই * * * *
তাহারি ঔষধ খোজে—তারি বিজ্ঞাপন!
এ নহে কুৎসিত কথা, এ ত নহে অশ্লীলতা,
এ যে গো জাতির এক বীভৎস মরণ,
কেহ না ভাবিছে তায়! এ বিলাস দ্রব্যে হায়,
দিতেছে প্রশংসা পত্র অপদার্থগণ!

৮

যারা আনে হেন মৃত্যু—মহা স্বার্থপর
দেশের পরম শত্রু পাপিষ্ঠ বর্ব্বর!
যারা আপনার বংশ, স্বজাতির করে ধ্বংস,
পিশাচ রাক্ষস ক্রূর লুব্ধ নিশাচর,
সামান্য ধনের আশে, বিনাশিছে অনায়াসে,
জাতীয় জীবন, শক্তি, স্বাস্থ্য, কলেবর,—
আপন জাতির জন্য, গড়িছে অভাব দৈন্য,
করিছে আনন্দ শূন্য সংসার সুন্দর,
স্বজাতির রক্তপায়ী, আত্মঘাতী আততায়ী,
হরিয়া দেশের ধন, যে দস্যু তস্কর,
ভিক্ষাপাত্র দেয় হাতে, দেশ দেয় অধঃপাতে,
পদাঘাতে কর তার পিষ্ট কলেবর,
সে যে গো দেশের শত্রু—মহা ভয়ঙ্কর!

৯

এ যে তীব্র বিষ বাষ্প—সৌরভ এ নয়,
এ নহে বিলাস দ্রব্য,—কালকূট চয়!
ঘ্রাণে এর জ্ঞান হরে, স্পর্শে পরবশ করে,
জীবন্ত জাতির মৃত্যু—চির পরাজয়!
এ যে তীব্র বিষ বাষ্প—সৌরভ এ নয়!

১০

পার যদি আন বন্ধু করিয়া চয়ন,
সে দিব্য অমৃতগন্ধ—মৃত সঞ্জীবন!
তেজ বীর্য্য মহিমার, আন সেই পুষ্পসার,
অতীত সে অযোধ্যার—সৌভ্রাত্র জীবন,
চিতোরের গিরি ঘাটে, পাইবে চিতার কাঠে,
নন্দন চন্দন গন্ধ বহে সমীরণ!
ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মভূমি, কর্ষিয়া ধর্ষিয়া তুমি,
সে বীর্য্য বীরণমূল কর উত্তোলন,
হোমধূম গন্ধ মাখা, কৌমুদী—কলঙ্ক ঢাকা,
আহরিয়া আন সেই ঋষির জীবন!
পদ্মিনী চিতার ছাই, সুগন্ধি পাউডার তাই,
রমণী রঞ্জিতে দেও চারু চন্দ্রানন,
"কর্ম্মের" সে মর্ম্ম-ঝরা, সতীত্ব গৌরব ভরা
সে সৌরভে সির রচ—সীমন্ত লোচন!

যে সৌরভে যাজ্ঞসেনী, বান্ধিলা বিমুক্ত বেণী,
দেও সে আনিয়া পুণ্য কেশ-প্রসাধন,
সে নব "কুন্তল বৃষ্য," বিস্ময়ে দেখিবে বিশ্ব!
শিহরিয়া পারিজাত বসিবে নন্দন!
বিলাস-রাক্ষস রক্ত, হইবে নব অলক্ত,
আনন্দে পরিবে পায় পুর নারিগণ,
হে বন্ধু পারফিউমার, কি কব অধিক আর,
তাজ স্বার্থ, রচ শয্যা ভীষ্মের শয়ন।
এ উগ্র তৃষ্ণার বারি, নহে যোগ্য স্বর্ণ ঝারি,
পুণ্য ভোগবতী পুনঃ কর উত্তোলন,
যাবে দুঃখ যাবে তাপ, যুগান্তের অভিশাপ,
সকল সন্তাপ জ্বালা হইবে বারণ!

১১

এ বিলাসে এ সৌরভে জাগে মৃত প্রাণ,
নব আশা অনুরাগে, নূতন চেতনা জাগে,
জাগে সে জাতীয় গর্ব্ব স্পর্দ্ধা অভিমান!
জেগে উঠে কর্ম্মশক্তি, অচল বিশ্বাস ভক্তি,
আবার জ্বলিয়া উঠে জীবন নির্ব্বাণ,
এ গন্ধ অমৃত শ্বাসে, বিশল্যকরণী বাসে,
উঠে দন্তে লাফাইয়া নাড়ী মজ্জমান!
আলস্য জড়তা ভয়, মোহ অপগত হয়,
সকল অভাব দৈন্য হয় অবসান!
তোমার "সৌরভ" কি সে আনন্দ কল্যাণ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

চন্দ্রলোকে অগ্ন্যুৎপাত।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমণ্ডল জ্যোতির্ব্বিদগণের একটী কৌতূহলপ্রদ পরীক্ষার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনেককাল পর্য্যন্ত এই পরীক্ষা এক-দিকে যেমন আমোদপ্রদ অন্যদিকে তেমনই নিরাশজনক বলিয়া বোধ হইতেছিল। দূরবীক্ষণের সাহায্যে অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণ যত বড় দেখায়, খোলা চক্ষেই চন্দ্রকে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বড় দেখায়। ইহার কারণ চন্দ্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে হয়ত জ্যোতির্ব্বিদগণ তাঁহাদের পরীক্ষাকার্য্য এই নিকটতম প্রতিবেশীর উপরই খুব কৃতিত্বের সহিত চালাইয়া থাকেন এবং সফল কামও হন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গেলিলিওর অল্পশক্তি সম্পন্ন দূরবীক্ষণেই চন্দ্রমণ্ডলের উপরিস্থ পাহাড়, পর্ব্বত, উপত্যকা, সমতলক্ষেত্র, এবং আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ গহ্বর প্রভৃতি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইত। আরও বেশী শক্তি সম্পন্ন দূরবীণে যে এইগুলি আরও বর্দ্ধিতায়তনে দৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে পূর্ব্বে চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগে যে সকল স্থান সমুদ্র বলিয়া কথিত হইত তাহা বাস্তবিক সমুদ্র নহে সমতলক্ষেত্র।

লর্ড রসের সুবৃহৎ দূরবীণে চন্দ্রকে আমাদের পৃথিবী হইতে ৪০ মাইল নিকট আনিয়া রাখে। ৪০ মাইল দূরের কোন জিনিষ খোলা চক্ষে যত বড় দেখায় চন্দ্রকে সেই অনুপাতে ৬০০০ হাজার গুণ বড় এবং ততোধিক উজ্জ্বল দেখায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে সুবৃহৎ পর্ব্বতমালা এবং তাহাদের ছায়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনশীল প্রস্তর এবং মৃত্তিকাস্তূপাদি দেখিতে পাওয়া যায়। যন্ত্রের সাহায্যে এ গুলি খুব ছোট দেখাইলেও প্রকৃত পক্ষে এ গুলি খুব প্রকাণ্ড জিনিষ। কোনটা সাধারণ সমতলে এবং কোনটা আগ্নেয়গিরির মুখস্থিত সমতলে অবস্থিত। যে যে ক্রমিক পরিবর্ত্তনে চন্দ্র তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে সেই সকল ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থারও অনেক উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

এই সকল পরীক্ষা যতই কেন কৌতূহলোদ্দীপক হউক না জ্যোতির্ব্বিদগণ কিন্তু তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য চন্দ্রকে পরীক্ষা করেন না। কোন প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে না পারিলে জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহাকে পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন। ক্রমিক ও ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন, উন্নতি বিকাশ ও ধ্বংশ প্রভৃতির ভিতরই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রহস্য নিহিত আছে।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী যাবৎ জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ গভীর গবেষণার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন ও চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগের বহু মানচিত্র সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে প্রস্তুত করিতেছেন। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার জন্য এবং চন্দ্রমণ্ডলস্থ গিরিগুহা, পর্ব্বত-শির-গহ্বর, সমতল, বিভিন্ন পর্ব্বতমালা এবং উপত্যকাদির বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ জন্য অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র যে চির নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরি অথবা সন্দেহ জনক আগ্নেয় গিরি সমূহের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু তাহা এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই।

আমরা হিন্দু, আমাদের ধারণা চন্দ্রলোকেই আমাদের পিতৃগণের বাস। পুরাণে আছে অম্বরিষকে ব্রহ্মশাপ দিয়া দুর্ব্বাসা মুনি সুদর্শন কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে বিচরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রে লোকবাসের ধারণা এদেশের ন্যায় সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান। সেই জন্য চন্দ্রাধিষ্ঠিত জীবগণের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াই জ্যোতিষিগণ চন্দ্রমণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

চন্দ্রে মানুষ আছে, এ ধারণা সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হর্শেলের নিজেরও বলবতী ছিল। তাই তিনি প্রাকৃতিক ও ঋতুগত বৈষম্য দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে—চন্দ্রমণ্ডলের জীব সমূহ পৃথিবীস্থ জীব সমূহের ন্যায় নহে। স্যার জন হর্শেল যখন কেপটাউন হইতে চন্দ্রমণ্ডলের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তখনও চন্দ্রে লোকস্থিতি নিরূপণের আশা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর উৎকৃষ্টতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজের কল্পনা হইতে এ ধারণা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

আমরা চন্দ্রলোকে যাইয়া যদি দূরবীক্ষণের সাহায্যে পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতাম, তবে পৃথিবীর উপরিভাগে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইতাম। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে যে সকল চিরতুষারময় স্থান আছে—সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ গতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকের তুষার রাশি যে গলিয়া যায় ও অন্যদিকের জমাট বাঁধিয়া যায় এবং তাহাতে যে মেরু প্রদেশের আয়তনের সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধি হয়—তাহা দেখিতে পাইতাম। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয়, সাহারা ও আরব মরুভূমি, উত্তর আমেরিকা ও সাইবেরিয়ার সমতল ক্ষেত্র, বিভিন্ন সমুদ্র, বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ সুবৃহৎ জঙ্গল ও পর্ব্বত বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন রংএ রঞ্জিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিত এবং এই পরিবর্ত্তন আমাদের চক্ষে রহস্যময় বলিয়া বোধ হইত।

চন্দ্রমণ্ডলের উপরি ভাগেও এই প্রকার বহু রঙের স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সাদা রঙের স্থান ও আছে। চন্দ্রে যদি জল থাকিত তবে আমরা অনুমান করিতে পারিতাম যে ঐ স্থান গুলিতে বরফ জমিয়াই এমত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে চন্দ্রে জলও নাই বায়ুমণ্ডলও নাই। চন্দ্রের কোন কোন স্থান গাঢ়কাল, কোনও স্থান নীল সবুজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঞ্জিত। কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যে রঙের সাময়িক পরিবর্ত্তন ঘটে চন্দ্রমণ্ডলে সেরূপ কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

তবে পৃথিবীর উপরি ভাগের কোন কোন পরিবর্ত্তনের ন্যায় চন্দ্রের উপরি ভাগেও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। হয় ত আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গম ইত্যাদির ন্যায় কোন পরিবর্ত্তন চন্দ্রে হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন ও অগ্ন্যুদ্গম পৃথিবীর আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গম হইতে অনেক বেশী পরিমাণে হয়। পৃথিবীর ছোট ছোট আগ্নেয়গিরি হইতে যে আগ্নেয়-ক্রীড়া হয়, তাহা চন্দ্র হইতে দূরবীণের সাহায্যে প্রতীয়মান হওয়া সম্ভব নহে। কেননা সেই সকল আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে যে সকল ধাতু নিস্রব ও ভস্মাদি বহির্গত হয় তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় না। তবে কোন কোন বৃহৎ আগ্নেয়গিরির চতুর্দ্দিকে বহু মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে ভস্মাদি পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। সেই সকল বিস্তৃত স্থান চন্দ্র হইতে দূরবীণের সাহায্যে প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নহে। পৃথিবীর উপরি ভাগের কোন কোন স্থান ভূমিকম্পেও আবার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তবে এই গুলি অতি বিরল। চন্দ্রেও যদি পৃথিবীর মত এত বিরল ভূমিকম্প হইয়া থাকে, তবে এ গুলি লক্ষ্য করা বড়ই দুরূহ।

কিন্তু বড় বড় দূরবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে ও অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে পৃথিবীতে যেমন আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের উৎপাত চলিতেছে, চন্দ্রে তাহা অপেক্ষাও গুরুতর রূপে এই সকল কাণ্ড চলিতেছে। চন্দ্রের উপরিস্থ পর্ব্বতমালা পৃথিবীস্থ পর্ব্বতমালার তুলনায় ৪১৫ গুন বড়। কেবল ইহাই তাহার আনুপাতিক আভ্যন্তরিক শক্তির পরিচায়ক নহে। সমস্ত চন্দ্রমণ্ডলেই চূড়াভাঙ্গা মঠের মত উচ্চ উচ্চ স্থান অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এ গুলি আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ-গহ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবিজ্ঞ হুক অনেক দিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, চন্দ্রমণ্ডলের উপরি ভাগে আমরা ইহার ভিতরকার অগ্নির ও নানা জাতীয় বাষ্পের ক্রিয়া দেখিয়া থাকি। তিনি খড়ি মিশ্রিত গাঢ় কর্দ্দমের সাহায্যে নানা প্রকার পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন যে, এ গুলি উত্তপ্ত করিয়া শীতল করিলে চন্দ্রের উপর যে সকল আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখগহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মত অনেক গহ্বর হয়। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এক সময়ে চন্দ্র খুব উত্তপ্ত জলীয় মিশ্রণ ছিল। আর ইহার উপরিভাগে যে সকল আগ্নেয় পর্ব্বত দেখা যায়, তাহা পৃথিবীর আগ্নেয় পর্ব্বতের তুলনায় খুব বড়।

চন্দ্রমণ্ডলে আগ্নেয় পর্ব্বতের অস্তিত্ব সম্ভব হইলে, দেখিতে হইবে যে কি প্রকারে এই গুলির কার্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। চন্দ্রের উপরি ভাগে যে সকল রঙ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ ভাবে মিশ্রিত যে একটী হইতে অন্যটী পৃথক করিয়া লইতে পারা যায় না। আর তথায় ধূসর বর্ণের স্থান এত অধিক যে ইহার উপরিভাগের আগ্নেয় গিরি হইতে উত্থিত পদার্থের বিস্তৃতিতে যে পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব তাহা লক্ষ্য করাও কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই সকল পদার্থ পতনে যে সকল স্থান উন্নত হইয়াছে তাহা সহজেই চিনিতে পারা যায়। কিরূপে এই উন্নত ও অবনত স্থান পরিচয় করিতে পারা যায়, তাহা বলা আবশ্যক।

খুব উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া হইতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করিলে, সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইত যে যখন পর্ব্বতের শৃঙ্গে সূর্য্যকিরণ পতিত হইতেছে তখনও ইহার পাদদেশে গাঢ় অন্ধকার প্রতিভাত হইতেছে। এবং যতই দূরে লক্ষ্য করা যাইবে এই অন্ধকার গাঢ়তর বলিয়া বোধ হইবে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে উচ্চ বৃক্ষ শিরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া তন্নিম্নস্থ বৃক্ষরাজিকে মলিন করিয়া দেয়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে পর্ব্বতের চূড়া গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইবার অনেক পূর্ব্বেই তন্নিম্নস্থ সমতলক্ষেত্রে রাত্রি আসিয়া দেখা দেয়। তবে চন্দ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের একটু বিশেষত্ব আছে। তথায় বায়ুমণ্ডল নাই। কাজেই আলোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছড়াইয়া অনালোকিত স্থান অর্দ্ধালোকিত করিতে পারে না। একস্থানে পতিত আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্যস্থান অল্প আলোকিত করিতে পারে মাত্র। কাজেই যে স্থানে সূর্য্যালোক পতিত হইতে পারে নাই, তাহাতে সম্পূর্ণ অন্ধকার বিরাজমান থাকিবে এবং চন্দ্রমণ্ডলে যে সকল পাহাড় আছে তাহাদের ছায়া সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। এই ছায়াগুলি অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলেই চন্দ্রমণ্ডলের উপরিস্থ পাহাড় শ্রেণীর আকার সহজেই ঠিক করিতে পারা যায়।

চন্দ্রমণ্ডলের পাহাড় শ্রেণীর উপর ও তন্নিকটস্থ স্থানে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত পরিদর্শন করা খুব আমোদজনক এবং মাঝারি দূরবীণেই এগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগ্নেয়গিরি কর্ত্তৃক স্থলভাগের উন্নতি সাধিত হইলে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ঠিক করিতে সুবৃহৎ দূরবীণের দরকার। এবং যিনি যন্ত্র পরিচালন করিবেন তাঁহারও এ বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যদিও চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত খুব ধীরে ধীরে হইয়া থাকে (কেননা চন্দ্রের ১ দিন আমাদের ১ চান্দ্র মাসের সমান) তবুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ছায়া লক্ষ্য করিতে যে সময়ের দরকার তাহা খুব সামান্য। আর মাসে এক বা দুইবারের বেশী সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করা যায় না। ইহার উপর আকাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকিলে তাহাও আবার বিফল হইয়া যায়। কাজেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে চন্দ্রমণ্ডলের উপরি-ভাগ নিরীক্ষণ করিতে সুদীর্ঘ সময় ও পরিশ্রমের দরকার।

এই সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইলে চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগের মানচিত্র খুব সাবধানতার সহিত অঙ্কিত করা

আবশ্যক। অনেক জ্যোতির্ব্বিদই এই মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে হাতেই এই মানচিত্র অঙ্কিত করিতে হইত। কিন্তু এখন ব্যোম নিরীক্ষণে অনেক স্থলেই জ্যোতিষ্কের ফটো তুলিয়া লওয়া হয়। যাহা হউক জ্যোতির্ব্বিদেরা পরিশ্রম করিয়া যে সকল মানচিত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহাতে পঞ্চনবতীটি শ্রেষ্ঠ চান্দ্র পর্ব্বত এবং প্রায় কুড়ি হাজার আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীতে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ চন্দ্রমণ্ডলস্থ আগ্নেয়গিরির অগ্নিকাণ্ডের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুপণ্ডিত হর্শেল তাঁহাদের মধ্যে একজন। চন্দ্রমণ্ডলে যে সকল কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মধ্যে তিনি উজ্জ্বল আলোকও দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা হইতেই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে চন্দ্রে আগ্নেয় পর্ব্বত আছে।

স্ক্রটার নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ তাঁহার জীবনের অনেকাংশই চন্দ্র পর্য্যবেক্ষণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন যে চন্দ্রে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির কার্য্যই এই পরিবর্ত্তনগুলির কারণ বলিয়া তাহার মনে হইত না। তিনি মনে করিতেন যে এই পরিবর্ত্তন চন্দ্রের বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহার একটী পরীক্ষা সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৭৮৮ খৃঃ নবেম্বর মাসে তিনি দেখিলেন যে, চন্দ্রের প্রশান্ত সাগর * নামক স্থানের লিনিয়াস্ মুখগহ্বরের স্থানে একটী কাল দাগ রহিয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের পরীক্ষায় এই স্থানটী তৎ নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে কিছু উজ্জ্বল দেখা যাইত। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে তবে চন্দ্রে যে সময় সময় আগ্নেয় গিরির ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

স্ক্রটারের পর অনেক জ্যোতির্ব্বিদই এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটু একটু অনুমান করিয়া গিয়াছেন। মিঃ ওয়েব ১৮৬৫ খ্রীঃ এই পরিবর্ত্তন আট বার লক্ষ্য করেন।

কপারনিকাস নামক চান্দ্রপর্ব্বতের মুখগহ্বর মাঝারি দূরবীণেই বেশ ভালমতে পরিদৃশ্যমান হয়। এই গহ্বরের নানাচিত্রও কোন কোন মানমন্দির হইতে প্রস্তুত করান হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ স্থান টুকুর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপাকার পাহাড়ের মত স্থান দেখা গিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রে ঐ ঐ উজ্জ্বল গিরিগহ্বরগুলি নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এই স্থানটী কপারনিকাস্ ও ইরেস্থিনিস্ নামক স্থানের মধ্যে অবস্থিত। শেষোক্ত স্থানটী মৌচাকের মত আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন মানচিত্রে এই সকল স্থানের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় যে এই স্থান পূর্ব্বে এরূপ ভাবে ছিল না। বর্ত্তমানে এরূপ হইয়াছে।

চন্দ্রমণ্ডলে মার্সেনিয়াম নামক অঙ্গুরীয়কের আকার সদৃশ অন্য একটী পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ক্রমোন্নত; তাই চন্দ্রপর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বিদগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে এই পাহাড়ের উপর পতিত হয়। স্ক্রটার প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন যে এই পাহাড় সম্পূর্ণ মসৃণ। এই সকল জ্যোতির্ব্বিদ বড়ই মনোযোগের সহিত অনেক পরিশ্রম করিয়া এই স্থানের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মানচিত্রও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে বিয়ার ও মেডলারের মানচিত্র প্রকাশিত হওয়ার ২। ১ বৎসর পরে মিঃ ওয়েব এই সম্পূর্ণ মসৃণ পাহাড়ের উপর একটী ছোট আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ইহা নিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ এক মতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। হয়ত ওয়েব যাহা দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণের চক্ষে তাহা পরে নাই। তাঁহাদের মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। এমন সময় সংবাদ প্রচারিত হইল যে এথেন্স নগরে একজন বিশ্বস্ত জ্যোতির্ব্বিদ পরীক্ষক এ বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্ক্রটার প্রশান্ত সাগরের লিনিয়াস নামক আগ্নেয় মুখ গহ্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে একটী কাল দাগ এই গহ্বর মুখে দেখা দিয়াছিল। যখন তপনদেব খরতর কিরণ জাল ইহার উপরে বিস্তার করিতেন তখন এই স্থানটীতে একটী

* Sea of Serenity—পূর্ব্বে চন্দ্রের কোন২ অংশ সমুদ্র বলিয়াই কল্পিত হইত কিন্তু এগুলি সমুদ্র নহে প্রমাণিত হইলেও স্থানগুলি পূর্ব্বের নামেই এখনও পরিচিত আছে।

উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণের দাগ দেখা যাইত। আর অন্য সময়ে এই গুহার ছায়া পড়িয়া তাহা একটু মলিন হইত। পূর্ব্বোক্ত এথেন্সবাসী জ্যোতির্ব্বিদ জুলিয়াস স্মিড্ বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ এই স্থানটী নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু ১৮৬৬ খৃঃ তিনি দেখিলেন ঐ গিরি মুখটী কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন সেখানে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানেও কোন উজ্জ্বল বিন্দু বা ছায়া—কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। এই গিরি মুখটী অন্ততঃ ৫ মাইল ব্যাসযুক্ত, এমত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। একই রাত্রি এই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,চন্দ্রে এইরূপ পরিবর্ত্তন সময় সময় হইয়া থাকে।

এই গিরি গর্ত্ত ১৬৫৩ খৃঃ অব্দের প্রকাশিত রিমিওলিসের মানচিত্রেও দৃষ্ট হয়, ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে শ্রূটার লিনিসের স্থানে গিরিগর্ত্তের পরিবর্ত্তে একটা কাল দাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে লরমেন চন্দ্রমণ্ডলের উপরি ভাগে একটা সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কাল দাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মানচিত্রের মধ্যে তিনি লিনিসের স্থানে একটী গিরিগর্ত্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন ইহার ব্যাস অন্যূন পাঁচ মাইল এবং ইহা অত্যন্ত গভীর। বিয়ার ও মেণ্ডলারেরমেপেও এই গিরিগর্ত্ত স্পষ্টতঃ অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহারা এই স্থানটী অনূন ৭ বার পরিমাপ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইহাদের মতেও এই গর্ত্তটী খুব গভীর এবং খুব উজ্জ্বল। ডিগাক্ এবং রদারফর্ডের ফটোগ্রাফে লিনি একটী উজ্জ্বল চিত্ররূপে বর্ত্তমান। স্মিড্ যখন অনেক অনুসন্ধানের পরও আর পূর্ব্বের মত ঐ স্থান লক্ষ্য করিতে পারেন নাই তখনও বাকিমহাম নামক সাহেব চন্দ্রমণ্ডলের ফটো উঠাইতে ছিলেন। ঐ ফটোতে লিনি খুব ছোট আকারে, অতি ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উজ্জ্বলতাও তখন তাহার ছিল না। যাহা হউক, লিনি পূর্ব্বে যে আকারেই থাক না কেন ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে বাকিমহাম যখন ফটো উঠাইতেছিলেন তখন কোন না কোন প্রকারের একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

স্মিডের মত সত্য কি মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত ওয়েব সাহেবও লিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন অন্যান্য মানচিত্রে যেস্থানে এই গিরি-গর্ত্ত নিহিত আছে সেই স্থানটায় একটু অস্পষ্ট শাদা দাগ রহিয়াছে। যে গিরিগর্ত্তের স্থান ইহা অধিকার করিয়াছে ইহা আয়তনে প্রায় তাহার দ্বিগুণ হইবে।

অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদেরাও এই স্থান নিয়া আরও অনেক পরীক্ষা করেন তাহারাও স্মিডের মতেই সায় দিয়াছেন। কেবল দুইজন মাত্র জ্যোতির্ব্বিদ (যাহারা এই পরীক্ষার বিষয়টী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই) তখনও ইহাতে সন্দিহান ছিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারীতে রোম নগরে ফাদার সেক্‌সি নামক জ্যোতির্ব্বিদ পাদরি সাহেব আবার লিনি পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন তখন এইস্থানে খুব ছোট একটী গিরি-মুখ-গহ্বর দেখিয়াছিলেন। যে সকল গিরিমুখ কোন নাম পায় নাই, ইহা তখন তাহাদের চেয়েও ছোট ছিল।

ইহার পরও এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের কোন ক্রটী হয় নাই। এই সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় চন্দ্র যে একটী আগ্নেয় পর্ব্বতের রাজ্য তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ১৯০৩ খৃঃ অব্দে ডাঃ পিকারিং চন্দ্রমণ্ডলের সম্পূর্ণ ফটোগ্রাফ অষ্টাশীখণ্ডে বিভক্ত করিয়া উঠাইয়াছেন। তিনিও পূর্ব্ব মহাজনগণের মন্তব্যেই সায় দিয়াছেন। অতঃপর ভবিষ্যৎ গবেষণায় এবিষয়ে আরও জানিতে পারা যাইবে বলিয়া আমাদের আশা হয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ দমনের পর আমরা ইউগণ্ডা গমন করিলাম। এবার আমাদের সঙ্গে অধিক লোক ছিল না। পূর্ব্বোক্ত দুইজন সাহেব, রতিকান্ত, আমি; তিনজন শিখসৈন্য ও ৫ জন ঐ দেশীয় কুলী। ইউগণ্ডার অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে ইহার ভূগোল-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

আফ্রিকার মধ্যে ইহা উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ। মিশর ও সুদানের জননী রূপিনী নীল নদী এই ইউগণ্ডা প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ ভূমি সমতল পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে এমন কয়েকটি হ্রদ আছে যাহাদের নাম সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। উত্তর পশ্চিম কোণে "আলবার্ট নিয়ানজা" (Albert Nyanza) ইহার দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ ও প্রস্থে প্রায় ২৫ মাইল। ইহার ঠিক দক্ষিণে "আলবার্ট এডোয়ার্ড নিয়ান্জা" (Albert Edward Nyanza)। এই উভয় হ্রদকে সেমলিকি (Semliki) নাম্নি এক নদী সংযুক্ত করিতেছে। এই দ্বিতীয় হ্রদের নিকটে "রোয়েন জোরি" (Ruwenzori) পর্ব্বত অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ডিউক অব আব্রুজি। (Duke of Abruzzi) প্রথমে এই উচ্চ পর্ব্বত আবিষ্কার করেন। ইহার উচ্চতা ১৬,৬২৫ ফুট।

এডোয়ার্ড নিয়ান্জার দক্ষিণে রিভূহ্রদ। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এইস্থান হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে ৮।১০ মাইল দূরে "ট্যাঙ্গানিকা" (Tanganyika) হ্রদে যাইয়া পড়িয়াছে। ইহা এক অদ্ভুত রকমের হ্রদ। ছোট মানচিত্রে দেখিলে সহসা নদী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০০ ও প্রস্থে ২০—৫০ মাইল। এই সুবৃহৎ হ্রদের পূর্ব্ব উপকূলের প্রায় সিকি অংশে জর্ম্মান্ ইষ্ট আফ্রিকা (German East Africa) অবস্থিত। অবশিষ্ট তিনভাগে পর্টুগীস্ ইষ্ট আফ্রিকা (Portuguese East Africa)। এই হ্রদের পশ্চিম কূলে "রোডেসিয়া" নামক প্রদেশ অবস্থিত। এই হ্রদের পূর্ব্ব উপকূলে দুই একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ছাড়া আর কোনও নদী দেখিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিম কূলে কিন্তু রকাক, রোকুক, লিম্‌টিপি, লুকুগা প্রভৃতি অনেকগুলি ছোটবড় নদী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে লুকুগার দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা সুপ্রসিদ্ধ কঙ্গো নামক মহানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই হ্রদের পূর্ব্ব কূলের উত্তর প্রান্তে উজ্জি নামক স্থান অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ আফ্রিকা ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোন ও ষ্টান্‌লী সাহেব এইস্থানে মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া আফ্রিকার ইতিহাসে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ সময়ে ইহা একটি বাণিজ্য স্থান ছিল। বিশেষ ইহার বাজারে ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয় হইতে দেখিয়া লিভিংষ্টোন্ সাহেব ঐ দিবস প্রতিজ্ঞা করেন যে উহা বন্ধ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে এ অভিলাষ তিনি আর পূর্ণ করিবার অবসর পান নাই। আজকাল উজ্জি এক প্রসিদ্ধ বন্দর। সুদূর কায়রো (মিশরের রাজধানী) হইতে এখানে বড়২ ষ্টীমার উপস্থিত হয়। এখন ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০। এই হ্রদের পশ্চিম উপকূলে করোঙ্গা, শ্রো, লকাটা, বনডি, কোটাপোটা, রিভূ, ম্যাগোঙ্গা প্রভৃতি বন্দর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইউগণ্ডার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা। আয়তনে ইহা সমস্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয় হ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমেরিকার সুপিরিয়ার হ্রদ সকলের অপেক্ষা বড়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বরটন্ ও স্পিকি সাহেব নীলনদের উৎপত্তি স্থল আবিষ্কার করিবার জন্য মিশর হইতে বাহির হয়েন। বরটন্ পীড়িত হইয়া পড়াতে ফিরিয়া যান। কিন্তু স্পিকি তাহাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত না হইয়া অগ্রসর হয়েন এবং পথিমধ্যে কাপ্তেন গ্রাণ্টের সহিত মিলিত হইয়া ভিক্টোরিয়া নিয়ান্জা আবিষ্কার করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ ষ্টানলি সাহেব এই হ্রদের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া ইহার আয়তন স্থির করেন। ইহা একটি সমুদ্র বিশেষ। আয়তনে ইহা স্কটল্যাণ্ডের সমান। ইহার চারিদিককার বেড় ৮০০ মাইলের উপর ইহার উত্তরাংশ ইংরাজের ও দক্ষিণ ভাগ জর্ম্মানীর অধীন। ট্যাঙ্গানিকার ন্যায় ইহারও চারিদিকে ছোটবড় অনেকগুলি বন্দর অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে উত্তরদিকে ভিক্টোরিয়া, কম্পালা, ডকিস্মু বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এত বড়২ হ্রদের একত্র সমাবেশ পৃথিবীতে এক উত্তর আমেরিকা ভিন্ন আর কোথা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য ইউগণ্ডা বিশেষ উর্ব্বরা। বৎসরের মধ্যে ধান, গম, ছোলা, ভূট্টা যব, মটর প্রভৃতি নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে ইহার ন্যায় উর্ব্বরা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন দেশ আর নাই। এইজন্যই ইংরাজ কোটি২ মুদ্রা ব্যয়ে এখানে রেল নির্ম্মাণ করিবার জন্য এত অধিক উৎসুক হইয়াছেন।

এখানকার লোকে ইউগণ্ডাকে "ইউগোগো" এবং ইহার প্রচলিত ভাষাকে "কিগোগো" বলে। ইহার অধিবাসীরা দুইভাগে বিভক্ত—শগোগো ও ওয়াগোগো। যখন ইউগণ্ডায় প্রথম ইংরাজ প্রবেশ করেন, তখন মটেসা নামক একজন রাজা এই সমগ্র প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহার অধীনে প্রায় ২০ হাজার পদাতিক সৈন্য ও ৩০০ যুদ্ধ ঘোড়া ছিল। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর যুদ্ধের পর রাজার ক্ষমতা একবারে লোপ পায় এবং ইংরাজের বাহুবলের গুণে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়। আমি যখন ঐ দেশে গমন করি, তখন কিন্তু দেশীয় রাজবংশ একবারে দূরীভূত হয় নাই। রাজা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাচীন প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন, তবে তাঁহার হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না।

ইউগণ্ডায় ইংরাজ অধিকার আরম্ভ হইবার পর সাহেবদের নিজেদের মধ্যে এক বিষম কলহ আরম্ভ হয়। আপনারা অবশ্যই জানেন, খ্রীষ্টানেরা রোমান কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। ইংরাজ রাজত্ব সুরু হইবার পর এখানে এই দুই শাখার পাদরীরা দলে দলে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যখন প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। শেষে ইহা রীতিমত বিবাদে পরিণত হয়—এমন কি অনেক স্থানে হাতাহাতি হইয়া রক্তস্রোত পর্য্যন্ত বহিয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট এই বিবাদ মিটাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে এই দেশকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দেন—কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট ও মুসলমান। নিয়ম করিয়া দেওয়া হইল যে, কোনও প্রচারক নিজের বিভাগ ছাড়িয়া অন্য বিভাগে যাইতে পাইবেন না। এখনও পর্য্যন্ত ঐ নিয়ম চলিতেছে।

বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকার ন্যায় এখানেও বড়২ কর্ম্মচারী ইংরাজ। তবে ছোট২ কর্ম্মচারিরা অনেক স্থানেই দেশীয় লোক দেখিলাম। প্রথমে বিনিময়ে কড়ি চলিত, এক্ষণে সর্ব্বত্র আমাদের দেশের টাকা, পয়সা, শিকি প্রভৃতি চলিতেছে। সমগ্র ইউগণ্ডায় ৪০০০ সৈন্য রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে তিন হাজারের অধিক ভারতের লোক—শিখ ও পাঠান। অবশিষ্ট এই দেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। যাহারা ভারতবর্ষ হইতে আসে তাহাদিগকে এখানে তিন বৎসরের কড়ারে আসিতে হয়। ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকাতেও প্রায় ২৫০০ ভারতীয় সৈন্য আছে।

এদেশে সিবিল পুলিশের সংখ্যা খুব কম। দেশ এখনও সুশাসিত নয় ব'লয়া এখানে মিলিটারি পুলিশ শান্তি রক্ষার কাজ করিতেছে। ইহাদের হাতে ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। কাহারও উপর সামান্য সন্দেহ হইলেই গুলি চালাইতে পারে। বিনা ওয়ারেণ্টে যাহাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা সামান্য সিপাহীর পর্য্যন্ত আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সব দেশে—আয়তনের হিসাবে পুলিসের সংখ্যা খুব কম। সেইজন্য এখনও দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। এই রেল ও তার শেষ হইলে আশা করা যায় দেশের অবস্থা অনেক ভাল হইবে।

ইউগণ্ডার রাজধানী মেঙ্গাগা। ইহা ভিক্টোরিয়া হ্রদের এক ক্ষুদ্র উপসাগরের উপর অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। অসভ্য আফ্রিকায় এত বড় সহর খুব অল্পই আছে। ইউরোপের রোমের মত ইহার অধিকাংশ কয়েকটি নাতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজার বাড়ী এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। রাজবাড়ীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার বেড় দুই মাইলের অধিক। একটি পাহাড়ের উপর ইংরাজ এক দুর্গ বেষ্টিত ক্ষুদ্র সহর খাড়া করিয়াছেন। ইউগণ্ডার চীফ কমিশনর (Chief Commissioner) সাহেব এইখানে বাস করেন। এই ইংরাজি সহরে ও ইহার চারিদিকে ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীরা অবস্থিতি করে। ইহাদের সংখ্যা (আমি যখন দেখিয়াছি) প্রায় ১২।১৩ শত হইবে। ইহাদের মধ্যে পারশী, মাড়োয়ারি, গুজরাতী ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। যুক্ত প্রদেশের ও মান্দ্রাজের চেটি সম্প্রদায়কেও দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের লোক একজনও নাই। রতিকান্ত বলিল, "সর্দ্দার সাহেব! আমাদের দেশের লোকেরা ভয়ানক কুড়ে। তাহারা ঘরে বসিয়া মুখের জোরে দুনিয়া জয় করিতে পারে। বক্তৃতায় তাহারা রোজ কত যে ভাল২ উপদেশ দেয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সব উপদেশ নিজেরা কখনও পালন করে না। যাহাতে

দশের ও দেশের ভাল হয়, এমন কাজ তাহারা কখনও করে না। এই দারুণ প্রতিযোগীতার দিনে ঘর ছাড়িয়া একপাও যাইবে না। আর যদি কেহ যায়, তাহাকে তাড়াতাড়ি একঘরে করিয়া বাহবা লয়। দুঃখের কথা আর কত বলিব। আমাদের দেশের ছেলেরা পর্য্যন্ত গণ্ডায়২ নবেল ও ডিডেকৃটিভের গল্প পড়িতেছে। অথচ যাহা পড়িলে তাহারা মানুষ হয়, এমন বই প্রায়ই ছোঁয় না"। যাহা হউক, ইংরাজ নির্ম্মিত সহরের নাম কম্পালা। ইহা এই দেশীয় শব্দ। ইহার অর্থ "নবিন সহর।" ইহার পথ ঘাট বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। অনেকগুলি পাকা বাড়ী দেখিলাম। আধুনিক সহরের উপযোগী কোনও জিনিষের অভাব এখানে দেখিলাম না। গাড়ী, ঘোড়া, সাইকেল, (মোটর তখনও আজকালকার মত সুলভ হয় নাই), স্কুল, মদের দোকান, টেনিস কোর্ট, লেমনেড সোডার দোকান, ক্লব প্রভৃতি সবই আছে। সমস্ত সহরে প্রায় ৩০। ৩৫ জন য়ুরোপীয় আছেন বলিয়া ক্লবের অবস্থা খুব ভালই বলিতে হইবে। কম্পালয় দুইটি গির্জ্জা দেখিলাম—একটি সাহেবদের অপরটি কালা আদমীদের জন্য।

একটি পাহাড়ে প্রোটেসটান্টদিগের ও অন্য একটি পাহাড়ে ক্যাথলিকদের উপনিবেশ। প্রোটেস্‌টনদিগের গির্জ্জাটি খুব বৃহৎ, আগাগোড়া দারু নির্ম্মিত। ইহাতে প্রায় ৪০০০ লোক এক সময়ে বসিয়া প্রার্থনা করিতে পারে। আমাদের যতদুর মনে হয়, মোম্বাসাতেও এত বড় গির্জ্জা দেখি নাই। ইহার বামদিকে সাহেবদিগের ও দক্ষিণে দেশীয়দিগের বসিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এক রবিবারে আমরা এই গির্জ্জায় গিয়াছিলাম। অতবড় হল, কিন্তু ৩০। ৪০টি ছাড়া আর কোন স্থান খালি দেখিলাম না। পাদরীদিগের বাহাদুরি আছে বটে। এই অল্প দিনের মধ্যে এই নূতন ধর্ম্ম এদেশে যে প্রকার ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে বোধ হয় ৫০। ৬০ বৎসর পরে ইউগণ্ডায় অপর ধর্ম্মের লোক আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অবশ্য এই নিরক্ষর অসভ্যেরা নিরাকার অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না।

দেশটা গরম, অথচ আমাদের দেশের মত অসহ্য নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। এইজন্য কয়েকজন সাহেব এখানে চা, কফি, আক, নীল, তামাক প্রভৃতির চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। বোধ হইতেছে, তাঁহারা এই সব কাজে বেশ লাভবান হইবেন।

পয়সা রোজগার করিতে সাহেবরা যেমন নিপুণ আমাদের দেশের লোকেরা যদি তাহা হইত, তাহা হইলে আমাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইত। যদি কেহ মোটে ৬০০।৭০০, টাকা মূলধন লইয়া ভারতবর্ষে উপযুক্ত দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া ইউগণ্ডা, ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বিক্রয় করেন তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মূলধন ৫।৬ গুণ বৃদ্ধি পায়। কয়েক জনে মিলিয়া এই কাজ আরম্ভ করিলে আরও সুবিধা হয়। অবশ্য এই সব কাজে সাহসী ও কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া চাই। যাহারা গোড়া হইতে 'তাইত, কি করিব,' 'কোথায় যাইয়া দাঁড়াইব' 'কি খাইব,' 'কে জানে লাভ হইবে কি না,' প্রভৃতি কথা ভাবিতে থাকেন, তাহাদের দ্বারা কখনই এই সব কাজ হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের মধ্যে বিদেশে বাহির হইবার সাহস হইতেছে, ততদিন আমরা মানুষ হইব না। বিদেশে যাওয়া অর্থে আমি অবশ্য কেবিনে বসিয়া, প্রথম শ্রেণীর খানা খাইতে খাইতে দেশ ভ্রমণের কথা বলিতেছি না।

বনানা এদেশের এক অতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহার পাতায় ঘর ছাওয়া, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি কাজ হয়। বড় বড় পাতা একত্রে গাঁথিয়া ছাতা প্রস্তুত হয়। ইহার রেখা হইতে দড়ি, সুতলি ব্যাগ এমন কি এক রকম কাপড় পর্য্যন্ত তৈয়ার হয়। ইহার ফল হইতে আজ কাল সাহেবরা রুটি, জ্যাম, এবং নানা প্রকারের মদ্য প্রস্তুত করিতেছেন। সে দেশের লোক ইহা হইতে এক প্রকার ময়দা প্রস্তুত করে। দেশের বার আনা লোকের জীবন ধারণের উহাই একমাত্র উপায়।

শুনিলাম, এখানকার অধিবাসীরা সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে অতিশয় চতুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাহেবরাও ইহাদের শত মুখে প্রশংসা করেন। যাহারা সৈনিক বিভাগে বা পুলিশে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা বেশ সুনামের সহিত কাজ করিতেছে। লোহার কাজের জন্য ইহারা আফ্রিকার

বোধ হয় অতুলনীয়। যে জিনিস একবার দেখে, তাহা অবিকল প্রস্তুত করিতে পারে। পুলিশের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে বন্দুক ব্যবহার করেন, তাহা এইখানেই প্রস্তুত হয়। বন্দুকের কারখানায় বড় সাহেব ছাড়া আর সকলেই দেশী লোক। বন্দুক কিন্তু এমন সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে যে হঠাৎ দেখিলে বিলাতী বলিয়া মনে হয়। এখানকার লোহারের কাজ করিবার সরঞ্জাম কতকটা আমাদের দেশের মত। সব কাজই হাতে করে। অবশ্য বন্দুকের কারখানায় এখন অনেক রকম কল আসিয়াছে। শুনিলাম, ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বেও এখানকার লোকে বন্দুক প্রস্তুত করিত।

এখানকার লোকেরা পূর্ব্বে নাকি সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিত। তবে হাড়ের, লোহার এবং শঙ্খের অলঙ্কার এবং উল্কীর ব্যবহার খুব প্রাচীন। এখন অবশ্য সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিবার প্রথা ইউগণ্ডা হইতে এক প্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। রাজধানীর নিম্ন শ্রেণীর নরনারী কৌপিন পরিয়া লজ্জা নিবারণ করে, আর বালকবালিকারা ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত এখনও সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে কয়েক রকমের পরিচ্ছদ দেখিলাম। পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধুতি ও কামিজ এবং কেহ কেহ কোট প্যাণ্ট বা সুধু প্যাণ্ট কামিজ ব্যবহার করে। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই প্যাণ্ট পড়িয়া থাকে। মস্তকের আবরণ কাহারও দেখিলাম না। আমাদের, যতদুর, মনে হয়, আফ্রিকার কোনও অসভ্য জাতির মধ্যে মস্তক আবরণের প্রথা দেখি নাই। ভারতের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও এই ব্যবহার। বাঙ্গালীরা ভারতের সমস্ত জাতি অপেক্ষা শিক্ষিত ও সুসভ্য। অথচ ইহাদের মধ্যে ও মস্তকাবরণ নাই। ইহার কারণ কি? রাজি বলিল, "গরম দেশ বলিয়া এই প্রকার, হইয়াছে।" কিন্তু ইহা কোনও কাজের কথা নয়। ভারতের মধ্যে রাজপুতনা ও পঞ্জাব সকলের অপেক্ষা গরম। অথচ এখানকার লোক ২২।২৩ হাত লম্বা পাগড়ী ব্যবহার করে। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসীরা অসভ্য ছিল। যুক্ত প্রদেশ হইতে আর্য্যেরা যখন ঐ স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন অবশ্য তাঁহাদের মস্তকাবরণ ছিল। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ও ঐ আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগের সংখ্যা খুব অধিক ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যেরাও মস্তকের আবরণ ত্যাগ করেন।

এ দেশের রমণীরা (মধ্য ও উচ্চ অবস্থার) ঘাঘরা এবং লম্বা লম্বা সেমিজের বিশেষ পক্ষপাতী দেখিলাম। কেহ কেহ মেমেদের মতন পোষাক ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সাধক কবি কাণকড়ি পণ্ডিত।

কবি কাণকড়ি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী ছিল আসমা *। ইনি জাততে ছিলেন, মাধ্বিস ব্রাহ্মণ। তাঁহার শ্যামল সৌম্য মূর্ত্তি সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষক ছিল। উপাধি না থাকিলেও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত মহাশয় পণ্ডিতই ছিলেন। স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যবহার জন্য অনেক সময় অনেক লোক তাঁহার নিকট প্রার্থী হইত।

পণ্ডিত মহাশয় যজমানিক ব্যবসা করিতেন না। অবধোতিক ও আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বৈদ্যবৃত্তিদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তা' ছাড়া শিষ্যবৃত্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

ইনি মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাকে প্রায় সকলেই "পণ্ডিত গোস্বামী" বলিয়া ডাকিত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকেই পণ্ডিত মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। পণ্ডিত গোস্বামী ষট্‌চক্র ও অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াই বহু লোকের গুরুর পদে বরিত হইয়াছিলেন।

---

* আস্‌মা ময়মনসিংহের একটি প্রসিদ্ধ পল্লিগ্রাম। নেত্রকোনা হইতে কিঞ্চিন্ন্যূন এগার মাইল পূর্ব্বদিকে কংস কূলে অবস্থিত। কংস নদের জল স্রোত বারহাট্টা থানা হইতে আস্‌মাকে, এবং আস্‌মা হইতে বারহাট্টা থানাকে, সম সূত্রে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কংসের পশ্চিম দক্ষিণ তীরে বারহাট্টা থানা, আর পূর্ব্বোত্তর তীরে আস্‌মা।

বেদান্তবাদের অসম্য তত্ত্বাদির অনুশীলন পূর্ব্বক ইনি একজন সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। যদিচ জ্ঞান-মার্গই তাঁহার সাধনার চরম সিদ্ধান্ত ছিল, তথাপি ভক্তি ও রসতত্ত্বে তিনি অনধিকারী ছিলেন না।

সমাজ, কমলপুর, কৈলাটী, আমতলা, আটপাড়া প্রভৃতি স্থানে পণ্ডিত মহাশয়ের যথেষ্ট সমাদর ছিল। কমলপুরের গোলকমোহন চৌধুরী মহাশয় প্রায় মাসে মাসে পণ্ডিত মহাশয়কে নিজ বাড়ীতে লইয়া নিরিবিলিমতে পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনা করিতেন।

রামজয় বিশ্বাস, রামজয় বক্সী, নবু দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ভক্ত ছিলেন। আমি জীবাধমও তাঁহার নিকট ভজন সম্বন্ধীয় বহু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি,—পণ্ডিত মহাশয় তখন অতি বৃদ্ধ। জরাগ্রস্ত পণ্ডিত গোস্বামী ভজন প্রভাবে ও সাধন বলে সর্ব্বদা বালকের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও আনন্দযুক্ত থাকিতেন। উদ্যমোৎসাহ তাঁহার যুবকের ন্যায় ছিল। আমরা বুঝিতাম, তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু তিনি তাঁহাকে বৃদ্ধ মনে করিতেন না। আলস্যাবসাদ তাঁহার সাধনসিদ্ধ শরীরে স্থান পাইত না।

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় কি শ্রীনাম কীর্ত্তনে দিবারাত্রি কাটিয়া গেলেও মহাশান্তি ভিন্ন তিনি অসুখ-অশান্তি বোধ করিতেন না।

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণে কি এক অমানুষী আনন্দ বিরাজ করিত। বৃদ্ধ, বালক, যুবক সকলের সঙ্গেই তাঁহার সহজে মিত্রতা জন্মিয়া যাইত। এমন মিষ্টভাষী ও সরল স্বভাবের লোক বর্ত্তমান যোগে অতি দুর্ল্লভ। অহঙ্কারাভিমান কাহাকে বলে পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিতেন না।

তিনি প্রথম বয়সে যৎসামান্য রূপ কবিগান ও হোলিগান গাইয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত মহাশয়কে কবিত্ব শক্তি আসিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয় করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় সারা জীবন সুস্থ থাকিয়া দুই চারি বৎসর ন্যূনাধিক শতবর্ষ বয়সে নিজ বাটীতে দেহ রক্ষা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ দেখা গিয়াছিল।

পণ্ডিত মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নিজকৃত সাধন সম্বন্ধীয় অনেকগুলি কবিতা ও গীত দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহারই কিয়দংশ লিখিত হইল।

পণ্ডিত মহাশয়ের সাধনপ্রণালীর পদ।

(১)

জলের উপরে আগুন জ্বলে।
বসুমতী আছে তাহার তলে॥
আগুন উপরে বায়ুর বাস।
তাহার উপরে আছে আকাশ॥
আকাশ উপরে হংসের নীড়।
তার উপরে নিত্য বৃন্দ ধীর॥
ভূতল ভেদিয়া পাইবে জল।
জল ভেদি ভেদ করিবে অনল॥
অনল ভেদিয়া অনিলে যাবে।
অনিল ভেদিয়া আকাশ পাবে॥
আকাশ ভেদিলে হংসের স্থান।
তার উপরে নিত্য গুরুতে জ্ঞান॥
কহে কাণকড়ি শুনহ ভাই!
নিত্যে গেলে জন্ম মরণ নাই॥

মূলাধার চতুর্দ্দলে পৃথ্বীচক্র, স্বাধিষ্ঠান ষড়্‌দলে জলচক্র, মণিপুর দশম দলে অগ্নিচক্র, অনহত দ্বাদশ দলে বায়ুচক্র, বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শ দলে নভোচক্র, আজ্ঞা দ্বিদলে হংসঃ। (পুরুষ-প্রকৃতি) এবং তদুপরে সহস্রার নামক শিরোমধ্যস্থ সহস্রদল কমলে নিত্যধাম।

পৃথ্বী জলাগ্নি প্রভৃতি দেহস্থিত পদ্মগুলি পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি সুষুম্নাসূত্রে গ্রথিত। পণ্ডিত মহাশয় এই বিষয়টী উপরের লিখিত কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—"জলের উপরে আগুন জ্বলে" ইত্যাদি।

(২)

মূলাধার চতুর্দ্দলে, ত্রিকোণ মেদিনী।
তাহাতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, কুল কুণ্ডলিনী॥
সার্দ্ধ ত্রিবেষ্টনে দেবী, লিঙ্গকে ঘেরিয়া।
বদনে বদন চুম্বি, আছে ঘুমাইয়া॥

ভুজঙ্গিনী রূপ ধরে অতি ভয়ঙ্কর।
এ বড় অপূর্ব্ব কথা, নিগম ভিতর॥
তাঁহাকে চৈতন্য কর, করিয়া হুঙ্কার।
মৃণালের মূলে পাবে, চক্র ভেদ দ্বার॥
সেই দ্বারে প্রবেশিবে হয়ে সাবধান।
ক্রমেতে উপর দিকে করিবে পয়ান॥
উঠিতে উঠিতে পাবে নিত্য সহস্রার।
পতন হইলে পথে, নাহিক নিস্তার॥
কহে কাণকড়ি দ্বিজ শুন সাধু ভাই।
শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর কোন চিন্তা নাই॥

এই পয়ারটিতে পণ্ডিত মহাশয় ষট্‌চক্র ভেদের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিদ্রাভিভূতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করাইবার কৌশলও কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

(৩) (ওঙ্কারতত্ব।)

অকার, উকার, মকার তিন।
নাদ-বিন্দু তার উপরে চিণ॥
ইহার যুগেতে যে শব্দ হয়।
শব্দ ব্রহ্ম বলি তাঁহাকে কয়॥
প্রণব তত্ত্ব যথেক আছে।
জানিতে পারিবে গুরুর কাছে॥
সৃষ্টির বীজ এ মহা মন্ত্র।
ইহা হৈতে যত আগম তন্ত্র॥
এ বীজ সাধিতে যে জন পারে।
সেজন অপার সংসার তরে॥
কাণকড়ি কহে শুনহ ভাই।
গুরু বিনে ভবে বান্ধব নাই॥

(৪)

'অ'কারে ব্রহ্মা, 'উ'কারে বিষ্ণু,
'ম'কারে মহেশ্বর।
(ঁ) নাদে 'খ' ধ্বনি, জানে যত মুনি,
(ং) বিন্দুতে শশধর॥
ইহার বিশেষ, গুরুর কাছে,
জানিবে সাধক ভাই।
কহে কাণকড়ি, যদি যাবে তরি,
ইহা ছাড়া কিছু নাই॥

(৫)

(হংসঃ।)

"হ"কার "স"কার বরণ দুই।
ইহার তত্ত্ব কি জানি মুই॥
পুরুষ প্রকৃতি এ দুই হয়।
জীবের জীবন স্বরূপে রয়॥
উভয় মধ্যেতে আছয়ে বিন্দু। (ং)
বিন্দুরূপে কৃষ্ণ গকুল ইন্দু॥
এ বিন্দু হইতে যে বিন্দু ক্ষরে।
সুজন সাধক তাহাকে ধরে॥
ধারণে অমর নিশ্চয় হয়।
না ধরিলে যায় শমন আলয়॥
কাণকড়ি কহে শুনহ ধীর।
বুঝহ এ তত্ত্ব হইয়া স্থির॥

(৬)

একুশ হাজার ছয় শত বিশ।
এদিকে কিঞ্চিত রাখিও দিশ॥
"হ"কার "স"কার নাসিকা পথে।
যাতায়াত করে দিবস রাতে॥
অজপা গায়ত্রী ইহাকে কয়।
হংসরূপে সদা দ্বিদলে রয়॥
হ্রাসেতে বৃদ্ধি, বৃদ্ধিতে হ্রাস।
কাণকড়ি কহে, কমাও শ্বাস॥

একুশ হাজার ছয় শত বিশবার দিবা রাত্রি ৬০ দণ্ড মধ্যে জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল করে; —সাধক প্রাণায়ামাদি দ্বারা এই শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়,—আর কোন কারণ বশতঃ বৃদ্ধি পাইলে আয়ু সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায়।

(৭)

(কামবীজ তত্ব।)

বর্গাদ্যের আদিবর্ণ, 'ল' কারে 'ঈ' কারে পূর্ণ।
অর্দ্ধচন্দ্র (ঁ) উপরেতে তার।
এই পঞ্চবর্গতত্ব, জানিলে সাধক সত্য,
ভবনদী হএগ যায় পার॥
'ক' কারেতে কৃষ্ণ হয়, 'ল' কারেতে রাধা হয়,
'ঈ' কারেতে আহ্লাদিনী শক্তি।

নাদে হয় আলিঙ্গন, বিন্দুতে স্নেহ চুম্বন,
　　ইহার সাধনে জন্মে ভক্তি ॥
কহে কাণ করি দ্বিজে, পরাজিয়া মনসিজে,
　　যুগল ভজন তত্ত্ব সার।
সাধন করিবে যেই, বৃন্দাবনে যাবে সেই,
　　ইহা বিনে কিছু নাই আর ॥

(৮)

গঙ্গার ধারা হিমালয় উপরে।
এ কথা কে প্রত্যয় করে ॥
মানুষে জানিলে মানুষ রীতি।
তবে সে হইবে সহজ পিরীতি ॥
দশেন্দ্রিয় যবে পঞ্চটী হবে।
'হ'কার 'স'কার মিলিবে তবে ॥
যদি না থাকে জীবনে আশা।
মরিল বাঁচিল না থাকে দিশা ॥
পরাণে পরাণ বদলি লয়।
সহজ পিরীত তবে সে হয় ॥
চৈতন্য বিভিন্ন না থাকে যার।
স্বরূপ পাইল রূপের দ্বার ॥
নিতাই লইয়ে করিছে খেলা।
অদ্বৈত তাহার সঙ্গের চেলা ॥
ছয় গোসাঞি তাঁর সেবাতে লাগে।
চৌষট্টি মহন্ত থাকে এক যোগে ॥
পঞ্চজন রসিকে বহিছে বোঝা।
সহজ পিরীতি ভক্তির রাজা ॥
কাণকড়ি কহে কি কব আর।
এ ভবে জন্মিলে পিরীতি সার ॥

(৯)

সহজ পিরীতি কে জানে কৈ?
সহজ মরম শুন লো, সই ॥
সহজ পিরীতি যে জন জানে।
বেদ, বিধি, ধর্ম্ম কিছু না মানে ॥
নীল কমলে তাহারি বাস।
রতি পতি গতির না থাকে আশ ॥
উলটি চলে ত্রিবেণী জল।
অটল না হয় কিঞ্চিত টল ॥
অনলে ঘৃত স্থাপিত রয়।
গলে না ঘৃত কঠিন হয় ॥
কাণকড়ি কহে এ তত্ত্ব সার।
সাধিলে সাধক পাইবে পার ॥

(১০)

ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে, সুমেরু শিখরে,
　　আছয়ে একটি ফুল।
তাহার মাঝারে, নাগিণী ফুৎকারে,
　　ভুবনে নাহিক তুল ॥
নাগিণী গমনে, পুষ্পের কাননে,
　　বায়ুতে ঝাঁপিয়া চলে।
সে বায়ু যেখানে, থাকয়ে গোপনে,
　　জীবাত্মা তাহাকে বলে ॥

*　*　*　*　*　*
*　*　*　*　*

ভঙ্গিমা তাহার, বুঝা বড় ভার,
　　বেদে বুঝিতে নারে ॥
যথা কর্ম্মকারে, চর্ম্মের ভিতরে,
　　বায়ুকে উৎপত্তি করে।
তেমনি প্রকার, জীব জীবাত্মার,
　　বায়ুতে মন নাম ধরে ॥
সে বায়ু যখনে, অন্য বায়ু সনে,
　　মিশায়ে করায় কর্ম্ম।
বাহ্যে প্রকাশিলে, দেখয়ে সকলে,
　　বুঝয়ে মনের মর্ম্ম ॥
যেমন জলেতে, রঙ্ মিশাইলে,
　　সেই বর্ণ ধরে জলে।

*　*　*　*　*

　　ভুল স্মরণ সেই জানাইতে পারে
মনকে ছাড়, আপনে বুঝ,
　　আত্মাকে কর স্থায়ী।
কহে কাণকড়ি, দেখহ বিচারি,
　　ইহার উপরে নাই ॥

(১১)

গীত।

কর যোগ মনোযোগ মনরে আমার।
সাধিলে সমাধি বিধি হবে ভবনদী পার॥
দেহ চিত্ত আপনার, শশী সূর্য্যানলাকার,
ঈড়া, পিঙ্গলা নাড়ী সুষুম্না যে আর।
তন্মধ্যে ব্রহ্মা বিরাজে, ব্রহ্মাতে চিত্রিনী সাজে,
তাহে হরিদ্বার মাঝে, আছে ব্রহ্ম নাম তাঁর।
মূল স্থান মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুর,
অনাহতের ধ্যান কর, পাবে ভবে পার॥
কেন ঘুর শূন্যাকারে, বৃথা চিন্তা শূন্যভরে,
দ্বিদলেতে হংস চরে, আছে তা'তে ব্রহ্ম সারাৎসার॥
পঞ্চতত্ত্ব কর তথ্য, সাধরে মন পরমার্থ,
কেন ঘুর ভূতের মত, তীর্থধামে আর॥
সাধিলে সাধিতে পার, তিন অক্ষরে মিলন কর,
দুই অক্ষরে যোগ ধর, হবে ভবনদী পার॥
ভাবনা মন ভাবনারে, কে ভাবে তাই দেখ নারে,
কার ভাবেতে মর ঘুরে, এ তিন সংসার।
কহে দীন কাণকড়ি, ভাবনা আর কারে করি,
ভাবনা ভক্তির অরি, হরিপদ কর সার॥

(১২)

পরম না জান্‌লে জীবের গতি নাই।
কর্‌লে তীর্থ একাদশী ব্রত যমে কি ছাড়িবে ভাই।
অজ্ঞানস্ত ক্রিয়ামূল, যাবৎতত্ত্ব ন জানাতি,
তত্ত্ব জান্‌লে ক্রিয়া নাস্তি গীতাশাস্ত্রে শুন্‌তে পাই,—
তন্ত্র নাস্তি, মন্ত্র নাস্তি, ঘটে পটে পূজা নাস্তি,
ত্রিসন্ধ্যা স্নান গায়ত্রী নাস্তি, মিছা শুধু হাত ঘুরাই।
কহে দ্বিজ কাণকড়ি, বেদ বিধি, সাধনের বৈরি,
পরম জান্‌লে পারের তরি ঘাটে বান্ধা চিন্তা নাই,
আত্ম তত্ত্ব, পর তত্ত্ব, গুরু তত্ত্ব, মন্ত্র তত্ত্ব,
ব্রহ্ম তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্বে, কৃষ্ণ পাই।

এই রূপ গান এবং সাধন সম্বন্ধীয় বহু পদাবলী পণ্ডিত মহাশয় রচনা করিয়া গিয়াছেন। সকল গুলি সংগ্রহ করিয়া লইলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে।

এই সকল গীত ও পদবলীর অর্থ আমরা সম্যক বুঝিতে পারি না। বাউল ভাবে অনুপ্রাণিত কবির কবিতা বুঝা বাউল সাধুর কার্য্য,—আমাদের মত বিষয় বিমুগ্ধ জনের কার্য্য নহে।

প্রবন্ধের লিখিত ৮।৯।১০ দফার পদ এবং ১১ দফার গীত ললিতা নাম্নী পণ্ডিত মহাশয়ের একটি শিষ্যা বৈষ্ণবীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। শেষ গীতটি ও অপর কয়টি কবিতা আমার নিকটেই ছিল। ললিতা বৈষ্ণবী বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট পণ্ডিত মহাশয়ের হস্ত লিখিত একখানা পদাবলী পুস্তক আছে। বহু চেষ্টা করিয়াও দেখিবার সুবিধা করিতে পারিলাম না।

মায়িক জগতে নবীনচন্দ্র নামে পণ্ডিত মহাশয়ের এক পুত্র ছিল। নবীনচন্দ্র পিতার পরলোক প্রাপ্তির অল্পদিন পরেই নবদ্বীপচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র দুই পুত্র রাখিয়া কাশীপ্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে নবদ্বীপচন্দ্র পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন সুখের কথা বটে,—সামীপ্য লাভে সমর্থ হইলেই আনন্দের উপর আনন্দ।

দুরূহ জটিল বিষয় সমূহের কবিতা করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী আপন কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

অশোকের নব জীবন।

(১)

"মন্ত্রী।"

"আদেশ করুন মহারাজ।"

"তুমি শাস্ত্র মান?"

"মহারাজ! শাস্ত্র মানিব না কেন?

"শাস্ত্রে নরক ভোগের কথা আছে জান?"

"জানি মহারাজ।"

"কিন্তু সে নরক ভোগ হয় কি না কে জানে? আমি ইহলোকে দোষী দিগকে নরক ভোগ করাইব; শাস্ত্রানুসারে দণ্ড দিব। তুমি নরক নির্ম্মাণ কর। নরকে যেমন যেমন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে এ নরকে সে সমুদয়ই থাকিবে। সেই তীব্র নীল শিখাময় অগ্নি, লৌহ দংষ্ট্রাশালী বৃশ্চিক, তীব্র

বিষধর সর্প, অগ্নিময় লৌহপুরুষ ও লৌহ স্ত্রী—সবই থাকিবে। আমি ইহলোকে মনুষ্যদিগকে নরক ভোগ করাইব।”

আদেশ শুনিয়া মন্ত্রী শিহরিল। প্রকাশ্যে বলিল—‘তাহাই হইবে মহারাজ।’

“কেবল তাহা হইলেই হইবে না। নরকের বহির্দ্দেশ এমন সুচিত্রিত, সুগঠিত ও সুনির্ম্মিত হইবে যে, এ ভুবনে উহার তুলনা নাই। তুমি সত্বর হও।”

(২)

পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের অদূরে বিচিত্র নরক নির্ম্মিত হইল। সুন্দর প্রাসাদ; উহার গঠন সৌন্দর্য্যে রাজপ্রাসাদও মলিন বোধ হইতে লাগিল।

নরকের অভ্যন্তরে প্রথমেই তরল অগ্নিময় বৈতরণী। তাহার পরে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নানা বিচিত্র যন্ত্রণার আয়োজন। মানুষের কল্পনায় যন্ত্রণা ভোগের যত চিত্র কল্পিত হইতে পারে তাহার একটীও উহাতে বাকী রহিল না।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধিগণ সেই নরকে শাস্ত্রানুযায়ী বিচিত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। কেহ নীলশিখ অগ্নিতে দগ্ধ হইল, কেহ হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় লৌহ দংষ্ট্রাশালী বৃশ্চিকের দংশনে চীৎকার করিতে লাগিল। দণ্ডধারী ভীমকায় চণ্ডালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডিত প্রজাদিগকে নরক ভোগ করাইতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকার উঠিল।

নৃপতি চণ্ডাশোক সে চীৎকার ও হাহাকার শুনিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য নূতন প্রণালীর নরক যন্ত্রণা তিনি শাস্ত্র দেখিয়া বাহির করিয়া মর্ত্ত্য ভূমিতে গড়িতে লাগিলেন।

প্রথমে দোষীরা নরকে যাইতে লাগিল। তাহার পর দোষী বলিয়া যাহাদিগকে সন্দেহ করা যাইত তাহারা গেল। শেষে আর দোষী নির্দ্দোষ ভেদ রহিল না। সেই নরকের আশে পাশে যাহাকে পাইত চণ্ডগিরিকের অনুচরেরা তাহাকেই আনিয়া নরক ভোগ করাইতে লাগিল; চণ্ডগিরিক অশোকের নরকের যমদূত ছিল।

মনোহর অট্টালিকা; দূর হইতে উহা দেখিয়া অনেক বিদেশী ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উহার কাছে আসিত। কিন্তু কাছে আসিলেই তাহাকে ভিতরে যাইতে হইত, নরক ভুগিতে হইত। একবার প্রবেশ করিলে বড় কেহ প্রাণ লইয়া বাহির হইত না।

(৩)

একদিন এক ভিক্ষু, নরকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ভিক্ষুর মস্তক মুণ্ডিত, পরিধান পীতবস্ত্র, হস্তে ভিক্ষা পাত্র। তাঁহার প্রশান্ত মুখ মৈত্রী ও করুণা মাখা। জীবের হিতের জন্য তাঁহার শান্তোজ্জ্বল নয়ন হইতে করুণার জ্যোতি বাহির হইতেছিল।

সম্মুখে মনোহর প্রাসাদ, অপূর্ব্ব স্থাপত্যে রচিত। ভিক্ষু একবার দাঁড়াইয়া সেই অট্টালিকার সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

রক্ত চক্ষু চণ্ডগিরিক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিল—“খাড়া রহ”। তাহার পর নিকটে আসিয়া সেই সৌম্য মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর হাত ধরিল।

সন্ন্যাসীর মুখ তেমনই শান্ত তেমনই করুণাময়। সেই যম দূতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“কল্যাণ হউক, কোথায় যাইতে হইবে, বাছা।”

“নরকে। তুমি নরকের পথে আসিয়াছ।”

“এ যে রাজপ্রাসাদ। ইহাই কি নরক?”

“হাঁ, ইহাই নরক। ভিতরে চল দেখিতে পাইবে। এ পথে আসিলে সকলকেই নরক ভোগ করিতে হয়; মহারাজের আদেশ।”

“কল্যাণ হউক। চল যাই।”

(৪)

চণ্ডগিরিক ভিক্ষুকে নরকে আনিয়া তপ্ত তৈলের কটাহে ফেলিল। ভিক্ষু সেই কটাহে বসিয়া শান্ত বদনে গাইতে লাগিলেন—

“ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।”

যমদূতেরা সেখান হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া নীলশিখ অগ্নিতে ফেলিয়া দিল। সন্ন্যাসীর শীতল দেহ স্পর্শে আগুন নিভিয়া গেল। বহুদিনের তপ্ত সেই নরক যেন শীতল হইল।

ভয়ে ও বিস্ময়ে চণ্ডগিরিক, অশোকের নিকটে যাইয়া জানাইল,—“মহারাজ, একটা ভিক্ষুকে নরক ভোগ করাইতেছিলাম কিন্তু সে ত নরক ভোগ করিলই না, বরং এত যত্নে নির্ম্মিত আমাদের নরক সে নষ্ট করিয়া ফেলিল।”

"কিরূপে নষ্ট করিয়াছে ?

"তাহাকে তপ্ত তৈলে ফেলিয়াছিলাম, তৈলের মধ্যে বসিয়া সে কি গান করিল, আর তৈল ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তাহার পরে তাহাকে আগুনে ফেলিয়াছিলাম; আগুন নিভিয়া গেল। মহারাজ, সে তপ্ত নরক একবারে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিয়াছে। নরকে আর জ্বালা নাই।"

"বলিস কি ?"

"হাঁ মহারাজ, এইরূপই বটে।"

"চল। আমি যাইব।"

অশোক চণ্ডগিরিককে লইয়া নরকে আসিলেন। ভিক্ষু তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

"সকলের কল্যাণ হউক, জগতের মঙ্গল হউক।"

"তুমি কে ?"

"আমি ভিক্ষু।"

"তুমি আমার নরকের জ্বালা নিভাইয়াছ ?

"জ্বালা নিভাইবার আমার সাধ্য কি মহারাজ। যিনি জীবের সকল দুঃখ, সকল জ্বালা নিভাইয়াছেন, সেই তথাগতই আপনার নরকের জ্বালাও দূর করিয়াছেন। মঙ্গল হউক, মহারাজ।"

"আমি দোষীকে নরক যন্ত্রনা ভোগ করাইয়া বড়ই আনন্দ পাইতাম।"

"মহারাজ, জীবের প্রতি করুণা করুন, উহা অপেক্ষা শতগুণ আনন্দ হইবে। ভগবান্ তথাগত, সর্ব্বজীবে মৈত্রী ও করুণার কথা বলিয়া গিয়াছেন।"

ভিক্ষুর মুখ বড় শান্ত, বড়ই করুণা মণ্ডিত। তাঁহার নয়ন হইতে যেন করুণার ধারা ক্ষরিতেছিল। তাঁহার করুণা মাখা কথাগুলি শুনিয়া চণ্ড অশোক কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ঝড় বহিল। অশোক একবার চণ্ডগিরিকের মুখের দিকে আর একবার ভিক্ষুর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। ভিক্ষুর বদন কি শান্ত, কি মমতা মাখা! এ যদি মানুষ, চণ্ডগিরিক যে, তাহা হইলে পশুরও অধম। হায় হিংসায় মানুষকে এমনই অধম করে। আমিও ত উহারই মত অধম হইয়াছি।

আপনার কার্য্যের জন্ত অশোকের অনুতাপ জন্মিল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া চণ্ডগিরিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আর নরক চাইনা, জগতে যন্ত্রণা আনিয়াছিলাম, জীবকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতাম, আর না, যদি পারি জীবের যন্ত্রণা দূর করিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুই পাটলীপুত্র ছাড়িয়া চলিয়া যা।"

(৫)

"ভিক্ষু, জীবের প্রতি মৈত্রী করুণা আমার নাই। আমি যে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়াই আনন্দ পাইতাম। বলিতে পার কেন এমন হইয়াছিল ?

"তুমি জীবদিগকে তোমার মত বলিয়া কখনও ভাব নাই। তাহাদেরও যে একটা সুখ দুঃখ আছে এবং সে সুখ দুঃখ যে তোমারই মত, তাহা একবারও অনুভব কর নাই। মহারাজ, জীবকে যন্ত্রণা দিয়া, বধ করিয়া, তোমার একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। উহা একটা উত্তেজনা মাত্র; আনন্দ নহে। এখন জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা দেখাও, আনন্দ পাইবে; জগৎ সুখময় দেখিবে। সকলে তোমার আপন হইবে।"

"কিরূপে আমার প্রাণে মৈত্রী ও করুণা আসিবে, ভিক্ষু। আমি যে চণ্ডা-শোক।"

"তুমি সকল জীবকে আপনার মত ভাব, তোমার মতই সকল জীবের যে সুখ দুঃখ আছে অনুভব কর, তবেই সকলকে সুখী করিতে আকাঙ্খা হইবে। তোমার হৃদয়ে মৈত্রী ও করুণা উজ্জল হইয়া উঠিবে।"

"মহারাজ, যন্ত্রণার নরক গড়িয়াছিলে, এখন শান্তির স্বর্গ প্রতিষ্ঠা কর। তথাগত, তোমাকে কৃপা করুন।"—বলিতে বলিতে সেই মুণ্ডিত মস্তক শান্তশ্রী ভিক্ষু চলিয়া গেল।

(৬)

অশোকের হৃদয়ে ঝড় বহিয়াছিল, এবার বিদ্যুৎ চমকিল। অশোক দেখিলেন সত্যই তিনি কোন জীবকেই আপনার মত বলিয়া ভাবেন নাই। কাহারও প্রাণে যে সুখ দুঃখ বোধ আছে, একথা তাহার মনে হয় নাই। সকলকে দুঃখ দিয়াছেন, কাহাকেও সুখী করেন নাই।

সম্মুখে নরকের আগুন তখনও জ্বলিতেছিল অশোক সেই আগুনে হাত দিলেন, হাত জ্বলিয়া গেল। অশোক হাত টানিয়া লইয়া শিহরিয়া উঠিলেন—হায়, কত লোককে এ

জ্বালায় জ্বালাইয়াছি। তপ্ত তৈলে অঙ্গুলি দিলেন, অঙ্গুলি পুড়িয়া গেল। জ্বালায় অশোক অস্থির হইলেন—হায় এত জ্বালা আমারই মত অসংখ্য মানবকে দিয়াছি।

এবার অশোক আপনার জ্বালা দিয়া পরের জ্বালা বুঝিলেন। জীবের প্রতি মৈত্রী আসিল, করুণা জন্মিল। কিরূপে জগতের দুঃখ দূর করিবেন, অশোক তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

(৭)

স্নিগ্ধ প্রভাত। শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছিল, উদ্যানের ফুলগুলি হইতে মধুর গন্ধ ছুটিতেছিল, উপবনে কলকণ্ঠ বিহঙ্গেরা মধুরস্বরে গান করিতেছিল। জগৎ শান্ত, রমণীয় ও করুণাময়।

এই স্নিগ্ধ প্রভাতে পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া এক সপ্তবর্ষীয় বালকভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া পীতবসন পরিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছিল—

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনোপদং,

অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামতা।

(অপ্রমাদ অমৃতের পথ; প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত, মরে না; যাহারা প্রমত্ত তাহারা মৃতের মত।)

সম্রাট অশোক বাতায়ন পথ দিয়া রাজপথেরদিকে চাহিয়াছিলেন। বালক ভিক্ষুর মধুর কণ্ঠে এই মধুর বাণী শুনিয়া তাঁহার চিত্ত অমৃতেরপথ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দেশ ও কালের একটা প্রভাব আছে। সেই মধুরপ্রভাত, ভিক্ষু বালকের সেই শান্ত মধুর মূর্ত্তি, আর তাহার সেই কলকণ্ঠ বিহঙ্গের ন্যায় সিগ্ধ করুণা মাখা কণ্ঠস্বর, এ সকলে মিলিয়া অশোককে যেন একবারে বিগলিত করিয়া ফেলিল।

অশোক প্রহরীকে আদেশ করিলেন, ঐ যে রাজপথ দিয়া বালক সন্ন্যাসী যাইতেছে উহাকে এখানে লইয়া আয়।

প্রহরী বালককে লইয়া আসিল। "জগতের কল্যান" হউক বলিয়া ভিক্ষু বালক সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

অশোক বলিলেন—"ভিক্ষু তুমি রাজপথে কি গাথা গাইতেছিলে, আবার গাও। বালক গাইল—"অপ্রমাদ অমৃতের পথ।"

বলিতে পার, এ অমৃতের পথে কিরূপে যাওয়া যায়?

জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা করিয়া—জগতের কল্যাণ চাহিয়া। মহারাজ, আমি বালক, আপনাকে কি বলিব? স্থবির উপগুপ্তকে আনয়ন করিয়া আপনি ভগবান তথাগতের শরণ লউন। অমৃতের পথ পাইবেন।

"উপগুপ্ত কোথায়?

"তিনি মথুরায় থাকেন।"

ভিক্ষু বালক বিদায় হইল।

(৮)

সেই দিনই অশোক, স্থবির উপগুপ্তকে আনিবার জন্য বিনয়পূর্ণ পত্রী সহ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পাঠাইলেন। উপগুপ্ত আসিলেন। তাঁহার শান্ত ও পবিত্রমূর্ত্তি দেখিয়া অশোকের মনে হইল আমি এই পৃথিবীতে নরক গড়িতে গিয়াছিলাম, তথাগতের উপদেশে স্বর্গগঠিত হইয়াছে। এই স্থবিরেরা সেই স্বর্গের দেবতা।

অশোক উপগুপ্তের পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—"আমাকে অমৃতের পথ দেখাইয়া দিন। আমি মানবের ক্লেশের নরক নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন।"

উপগুপ্ত বলিলেন "মহারাজ, জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণাই অমৃতের পথ। ইহাই মানুষকে মঙ্গলের স্বর্গে লইয়া যায়। এই মৈত্রী ও করুণার বিস্তারেই আপনার সকলপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আসুন আপনাকে তথাগতের ধর্ম্মে দীক্ষিত করি। বলুন—

"ধম্মং শরণং গচ্ছামি,

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

সকল প্রাণীকেই নিরুদ্বেগ ও সুখী করুন। আপনি অমর হইবেন, আপনার সকল কলঙ্ক মুছিয়া যাইবে।"

উপগুপ্তের দীক্ষায় অশোক নবজীবন লাভ করিলেন। সেইদিন জগতের স্মরণীয় দিন, যে দিন সম্রাট অশোকের হৃদয় হইতে করুণার অমৃতধারা সকল জীবের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত প্রবাহিত হইয়াছিল।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

আলোচনা ও মন্তব্য।

বাংলা সাহিত্যের গৃহস্থালী—গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ

করিয়াই গৃহী চিন্তা করেন, কি কি সরঞ্জাম হইলে তাঁহার গৃহটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কি কি জিনিষ দিয়া গৃহটীকে সাজাইতে হইবে, এবং কেমন করিয়া উহাকে মনোরম ও নয়নাভিরাম করিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ ও রুচিমান্ গৃহী মাত্রেই যথাসাধ্য সাজসরঞ্জাম দিয়া গৃহটীকে এমনই করিয়া তুলিতে চান, যাহাতে একাধারে অভাবের পূরণ ও চিত্তের প্রসাদ উভয়ই লাভ করা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ও আজ গৃহস্থালী আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং এ গৃহের নির্ম্মাণে ও শোভা সম্পাদনে যাঁহারা সমুৎসুক তাঁহাদের চিন্তনীয় বিষয়, কিসে ইহার প্রতি জগতের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইবে। আমাদিগকে সুতরাং ভাবিতে হইতেছে, এ গৃহস্থালীর জন্য আর কি কি চাই।

দুইটী বিশাল সভ্যতার সহিত আমরা অতি ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত;—মুসলমান সভ্যতা ও ইউরোপীয় সভ্যতা। আমাদের উচিত ইহাদের সম্যক্ পরিচয় লওয়া। মুসলমানেরা যদি তেমন উৎসাহের সহিত বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, তাহা হইলে মুসলমান সভ্যতার অনেক তথ্য এতদিন আমাদের জানা হইয়া যাইত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে মুসলমান পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে অবহেলা করিয়া চলিয়াছেন বলিয়া শুধু আমরাই যে মুসলমান সভ্যতার রসাস্বাদনে বঞ্চিত তাহা নহে; যে ভাষায় সেই সভ্যতা প্রকাশ লাভ করিয়াছিল সে ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরাও তাহার তত খবর রাখেন না।

ইউরোপের অন্ততঃ একটী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচয় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই আছে। কিন্তু তথাপি সে দেশের সভ্যতার ঠিক ঠিক স্বরূপ আমরা ধরিতে পারিয়াছি—কি না সন্দেহ—তাহার আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছি কি না সন্দেহ। ইউরোপের বাহ্য আচার আমরা অনেক অনুকরণ করি বটে, কিন্তু সে দেশের সভ্যতার বীজ কোথায় তাহার খবর রাখি কি না সন্দেহ, আমাদের অনুকরণ শুধু পল্লব গ্রাহিতা মাত্র।

মনে রাখিতে হইবে, তিনটী স্বতন্ত্র সভ্যতার সংমিশ্রণে ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকি যে, বর্ত্তমান ইউরোপ প্রাচীন গ্রীস হইতে তাহার কলা বিদ্যা ও সাহিত্য, প্রাচীন রোম হইতে রাষ্ট্র-নীতি ও ব্যবহার-নীতি, এবং ইহুদীদের নিকট হইতে তাহার ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া এ তিনের সংমিশ্রনে এত বড় একটা বিরাট সভ্যতার জন্ম হইল, তাহার সূক্ষ্ম ইতিবৃত্ত আমাদের জানা কর্ত্তব্য। ইতিহাসের চর্চ্চা বাংলা ভাষায় আজ কাল মন্দ হইতেছে না; কিন্তু সে সকলই শুধু স্থান বিশেষ নিয়া, সমস্তই কেবল তারানাথ ও শ্যামল বর্ম্মার বিষয়ে। এখানে আমরা অত্যন্ত স্বদেশী ভাবাপন্ন। কিন্তু বিদেশের ইতিহাস চর্চ্চা যদি কেহ না করিত; তবে আমাদের স্বদেশ-বিষয়ে অনেক কথাই জানা হইত না; কারণ আমরা যাহা কিছু করিতেছ তাহার সকল গুলিরই আরম্ভ হইয়াছিল ইউরোপীয় মনিষীদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে।

আমরা যে অভাবের কথা এখানে তুলিয়াছি—এক কথায় বলিতে গেলে তাহা এই যে, জীবিত ও মৃত বিভিন্ন ভাষার সম্পদ্ বাংলায় অতি মন্থর ভাবেও আসিতেছে বলিয়া মনে হয় না। কোরাণের একটী উল্লেখ যোগ্য বাংলা অনুবাদ নাই; বাইবেলের ও নাই। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলা ভাষার সাহায্যে কোন জ্ঞানই লাভ করা যায় না। এ সব অভাব থাকা পর্য্যন্ত ভাষা কখনও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। ইউরোপের সমৃদ্ধ ভাষা মাত্রেই এ সকল জ্ঞান দিতে পারে; শুধু তাই নয়, আমাদের বেদ-উপনিষদ্, দীপঙ্কর-গোপালের কথাও তথায় মিলিবে।

ময়মনসিংহ লিপিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাচীন ময়মনসিংহের উপেক্ষিত ঐতিহাসিক সম্পদ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সন। { ৮ম সংখ্যা।

আলোচনা ও মন্তব্য।

রমণীর উচ্চ-শিক্ষা—কন্যাকেও যে শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা আর এখন কেহই অস্বীকার করে না; কোনও দিন কেহ করিয়াছিল কি না, বলা কঠিন। এক সময় অবশ্যই এ দেশে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে, এ দেশের লোকের এ জ্ঞানটুকুও ছিল না; তখন, 'কন্যা চাপি পালনীয়া শিক্ষনীয়া তি যত্নতঃ'—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই উক্তিটাকে একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু পিতা মাত্রেই সমাজের আদি হইতেই কন্যাকে পালন করিয়াছেন এবং কোন না কোনরূপ শিক্ষাও দিয়া আসিয়াছেন। যেরূপ শিক্ষার অনুমোদনের জন্য এই শ্লোকার্দ্ধটীকে মূল্যবান মনে করা হইয়াছিল, সেরূপ শিক্ষার ধারণা প্রাচীন শাস্ত্রকারদের ছিল না; সুতরাং তাঁহারা তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলেন নাই। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, অধুনা—উচ্চ শিক্ষা—অর্থে আমরা যাহা বুঝি, কন্যারও তাহা প্রাপ্য কি না। এ প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রের সাহায্যে হইতে পারে নাই।

প্রশ্নটার একটা মীমাংসা যে তখন হইয়াছিল, তার প্রমাণ কলিকাতার বেথুন কলেজ। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত মীমাংসা কি না সন্দেহ। অবশ্যই ইহাই বলবত্তর মত। এখনও মেয়েদের জন্য নূতন নূতন কলেজ স্থাপনের উদ্যম ক্ষীণ হয় নাই। সেদিনও দিল্লীতে মেয়েদিগকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিদ্যা শিখাইবার জন্য একটী কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে; এবং ঢাকাতে যে বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, তাহার অধীনও একটী রমণীর কলেজ রাখিবার প্রস্তাব রহিয়াছে।

তথাপি রমণীর উচ্চ-শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু বলার নাই, এমন নয়। কয়েক মাস পূর্ব্বেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অধুনাতন উচ্চ-শিক্ষার ফলে রমণীর স্বাস্থ্য দিন দিনই খারাপ হইয়া যাইতেছে। আগে যাহা হয়ত শুধু আনুমানিক যুক্তি-তর্কের বিষয় ছিল, এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি তাহার বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইহার পক্ষে কি বলার আছে সে বিষয়ে অনুধাবন আবশ্যক।

কন্যাকে অতি যত্নে শিক্ষা দিবে, কিন্তু তাহাকেও বি-এ, এম-এ, পাশ করাইতে হইবে কি না তাহাই বিচার্য্য। কন্যাকে শিক্ষা দিবার বেলায় আমাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য কি? আমরা সর্ব্বাগ্রে চাই উত্তমা জননী; এ বিষয়ে দ্বিমত আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং যদি কোনও প্রণালীর শিক্ষা ভবিষ্যৎকালের জননীদের স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, সে শিক্ষা দেশের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। ডাক্তারদের মধ্যে কেহ কেহ যখন বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন, তখন স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেরই বিষয়টার পুনরালোচনা আবশ্যক।

উত্তমা জননী অর্থে অবশ্যই শুধু দেহে সুস্থ রমণীকেই বুঝায় না;—মনের স্বাস্থ্যও কম মূল্যবান নহে;—কিন্তু দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া তথা-কথিত মনের স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা বিষ্ণু শর্ম্মার সেই শৃগালের অনুরূপ 'যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।'

আমরা সমস্যাটীর প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র, কোন মত প্রকাশ করিতেছি না। কারণ, আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান এখনও হয় নাই।

শাস্ত্র ও বিজ্ঞান।—সাহিত্য চর্চ্চা করিবার সময় প্রাচীন লুপ্তপ্রায় লেখকদের লেখার কথা আমরা যত ভাবি বিনাশের মুখ হইতে প্রাচীন কবিদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা আমরা যত করি, প্রকাশ্যমান বা প্রকাশিত গ্রন্থের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা আমরা তার অর্দ্ধেকও করি কিনা সন্দেহ; এবং রক্ষিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মূল্য এবং জাতির সাহিত্যে তাহাদের স্থান যে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে নির্দ্ধারিত হইতে পারে এবং হওয়া উচিত—এ কথা আদৌ ভাবি বলিয়াই মনে হয় না। নিজের দেশের যে সমস্ত গ্রন্থের সহিত আমরা পরিচিত সে সকলের কতক শাস্ত্র গ্রন্থ আর বাকী ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যের বিবিধ প্রকার বিচারে কোনই বাধা থাকিবার কথা নহে; সেখানেই যখন কেবল ঐতিহাসিক ও লুপ্ত রত্নের উদ্ধারকারী না হইয়া যথার্থ সমালোচক হইতে আমাদের এত অনিচ্ছা, তখন যে সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত, যে সকলের বিচারে ব্যক্তি বিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের গৃহীত মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে পারে, সে সকলের প্রকৃত সমালোচনা করিতে আমরা যে সাহস পাই না, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সুতরাং দাঁড়াইয়াছে এই যে, কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত যদি জানিতে চায় আমাদের ধর্ম্ম কিংবা অন্য কোন বিশিষ্ট আচার কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে আমাদের ভাষায় কোন বইয়ের নাম আমরা করিতে পারি না। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তনের কত বিস্তৃত ইতিবৃত্ত রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের কোন ইতিহাস নাই। ইস্কুলের ছোকড়া পর্য্যন্ত বলিয়া বসে, সাহেবেরা কি ও সব বুঝিবে। অর্থাৎ এতকাল আমরা মনে করিতাম আমাদের জ্ঞান কাহাকেও জানাইবার প্রয়োজন নাই, নিজেরা জানিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এখন যে নিজেদের মধ্যেই সে প্রশ্ন উঠিয়াছে, তার খবর রাখি কি? এবং উত্তর যে অনেকে পাদ্রীদের লিখিত পুস্তক হইতে গ্রহণ করে, তাহা আমাদের চোখে পড়ে কি? সেদিন এক পাদ্রীর লিখিত পুস্তক দেখিতেছিলাম; তাহাতে ইনি হিন্দুধর্ম্মের ক্রম বিকাশ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্যই, উনি যে রকম বুঝিয়াছেন, কিংবা বুঝিতে চাহিয়াছেন, সেরূপই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দিকের বক্তব্য ত বহু খুঁজিতে হয়, তথাপি সব সময় মিলে কি না সন্দেহ।

আর এক কথা। সে দিন একখানা বই পড়িতেছিলাম তাহা—মানবের বিবাহ-পদ্ধতির ইতিহাস। বইখানিতে গ্রন্থকার কালিফর্ণিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া কামস্কাট্কা পর্য্যন্ত এবং গ্রীনল্যাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া টিয়ের-ডেল্-ফিউগো পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমণ্ডলে যতপ্রকার মানব-সমাজ আছে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত বিবিধ প্রকারের বিবাহের বৃত্তান্ত যথাসম্ভব সংগৃহীত করিয়াছেন; এমন কি, হেরোডোটস্ প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকদের লিখিত বৃত্তান্তের সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন। এত অনুসন্ধানের ফলে বিবাহের ক্রম বিকাশের যে কয়টী স্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সঙ্গে মিলাইলে আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত অষ্টপ্রকার বিবাহের অর্থ অনেক ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এইখানে আমাদের শাস্ত্র বিজ্ঞানকে সহায়তা করিতে পারে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে শাস্ত্রের গূঢ় অর্থও আমরা স্ফুট করিয়া তুলিতে পারি। কর্ণবেধ, চূড়াকরণ (বা মস্তকমুণ্ডন) প্রভৃতি যে সমস্ত আচারকে আমরা আমাদের বিশিষ্ট সম্পত্তি মনে করি টাইলর্ প্রভৃতি দেখাইয়াছেন, সে সমস্তও পৃথিবীর অন্যান্য বহু জাতির মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিজ্ঞানের এই সকল আবিষ্কারের সঙ্গে মিলাইলে শাস্ত্রের বিহিত আচারের কি অর্থ হইবে, জানি না; কিন্তু মিলাইতে দোষ কি?

শাস্ত্র নিজেই বলেন, "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"; এই যুক্তির অবাধ ক্রিয়া যদি কোথাও থাকিয়া থাকে, তবে তাহা বিজ্ঞানে। সুতরাং বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের সখ্য সম্পাদনে আমরা কেন সহায়তা করিব না। খ্রীষ্টানধর্ম্ম বিজ্ঞানকে এই সহায়তা অনেককাল করিতে চায় নাই; এমন কি, বিজ্ঞানের নিজের রাজ্যেও তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। ইউরোপে বিজ্ঞান এখন

যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, বিনা রক্তপাতে তাহা হয় নাই। কিন্তু উদার ধর্ম্ম আমাদের; আচার সংযত করিতে চাহে সত্য, কিন্তু বিচারে কোথাও বাধা দেয় না। আমরা কেন অসীম জ্ঞানের পথে আমাদের জাতির মনকে চালাইয়া দেই না?

ভাবুক ও কর্ম্মী।—প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এক বার প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কর্ম্মীর জীবন বড় না ভাবুকের জীবন বড়? মীমাংসা হইয়াছিল, গভীর তত্ত্বের—দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজের গূঢ় সত্যের অনুসন্ধানে যে জীবন ব্যয়িত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। অবশ্যই ইহা ছিল এক পক্ষের সিদ্ধান্ত, জীবিকার জন্য যাহাদের খাটিতে হইত না তাহাদের সিদ্ধান্ত। কর্ম্মী সে দেশে তখনও ছিল এবং তাহারা নিজেদের জীবনটাকে নিতান্তই মূল্যহীন মনে করিত না। জ্ঞান ও কর্ম্মের কলহের সহিত আমরাও সুপরিচিত। এবং আমাদের দেশেও বিবিধ প্রকার মীমাংসা হইয়াছিল। এবং উপনিষদে উদর ও হস্তপদাদির রূপক দ্বারা ব্যক্তির এবং সমাজের বিবিধ প্রকার শক্তির যে সমন্বয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, গীতার রূপকের সাহায্য ছাড়া অধিকতর গভীর ভাবে তাহা করা হইয়াছিল।

কিন্তু মানুষের জীবন এখনও শেষ হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে নূতন নূতন অবস্থার ভিতর মানুষকে বার বার পুরাতন প্রশ্নের বিচার করিতে হইতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কে বড়, এই প্রশ্নও কাজেই এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতেও বিপ্লুত ফরাসী দেশে এবং কারুশালার পূর্য্যমান সমগ্র ইউরোপে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে মনে হয় একটা কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে; এখন আর কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট এই প্রশ্নের কোন অর্থ নাই, কারণ এখন আমরা বুঝি সকলই পরস্পরের জন্য দরকার। কারুশালার ফোর পতি যে মনে করিবেন, যে ব্যক্তি কেবলই মুদ্রিত বা লিখিত অক্ষর ঘাটিয়া বাহির করিতে চায়—রোমের অধিবাসীরা কিসে বড় হইয়াছিল কিংবা গ্রীক সভ্যতার কি বিশিষ্টতা ছিল, সমাজে তাহার কোন উপযোগিতা নাই, নিরর্থকই তাহাকে বেতন দেওয়া হয়,—তাহা আর এখন হইবার যো নাই; আর, বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে মনে করিবেন, যে ব্যক্তি মাটী খুঁড়িয়া লোহা বাহির করে এবং লোহা পিটাইয়া নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ার করে, সে একটা মস্ত অপকর্ম্ম করে, সে পতিত,—তাহাও হইবার যো নাই। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ—যাঁহাদের মুখে অন্ততঃ স্বীকৃত কার্য্য হইতেছে—বালক ও যুবকদের মন গঠন করা, তাহাদের কার্য্য যেমন সমাজের উপকারী, যাহারা বিবিধ কারুকর্ম্ম ও ব্যবসায় দ্বারা সমাজের ধন বৃদ্ধি করে তাহাদের কাজও তেমনই হিতকর। একথা আজ কাল মোটামুটি স্বীকৃত। বর্ত্তমানে সুতরাং কে বড় কে ছোট—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীবৎস রাজার মত লাঞ্ছিত হইতে হইবে না।

বর্ত্তমানে বিচার্য্য বিষয় কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পরস্পর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধেও মনে হয় ফরাসী দার্শনিক কোঁতের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই। জ্ঞানী জ্ঞান দিবেন এবং কর্ম্মী সেই জ্ঞান অনুসারে কাজ করিবেন, ইহা ইউরোপের সকল দেশেই আজ কাল স্বীকৃত। বার্ক ও মিলের চিন্তা প্রবাহ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রে ও সমাজে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু তাঁহারা দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না; এবং মিল অন্ততঃ দেশ বিশ্রুত বাগ্মীও ছিলেন না। কর্ম্মীরা তাঁহাদের সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিসের শিক্ষা যেমন গোপনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যদিও সক্রেটিস্ নিজে একখানা বইও লিখেন নাই, তেমনই মিলের বাড়ীতে যে সকল কর্ম্মী পার্লেমেণ্টের সভ্য একত্র হইতেন, মিলের শিক্ষা ও পরামর্শই তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দিত। নব্য জার্ম্মেনীর সভ্যতা ও বর্ত্তমান সমরের জন্য সে দেশের অধ্যাপকদিগকে কি পরিমাণে দায়ী করা হইয়া থাকে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, এই উপলক্ষে নীট্চে ও ট্রীট্‌চ্‌কের নাম যত বার করা হইয়াছে, হিণ্ডেনবার্গ এমন কি স্বয়ং কৈসরের নামও তাহার চেয়ে খুব বেশী নেওয়া হইয়াছে কি না সন্দেহ। কর্ম্মকে পরিচালিত করিবার অধিকার জ্ঞানের যে আছে, তাহা সুতরাং স্বীকৃত। সমাজে শ্রম বিভাগ যখন হইয়া গিয়াছে, তখন ইহাই যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। ব্যক্তির জীবনেও দেখিতে পাই, ভাবিয়া যে ব্যক্তি কাজ করে, কাজ তাহার চিন্তাকে চাপিয়া রাখে না, চিন্তাই তাহার কাজকে পরিচালিত করে।

আমাদের দেশে যাঁহারা দেশের বিবিধ উন্নতির জন্য চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন তাঁহারা কখনও ভাবেন কি? ভাবিবার সুযোগ ও সময় তাঁহাদের আছে কি? না থাকিলে অন্য কোন, ভাবুক শ্রেণী এ দেশে আছে কি? এবং তাঁহাদের চিন্তার ফল কর্ম্মীরা গ্রহণ করিতে চান কি? মনে হয় আমরা যেন সকলই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, দর্শক বৃন্দের বাহবার ভিখারী। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ভাবুকের ভূমিকা যাঁহার ভাগ্যে পড়িয়াছে তিনি চিন্তা করিবার আগেই দেখাইতে চান যে তিনি চিন্তাশীল; আর কর্ম্মী তাঁহার ঘনায়মান যশের বন্যায় চিন্তার কোন আবশ্যকতাই দেখিতে পান না। আমাদের সমাজের স্বাস্থ্য ফিরিবে কবে?

ফলেন পরিচীয়তে।

যীশু কহিয়াছিলেন 'বৃক্ষকে তাহার ফল দেখিয়াই চিনিতে হয়'; যোহন স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, 'যে বৃক্ষ সুস্বাদু ফল ধরে না, মানুষ তাহাকে কাটিয়া আগুনে নিক্ষেপ করে।' যীশু এবং যোহন য়ীহুদীদের আচার ধর্ম্ম ও নীতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মনে হয়, ব্যক্তি ও জাতিকে জীবনে একাধিকবার তাহা স্মরণ করিতে হয়। অনেকে যেমন বলিয়া থাকেন, বাস্তবিকই যদি তেমনই মানুষের ইতিহাস একটা বর্দ্ধিষ্ণু উন্নতির কাহিনী হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, একাধিকবার মানব জাতি যীশু ও যোহনের এই নীতি অনুসরণ করিয়াছে। বিলাসমগ্ন রোম যখন ত্যাগে ও বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহার কুফল-প্রসূ পূর্ব্বাচারকে সে কুফলপ্রদ বৃক্ষেরই মত কাটিয়া অনুতাপের আগুনে পুড়াইয়াছিল। মধ্য যুগের ফলহীন কথা কাটাকাটির পর ইউরোপ যখন বেকন ডে-কার্টের নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করিয়াছিল তখন নূতনত্বের মোহে সে অন্ধ ছিল না, নিষ্ফল বলিয়াই প্রাচীনকে সে ত্যাগ করিয়াছিল।

তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, একগাছ তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর দার্শনিক তত্ত্ব পর্য্যন্ত,—যে সমস্ত বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাদের সকল গুলিরই একটা মূল্য আমরা নির্দ্ধারণ করিয়া লই; এবং এই মূল্যের উপরই আমাদের আদর অনাদর নির্ভর করে। যে বস্তুর মূল্য আছে তাহার জন্য আমরা যত্ন নিয়া থাকি, আর যে বস্তু আমাদের কোন কাজে আসে না তাহাকে যে শুধু অনাদর করি তা নয়, তাহার স্থানে অধিকতর মূল্যবান বস্তু স্থাপন করিবার জন্য তাহার প্রতি অগ্নি প্রবেশেরও বিধান দেই। এই নিয়ম অনুসারে প্রাণিজগতে কত জন্তু এবং মানবসমাজে কত আচার, কত ধর্ম্মমত, কত বিহার-সঙ্ঘ লোপ পাইয়াছে তাহার সংখ্যা আমরা করিতে পারি কি? জীবিত মানুষ যেমন অশনে বসনে সর্ব্বদাই বিবেচনা করিয়া চলে, কিসে তাহার মঙ্গল হইবে এবং কিসে অনিষ্টের পরিহার সম্ভব, জীবিত সমাজও তেমনই ভাবিয়া চলে তাহার গৃহীত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনগুলি রক্ষণীয় আর কোনগুলি বর্জ্জনীয়। রক্ষণীয়কে যে রক্ষা করিতে না পারে এবং বর্জ্জনীয়কে যে বর্জ্জন না করে, তাহার জীবনের চিহ্ন কোথায়?

সমাজ ও ব্যক্তির কাজে একটুকু তফাৎ এই যে, ব্যক্তির চিন্তা একা তাহাকেই করিতে হয়, কিন্তু সমাজের কাজ দশে করিয়া থাকে। সমাজের পক্ষে কি ভাল আর কি মন্দ সমাজের প্রত্যেককেই তাহা ভাবিতে হয় না! এবং—কাহারও কাহারও মতে—ভাবা উচিতও নয়। কিন্তু এমন লোক সকল সমাজেই চাই, যাঁরা সমাজের হিতাহিত চিন্তা করেন। আর সমাজের উচিত, ইঁহাদের চিন্তার ফল গ্রহণ করিয়া ফলদায়ী বৃক্ষকে রক্ষা করা এবং ফলহীন বৃক্ষকে কর্ত্তন করিয়া অগ্নিমুখে অর্পণ করা। যে সমাজ তাহা করে না, বুঝিতে হইবে, তাহার চলচ্ছক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং মৃত্যু তাহারদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

সমাজের এই বিচার শুধু পুরাণ-পাঠ মাত্র নহে; জীবনের এই লক্ষণ শুধু প্রাচীনের দোষ গুণ বিচারেই প্রকাশ পায় না। বর্ত্তমানের প্রতি যে সমাজ এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি না রাখে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। প্রাচীনকালে

যাহা আচরিত ও অনুষ্ঠিত হইত, প্রাচীনকালে যে সমস্ত বিশ্বাস ও ধারণা ছিল, তাহার দোষ গুণ বিচার যেমন করা উচিত, বর্ত্তমানে যে সমস্ত আচার আমরা অনুসরণ করি, যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে আমাদিগকে জড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার ফলাফল বিবেচনা করাও তেমনই কিংবা ততোধিক উচিত। তাহা না করিলে বুঝিতে হইবে, আমরা ভাবিবার শক্তি ও সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বিচার আর প্রচার এক বস্তু নয়। আমরা বিচারের কথা বলিতেছি, প্রচারের বিষয় নয়। প্রচারের অর্থাৎ স্বীয় মত ও স্বীয় আচারের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার বেগ এ দেশে মন্দীভূত দেখা যায় না; কিন্তু যেমন করিয়া বিজ্ঞানের কি বা দর্শনের সত্যাসত্যের বিচার করা হয়, তেমন নিরপেক্ষভাবে সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিচার আমরা করিয়া থাকি কি? খ্রীষ্টান ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উৎপত্তি, উপযোগিতা, মূলতত্ত্ব প্রভৃতি ঐতিহাসিক দার্শনিক সমস্যার যে সূক্ষ্ম বিচার করা হইয়া থাকে, আমাদের সাহিত্যে সেরূপ কিছু দেখাইবার আছে কি? রাজার ধর্ম্ম বলিয়া ভয়েই হউক, কিংবা কিছু জানি না বলিয়াই হউক, ঐ সব দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিজেদের বেদ উপনিষদের, সভ্যতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার এত যে বড়াই করিয়া থাকি, তাহারও কোনরূপ সূক্ষ্ম বিচার আমরা করি কি? ছাপার প্রশ্নে কয়েকটী অশুদ্ধ প্রয়োগ দিয়া ছাত্রকে বলা হইয়াছিল, 'শুদ্ধ কর কিংবা সমর্থন কর।' উত্তরে ছাত্র মুদ্রিত প্রশ্নই পুনর্ব্বার লিখিয়া দিয়াছিল। হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষক যখন সস্নেহে জানিতে চাহিয়াছিলেন ছাত্র কি লিখিয়াছে, ছাত্র তখন বলিয়াছিল যে, সে 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং,—এর বেশী আর কিছু করে নাই; কারণ, ছাপার অক্ষরে কি ভুল থাকে? আমাদেরও তেমনই কাহারও কাহারও ধারণা জন্মিয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিত আছে তাহার বিচার অসম্ভব, বিশেষত ধর্ম্মের বিচার মোটেই সম্ভব নহে। কেহ বা একেবারেই শ্রদ্ধাহীন আর কেহ বা একেবারেই অন্ধ বিশ্বাসের অধীন; কিন্তু নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিচারের অধীনে এ সমস্তবিষয়ও যে আসিতে পারে, তাহা আমাদিগের এখনও শিখিবার বাকী আছে।

মাসিক পত্রিকার সম্পাদক লেখকের নিকট দাবী করিয়া বসেন, লেখা অসাম্প্রদায়িক হওয়া চাই। কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিশ্বাস বা আচারের উপর অনাবশ্যক রূপে নির্দ্দয় আক্রমণ অনেকের নিকট রুচিকর নহে; কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে ভাবিবার ও মত প্রকাশ করিবার অধিকার না দেওয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় সকলের চেয়ে নিন্দনীয় অন্তরায়। কাহারও গৃহীত বিশ্বাস বা অনুষ্ঠান বিচলিত হইতে সহায়তা করিব না, এই মনে করিয়া লিখিতে গেলে শুধু পাটীগণিত লিখিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে হয়। যে সকল বিষয়ের প্রতি কাহারও আগ্রহ কিংবা বিদ্বেষ নাই, যে সমস্ত বিষয়ে সকলেই নির্ব্বিকার, সে সমস্ত এমনই বিষয় যে তাহাদের সম্বন্ধে লেখা বেশী লোকে পড়িতে চাহিবে না, এবং সে সকলের ভিতরে কোনরূপ উৎসাহ বা উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাহীন, উদ্দীপনাহীন, নির্গুণ সাহিত্য নিয়া কোন্ জাতি কবে বড়াই করিতে পারিয়াছে? সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, সমাজে যে সকল শিল্প বা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, সে সমস্তই আমাদের মনে কোন না কোন ভাব উদ্দীপ্ত করে, সে সমস্তই কোন না কোন প্রকারে আমাদের জীবনে ফল-প্রসব করে; কিন্তু এ সমস্ত বিষয় বিচার বা অনুভূতি যদি সাহিত্যে গ্রহণ করিতে না চায়, তবে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ বলিবার কোনই হেতু থাকিবে না। জ্ঞানের বৃদ্ধি সুতরাং সাহিত্যের সমৃদ্ধি আমরা তখনই আশা করিতে পারি, যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয়েরই—গগনের গ্রহ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি পর্য্যন্ত, ঈশ্বর অস্তিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্কটনারায়ণ ব্রতের বিষয় পর্য্যন্ত, সৌরমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুসমাজে কর্ণবেধ প্রথা পর্য্যন্ত— সকল বিষয়েরই বিচার ও চর্চ্চা সাহিত্যে সম্ভব হয়। প্রচারে যে বাগ্মিতা বাহিত হয় তাহা সাহিত্যে সকলের চেয়ে মূল্যবান সামগ্রী নয়; অথচ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-সম্মত বিচারে আমরা এতই অপটু যে, সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিবাদের আলোচনা করিতেও আমরা শুধু ভক্তি কিম্বা অবহেলাই দেখাইতে পারি, তুলনা বা সমালোচনার কাছে বড় যাইতে চাই না।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নাম করেন না এমন লেখক বাংলায় কম। কিন্তু যেরূপ সমাজে, যেরূপ আচার ব্যবহারের ভিতর ইহাদের জন্ম হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম বিশ্বাস ইহাদের লেখায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণের চেষ্টা আমরা করি কি? পরকীয়া নায়িকা না হইলে যাহাদের রসের সঞ্চার হইত না, সোজা কথায়, বিধবা রজকিনী না হইলে যাঁহারা কবিতা লিখিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি, তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের কবিতা পড়িতে পারি, কিন্তু তাঁহাদিগকে বুদ্ধ বা যীশুর মত সম্মান করিতে পারি না। বিলাসের ভিতর দিয়া ভগবৎ প্রাপ্তির চেষ্টা, কামোৎসবের হুতাশনে দেবতার আরতি, প্রভৃতিকে কেহ যদি সমীচীন মনে না করে তবে সে তাহা বলিবে না কেন? এক কথায়, বৃক্ষের মত ফল দেখিয়া এ সকলেরও বিচার হইবে না কেন?

শাক্ত বৈষ্ণবের কলহ এ দেশের একটা প্রাচীন জিনিষ। আমরা হয়ত কেহ বা শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব। কিন্তু পর মত সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়া আমরা কেহই কাহার ও সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু ইহা কি ঠিক? আমরা প্রচার চাই না; উনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞানের পরে, মিল-বেন্থামের শিক্ষার পরে, ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা একটু কমাইলে দোষ নাই। কিন্তু বিচার থাকিবে না কেন? বিচারে সমাজ টপকাইয়া পড়িবে না, তাহাতে নীতির ভিত্তি শিথিল হইবে না।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ইউরোপীয় মানব সমাজের কিংবা সমগ্র মানবজাতির কি করিয়াছে কিংবা কি করিতে পারে সে বিচারে খ্রীষ্টান মনীষীগণ উদাসীন নহেন। কিন্তু শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমাদের কি করিয়াছে এবং কি করিতেছে, সে বিচার আমরা করিতে চাইনা কেন? প্যারিস বা পাড়ুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের কি করিয়াছে, তাহা ভাবিতে ইউরোপের ঐতিহাসিক কুণ্ঠিত হন না; নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় কি উপকার বা অপকার করিয়াছে তাহার বিচারে তাহারও দ্বিধা দেখিলে আমরা তাহাকে ঐতিহাসিক বলিতে চাহিব না; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কি করিতেছে, তাহা আমরা ভাবিতে চাই না কেন? বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতির মূল্য নিরূপণ ও ধর্ম্মের উৎপত্তি অভিব্যক্তি প্রভৃতি নিয়া ইউরোপে এক নূতন বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে; আমরা তাহার খবর রাখি, কিন্তু অনুকরণ করি না কেন? শিল্পশালা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান (institution) নিয়া ইউরোপের সাহিত্যে বিচার হয়, আমাদের কেন হয় না?

বিচারের প্রণালী সহজ; বৃক্ষের ন্যায় এ সকলও "ফলেন পরিচীয়তে।" খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রশংসা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকেরই অন্যতম যুক্তি এই যে, ইউরোপের যে অধিবাসীবৃন্দকে নীট্‌চে সাদা রংয়ের দ্বিপদ পশু বলিয়াছেন তাহাদিগকে উহা মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। যে ধর্ম্ম পশুকে মানুষ করিতে পারে, অসভ্যকে সভ্য করিতে পারে, তাহার ফল কি মন্দ? খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ইতিহাসে এক সময় নানা আবর্জ্জনা ইহাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু আদিতে সে সমস্ত ছিল না, এবং বর্ত্তমানে খ্রীষ্টান দার্শনিকগণ নানা উপায়ে সে সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ফলানুসারে সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরিচয় ত মন্দ নয়।

এই ভাবে যাঁহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকটিত করিতে চান, তাঁহারা অভ্রান্ত কিনা সে বিচার এখানে করিতে চাই না। কিন্তু আমরাও ত একাধিক ধর্ম্মমত একাধিক সাধন-প্রণালীর সহিত পরিচিত; সেগুলির ফল দেখিয়া পরিচয় নিতে চেষ্টা আমরা করি না কেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাধা-ভাব যে ধর্ম্মের প্রাণ, ঈশ্বরকে পতি এবং নিজকে পত্নী কল্পনা করিয়া যে ধর্ম্ম ভগবৎপ্রেমের বিকাশ করিতে চায়, পরকীয়ার সংস্রব না হইলে যে ধর্ম্মের রসাস্বাদন সম্ভব হয় না, কিশোরী-ভজন প্রভৃতি যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল, জয়দেব বিদ্যাপতির কবিতাগুলি সুন্দর বলিয়াই সে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। দেখিতে হইবে, এই ধর্ম্ম যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল কিংবা করিতেছে, তাহারা কি প্রকারের লোক, তাহাদের চরিত্র কেমন, এবং মানুষের অবশ্য পালনীয় বিধিনিষেধ ইহারা কি ভাবে গ্রহণ করে। যে ধর্ম্ম মানুষকে মানুষ হিসাবে তাহার সাধারণ কর্ত্তব্য হইতে দূরে নিয়া যায়, বুঝিতে হইবে সে ধর্ম্মের ফল মন্দ

আমরা যতই কাপুরুষ হই না কেন, বীরের সমাদর বোধ হয় ভুলিয়া যাই নাই। জীবনের কর্ত্তব্যের প্রতি বীরের মত নির্ভীক ভাবে যে দৃষ্টি রাখিতে পারে, কিংবা প্রমিথিউস্ (Prometheus) বা চাঁদ সদাগরের মত দেবতার সহস্র লাঞ্ছনাও যে বীরের মত সহ্য করিতে জানে, তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আমরা এখনও জানি। শাক্তই হউক আর বৈষ্ণবই হউক, যে ধর্ম্ম এমন চরিত্রের পোষণ করে, সে ধর্ম্মের ফলকে মন্দ বলিব না। কিন্তু ন্যাকামি বলিয়া একটা জিনিষ আছে। ভগবৎপ্রেমে অশ্রুধারাসিক্ত সাধক যখন চোরের মত জীবনের সামান্য কর্ত্তব্যগুলি হইতেও সরিয়া পড়ে, অপকর্ম্ম করিয়া দেবলীলার দোহাই দেয়, এবং পাপের স্রোতে তৃণের মত নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া বলে "ভগবান্ জানেন,"—তখন তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি জন্মে কি? ধর্ম্মের নামে অশ্রুর বন্যা এবং কাজে এই ন্যাকামি আমরা প্রশংসা করি কি? যদি না করি, তবে ফলানুসারে বিচার করিব না কেন? 'পশ্চিমে হাওয়া'কে (West wind) লক্ষ্য করিয়া শেলী (Shelley) বলিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার বীণা করিয়া লও' (Make me thy lyre); যে সকল ভক্ত তেমনই নিজের দেহকে ভগবানের ভোগের উপকরণ মনে করে এবং নিজের ভোগকে ঈশ্বরের ভোগ মনে করে, তাহাতে পুরুষোচিত গুণ কিছুই নাই। পুরুষে পুরুষোচিত গুণের অভাব প্রশংসার বিষয় নয়। তথাপি ফল দেখিয়া আমরা বিচার করি না কেন? স্বীয়া, পরকীয়া, সাধারণী—বিবিধ ভোগের সামগ্রী ভোগ করিব, আর মনে করিব ঈশ্বরের আনন্দ হইতেছে, তাহার চেয়ে ইহুদীদের অনুকরণে জর্ম্মান সম্রাট যে মনে করিতেন যে, ঈশ্বর তাঁহার একজন মিত্র (ally),—ইহা বরং প্রশংসনীয়; কারণ ইহাতে মানুষকে কাপুরুষ করিয়া তুলে না; ধর্ম্ম এবং সমাজকে ফাঁক দিবার প্রবৃত্তি ইহা হইতে জন্মে না আবার সেই কথা, "ফলেন পরিচীয়তে"।

সকল বিচারের চেয়ে নিজের সম্বন্ধে বিচার কঠিন, তথাপি এই বিচারই সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। যে মানুষ দর্পণের আবিষ্কার করিয়াছিল তাহার নাম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি; কিন্তু "আমি কেমন" দেখিতে যে সহায়তা করিয়াছিল, সমস্ত মানবজাতি তাহার নিকট ঋণী। বাহিরের "আমির" চেয়ে ভিতরের 'আমি'র মূল্য বেশী; এইজন্যই ভিতরের 'আমি'কে দেখিতে চেষ্টা করিতে হয়; এইজন্যই উপদেশ হইয়াছে, 'আত্মানং বিদ্ধি'।

আমি কি প্রকারের লোক—এই বিচারেও সেই একই রীতি—"ফলেন পরিচীয়তে"। আরও ত মানুষ আছে, আরও ত জাতি আছে, তাহাদের সম্পর্কে আমাকে কেমন দেখায়, আমার সম্বন্ধে তাহারা কি মনে করে—এক কথায়, আমার কার্য্য ও জীবনপদ্ধতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি ফল প্রসব করিতেছে, তাই জানিয়া নিজের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যে যে কাজ করিতে পারে আমি কি তাহা পারি, অন্যের যে গুণ আমি প্রশংসনীয় মনে করি, আমার কি তাহা আছে? যদি না থাকে তবে, যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, যে আচারের অনুষ্ঠান করিয়া এবং যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আমার এই অবস্থা হইয়াছে, তাহার ফল স্পষ্ট। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের নিজেদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি। তাহা করি না কেন? বলা অনাবশ্যক, তাহা করিলে ফলহীন বৃক্ষের মত তথা কথিত অনেক সম্পদকেই আমাদের পরিহার করিতে হইবে।

পঞ্জাবের এক দেশনায়ক লিখিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানী ছাত্রেরা বাহিরের সভ্য সমাজে প্রবেশ করিয়া নিজেদের সত্ত্ব কখনও বোধ করিতে পারে না,—এমনই তাদের শিক্ষা। একজনকে একখানা বই পড়িতে দেখিয়া এক টোলের অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উনি ঐ বইখানা কোন্ অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠক যখন বলিয়াছিলেন যে, বইখানা পড়িবার জন্য কোন অধ্যাপকের সাহায্য তাঁহাকে নিতে হয় নাই, অধ্যাপক তখন অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন; কারণ, অধ্যাপকের সহায়তা ছাড়া গ্রন্থ পাঠ কি প্রকারে সম্ভবে? আমাদের ছাত্রদিগকেও আমরা এমন শিক্ষাই দেই যে, যে বিষয়ে সে উপদেশ গ্রহণ না করে সে বিষয়ে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন। ওসব দেশের ছাত্রেরা শিখে কি করিয়া কোনও একটা কাজ করিতে হয় কিংবা কোনও একটা বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়; আমাদের ছাত্রেরা শিখে অমুক

গ্রন্থ সম্বন্ধে অমুকের মত কি? প্রচুর বই পড়িয়া কেমন করিয়া কিছুই না শিখিতে হয়, তাহা আমরা যেমন জানি অন্য কেহ তেমন জানে কিনা সন্দেহ। ফলে হয় এই, আমরা অনেক কাজেরই অনুপযুক্ত। লেখক তাই দুঃখ করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের ছাত্রেরা যে শিক্ষা পায় তাহাতে তাহারা যে কোন অবস্থায়, যে কোন কাজে হস্ত প্রয়োগ করিতে পারে; একথানে নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে ভদ্রভাবে দুইটা গল্প বলিতে জানে, হয়ত বা একটু গান করিতে বা বাজাইতেও জানে, কিম্বা দুইছত্র কবিতা আওড়াইতে পারে; কিন্তু আমাদের ছাত্রদের এমনই শিক্ষা যে, হয়ত বা বৃত্ত-ত্রিভুজে তাহাদের মাথা ভরা, কিন্তু একখানা কাষ্ঠফলক ও এক টুকরা খড়ি না পাইলে তাহাদের কিছুই বলিবার নাই। কোনও ব্যায়াম শিক্ষক যদি সাকরিদের একটী মাত্র হাতকে খুবই পুষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে আমরা কি মনে করি? অথচ যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করিতেছি তাহাতে যে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, সে চিন্তা আমরা করি কি?

রাস্তার পাশে যে মুদির দোকান থাকে হঠাৎ তাহা উঠিয়া গেলে পথিকের অসুবিধা হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা এমন কোন কাজ করে না যে, উঠিয়া গেলেও তাহার চিহ্ন থাকে। দশের চক্রে কিংবা ভগবানের চক্রে হঠাৎ যদি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়া যায়, তাহা হইলে যাহারা এখানে পণ্য ক্রয় করে তাহাদের একটু অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু জানি না আর কোন চিহ্ন তাহার থাকিবে কি না। নৈমিষারণ্যে যে ঋষিদিগের সম্মেলন হইত তাহার সাক্ষী অষ্টাদশ পুরাণ; মিথিলায় যে শাস্ত্রচর্চ্চা হইত তাহার প্রমাণ নব্য স্যায়; অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহার প্রমাণ ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ; আর কলিকাতায় যে একটা লেখাপড়ার স্থান আছে তাহার প্রমাণ 'সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য' শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানা টিপ্পনী পুস্তক।

এত বড় একটা জাতি আমরা; কত প্রাচীন জিনিস উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পাইয়াছি; কত নূতন জিনিস গ্রহণ করিবার সুবিধা আমাদের হইয়াছে। ফলের পরিচয় লইয়া এ সকল গ্রহণ কিম্বা পরিবর্জ্জন আমাদের করা উচিত। ইহার জন্য আবশ্যক বিচার শক্তির সম্পূর্ণ উন্মেষ। আমাদিগকে স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে যে, যে শিক্ষা হইতে বিচারশক্তি পরিপুষ্ট না হয় সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

বিচারে কুণ্ঠিত হওয়ার মত কাপুরুষতা আর কিছু নাই। শিক্ষাপদ্ধতিই হউক আর সাধনপদ্ধতিই হউক, সাহিত্যই হউক আর সামাজিক আচারই হউক, ফল দেখিয়া বিচার কর; এবং যে বৃক্ষ সুফল প্রদান না করে তাহাকে কাটিয়া আগুণে নিক্ষেপ কর।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দেওয়া নেওয়ার খেলা।

কোথায় তুমি সব পেয়েছ, সবার মাঝে আজ,
একটু খানি পেলে বলে আমায় দিলে লাজ?
এতই যদি গুমর মনে, গরব যদি এত,
ডেকে ডেকে সবায় কেন করলে জমায়েত
আমারি এই দ্বারে?
লুকিয়ে আপনারে
ভিখারীরই ভিড়ে, তুমি ভিড়লে নাকো কাছে;
হঠাৎ এসে বল্লে "আমায় দাও যা' কিছু আছে।"

কাঁধে তোমার ভিক্ষা ঝুলি, দেহে তোমার ছাই,
তোমার গুমর দেখে হার মেনে যে যাই।
সব বিলিয়ে আজ
পথের মাঝে হাত পেতেছ হে মোর মহারাজ।
পড়ে চলার ভিড়ে
নিদেন দুটি চোখের চা য়া তারেই নিয়ো শিরে।
যখন করলে খেলা সুরু
তখন বক্ষ যতই কাঁপুক দুরু দুরু,
অশ্রুতে দু চক্ষে ডাকুক বাণ
করতে হবে খেলার অবসান।

বড়াই করে আপনি হলে খাটো;
দেখি এখন কেমন করে আঁটো।
ফিরিয়ে আজ পেতে হবে, তোমার যাহা দান
হোক তা আঘাত, হোক তা' অপমান।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

সেরসিংহের উইগণ্ডা প্রবাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা আমি অবশ্য একদিনে দেখি নাই; তাহা উইগণ্ডায় আমার প্রায় এক বৎসর বাসের অভিজ্ঞতার ফল। এই এক বৎসরে আমি উহার প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি। উহা দ্বারা আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম তাহা সবিস্তার বলিবার সময় বা স্থান নাই। দেশের ভূগোল পরিচয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট মনে করি। এইবার এইদেশ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা যখন সাভো ত্যাগ করি তখন স্থির হইয়াছিল যে ইউগণ্ডা হইয়া আমরা জর্ম্মান্ ইষ্ট আফ্রিকায় গমন করিব। কিন্তু ইউগণ্ডায় প্রবেশ করিয়াই (ঠিক কি জন্য বলিতে পারি না) এই প্রস্তাব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আমাদিগকে উপস্থিত একবৎসর কাল এই দেশেই থাকিতে হইবে। তাহার পর যাহা হইবে তাহা ভবিষৎ গর্ভে নিহিত। প্রকৃত কথা এই যে, ঐ সময়ে ইউগণ্ডায় কয়েকটি রাস্তা নির্ম্মাণের ভার আমাদের কাপ্তেন সাহেবের উপর দেওয়া হয়। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে আপাততঃ জর্ম্মান্ ইষ্ট্ আফ্রিকা যাইবার প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়।

আমরা প্রথমে ভিক্টোরিয়া হ্রদের উপকূল স্থিত ভিক্টোরিয়া নামক বন্দরে উপস্থিত হই। তখন উহা একটি সামান্য স্থান, অধিবাসীর সংখ্যা ৭।৮-শতের অধিক হইবে না। চারিদিকে জঙ্গল। আমরা একখানি বড় দেশী নৌকা সংগ্রহ করিয়া একদিন বেলা দুইটার সময় ইউগণ্ডার রাজধানী মেঙ্গো অভিমুখে রওনা হই। আমাদের সহিত দুইখানি নৌকা ছিল। নৌকাগুলি বেশ বড় ২ বলিয়া আমাদের কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

এই হ্রদের জল লোণা নয়, কিন্তু ইহার মধ্যে এমন এক প্রকার স্বাদ আছে যাহা প্রায়ই লোকে ভালবাসে না। সাহেবরাও ইহার জল পান করেন না, এই জন্য আমরা সঙ্গে কয়েক পিপা ভাল জল লইয়াছিলাম। আমরা সকলে ঐ জল পান করিতাম। মনে রাখিবেন, আমাদের দলে ১২ জন লোক ছিল। ইহা ছাড়া দুইখানা নৌকা চালাইবার জন্য ১৫ জন দাঁড়ী ও ২জন মাঝী ছিল।

চতুর্থ দিনে শুনিলাম, জল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। শীঘ্র নূতন জল সংগ্রহ করিতে না পারিলে আমাদিগকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। মাঝীদিগের নিকট হইতে শুনিলাম যে, বেলা ২ টার সময় আমরা যেখানে উপস্থিত হইব, তাহার খুব নিকটেই পানীয় জল পাওয়া যাইবে। যথা সময়ে ও যথা স্থানে আমরা নৌকা দুইখানি থামাইলাম। কাপ্তেন সাহেব একজন মাঝীকে আমাদের পথ প্রদর্শক হইতে বলায় সে অস্বীকার করিল। সে বলিল, যেখানে জল পাওয়া যায় তাহার নিকটে একখানি গ্রাম আছে। উহার অধিবাসীরা ঘোর অসভ্য এবং কোনও নূতন লোককে গ্রামের নিকট দেখিলেই উহারা উহাকে আক্রমণ করে। এ প্রকার বিপজ্জনক স্থানে আমরা যাইব না। তখন জল আনিবার জন্য কাপ্তেন সাহেব এক ক্ষুদ্র দল প্রস্তুত করিলেন। কাপ্তেন সাহেব নিজে ইহার নেতা হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রতিকান্ত, দুইজন শিখ সিপাহী ও আমি চলিলাম। জলের পিপা লইয়া যাইবার জন্য তিনজন কুলী সঙ্গে লওয়া হইল।

যেখানে আমরা নৌকা থামাইয়াছিলাম, সেইখানে একটি ছোট নদী হ্রদের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছিল। এই নদীর মোহানার প্রায় ৩ মাইল দূরে এক প্রকাণ্ড বিল ছিল। ঐ নদী এই বিলের ঠিক পূর্ব্বপাশ দিয়া বহিয়া গিয়াছে। জল আনিবার জন্য আমরা ঐ বিল অভিমুখে রওনা হইলাম। নদী যদি একটু চওড়া হইত, তাহা হইলে আমরা একখানা নৌকা লইয়া যাইতাম, কিন্তু তাহা সম্ভব নয় বলিয়া আমরা পদব্রজে রওনা হইলাম।

যখন আমরা ঐ বিলের ধারে আসিলাম, তখন সেখানে জনমানব ছিল না। আমাদের সঙ্গে ছয়টা পিপা ও ৩ জন কুলী ছিল। কুলীরা ভার প্রস্তুত করিয়াছিল বলিয়া এক ২ জনে দুইটা করিয়া পিপা অনায়াসে লইয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক, আমরা সেখানে তিল মাত্র বিলম্ব করিলাম না। ক্ষিপ্রভাবে পিপাগুলা ভরিয়া দিয়া কুলি তিনজন ও শিখ দুইজনকে আগে রওয়ানা করাইয়া আমরা তিনজনে ধীরে ২

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় ২ মাইল পথ আমরা বেশ নির্ব্বিবাদে গমন করিলাম। তাহার পর গোল আরম্ভ হইল।

তখন আমরা এক অতি অল্প পরিসর রাস্তার ভিতর দিয়া যাইতে ছিলাম। প্রায় ৩০।৪০ গজ দূরে কুলীরা গমন করিতেছে। পথটা এত অপ্রশস্ত যে দুইজন লোক অতি কষ্টে পাশাপাশি যাইতে পারে। দুইদিকে দুর্ভেদ্য গভীর জঙ্গল। সাহেব আগে, রতিকান্ত মধ্যে ও আমি সর্ব্ব পশ্চাতে। আমাদের প্রত্যেকের নিকট একটা করিয়া দুই নালা বন্দুক ছিল। এমন সময় অদূরে অতিগম্ভীর স্বরে কুকুরের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কাজে কাজেই আমাদের দুইজনকেও দাঁড়াইতে হইল। সাহেব তাঁহার দক্ষিণদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন। দেখি দুইটা অতি বৃহৎকায় কুকুর তীরের মত আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রায় পোয়া মাইল দূরে কয়েক জন সম্পূর্ণ উলঙ্গ লোক চীৎকার করিতে ২ আসিতেছে। এমন ভীষণ কুকুর আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আপনারা হয়ত অনেকে গ্রে হাউণ্ড (Greyhound) দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা তাহাদের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ উঁচু। পরে দেখিয়াছিলাম, ইহাদের উচ্চতা প্রায় ৩॥ ফুট। মুখখানা বুলডগের মত।

সাহেব ইহাদিগকে দেখিয়াই পকেট হইতে একটা হুইসিল্ বাহির করিয়া সজোরে বাজাইয়া দিলেন——— উদ্দেশ্য অগ্রবর্ত্তী শিখেরা আমাদের বিপদের কথা জানিতে পারুক। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কিনা তাহা দেখিবার আর অবসর পাইলাম না। ঝড়ের মত কুকুর দুইটা আসিয়া পড়িল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দুইদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। জঙ্গল বটে, কিন্তু উহার উচ্চতা ৪।৫ ফুটের অধিক নয়। ঠিক রাস্তার দুইদিকে উহা যেন ঘন নীল বাঁশের বেড়ার মত দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু ৩।৪ হাত দূরে ঐ জঙ্গল অনেকটা পাতলা হইয়া গিয়াছে, কোনও ২ স্থানে জঙ্গল একবারে অদৃশ্য হইয়াছে। একটা কুকুর ঐ জঙ্গলের প্রাচীর একলম্ফে অতিক্রম করিল, এবং চক্ষুর নিমিষে আমার পিঠের উপর লাফাইয়া পড়িল। আমি সামলাইবার অবসর পাইলাম না, উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলাম। তখনই একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। উঠিয়া দেখি, কুকুটার মৃত দেহ এক স্থানে পড়িয়া আছে। অন্যদিকে দেখি সাহেবের সহিত অন্য কুকুরটার ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। সাহেব তাঁহার রিভলভারটার মাথাটা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া আছেন এবং যখনই কুকুরটা তাঁহার উপর লম্ফ দিতেছে, তিনি একদিকে সরিয়া গিয়া বন্দুকের দ্বারা উহাকে সজোরে আঘাত করিতেছেন।

তখন বুঝিলাম—রতিকান্ত আমার রক্ষা কর্ত্তা। তাহারই বন্দুকের গুলিতে প্রথম কুকুরটা হত হইয়াছে। রতি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াই সাহেবের দিকে গিয়াছিল। এক্ষণে দেখিলাম, সে অতি সন্তর্পণে কুকুরটার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার হাতে ভরা রিভলভার। রাস্তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহার উপর কুকুরে ও সাহেবে এমন ভাবে যুদ্ধ হইতেছিল যে, সে গুলি চালাইবার অবসর পাইতেছিল না। তাহার ভয় হইতেছিল, গুলি চালাইলে উহা সাহেবের উপর যাইয়া না পড়ে। এই সময়ে সাহেব কুকুরের মস্তকে এক প্রচণ্ড আঘাত করাতে, সে পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে রতি তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইল। ধন্য ছোকরার লক্ষ্য। এক গুলিতে সে প্রথম কুকুরটাকে মারিয়াছিল। দ্বিতীয়টাও এক গুলিতে শেষ হইল। সাহেব সুধু বলিলেন, "রতি! তোমার অব্যর্থ লক্ষ্যকে ধন্যবাদ।" অধিক কিছু বলিবার সময় ও ছিল না। কারণ ঠিক এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত অসভ্যেরা প্রায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উহারা সংখ্যায় তের জন। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া সুদীর্ঘ বর্‌ছা।

তাহারা রাস্তার ওপারে আসিয়া সহসা গতি রোধ করিল। এই সময়ে সাহেব হস্ত সঙ্কেতে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং মৃত কুকুর দুইটা ও হাতের বন্দুক দেখাইয়া ইসারায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তাহারা অগ্রসর হইলেই তাহাদের অবস্থা ঐ কুকুরের মত হইবে। তাহারা তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিল কিনা জানি না, তবে তাহারা অনুচ্চ স্বরে কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিল, তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ঐ জঙ্গল অতিক্রম করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। তখন সাহেব হুকুম দিলেন, আমরা যেন

ক্রমান্বয়ে তিনটা করিয়া গুলি উহাদিগের হাত বা পায়ের দিক লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করি। বলা বাহুল্য, অবিলম্বে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। দেখিলাম, চারি জন লোক জখম হইয়াছে এবং একজন বোধ হইল যেন হত হইয়াছে; কারণ লোকটা নীরব নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া রহিল।

একবারে ৫ জন লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়াতে তাহারা যেন বড়ই শঙ্কিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সামান্য পরামর্শের পর—তাহারা পুনরায় রাস্তার উপর আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমরা পুনরায় বন্দুক ছুড়িলাম। এবার ২ জন হত ও ২ জন আহত হইল। এইবার অবশিষ্ট ৪ জন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমরা তখন পুনরায় অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর গমনের পর, দেখি ডাক্তার সাহেব ৭ জন লোক লইয়া দ্রুতবেগে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কাপ্তেন যে হুইসিল বাজাইয়াছিলেন তাহা শিখ দুই জনের শ্রুতি গোচর হইয়াছিল। উহারা উহা শুনিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে নৌকায় গমন করে এবং ডাক্তার সাহেব ও কয়েক জন লোক লইয়া আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা।

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক। বঙ্গসাহিত্যে ইনি যে উচ্চ আসন পাইবার উপযুক্ত একথা কাব্যামোদী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইনি আজ পর্য্যন্ত ভীষণ দারিদ্র্য, গভীর চিত্তসন্তাপ, লাঞ্ছনা এবং শোকের দানবী লীলায় জর্জ্জরিত হইয়াও বঙ্গসাহিত্যকে দিনেকের তরে বিস্মৃত হয়েন নাই, ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব।

গোবিন্দ দাস স্বভাব-কবি। ইঁহাকে "খাঁটি বাঙ্গালী কবি" নামে অভিহিত করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহার কবিতার বৈদেশিকতা নাই, কারণ ইংরেজী ভাষায় তিনি অনভিজ্ঞ। বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে বৈদেশিক অনুকরণ প্রিয়তা বিশেষ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বসিয়াছে। ফলে বাঙ্গালা ভাষা অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ এবং নিরর্থক বাক্‌চাতুরী জালে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহুবিধ বর্ত্তমান কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে; এই সকল কবিতা প্রাণকে একেবারেই স্পর্শ করে না, কেবল কাণের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মিলাইয়া যায়।

ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়াই গোবিন্দ দাসকে আমরা একজন "খাঁটি বাঙ্গালী কবি" রূপে পাইয়াছি। দুঃখময় জীবনের জ্বালাময় ইতিহাস ব্যতীত তিনি আরও যে সকল সুললিত গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মানব মনের অনুভূতি অতি প্রবল বেগে জাগিয়া উঠে।

তাঁহার রচিত অমিয় মধুর গীতি কবিতার কাব্যরস যিনি পান করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে দাস-কবি কাব্য কাননের একজন কলকণ্ঠ কোকিল। তিনি ভাবুক-কবি, ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে জানেন।

ভাবের উচ্ছ্বাস, প্রেমের তরঙ্গ—তাঁহার "প্রেম ও ফুল" কাব্যের ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান। শ্মশান শয্যায় শায়িতা প্রাণসমা প্রেয়সি ও কন্যার বিলাপ সংগীতে "প্রেম ও ফুলের" সৃষ্টি। "প্রেম ও ফুল" প্রিয়জনের সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ। ইহাতে এণ্টনি ও ক্লিউপ্রেট্রার, রোমিও ও জুলিয়েটের, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমের হিল্লোল নাই; আছে সুধু মরজগতের সহিত পরলোকের সম্বন্ধ। ইহা বঙ্গসাহিত্যের In memoriam. পত্নীহারা, ভ্রাতৃহীন কন্যাহারা দরিদ্র কবির শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতাবলী পরিপূরিত। বিরহী চক্রবাকের আর্ত্তনাদের ন্যায়, ব্যথিত ঘুঘুর করুণ বিলাপের ন্যায়, তাঁহার কবিতা হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া দেয়। এ ভাবের কবিতা রচনায় বঙ্গসাহিত্যে গোবিন্দ দাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে আমাদের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমরা তখন গোবিন্দ দাসের জীবন-কথা রচনায় ব্যাপৃত ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বড়াল-কবি বলিয়াছিলেন যে, যদি গোবিন্দদাসের জীবন কথায় কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির উল্লেখ

না করিয়া তাঁহার কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায়, তবেই রচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে গোবিন্দদাসের "শ্মশানে সম্ভাষণ" শীর্ষক মনোরম করুণ কবিতাটী Art এর অভাবে অনিন্দনীয় হইতে পারে নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে চিতার উপর জীবন সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নীকে শয়ন করাইয়া "আজ কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর?" বলিয়া একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করা অস্বাভাবিক এবং এই দোষেই "শ্মশানে সম্ভাষণ" কবিতায় Art মারা গেছে।" একজন ইংরেজী ভাষা অনভিজ্ঞ, আজন্ম প্রকৃতির ক্রোড়-পালিত স্বভাব-কবির এই কবিতাটী প্রকৃতই অঙ্গহীন কিনা সমালোচক তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু ইহা যে শোকসন্তপ্ত বিশ্বমানব হৃদয়ের মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যিনি এমন প্রাণস্পর্শী করুণ ভাষায়, মানব হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ তাঁহার শিরে বর্ষিত হউক।

গোবিন্দদাস "প্রেম ও ফুল" "কুঙ্কুম" "কস্তুরী", "চন্দন", "ফুলরেণু", "বৈজয়ন্তী" প্রভৃতি গীতিকাব্যগুলি রচনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি বহু কবিতাও রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কতকগুলি সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "নবজীবনে" মুদ্রিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে [illegible] কবিতা তাঁহার কোন গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয় [illegible] তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, [illegible] তাহার কারণ। এমন পরম উপভোগের বস্তু যে [illegible] কোন কাব্য-গ্রন্থে স্থান পায় নাই একথা [illegible] কেমন করিয়া বলিব? আমরা বলি যশোলিপ্সায় [illegible] ইহার অন্যতম কারণ।

[illegible] আমরা "বীণা" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত [illegible] কতকগুলি কবিতার আলোচনা করিব।

[illegible] গোবিন্দদাসের কবিতাগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে [illegible] করা যাইতে পারে।

(ক) প্রেমমূলক কবিতা।

(খ) দেশভক্তিসূচক ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা।

(গ) বিদ্রুপ রসাত্মক কবিতা।

(ক) ইহার প্রেমের কবিতাগুলি সহজ সরল ভাবে রচিত হইয়াছে। তাহা স্বচ্ছ, অনাবিল এবং জ্যোৎস্না রজনীর মেঘমুক্ত গগনের ন্যায় প্রাণোন্মাদক। এই প্রেমমূলক কবিতাগুলির মেরুদণ্ডে নারী-ভক্তি বিদ্যমান। পত্নীর নিষ্কলঙ্ক প্রেম তাহার প্রাণ; দুঃখবাদ এবং নিরাশার মর্ম্মন্তুদ করুণ ক্রন্দনে তাহা অভিষিক্ত। যাহারা গোবিন্দ দাসের জীবনের ঘটনা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে অদৃষ্টের কঠোর নিষ্পেষণে পীড়িত কবির হৃদয়ে যে নিরাশার মর্ম্মভেদী সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই সুরই তাঁহার পীযূষবর্ষী কাব্যগ্রন্থে অপূর্ব্ব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সুর মানুষের হৃদয় আলোড়িত করিয়া অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে। বর্ত্তমান যুগের দুর্ব্বোধ কবিতার ন্যায় তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে যাইয়া পাঠকগণকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হয় না। পতিপত্নীর প্রেম ও সন্তানপ্রীতির কবিতা বঙ্গভাষায় অতি বিরল।

পত্নী-বিয়োগ বিধুর কবি "চন্দনে" লিখিয়াছেন :—

"সেই নিশি সেই দিবা, নূতন হয়েছে কিবা,
সেই আলো অন্ধকার আগের মতন।
বসন্তের পিছে পিছে, কোকিল ডাকিছে মিছে,
পুরাণ সেকেলে সেই অলির গুঞ্জন;
সেই আমি সেই তুমি, সেই ত আকাশ ভূমি,
সেই জন্ম সেই মৃত্যু,—সব পুরাতন।
পুরাণা পথের ধূলি, অণু পরমাণুগুলি—
পুরাতন এ জীবন, দেহ আত্মা মন।
পুরাতন সেই আঁখি, অশ্রুজলে মাখামাখি
পুরাতন হাহাকারে বিদীর্ণ গগন।
কি বিপুল কি বিশাল, অনাদি এ মহাকাল,
অতি পুরাতন সৃষ্টি করিছে বহন,
পুরাতন এই রাজ্যে, প্রতি কণা প্রতি কার্য্যে
সেতজ্যো হইয়া গেছে অতি পুরাতন।
সকলে ভুলেছে তারে, মনে নাই একেবারে
সে যে গো এদেশে আহা ছিল একজন।

লইয়া দুঃখিনী মেয়ে, গেছে কত দুঃখ পেয়ে
ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন ?"

কারো প্রয়োজন নাই কিন্তু কবির আছে। আছে বলিয়াই এই করুণ ক্রন্দনের সৃষ্টি। যাহার সঙ্গে স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ, এই দুঃখময় মরজগতে যাহার প্রেম একদিন শান্তির স্নিগ্ধবারি বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাকে পরপারে বিদায় দিয়া মানুষের কি হাহাকার! জগতের হিসাবে তাঁহার বিদায় পুরাতন হইলেও আত্মার কাছে সে চির নূতন। পার্থিব প্রেমের সঙ্গে পরলোকের বিশ্বাস একত্রীভূত হইয়া তাহা একটী মনোরম আলেখ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহার পরক্ষণেই কবি গাহিয়াছেন :—

"আছে প্রয়োজন আছে, নহিলে কি প্রাণ বাঁচে
নহিলে কি তার কথা করি আন্দোলন ?
* * * *
রক্ত মাংসে মাখা মাখি, সে আকাঙ্ক্ষা নাহি রাখি,
করে না কামের ক্লেদে কুটু কুটু মন ;
পবিত্র তাহার স্মৃতি, পবিত্র উজ্জ্বল নীতি,
পবিত্র করিয়া দেয় প্রাণ পুরাতন।"

কি অপূর্ব্ব কবিতা! ইহা পার্থিব দেহ সম্পর্কের কথা নহে। দেহাতিরিক্ত আরো কিছুর কথাই কবির প্রতিপাদ্য বিষয়। তার পর কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস কি গভীরতর রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
বিনোদ বৈশাখে নব চম্পক চন্দন।
উষার কদম্ব কেলি, সাঁজের ফুটন্ত বেলি,
সিক্ত বেনামূল গন্ধী শীত সমিরণ।
সেই মম প্রিয় নারী, নবীন মেঘের বারি,
অবনীতে শ্যাম শোভা করে আনয়ন,
শিখী নাচে পাখী গায়, আনন্দে চাতক চায়
উল্লাসে ভরিয়া যায় সমস্ত ভুবন।"

পবিত্র প্রণয়ের একটী মধু শ্রাবিনী সঙ্গীত কবি আমাদিগকে শুনাইয়া গেলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবজলধর হেরিয়া যক্ষের প্রাণে যে অভাবনীয় বিরহানল জাগিয়া উঠিয়াছিল, নববর্ষে কবির প্রাণে তাহা অপেক্ষা কম দুঃখ জাগে নাই।

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
শুভ চন্দ্র মমতার শুভ চন্দ্রানন,
কি পুণ্য অমৃত যোগ, প্রাণে করি উপভোগ
একটী মুহূর্ত্ত তারে করিলে স্মরণ।"

অলকার অভিশপ্ত যক্ষের বিরহের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই মৃত্যু শোকাচ্ছন্ন কবির অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুইটীর মূলেই Pessimism কিন্তু যক্ষের বিরহে ভবিষ্যৎ মিলনের একটী ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায়, আর পরবর্ত্তীটী নিরাশা মাখা হইলেও তাহাতে প্রলয় ঝঞ্ঝার আলোড়ন নাই।

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ"

বলিয়া কবি তাঁহার শোকার্ত্ত হৃদয়কে যে সংযত রাখিয়াছেন এজন্য তিনি প্রশংসার্হ।

তাঁহার প্রেমমূলক কবিতালোচনা প্রসঙ্গে "বীণা" পত্রিকায় প্রকাশিত "ইহা কিছু নয়" কবিতাটীর কতক আলোচনা করিব।

যৌবনোন্মেষে মানুষের শিরায় শিরায় যখন উন্মাদ রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে ;—যখন তরুণ হৃদয় প্রেমের স্বপ্নে বিভোর ; যখন মানস ভৃঙ্গ কল্পনার নন্দন-কাননে সঞ্চরণ করিতে থাকে ; তখন তাহার হৃদয়ের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া যদি তাহাকে বলা যায় যে "ইহা কিছু নয়" তাহা হইলে হৃদয় কি সে কথা বিশ্বাস করে ? তাই কবি বলিতেছেন,—

"নিরেট নির্ব্বোধ প্রাণ করে নি প্রত্যয়
কত বার বলিয়াছি,—"ইহা কিছু নয় ?"

হৃদয়ের তখন কি অবস্থা তাহা ভাষা দিয়া বর্ণনা করা যায় না। মানব প্রকৃতির অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান। যে সময় হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রণয়ের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়, তখন তখন সংযমের কঠোর শাসনকে এড়াইতে পারিলে বাঁচে। সে সময় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে ;— নিসর্গের প্রতি অণু পরমাণু তখন প্রাণে এক অবর্ণনীয় মত্তা আনয়ন করে। এই ভাবে মানব হৃদয়ে চিত্তবৃত্তির পরিস্ফুরণ। একটী পাখীর গানে, একটী পুষ্পে, নদীর কল্লোলে, অথবা মন্দ পবন হিল্লোলে, সৌন্দর্য্যের প্রাণারাম চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় ;—প্রাণের ভিতর

স্বর্গের এক অপরূপ দৃশ্য বিকশিত হইয়া উঠে। কবি লিখিলেন,—

"সেই চন্দ্র সেই হাসি, যারে বড় ভালবাসি
দেখিলে উছলি উঠে হৃদয় রুধির,
সেই চন্দ্র সেই হাসি, অজানা ছুইল আসি
হৃদয় আওট পূর্ণ—শোণিত গভীর।
সেই বেলা শেষে নৃত্য নব কৌমুদীর—
সেই সুবঙ্কিম গ্রীবা, হেলান মৃণাল কিবা
সেই যে লাবণ্য লীলা রজত নদীর।
যদি নাহি দেখে থাকো, (দেখিলে বলিবে নাকো)
বল তবে, বল শুনি,—এ নহে বিস্ময় ;
আর না ঢাকিব কান, বলনা খুলিয়া প্রাণ।
মুখে আসে যত আর যত মনে লয়,
সহস্র জিহ্বায় বল "ইহা কিছু নয়।"

কবি মুখে বলিতেছেন "ইহা কিছু নয়" ; কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহা পারিতেছেন না। মানুষ তাহা পারে না।

কবি আর একটী চিত্রে দেখাইয়াছেন—

"মহর্ষি কণ্বের সেই পবিত্র আশ্রমে
বাসরে ও শকুন্তলা মলিনা শয়নে।
সমিরণে দুলি দুলি, নাচায়ে কুসুমগুলি
উড়া'য়ে পরাগ তার দিছে দুনয়নে
কিংবা কুরুবক শাখে, বহুল আটকি থাকে
নব কুশাঙ্কুর ফোটে চলিতে চরণে।
সে সময়ে দেখে শুনে,
স্বর্গীয় প্রেমের সেই নব অভিনয়,
সে দুষ্মন্ত তুমি হয়ে, তার সেই প্রাণ লয়ে
বল শুনি একবার—'উন্মাদ হৃদয়'
শুনিব হাসিব আমি—"ইহা কিছু নয়।"

হৃদয় তরঙ্গিনী যখন প্রেমের তরঙ্গে টলটলায়মান—হৃদয় সমস্ত ছিন্ন অনন্ত সমুদ্রের মত অনন্ত প্রণয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন "ইহা কিছু নয়" বলিলে সমস্ত সংসার তাহা স্বীকার করিবে কেন? কবি তাই বলিতেছেন ;—

"সে সময় বলিবারে, এ পাষাণ যদি পারে
দ্রবীভূত হয়ে প্রাণ নাহি যায় তার,
পাষাণ পাষাণ প্রাণ রাগে আপনার।
শুনিবে না এ সংসার—প্রেমার্দ্র হৃদয়
শতবার বলে যদি—"ইহা কিছু নয়।"

ইহা পার্থিব প্রেমের কথা। পৃথিবীতে প্রণয়ের এই প্রকার চিত্র সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আধ্যাত্মিকতা নাই। জোর করিয়া এই কবিতা হইতে আমরা আত্মা পরমাত্মার মিলনের কথা বুঝাইতে যাইতেছি না। ইহা একটী স্বাভাবিক প্রণয় সঙ্গীত। কিন্তু ইহাতে Immortality নাই। ইহা অভিসার অথবা পরকীয়া প্রেমের কবিতা নহে।

বাহুল্য ভয়ে "বীণা" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার রচিত "নীল জলদ," "সোহাগের আর একটুকু," "বসোরা গোলাপ ফুল," "সতিনী" কবিতার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

(খ) দেশ ভক্তি সূচক ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক বহু কবিতা গোবিন্দ দাস রচনা করিয়াছেন। আজ যে জাতীয় ভাবে সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় অনুপ্রাণিত সেই জাতীয়তা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন দরিদ্র গ্রাম্য কবির প্রাণে কেমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। "বীণা" পত্রিকায় তাঁহার দেশ ভক্তি মূলক বহু অপূর্ব্ব কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে "দুর্গোৎসব" এবং "নিরন্ন কবি" বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এইগুলি তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়সের রচনা।

"ভারতে শারদ শুক্লা ষষ্ঠি নিশি শেষ,
ধীরে ধীরে তারাগুলি লুকাইলে সব,
দম্পতী-নয়নে আছে ঘুমের আবেশ,
ডাকেনি এখনো পাখী প্রকৃতি নীরব!
কেন আজি শঙ্খ ঘণ্টা দ্বারে মহারোলে
কাঁপাইয়া ভারতের প্রাণোম অবর
মুহূর্ত্তে, প্রকৃতি সুপ্ত ভীম গণ্ডগোলে
জাগাইল? কি আনন্দ প্রমত্ত অন্তর?
কি আনন্দ সকরিল বাঙ্গালীর ঘরে
হৃদয় উন্মাদ রক্ত আছাড়িয়া পড়ে!"

এই ভাবে "দুর্গোৎসব" কবিতার আরম্ভ। এই কবিতাটী সুমার্জ্জিত উচ্চ শ্রেণীর কল্পনায় অভিষিক্ত। বঙ্গ-জননীর নিরানন্দ ময় প্রাণে বৎসরে একবার দুর্গোৎসব কি আনন্দ আনয়ন করে ইহা তাহারই করুণ বর্ণনা।

"এই দিন ভারতের কত পুণ্যময়,
অনন্ত নরকে বহে মলয় বাতাস!
প্রজ্জ্বলিত মহা চিতা শোকের নিলয়
মূর্ত্তিমান আজি তাহে আনন্দ উল্লাস!
ঘন অন্ধকারে আজি আলোক সঞ্চার,
সাহারা সম্পৃপ্ত নব বরষার জলে,
ল্যাপল্যাণ্ডে ফুটিয়াছে হাসি চন্দ্রমার—
হীরক খচিত চারু নীল নভ জলে।
অধিক কি—
ননদী বাঘিনী মুখে, চির পরাধীনা—
আজি সেই বঙ্গ-বধু তারাও স্বাধীনা!"

ভাবের মহিমায় এবং ভাষার সৌষ্টবে ইহা কবিত্বের একটী নিরাবিল অক্ষয় প্রস্রবণ।

"বীণা"য় প্রকাশিত তাঁহার "নিরন্ন কবি" শীর্ষক কবিতাটীও এই "দুর্গোৎসব" পর্য্যায়ের।

আমরা এই কবিতাটীর কএকটী অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। গুণগ্রাহী পাঠক ইহা হইতেই সমগ্র কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কবির উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইবেন।

মণি-মুকুতার　　　না পাই সন্ধান
দেখিনা ত্রিকাল হৃদয়ে ভাসে
অসি বরাভয়　　　চামুণ্ডারূপিনী
নৃমুণ্ডমালিনী গভীর হাসে।

*　*　*　*

পোহাবে না　　　এই তামসী রজনী
উঠিবে না রবি —— হবে না প্রভাত

*　*　*　*

জনমের তরে নিপাত! —— নিপাত!

*　*　*　*

দেখালো কল্পনে!　　　সেই বিদ্যুজ্জ্যোতি
ভাগীরথী বক্ষে কেমনে ভাসে,
পর্ব্বত কন্দর　　　আদি তৃণ দল
সে অট্ট হাসিতে কেমনে হাসে।

*　*　*　*

স্বর্গীয় সৌরভে পূরিয়া দিক্
হাসিবে ভারত অময়া হাসি,
নয়ন ভরিয়া আশা মিটাইয়া
দেখিবে ভূলোক দ্যুলোক বাসী।

*　*　*　*

দেখালো কল্পনে! সে মহাভারত
ভূতলে অতুল ত্রিদিব ছবি,
দেখিবি কেমনে? পাবি না দেখিতে
তুই ভারতের নিরন্ন কবি।"

এই কবিতাটী লিপি কৌশলে এবং ভাষা বিন্যাসের মনোহারিত্বে অপরূপ। অন্তঃ প্রকৃতির বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব অপারসীম। আবার অনলবর্ষী প্রদীপ্ত ও জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করিয়া ও তিনি আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাহাদের নিকট ১২৮৬ সালের "বীণা" আছে তাঁহারা সমগ্র কবিতাটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন।

১২৯৪ সনের চৈত্র সংখ্যা "নবজীবন" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "শিকার" শীর্ষক কবিতাটী পরবর্ত্তী কালে কোন গ্রন্থে স্থান পায় নাই। অতএব ইহা সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর নিকট অবিদিত। গোবিন্দ দাস যখন ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের ভূম্যধিকারী, স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কার্য্য করিতেন তখন তাঁহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শিকার করিতে বহির্গত হইতেন। উক্ত কবিতাটী সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল। কবিতাটীর কেবল শেষ অংশ টুকু উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন তাঁহার রচনায় কি কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

"এই ছাড়িলাম গোলা রক্ষা নাই আর,—
গর্জ্জিল রাইফেল "সেন্ট্রাল ফায়ার"!—
একি হে মুহূর্ত্তে হায়,　　　দেখি অচেতন প্রায়,
পতিত বিদীর্ণ বক্ষ মৃত্যুর আকার;

বীরেন্দ্র শার্দ্দুল রাজ, এত যে অযত্নে আজ
বনেই পতিত রনবীর অহঙ্কার ?
[illegible] কি অজ্ঞান, এই আত্ম বলিদান,
এই আত্মবধ চিত্র দেখি পুনর্ব্বার,
সমাহিত স্মৃতি রোগে জাগা'লে আবার।"

[illegible] ধন্ত নবকা[illegible] চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সুবিখ্যাত [illegible]ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী "গ্রন্থে গোবিন্দ দাসের কএকটী সুরাপান নিবারণী কবিতা ও দুইটী জাতীয় সঙ্গীত দেখিতে পাওয়া যায়। পদলালিত্য ও ভাবের মনোহারিত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত একটী সঙ্গীতের কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বহুদিন হ'তে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী,
আগের নাহি সে কিছু ঐশ্বর্য্য রূপ-মাধুরী।

* * * *

[illegible] না পরাণে আর, এ বাতনা অনিবার,
এস ভাই একবার সবে প্রাণপণ করি,
[illegible]সিন্ধু দেবতার, বহু রত্ন গর্ভে তার—
উদ্যম-মন্দিরে মথি আশার বাসুকী ধরি।
উঠিবে সে ঐরাবত, ধন রত্ন শত শত,
লইয়া অমৃত-কুম্ভ উঠিবে সে ধন্বন্তরী।
যদি উঠে হলাহল, করিব কণ্ঠের তল,
বল না কি ভয় তাহে ? প্রতিজ্ঞা "বাঁচি কি মরি"।"

গোবিন্দ দাসের দেশ-ভক্তি অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক। জন্মভূমির প্রতি কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস কি অপরিমেয় তাহা [illegible] কবিতা দৃষ্টে কতক পরিমাণে উপলব্ধি করা [illegible] দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কবি লিখিয়াছিলেন,—

[illegible] আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ।
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।
[illegible] শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে
যদি তার দুঃখরাশি হয় অবসান,
[illegible] ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি,
কলিজা কাটিয়া দেহু করি শতখান।"
[illegible] আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ।
[illegible], যদি ও দেখি না তায়,
[illegible] দূরে আছি ব্যবধান।
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।"

ইহাতে তাঁহার অকৃত্রিম দেশ ভক্তি সূচীত হইতেছে। যাহারা কবির জীবনের সঙ্গে পরিচিত তাঁহারা জানেন যে দাস-কবির প্রাণ দেশ ভক্তিতে অনুপ্রাণিত।

(গ) বিদ্রূপরসাত্মক কবিতার জন্ম দাস কবি বিশেষ ভাবে পরিচিত। দেশের লোকের নিকট হইতে দুর্ব্যবহার পাইয়া কবি ঘৃণা ব্যঞ্জক ভাষায় যে কবিতা গুলি লিখিয়াছিলেন তাহাতে অনেক ব্যক্তিগত কথা আছে বলিয়া তাহার আলোচনা আমরা করিলাম না।

গোবিন্দ দাসের বহু উৎকৃষ্ট কবিতা অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইবে এবং সাহিত্যে গীতি কবিতার দিক আরো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
ব্রহ্মদেশ।

রুশ রাষ্ট্র-বিপ্লব।

বিংশ শতাব্দীতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রুশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লব বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইউরোপ মহাদেশে যে সাম্যবাদ ঘোষিত হইয়া আসিয়াছে এবং যাহার ফলে আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই প্রজা শক্তির অভ্যুত্থান সংঘটিত হইয়াছে—যে সাম্যবাদ শেষে ইউরোপ ছাড়িয়া দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র বারি অতিক্রম করতঃ আহিফেন সেবী নিদ্রিত চীন জাতিরও চৈতন্য সঞ্চার করিয়া তথায় সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, একমাত্র প্রবল পরাক্রান্ত রুশ সম্রাটই এতকাল তাহাকে উপেক্ষা করতঃ স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহারও পতন হইল। যে প্রবল প্রতাপ সম্রাটের ভ্রূকুটী ভঙ্গিতে প্রশান্ত

মহাসাগর হইতে বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের কোটী কোটী নরনারী যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার ন্যায় চালিত হইত, এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধি জ্ঞানে যাঁহার উদ্দেশ্যে কোটী কোটী প্রজার প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হইত, আজ সেই রুষিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট জার নিকোলাস সিংহাসনচ্যুত। রুশ সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই অভাবনীয় ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিবার ও বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণকে রুশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্তমর্ম্ম প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

রুশিয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রুরিক নামক স্কেণ্ডেনেভিয়ার রাজবংশের জনৈক রাজপুত্র এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রুশিয়ার রাজধানী প্রথমতঃ নভগর্ডে এবং অতঃপর কিফ্ নগরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু রুরিক অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তেমন শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। সেকারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুরস্ক রুশিয়া জয় করতঃ প্রায় দুইশত বৎসর কাল তাহা নিজেদের রাজ্যভুক্ত করিয়া রাখেন। ইহার পর মস্কোনগরে রুরিকের বংশধরগণ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকেন। অবশেষে তৃতীয় আইয়ান (১৪৬২—১৫০৫) রুশিয়া হইতে তুরস্ক-প্রাধান্যের উচ্ছেদ সাধন করেন। পরবর্ত্তী রাজা চতুর্থ আইয়ান (১৫৩৩—১৫৮৪) সর্ব্বপ্রথম "জার" বা সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তদবধি রুশসম্রাটগণ এই গৌরবসূচক উপাধিতেই পরিচিত হইয়া আসিতেছিলেন। চতুর্থ আইয়ান কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত রুশসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। আইয়ানের মৃত্যুর পর কিছুকাল রুশিয়াতে অন্তর্বিপ্লব চলিতে থাকে। অবশেষে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পিটার (Peter the Great) রুশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত রুশিয়ায় ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। পিটার জার্ম্মেনী, হলণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানের রীতিনীতি, সভ্যতা, ও অন্যান্য নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসেন এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বরাজ্যে তাহা প্রচার করেন। এইরূপে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান প্রভৃতি দ্বারা তিনি রুশ-সাম্রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি বিধান করেন। অতঃপর সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। চার্লসকে পরাজিত করিয়া পিটার আজফ্ অধিকার করতঃ কৃষ্ণসাগরের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং বাল্টিক সাগরেও সুইডেনের একাধিপত্য বিনষ্ট করিয়া দেন। তিনি মস্কো হইতে রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গে স্থানান্তরিত করেন।

পিটারের পর এন, এলিজাবেথ, ও দ্বিতীয় কেথারিণ এই তিনজন রমণী রুশিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহারা সকলেই পিটারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাজ্য বিস্তার ও বিবিধ প্রকারে রুশিয়ার সমৃদ্ধি সাধন করিতে থাকেন। কেথারিন, অষ্ট্রীয়ার সহিত মিলিত হইয়া পোলাণ্ডের স্বাধীনতা লোপ করতঃ তাহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। এইরূপে ওয়ারস (Warsaw) রুশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

মহাবীর নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধে যখন সমগ্র ইয়োরোপ টলটলায়মান, তখন ১ম আলেকজেণ্ডার রুশিয়ার জার। নেপোলিয়ান প্রথমে তাঁহার সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান বিপুল বাহিনী লইয়া রুষরাজ্যে অভিযান করিলে রুশসৈন্য ফরাসীদের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াও যখন তাহাদের প্রচণ্ড বেগ রোধ করিতে পারিল না তখন তাহারা পশ্চাৎপানে হটিয়া যাইতে লাগিল। নেপোলিয়ান বিজয় গৌরবে রুশিয়ার অন্যতম রাজধানী মস্কো অধিকার করিলেন। এদিকে রুশসৈন্যগণ নগর পরিত্যাগের পূর্ব্বেই নগরস্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাসাদ-সমূহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত নগর ব্যাপিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং সুপ্রসিদ্ধ মস্কোনগর মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তখন শীতকাল। রুশিয়ার সেই ভীষণ শীতে ও খাদ্যাভাবে নিরাশ্রয় ফরাসী সৈন্যগণ যারপর নাই কষ্ট পাইতে লাগিল। শেষে ফিরিয়া আসা ভিন্ন আর উপায় রহিল না। অনাহার, প্লেগ এবং কসাক সৈন্যদের আক্রমণে অধিকাংশ ফরাসী সৈন্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নেপোলিয়ান ভগ্নহৃদয়ে অবশিষ্ট

সৈন্যদিগকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। এই রুশ-অভিযানই হইয়াছিল নেপোলিয়ানের পতনের একটা প্রধান কারণ।

নেপোলিয়ান পরাজিত হইয়া যখন নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন ইউরোপীয় রাজন্যগণ মধ্যে রুশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন।

তিনি অন্যান্য ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি (Holyalliance) করেন। তদ্বারা তাঁহারা—ইউরোপের কোন ও দেশে প্রজাগণ রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে সকলে এক যোগে তাহাদের দমন করিবেন—এই স্থির করেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব যে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছিল, তাহাকে দমন করিয়া রাখা সহজ সাধ্য হইল না। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্র বিপ্লবে প্রজাশক্তি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে স্ব স্ব ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়াছিল। একমাত্র রুশিয়াতেই তাহা তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

১ম আলেকজাণ্ডারের পর ১ম নিকোলাস, দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার ও তৃতীয় আলেকজেণ্ডার যথাক্রমে রুশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা সকলেই যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডারের সময় হইতে রুশিয়াতে নিহিলিষ্টদিগের উৎপত্তি হয়। শাসন কার্য্যে তিনি অন্যান্য জারগণ হইতে একটু উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সময়েই রুশিয়াতে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ (Emancipation of the serfs) সাধিত হয়। কিন্তু উন্মত্ত নিহিলিষ্টগণ পেট্রগ্রাডের প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহাকে হত্যা করে।

ভূতপূর্ব্ব জার ২য় নিকোলাস ১৮৬৮ খৃঃ ১৮ইমে পেট্রগ্রাড নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর (১৮৮১ খৃঃ) তিনি রুশিয়ার যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন। বাল্যকালে যদিও তিনি যথারীতি সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি সে দিকে তাঁহার তেমন একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি একটু শান্তি প্রিয় ছিলেন। ১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রীস, ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ ও জাপানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। জাপান ভ্রমণকালে একজন গুপ্তঘাতক তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি সাইবেরিয়ার ব্লাডিভাষ্টক নগরে কিছুকাল অবস্থান করেন। এবং তথাকার রেলবিস্তার কার্য্য পরিদর্শন করেন। ১৮৯৪ খৃঃ তাঁহার পিতা তৃতীয় আলেকজেণ্ডারের মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন: ঐ বৎসরই সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পিশতুত, ভগ্নী রাজকুমারী এলিক্সের সহিত তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং সিংহাসনে আরোহণ করিবার ১৮ মাস পরে মস্কোনগরে বিপুল আড়ম্বরের সহিত তাঁহার রাজ্যাভিষেক (Coronation) উৎসব সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই উৎসবের সময় একটী আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা প্রভৃতিতে প্রায় দুই সহস্র লোকের প্রাণ বিয়োগ হয়।

নিকোলাস বৈদেশিক শক্তি সমূহের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলারই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে হেগনগরে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের দুইটী শান্তি সভার অধিবেশন হয়। এবং তাঁহারই চেষ্টায় ইংরেজ, ফরাসী, রুশিয়া এই তিন দেশের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। জাপানের সহিত যুদ্ধ তাঁহার রাজত্বের আর একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ হইতে তিনি একটু উদার মতাবলম্বী হইলেও প্রজাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। কাজেই রাজ্য মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ইহাতে এক দিকে ইহারা দেশ মধ্যে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিল, অপরদিকে রাজকীয়সৈন্যগণও বিদ্রোহীদিগের শাস্তি বিধান করিতে যাইয়া শত শত নিরীহ লোকের শোণিতে ধরা বক্ষ রঞ্জিত করিল। প্রসিদ্ধ জননায়কগণ নির্ব্বাসিত হইতে লাগিলেন। এবং সাইবেরিয়ার জেলসমূহ রাজনৈতিক অপরাধীদের সংখ্যায় পূর্ণ হইয়া গেল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পেট্রগ্রাডে সম্রাটকে সৈন্যগণের অভিবাদন জ্ঞাপনকালে একটী গোলা আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে পতিত হয়। জার ক্রোধান্বিত হইয়া পেট্রগ্রাড পরিত্যাগ করিয়া যান। প্রধান মন্ত্রি মিরস্কি পদচ্যুত হন এবং সিপাক তাঁহার স্থলে মন্ত্রি হন। পেট্রগ্রাডের রাজপথ নর-শোণিতে রঞ্জিত হয়—উন্মত্ত জন সাধারণ অসংখ্য পুলিশ কর্ম্মচারী ও

গ্রাণ্ডডিউক সার্জ্জিয়াস্কে হত্যা করে। সম্রাট অবশেষে প্রজাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ডোমা বা জন সাধারণের একটী প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করেন। এইরূপে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডোমার প্রতিষ্ঠা হয়।

বিপ্লবের কারণ।—ডোমা প্রতিষ্ঠার পর নিহিলিষ্ট দিগের অত্যাচার কতকটা প্রশমিত হইলেও প্রজাদের অসন্তোষের কারণ দূরীকৃত হয় নাই। প্রজারা যেরূপ অধিকার পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, সেরূপ কিছুই তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। ডোমাতে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকগণই প্রাধান্য লাভ করেন। সর্ব্বসাধারণ তাহাতে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণের তেমন সুবিধা পায় নাই। তারপর ডোমার হাতে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল, তাহাও অতি নগণ্য। ডোমার অভিমত মন্ত্রি সভা ও জার ইচ্ছা করিলেই প্রত্যাহার করিতে পারিতেন। দেশ ব্যাপি প্রজাদের মধ্যে এই অসন্তোষের বিস্তৃতিই বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রধান কারণ। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই অসন্তোষ বহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল। তাহা হইতে মধ্যে মধ্যে যে ধূম উত্থিত হইত স্বার্থপর মন্ত্রিগণ তাহা জারকে ভাল করিয়া বুঝিতে দেন নাই। অথবা সামান্য বায়ুবেগেই যে এই ভস্মরাশি উড়িয়া যাইয়া প্রবল দাবানলে পরিণত হইতে পারে, জার এতটা মনে করিতে পারেন নাই।

জাপানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতেও জনসাধারণ জার নিকোলাসের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। তারপর জার নিকোলাসের অন্তঃকরণ ভাল হইলেও তাঁহার তেমন মানসিক বল ছিল না। তিনি অনেক সময়েই নিজের দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের চরিত্র ও ভাগ্যের সহিত নিকোলাসের চরিত্র ও ভাগ্যের অনেকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই শান্তিপ্রিয়, সরল ও কঠোরতার বিরুদ্ধবাদী; উভয়েই দুর্ব্বলচিত্ত, অস্থিরবুদ্ধি এবং অল্পাধিক পরিমাণে মন্ত্রিদিগের ক্রীড়নক ছিলেন। শান্তির সময় হইলে উভয়েই উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত হইতে পারিতেন। সুশাসন, দয়া ও ন্যায়পরায়ণতায় উভয়েই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্রোহী দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ইঁহাদের কেহই তাহা তেমন জানিতেন না। তবে সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে জার নিকোলাসের পরিণাম তেমন শোচনীয় হয় নাই। রুশিয়ার জনসাধারণ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ভীষণ কাহিনী ভুলিতে পারে নাই। তাহারা নিজেদের বেলায় যথাসম্ভব ধীরতা ও শৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে পারিয়াছে। তাহারপর নিকোলাসও তাঁহার পিতামহের হত্যার কথা মনে রাখাতেই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যদি ক্রমে ক্রমে তাহার আরও একটুকু বিস্তৃতি সাধন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত হইতে হইত না।

বর্ত্তমান মহাসমরেও রুষ গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট আশানুরূপ কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। যুদ্ধের ফলে দেশে অর্থাভাব ও ভীষণ অন্নকষ্ট আরম্ভ হয়। কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহার প্রতিকারের তেমন চেষ্টা পান নাই। ফলে বিগত কয়েক মাস ধরিয়া বুভুক্ষু নরনারী অসন্তুষ্ট হইয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে থাকে। ইহাও প্রকাশ যে রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের উপর জার্ম্মাণীর প্রাধান্য আছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মে এবং তাহাতে তাহারা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। মন্ত্রিগণ জার্ম্মেণীর সহিত পৃথক সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রজাগণ তাহা মোটেই পছন্দ করিত না।

সর্ব্বশেষে আর একটী কারণে জনসাধারণ জার নিকোলাসের উপর একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। গ্রেগরি রাসপুটিন নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক দৈবশক্তিবলে বিনা ঔষধে সকলপ্রকার কঠিন রোগ আরাম করিতে পারেন বলিয়া প্রকাশ করেন। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া জার স্বীয় পুত্রের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই সুযোগে রাসপুটিন জার ও তাঁহার মন্ত্রিগণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। প্রজাদিগের বিশ্বাস জন্মে যে এই ব্যক্তি জার্ম্মেণীর পক্ষ সমর্থনকারী এবং তাহারই পরামর্শে মন্ত্রিগণ তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের

তেমন পন্থা অবলম্বন করিতেছেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জনসাধারণ রাসপুটিনের প্রাণ নাশ করে। এই উপলক্ষে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়াতেই বিপ্লবের সূচনা হইল।

বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।—গবর্ণমেণ্ট পুলিশের উপর বিপ্লব দমনের ভার দিলেন। পুলিশ গুলি চালাইয়াও যখন তাহা দমন করিতে পারিল না; তখন গবর্ণমেণ্ট সেনাদলকে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য পাঠাইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর দাঙ্গা হইল। অবশেষে সেনাদল বিপ্লববাদীদের পক্ষে যোগদান করিল। জার ইহার পূর্ব্বেই এক আদেশ দ্বারা ডোমার কোন অধিবেশন হইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ডোমা সেই আদেশ অমান্য করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক সভার অধিবেশন করিলেন। ডোমার প্রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট কি করিবেন সহসা তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ডোমার প্রেসিডেণ্টকে কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে নৌবিভাগও বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিল। সম্রাট অগত্যা নিরুপায় হইয়া বিগত ১৫ই মার্চ্চ সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় সহোদর গ্রাণ্ডডিউক নিকোলাসকে রাজ্যভার দিয়া এক ঘোষণা দ্বারা সকলকে জানাইলেন যে, দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং অবাধে মহাসমর চালাইবার ইচ্ছায় তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। গ্রাণ্ডডিউক নিকোলাস সম্রাট হউন, জন-সাধারণের তাহাও অভিপ্রেত হইল না। ইহা বুঝিতে পারিয়া পর দিন বিকালে তিনিও সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর ডোমা সাম্রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্রাটের সিংহাসন পরিত্যাগ করার কথা প্রচারিত হইবা মাত্র রাজপ্রাসাদ হইতে রাজকীয় পতাকা নামাইয়া ফেলা হয়। সরকারী কার্য্যালয় দোকান ইত্যাদি যেখানেই রাজচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, সেখান হইতেই তাহা উঠাইয়া ফেলা হইল।

ডোমা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে এই শাসন পরিবর্ত্তনের কথা জ্ঞাপন করেন। ১৬ই মার্চ্চ পেট্রগ্রাড হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালী গবর্ণমেণ্ট ডোমাকে বিধি সঙ্গত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এই গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের ফলে রুষ সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র মূলক শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র মূলক শাসন প্রবর্ত্তন হইল।

ভূতপূর্ব্ব জার এখন লিভাডিয়াতে এবং জার মহিষী সন্তানদিগকে লইয়া জারকোসেলোতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের উপর যাহাতে কোনও অত্যাচার না হয়, ডোমা সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন নিয়াছেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এখন রুশিয়াতে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন গবর্ণমেণ্ট অধিকতর শান্তির সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক।

বাঙ্গলার পল্লী।

কিছুদিন হইতে বাঙ্গলার পল্লীর প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালার দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গলার পল্লী সমূহ যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে পল্লী লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল, যাহা অর্থশালী এবং পণ্ডিতদিগের বাসস্থান ছিল, যে স্থান "বারমাসে তের পার্ব্বণে" সকলের মন আনন্দে এবং ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ করিত, আজ তাহা যে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্দ্ধিষ্ণু লোক এখন পল্লীগ্রামে থাকিতে অনিচ্ছুক এবং সুবিধা পাইলেই সহরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া সেই খানে জীবন অতিবাহিত করেন। পণ্ডিতগণ এখন পল্লীসমূহে টোল ইত্যাদি স্থাপন পূর্ব্বক ছাত্রদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যা বিতরণে অসমর্থ। মধ্যবিৎ ভদ্রলোক পল্লী ত্যাগ করিয়া বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জনোপলক্ষে এখন সহরবাসী। কচিৎ তাঁহারা ছুটী

উপলক্ষে গ্রামে যাইয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গত শতাব্দীতে বাঙ্গলার পল্লীর যে সমৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব ছিল, তাহা এখন নাই এবং ক্রমেই যে উহা ক্ষীণতর হইবে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ সম্মুখে রহিয়াছে।

পল্লী সমূহের অবস্থা কেন এইরূপ হইল, তাহা লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে বাঙ্গালী অত্যন্ত বাবু হইয়া উঠিয়াছে, সহর ভিন্ন "বাবুগিরি" করিবার উপায় নাই সুতরাং ধীরে ধীরে তাহারা পল্লীবাস ছাড়িয়া সহরবাসী হইতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে পল্লীসমূহ এখন অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে সেখানে বাস করা একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। সহরগুলি মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদির জন্য অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর সুতরাং এখন সহরবাস আবশ্যক। আবার আর একদল বলেন যে পল্লীসমূহে অন্ন জুটে না; উপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে হইবে, সুতরাং সহরবাসই আবশ্যক; কারণ সহরই উপার্জ্জন ও শিক্ষার প্রশস্ত স্থান। কোনও কোনও স্থলে দুর্দ্দান্ত ও বদমায়েস লোকদিগের অত্যাচারে নিরীহ লোক পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে ও এখনও হইতেছে।

উপরি লিখিত কোনও একটা কারণে লোক পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইতেছে না, ইহা বোধ হয় নিশ্চত। কিন্তু সমস্তগুলি কারণ যে একত্র হইয়া বাঙ্গালীকে পল্লীসমূহ হইতে বিতাড়িত করিতেছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। তবে ইহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইতেছে অন্নাভাব। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লী সমূহ যে পরিমাণে তাহার সন্তানগণকে ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম ছিল, এখন তাহার ৫ ভাগের ন্যায় করিতে অসমর্থ। সুতরাং উদরান্নের জন্য এখন বাঙ্গালীকে নানা স্থানে ঘুরিতে হইতেছে, এবং দিন কাল যেরূপ দাঁড়াইতেছে, আহার্য্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য যেরূপ বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, জীবন সংগ্রাম যেরূপ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে, তাহাতে মধ্যবিৎ বাঙ্গালীর পক্ষে নিজের সংসার প্রতিপালন করিয়া পল্লীর বাড়ী রক্ষা বা তথাকার আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন করা বা তাহাদের জীবনধারণে সাহায্য করা একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। সুতরাং পল্লীবাসীর সংখ্যা যে দিন দিন ক্ষীণ হইবে, গৃহস্থহীন বাড়ীর সংখ্যা যে ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? পূর্ব্বে যে সামান্য সম্পত্তির দ্বারা বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করা যাইত, এখন তাহা দ্বারা ছই মাসোপযোগী অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হয় না। যে সমস্ত পরিবারের জীবন খামার জমির শস্যের উপর নির্ভর করিত সে সমস্ত জমিতে প্রজার দখলীস্বত্ব হওয়ায় ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হইয়াছে সুতরাং সেরূপ শস্য উৎপন্ন হয় না। কাজে কাজেই সেরূপ আয়ও নাই। নদী ইত্যাদির অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় ধীবরগণকে পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিতে হইয়াছে, অথচ অন্য ব্যবসা গ্রহণ করাও তত সহজ নয় বলিয়া তাহাদের পরিণাম দারিদ্র্য ও মৃত্যু। বাঙ্গালায় এই কারণে বোধ হয় ধীবরের সংখ্যাও হ্রাস হইয়া থাকিবে।

লোকের অভাব বৃদ্ধি হওয়ায় পল্লীসমূহে একখণ্ড ভূমিও বিনা আবাদে থাকে না। সুতরাং গরুর ঘাস এখন পাওয়া যায় না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাড়ীতে ২। ৪। ৫টী করিয়া গরু থাকিত। লোকে দুধ সহজে ও সস্তায় পাইত; খাওয়া দাওয়ার কোনও কষ্ট ছিল না, গোপগণের ব্যবসায় বেশ সুন্দর চলিত; এখন দধি, দুগ্ধ, ঘৃত যেরূপ মহার্ঘ গোপদিগের ব্যবসাও তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে গোপগণ স্বীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে ধাবিত হইতেছে। পল্লীসমূহে অর্থোপার্জ্জনের উপায় নাই সুতরাং সকলেই সহরবাসী হইতেছে।

আমাদের সম্মিলিত শক্তি কার্য্যকরী নহে সুতরাং কোনও বাণিজ্য বা গ্রাম-হিতকর কার্য্য একত্রে করিতে পারি না। যে দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদির এত অভাব হইয়াছে, তাহা সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে কিরূপ পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বোধগম্য হইবে।

সুইজারল্যাণ্ডবাসী জনৈক মিশনারী আমাকে তাঁহাদের দেশে দুগ্ধের ব্যবসা কি প্রকারে উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং কি প্রকারে পরিচালিত হইতেছে, তাহার গল্প করিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি এক পল্লীতে বাস

করেন; সেখানে দুগ্ধ জমাট করিবার একটী কারখানা আছে। তাহার কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য একটী কমিটী ও কতকগুলি কর্ম্মচারী আছে। যাহাদের গরু আছে, তাহারা প্রত্যহ তাহাদের গরুর দুগ্ধ একটী পাত্রে আনিয়া ঢালে। সেই পাত্রের গাত্রে মাপিবার হিসাব আছে। একজন কর্ম্মচারী প্রত্যেকের নামে কাহার কত পরিমাণ দুগ্ধ হয়, তাহা লিখিয়া রাখে। দুগ্ধ প্রত্যহ রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমাট করা হইতেছে। এই সমস্ত জমাট দুগ্ধ টিনে পুরিয়া পাইকারী দরে নিকটস্থ স্থানে বিক্রয় করা হইতেছে। পাইকারেরা তাহা বিদেশে চালান দিতেছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিচালকদিগের বেতন এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যয় বাদে—মুনাফা প্রত্যেক সপ্তাহে দুগ্ধবিক্রেতাদিগকে হিসাবানুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে কোনও গোলমাল নাই। হিংসা, দ্বেষ, ঝগড়া, দলাদলি ইত্যাদির ব্যাপার নাই। কমিটীর উপর সকলেরই প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। তাহারা হিসাব করিয়া লাভের যেরূপ হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, সকলেই তাহা মানিয়া লয়। কমিটীর সভ্যগণ রীতিমত নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত কাজ করিয়া থাকে।

ইহা কোনও যৌথ কারবার নহে; প্রকৃত পক্ষে Co-operative system বা সম্মিলিত কার্য্য প্রণালীর ফল। কিন্তু আমাদিগের পল্লীতে কি হয়? নিকটে হাট বাজার থাকিলে সেখানে লোকে দুগ্ধ লইয়া যায় কিম্বা নিকটে কোন ও বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী থাকিলে তথায় বিক্রয়ের জন্য যায়। তাহার ফল এইরূপ হয় যে কোনও দিন লোক দুগ্ধ ক্রয় করিতে পারে না, আবার কোনও দিন দুগ্ধ বিক্রেতাকে দুগ্ধ বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে হয়। যদি Co-operation বা সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তি আমাদের থাকিত; তাহা হইলে সমাজের এতগুলি লোক দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়া সকাল হইতে দ্বিপ্রহর, বিকাল হইতে রাত্র ৭।৮টা পর্য্যন্ত হাটে বাজারে শুধু দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য বসিয়া থাকিত না। ইহাতে যে সময় ও শক্তির অপব্যবহার হয় তাহা সহজেই নিবারণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু শিক্ষার অভাবে সেই Co-operation বা সম্মিলিত কার্য্যকরী ক্ষমতা আমাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইতেছে না। আমাদের শক্তি দলাদলি প্রভৃতিতে কিরূপ অপব্যয়িত হইতেছে, তাহা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে দেখান যাইতে পারে।

এই জেলার কোনও একটী গ্রামে পূর্ব্বে অনেক নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্ত ইত্যাদি হিন্দুর বসতি ছিল। হিন্দুর সংখ্যা প্রায় শত ঘর হইবে। ক্রমে এখন তাহা ২০।৫টী ঘরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নমঃশূদ্রের ছেলের বিবাহে অনেক টাকা লাগে; সুতরাং একবাড়ীর সব পুরুষই বিবাহ করিতে সক্ষম হয় না এবং একটু বেশী বয়স না হইলে বিবাহ হয় না। সেখানের কোনও একটী পরিবারে মাত্র একটী পুরুষ ছিল। সে অতি কষ্টে কিছু ঋণ করিয়া প্রথমে বিবাহ করে। তাহার যে জমি জমা ছিল তাহাতেই তাহার কোন প্রকারে চলিয়া যাইত। সেই নমঃশূদ্রটী শেষ একটী সন্তান ও স্ত্রী লইয়া কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল।

গ্রামে জলকষ্ট; বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপে ২।১টী পুকুর যাহা ছিল তাহাও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই সময় প্রতি বৎসরই ওলাউটা দেবীর প্রাদুর্ভাব হয়। এক বৎসরে সেই নমঃশূদ্রটী তাহার স্ত্রী ও সন্তানটীকে হারায়। অতঃপর বিপত্নীক হইয়া সে সমাজের প্রথানুযায়ী একটী বিধবাকে গৃহে আনিয়া স্বামী স্ত্রী রূপে বাস করিতে থাকে। ইহা তাহাদের সমাজে দূষণীয় নহে। কিছুদিন পরে সেই বিধবার গর্ভে তাহার এক পুত্র হয়। অর্থাভাবে সে তখন কোন প্রকার সামাজিক ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না। হিন্দুর দলাদলির কারণের অভাব নাই। তাহাকে সকলে 'একঘরে' করিল। সে আপন মনে সংসার চালাইতে লাগিল। দৈব দুর্ব্বিপাকে আর এক বৎসর ওলাউঠা হওয়ায় সে তাহার এই সন্তানটীও হারাইল। সন্তানটীর বয়স তখন ৮।১০ বৎসর হইবে। নমঃশূদ্রটী তখন বৃদ্ধ হইয়াছিল। মৃতদেহ সৎকারের জন্য সে স্ব শ্রেণী লোকদিগের শরণাপন্ন হইলে তাহারা সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। সকাল হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত সে ও বিধবাটী দ্বারে দ্বারে কাতর-প্রার্থনা করিয়া সাহায্য চাহিল, কিন্তু কেহই তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। তখন স্ত্রী পুরুষ দুইজনেই সেইমৃত দেহ বহন করিয়া শ্মশানে

লইয়া গেল। যখন তাহারা সৎকারের উদ্যোগ করিতেছে তখন কয়েকটী মুসলমান আসিয়া বাধা প্রদান করিল। অবশ্য তাহাদের স্ব শ্রেণীর কয়েক ব্যক্তিই স্থানীয় মুসলমানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ঐ পতিত ব্যক্তির মৃত দেহ ঐ স্থানে দাহ করিতে বাধা প্রদান করিল। ঐ লোকটী মুসলমানদিগের নিকট বহু কাকুতি মিনতি করিল, কত দীনতা জ্ঞাপন করিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তাহারা চিতার উপর সজ্জিত মৃত দেহ, স্থানান্তরিত করিবার জন্য ভয় দেখাইতে লাগিল। ঐ লোকটী তখন জোর করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে গেল। তখন একটী মুসলমান আসিয়া বাধা দিতে উদ্যত হইল। একে পুত্র শোক, তাহার উপর সমস্ত দিনের অনাহার, স্ব শ্রেণীয় ব্যক্তি দিগের মর্ম্মান্তিক ব্যবহার, শেষে দাহ করিতে বাধা পাইয়া লোকটী পাগলের ন্যায় হইয়া নিকটস্থ কুঠার লইয়া মুসলমানটীকে আক্রমণ করিয়া এক আঘাতেই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিল এবং সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া সে স্বয়ং থানায় আসিয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। অবশ্য তখন তাহাকে হাত কড়ি লাগাইয়া চালান দেওয়া হইল। যথারীতি মোকদ্দমা হইল, সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া দরদর ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে জ্ঞান হারা হইয়া এই কাজ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে স্বল্প শাস্তির বিধান করিয়া হাকিম তাহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। এখন দেখুন সামাজিক কুপ্রথায় আমাদের দুর্দ্দশা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে—পল্লীকে আবার কিরূপে জাগ্রত করা যাইতে পারে? আমার বোধ হয়, যে পর্য্যন্ত না পল্লীতে অর্থ উপার্জ্জনের স্থান করা যায়, সে পর্য্যন্ত শুধু কৃষক ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে পল্লী বাস সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং পল্লীতে কি উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। সুইজারল্যাণ্ডের দুগ্ধের ব্যবসায়ের ন্যায় গ্রাম্য ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে Cottage Industry বা কুটীর শিল্প স্থাপন করিয়া তাহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট না হইলে এই জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। শুধু চাকরীর উপরে কোনও জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতে পারে না এবং সহর বাসও ব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং পল্লীতে ছোট ছোট ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিলে জাতির এবং পল্লীর মহদুপকার সাধিত হইবে। ছোট ছোট তেলের কল, মোজা ও গঞ্জির কল, ডায়রি ফার্ম্ বা দুগ্ধ মাখন ইত্যাদির কল, যব, মগ, শঠি ইত্যাদির ছোট ছোট কারখানা। ছোট ছোট সূতারের কারখানা বা লৌহ শিল্প ইত্যাদির কারখানা খুলিয়া ব্যবসাবাণিজ্যেরদিকে ধীরে২ অগ্রসর হইতে না পারিলে পল্লীর বা জাতির শুভ নাই। পল্লীতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়েই জীবন ধারণ করা যায়; সুতরাং সেখানে অল্প ব্যয়ে ছোট ছোট ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা যাইতে পারে। যে মহোদয়গণ বাঙ্গালী জাতির ও পল্লীর শুভকামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা পল্লীতে পল্লীতে ছোট ছোট ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা যাহাতে হয়, তাহার উদ্যোগ করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে ও বাঙ্গালীর পল্লীকে রক্ষা করুন।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

দিদি।

নন্দর এগার বৎসর বয়সে তাহার কোন বিধি ব্যবস্থা না করিয়া নেহাৎ অবিবেচকের মত তাহার মাতা এক দিন কোন এক অজানা দেশে চলিয়া গেল। নন্দ মাটিতে পড়িয়া খুব এক চোট কাঁদিয়া লইল। তারপর পাড়ার নিধিরাম মুখুয্যের কাছে যাইয়া বলিল, "দাদা, মা ত ম'রে গেল, এখন দাঁড়াব কোথায়?" বৃদ্ধ একটি সহানুভূতির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তার আর চিন্তা কি ভাই, আমি তোকে তোর দিদির বাড়ী দিয়ে আস্‌ব। মাতৃকার্য্য হয়ে যাক্, তারপর আমরা দিদির কাছে যাব'খন।"

যথাসময়ে নন্দ নিধি মুখুয্যের সহিত দিদির বাড়ী চলিল।

নন্দ দিদিকে কখনও দেখে নাই। লক্ষ্মীমণি তাহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী। নন্দের মা লক্ষ্মীকে কখনও নিজ বাড়ীতে আনেন নাই, কারণ, তাহার ছিল অবস্থা খারাপ, অথবা তাহার কোঁদল স্বভাবের জন্য লক্ষ্মীমণি নিজেই আসেন নাই।

সন্ধ্যাবেলা নন্দ দিদির বাড়ী ইছাপুরে পৌঁছিল। লক্ষ্মীমণি সন্ধ্যার দীপ দিয়া ছেলেমেয়ে গুলিকে খাওয়াইতে-ছিল, বাহির হইতে কে ডাকিল "লক্ষ্মী"। লক্ষ্মী হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার বাপের দেশের নিধি মুখুয্যে একটী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। মুখুয্যে বলিলেন "এটি তোমার ভাই। তোমার মা মরেছে, তাই তোমার কাছে এসেছে।" "এস" বলিয়া লক্ষ্মী শোক-সন্তপ্ত বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইল। নন্দ দিদির বুকে মুখ রাখিয়া একবার খুব কাঁদিয়া মনের রুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করিল।

পরদিন সকাল বেলা মুখুয্যে মশায় বলিলেন "নন্দ এখানে থা'ক। কেমন রে নন্দ, দিদির কাছে থাকতে পার'বনে।" নন্দ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

দুপুর বেলা লক্ষ্মীর স্বামী মণিকলাল দত্ত বাড়ী আসিয়া লক্ষ্মীর কাছে অপরিচিত বালকটীকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। লক্ষ্মী বলিল "এটি আমার ভাই, এখানে থাকবে বলে এসেছে"। মাণিক বলিল "বেশ ত"।

মাণিকলাল লোকটী কিছু কৃপণ। বাজারে তাহার একটী ছোট খাটো রকমের দোকান আছে। দোকানের আয় ও বাড়ীর তরিতরকারী, বাঁশ ইত্যাদি বেচিয়া সংসার চালায়। সংসার ও তেমন বড় নয়; স্ত্রী, একটী সাত বৎসরের মেয়ে আর একটী তিন বৎসরের শিশু পুত্র। মাণিক অনেক দিন যাবত অল্প বেতনে একটি চাকর খুঁজিতেছিল। তাই নন্দকে দেখিয়া এত সহজে বলিল "বেশ ত।"

লক্ষ্মীমণি নন্দকে একখানা কাপড় ও একটী পিরাণ আনাইয়া দিল। মাণিক তাহা দেখিয়া একটী বড় রকমের ভ্রুকুটী করিল, কিছু বলিল না। পত্নীকে সে কিছু ভয় করিত। মাণিক নন্দকে একছিলিম তামাক সাজিতে আদেশ করিয়া হিসাবের খাতা লইয়া বসিল। নন্দ রান্নাঘরে যাইয়া দিদির কাছে আগুন চাহিল। দিদি বলিল "কেনরে নন্দ আগুন দিয়ে কি হবে?" নন্দ বলিল "দত্ত মশায় তামাক খাবেন।" "তোকে বলেছে কেন? যা'ত মা সুরু ওঁকে একছিলিম তামাক দিয়ে আয়!" মেয়েকে তামাক আনিতে দেখিয়া মাণিক বলিল "নন্দ কোথায়?" মেয়ে বলিল "মার কাছে বসে কি কথা কচ্ছে।" সুরু চলিয়া গেল। মাণিকলাল বুঝিল নন্দ ক্রমে ২ লক্ষ্মীর হৃদয় অধিকার করিতেছে। এ তাহার পক্ষে বড় সুবিধার কথা নহে।

দিন কয়েক পরে একদিন আহারে বসিয়া মাণিক বলিল "নন্দ এখন কি করবে, এমনি করে ত আর চিরকাল চলবে না।" লক্ষ্মী বলিল "আমিও ভাবছি তাই, আচ্ছা কাল তাকে একবার বামুঠাকুরের পাঠশালায় নিয়ে যেও না হয়?" মাণিক ভাবিল তবেই হয়েছে, বলিল "দেখ লেখে পড়ে আর কি হবে? আজকাল যে দিন পড়েছে, তাতে লেখা পড়ায় কিছু কাজ হয় না; আমি ভাবছি ওকে দোকানে নিয়ে কিছু কিছু করে কাজকর্ম্ম শেখাব।" "যা ভাল বোঝ কর, তবেও ছেলে মানুষ পেরে উঠবে কিনা ভাবছি।" লক্ষ্মী স্বামীর স্বভাব জানিত তাই এই কথা বলিল।

(২)

পরদিন হইতে নন্দ সময় মত দোকানে যাইতে আরম্ভ করিল। কোন দিন মাণিক সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিত না। পথে দেখিত ছেলেরা সব ঘুড়ি লাটাই নিয়া খেলা করিতেছে; তাহার হৃদয় ফাটিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আসিত, কখন কখন দুই এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। ভাবিত 'কি সুখের দিনই তাহার গিয়াছে'। সে সব ভুলিয়া যাইত। বাজার-যাত্রিগণ তাহার অতীত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিত। ঘরের রোয়াকে পা দিতে না দিতেই মাণিকের কণ্ঠস্বর তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিত "কিরে নন্দ তুই আমার দোকান বন্ধ করবি নাকি? কত লোক যে ফিরে গেল, এই ক্ষতিপূরণ দেয় কে? বসে বসে খাচ্ছ আর বয়ে যাচ্ছ, নয়? যা, যা এই তেলের বোতল কটা ভরে দে।" নন্দ জোর করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া তেল ভরিতে চলিল।

একদিন তাড়াতাড়ি ভরিতে যাইয়া কতটুকু তেল মাটীতে পড়িয়া গেল; দেখিয়া মাণিকলালের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিল "হতভাগা, দেখ্‌ত কি করলি, বের এখান থেকে।" নন্দ এককোণে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। মাণিকলাল অতি কষ্টে ধূলি মিশ্রিত তৈল উঠাইয়া বলিল "হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক্‌লে চলবে না, এই বস্তা নিয়ে বাড়ী চ।" এই বলিয়া নন্দের

মাথায় এক মণের এক চাউলের বস্তা তুলিয়া দিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ী চলিল। নন্দ ভয়ে ভয়ে অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। ঘরে ঢুকিতেই বস্তার গুতা লাগিয়া তাক হইতে মাণিকের আফিমের কৌটা পড়িয়া গেল। মাণিকলাল "তবে রে" বলিয়া নন্দের গণ্ডদেশে দুই ঘা বসাইয়া দিল। নন্দ এতক্ষণ অতি কষ্টে কান্না চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী তখন পাকের কয়লা জ্বালাইতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া নন্দকে ধরিল, বলিল "তুমি কি মানুষ, দুধের শিশুকে এমনি করিয়া খাটান, তার উপর আবার মারা। নন্দ, কাঁদিস না ভাই ও বাড়ী তোকে গান শুনতে নিয়ে যাব এখন।" তারপর স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল "আর যদি একে মার ত আমি এ সংসারে টিক্‌তে পারিব না।" মাণিক বেগতিক দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

আর একদিন হঠাৎ আছাড় খাইয়া নন্দ একটা তেলের বৈয়াম ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মাণিক যাইয়া নন্দকে খুব কয়েকটা উত্তম মধ্যম দিল। নন্দ "মাগো বলিয়া গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। "তেল গুলা নষ্ট করেছেন, আবার; চুপ কর হতভাগা। বাড়ীতে যেয়ে এ সব কথা বলবি ত তোর রক্ষা নেই।"

লক্ষ্মী নন্দকে দেখিয়া বুঝিল, কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে। সে নন্দের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি রে নন্দ কি হইয়াছে?" নন্দ কাঁদিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী সস্নেহে নন্দের গায় হাত দিল "ও মা তোর গা যে আগুণের মত গরম।" লক্ষ্মী তাহাকে কোলে করিয়া নিয়া বিছানায় শোয়াইল। তারপর বলিল "বল ত ভাই কি হইয়াছে, বল, আমার কাছে বল।" নন্দ সব বলিয়া ফেলিল।

রাত্রে জ্বরটা কিছু বাড়িল। নন্দ ডাকিল "দিদি।" "কেন ভাই বড় কি কষ্ট হইতেছে?" বলিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া বসিল। নন্দ একটু জল চাহিল। ভোর রাত্রে একটু একটু করিয়া জ্বর কমিয়া আসিল। সকালে লক্ষ্মী উঠিয়া গৃহ কার্য্য সারিয়া নন্দের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল নন্দ বিছানায় নাই সে শিহরিয়া উঠিল। বাড়ীর চারিদিক একবার অস্থির পদে ঘুরিয়া আসিল; কোথাও নন্দকে দেখিতে পাইল না। তাড়াতাড়ি মেয়েকে ডাকিয়া বলিল "তাঁকে একবার বাজার হইতে ডাকিয়া আন্‌ত।" মেয়ে ছুটিয়া বাজারে গেল।

মাণিক আসিলে লক্ষ্মী তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল "নন্দ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে আমায় আনিয়া দাও নইলে আমি বাঁচিব না।" মাণিক বলিল "বল কি?" কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলে লক্ষ্মী দেখিতে পাইত যে মাণিক একটা পৈশাচিক আনন্দের হাসি গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। মাণিক বাহিরে যাইয়া কতক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল "পাওয়া গেল না।" লক্ষ্মী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৩)

নন্দের অন্তর্দ্ধানের পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর হৃদয়ের দ্বারে কি যেন কিসে সময় সময় মৃদু মৃদু আঘাত করে।

বারোয়ারী পূজার যাত্রা গান। মেয়ে বলিল "চল মা গান শুনিতে যাই।" লক্ষ্মী প্রথমে স্বীকৃত হইল না, পরে কি ভাবিয়া যেন গান শুনিতে গেল।

* * *

"কোথা যাও"

"নন্দের কাছে"

"কোথায় সে?"

"এই যাত্রার দলে আছে, আমি তাকে দেখিয়াছি।"

"সে হতভাগার কাছে গিয়া আর কি হবে? যাইয়া দরকার নাই।"

"না আমি যাব; সে হতভাগা হইলেও আমার ভাই— আমি তার দিদি।"

"সে তো তোমার সহোদর ভাই নয়—"

"এমন কথা বলিও না। আমি তার দিদি—আমি জিজ্ঞাসা না করিলে তাহাকে কে জিজ্ঞাসা করিবে?"

"যদি যাও ত সংসারে তোমার স্থান হবে না বল্‌ছি।" মাণিক দৃঢ় স্বরে এই কথা বলিল।

"তা বেশ জানি"—বলিয়া লক্ষ্মী মেয়ের হাত ধরিয়া চলিল। নন্দ লক্ষ্মীর মধ্যে প্রকৃত লক্ষ্মশ্রী দেখিতে পাইল। সে গদগদ কণ্ঠে বলিল "তুমি দিদিই বটে। আমি তোমার ভাইকে আনিতেছি—তুমি ঘরে যাও।"

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

জীবনাদর্শ।

ফ্রেডারিক নিট্‌জি (Nietzsche)

অনেকদিন পূর্ব্বে (১৯০৬ সনে) জার্ম্মেন দার্শনিক নিট্‌জির লিখিত Beyond Good and Evil নামক গ্রন্থ কিনিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যের শ্রেণী, অনেকটা পাগলের উক্তির মত বোধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সংবাদপত্রে যেখানে সেখানে তাহার উল্লেখ দেখিতেছিলাম। তাই বইখানা আনিয়া পড়া গেল, তাহার অন্যান্য গ্রন্থাদিরও সাক্ষাৎ লাভ হইল। এখন দেখিতেছি, তেমন অবোধ্য কিছু নয়। নিট্‌জির দর্শন-শক্তি দর্শন (Philosophy of Power);—তাই, এই মহা প্রলয়ের দিনে যখন আকাশ সর্ব্বক্ষণ কেবল শক্তি, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের আলোচনা ও অনুশীলনেই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার দর্শন বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইতেছে, না, আবছায়ার মত চক্ষের কাছে যাহা ছিল তাহা যেন অপসারিত হইয়াছে।

সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই মহাযুদ্ধে জার্ম্মেনদিগের দার্শনিকই হইতেছেন—নিট্‌জি। সকলেরই বিশ্বাস জার্ম্মেনগণ তাহারই দার্শনিক মতে প্রবুদ্ধ হইয়া এই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সঙ্গে আরও দুইজনের নাম উঠিয়াছে, ঐতিহাসিক ট্রিস্কি (Treischke) ও সৈন্যাধ্যক্ষ বার্ণহার্ডি (Barnhardi)। নিট্‌জির অথবা তাহারই প্রচারিত অনুরূপ ভাবের উপর ট্রিস্কি তাহার মত সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বার্ণহার্ডি তাহার Germany and the Next War নামক গ্রন্থে কি উপায়ে সে সকল স্বদেশের কার্য্যে নিয়োজিত করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইহারা প্রত্যেকেই শক্তিবাদী, অভিষ্ট সাধনে দয়ামায়া লেশশূন্য। যুদ্ধ ভয়াবহ নৃশংস ব্যাপার, নিতান্ত না ঠেকিলে ইহাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, এপর্য্যন্ত সমাজে এই প্রকার ধারণাই প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহাদের মত অন্যরূপ—জাতীয় উন্নতির জন্য সমর্ক বুঝিয়া ইচ্ছায় এই ভীষণ ব্যাপারে লিপ্ত হওয়াও দরকার। কি উদ্ভিত জগতে, কি প্রাণিজগতে, কি মানবসমাজে সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলকে পরাস্ত ও পদদলিত করিয়া সবল বড় হইতেছে, সর্ব্বত্রই শক্তিমানের জয়। নিট্‌জির মতে war যুদ্ধ একটী Biological necessity জীবজগতের অনলঙ্ঘনীয় নিয়ম। যে জাতি শুধু শান্তি অন্বেষী অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জন করা ও ধনী হওয়াই যার লক্ষ্য, তাহার ধ্বংস নিকটবর্ত্তী, অনিবার্য্য। দৃষ্টান্ত—নরওয়ে, হলেণ্ড, পর্ত্তুগাল, স্পেন। যেমন রুগ্নব্যক্তির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সময় বিশেষে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রয়োজন, সেই প্রকার ইহাদের মতে দুর্ব্বল মুমূর্ষু জাতির পক্ষে যুদ্ধও মৃত সঞ্জিবনী বিশেষ। ইহারা প্রত্যেকেই মনস্বী, স্বদেশভক্ত; স্বীয় দেশের মহিমা, সভ্যতা ও প্রভাব যাহাতে জগৎব্যাপ্ত হইয়া পড়ে প্রত্যেকেরই তাহা লক্ষ্য। উদ্দেশ্য সাধনে কোনও কুকার্য্যেই পরাঙ্মুখ নহেন—ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিত্রয়!

নিট্‌জির জীবনে তেমন বিশেষত্ব কিছু না থাকিলেও সাধারণ লোকের জীবনের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সেক্সনির অন্তর্গত রকেন নামক পল্লীগ্রামে এক ধর্ম্মযাজকের বংশে তাহার জন্ম হয়। মাতামহও ধর্ম্মযাজক ছিলেন। বাল্যকালেই পিতৃহীন হন। ১৮৫০—১৮৬৮ স্কুল ও কলেজে পাঠ্যাবস্থা। প্রতিভাবান, পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত হইয়াছিলেন। সঙ্কল্প ছিল তিনিও পিতার ব্যবসাই গ্রহণ করিবেন—তদুদ্দেশে ধর্ম্ম-শাস্ত্র(Divinity) ও শব্দশাস্ত্র (Philology) পাঠ করিতে ছিলেন, কিন্তু ১৮৬৫ সনে লিপ্‌জিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ কালীন জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক সোপেনহরের সুবিখ্যাত গ্রন্থ The World as Will and Idea পাঠে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন হয় এবং ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া ফেলেন। ১৮৬৭ সনে এক বৎসরের জন্য রাজ্যের নিয়মানুসারে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হন। ইহার কিয়ৎ-কাল পরেই চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সের সময় সুইজারলেণ্ডের অন্তর্গত বেছিল (Basle) বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দ শাস্ত্রের (Philology) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ সনে তাহার প্রথম গ্রন্থ Birth of Tragedy প্রকাশিত হয়। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, দেহ বলিষ্ঠ ও চক্ষুদ্বয় জ্যোতিষ্মান্ ছিল, সুন্দর স্বাস্থ্য গুণে দর্শকের চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত কিন্তু মাঝে মাঝে শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেন। ১৮৭১ সনে অত্যধিক পরিশ্রম হেতু তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে।

কিয়ৎকাল দেশ ভ্রমণের পর স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু এখন হইতে প্রায়ই শিরঃপীড়ায় ভুগিতে লাগিলেন। অবশেষে শরীর এতই খারাপ হইয়া পড়িল যে উপায়ান্তরবিহীন হইয়া ১৮৭৯ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এখন হইতে ইউনিভার্সিটী হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক একশত কুড়ি পাউণ্ড মুদ্রা মাত্র পেনসেনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে জীবন যাপন করিতে হইতে লাগিল। স্বাস্থ্য লাভের জন্য কখন ও সুইজারলেণ্ডের পর্ব্বত মালায় স্থাপিত সেণ্ট মরিটজ, সিলস মেরিয়া, কখনও ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস, জেনোয়া, নাইস ইত্যাদি নানাস্থানে, কখনও হোটেলে, কখনও কৃষকের গৃহে একাকী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোথায়ও শান্তি পাইতেছিলেন না। অতি কষ্টে নিতান্ত মিতব্যয়ী ভাবে জীবন যাপন করিতেন। যখন জেনোয়া নগরে বাস করিতেন, তখন স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে নিজ হস্তে সামান্য রকমের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। নির্জ্জনেই অধিক সময় অতিবাহিত হইত, প্রভাতে একাকী সমুদ্র তীরে বা পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে নোট বুক হস্তে কর্ত্তন করিতেন, রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে কখনও বিশ্রাম করিতেন, কি যেন চিন্তায় সকল সময়ই বিভোর থাকিতেন, যখন যাহা মনে হইত নোট বুকে লিখিয়া রাখিতেন। ক্রমে ক্রমে Human All Too Human, Gay Science, Thus Spake Zarathustra, Beyond Good and Evil, The Will to Power ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, কিন্তু সাধারণে তাহার প্রতিপত্তি কিছুই হইল না। বরং তাহা পাঠ করিয়া বন্ধু বান্ধব সকলেই বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল, ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিল, অবশেষে প্রকাশকও গ্রন্থাদি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ, তাহার গ্রন্থাদিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিষম আক্রমণ দৃষ্ট হইত, তদুপরি তাহার লেখার রীতি ও ভঙ্গিমাই এমন নূতন ধরণের ছিল যে তাহা অনেকের নিকটই দুর্ব্বোধ্য বোধ হইত। অবস্থা শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Thus Spake Zarathustra চতুর্থ খণ্ড তিনি নিজ ব্যয়ে চল্লিশ খানা মাত্র মুদ্রিত করিলেন, এবং খুঁজিয়া সাতজন বন্ধু ও আত্মীয়ের কাছে তাহা প্রেরণ করিলেন। সাধারণের ব্যবহারে তিনি দিন দিনই ক্ষুণ্ণ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছিলেন, কার্য্যে উৎসাহও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

জীবনের শেষ ভাগে যেন জনসাধারণের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব কমিয়া আসিতে লাগিল। সুবিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক টেইন, ডেনিস লেখক ব্রেণ্ডেস ও সুইডেনের বিখ্যাত নাট্যকার ষ্ট্রিণ্ডবার্গের দৃষ্টি তাহার গ্রন্থাদির প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাহার সমধ্যায়ী বাল্যবন্ধু প্রফেসার পল ডুসেন (উত্তর কালে যিনি উপনিষদের দর্শন তত্ত্বের আলোচনা করিয়া জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন) তাহার গ্রন্থের এক সংস্করণ ক্রয় করিবার জন্য তার বন্ধুবিশেষ হইতে তাহার নিকট দুই হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। মেডাম মার্সলিনস নামক জনৈক বিদুষী রমণী ১০০০ এক হাজার ফ্রাঙ্ক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তখন তাহার কর্ম্ম জীবনের শেষ অবস্থা প্রায় সমাগত। ১৮৮৯ সনে তিনি অকস্মাৎ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহার বন্ধুবর প্রফেসার ওভারবেক তাহাকে সেই অবস্থায় টিউরিন হইতে বেছিল নগরে লইয়া আসেন। তাহার বৃদ্ধ মাতা তখন ও জীবিত, তিনি তাহাকে জেনা নগরে লইয়া যান ও সেখান হইতে ১৮৯০ সনে নৌমবার্গে স্বগৃহে আনয়ন করেন। তিনি আর আরোগ্য হন নাই। ১৯০০ সনে উইমার নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার উন্মাদকতার কারণ এখনও নির্ণয় হয় নাই। যাহাই হউক, তাহার শোচনীয় পরিণামের বিষয় ভাবিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। নিট্‌জির বিবাহ সম্বন্ধে অমত ছিল না—দুই বার দুইটী রমণীর পাণিপ্রার্থীও হইয়াছিলেন—দুই বারই প্রত্যাখ্যাত হন, শেষে আর বিবাহের দিকে দৃষ্টি করেন নাই। একমাত্র জ্ঞানচর্চ্চাতেই তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। চরিত্র নির্ম্মল, স্বভাব সরল ছিল,—তাহার মহানিন্দুকও এ বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে নাই।

পূর্ব্বাপরই নিট্‌জির নিজ প্রতিভা ও শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ১৮৮৩ সনে নাইস নগরে অবস্থান কালীন তিনি তাহার প্রতিবেশীগণকে কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,

চল্লিশ বৎসর মধ্যে তিনি ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়া পড়িবেন। আর এক সময় তাহার বন্ধু পিটার গেষ্টকে লিখিয়াছিলেন, যে পর্ব্বত প্রদেশে তিনি ভ্রমণ করিতেন, উত্তর কালে লোকে সেখানে তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে।

ভবিষ্যৎবাণী সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। মৃত্যুর পর বিংশ বৎসর ও অতীত হয় নাই—এই অত্যল্প কাল মধ্যে তাহার নাম জগতের সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইতেছে। ইয়ুরোপ ব্যাপিয়া তাহার শিষ্যানুশিষ্যের অভাব নাই। বলিতে গেলে সমস্ত জার্ম্মেন জাতিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাহার শিষ্য স্বরূপ। ইংলণ্ডে ও সুবিখ্যাত নাট্যকার বার্ণাড স প্রমুখ অনেকানেক লেখক অনেক বিষয়ে তাহার মতাবলম্বী ও ভাবে অনুপ্রাণিত।

চিরকালই এমন হইয়া আসিয়াছে। এক যুগে যিনি ঘৃণ্য নগণ্য, পরবর্ত্তী যুগে তাহার মূর্ত্তি পূজা করিয়া দেশবাসী ধন্য হয়। নিট্‌জির প্রতিপত্তির প্রধান কারণ তাহার সত্যান্বেষণ প্রবৃত্তি এবং নির্ভীকতা, যাহা তিনি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভাষা কবিত্ব মণ্ডিত ও প্রাণস্পর্শী, তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি। তৃতীয়তঃ, তিনি দার্শনিকদের জটিল তর্ক ও বৃথা শব্দাড়ম্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ঠিক বলিতে গেলে তাহাকে Philosopher বলা যায় না—বরং তাহাকে Prophet বলিলেই সমীচীন হয়। যুক্তি অপেক্ষা ভাবের প্রাবল্যই অধিক, সূত্রাকারেই (aphorism) অনেক বিষয় লিখিত—অনেক সময় কবিতারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কারণেও তাহাকে দার্শনিক বলিতে ইচ্ছা হয় না। দার্শনিক যিনি, জীবনের সমস্যা সমূহ তাহার পূরণ হইয়াছে—তিনি শান্ত, ধীর, গম্ভীর—ইহাই আমাদের ধারণা কিন্তু নিট্‌জির জীবনের দিকে দৃষ্টি করিলে তেমন কিছু মনে হয় না, বরং বোধ হয় কি যেন এক অশান্তি ও অতৃপ্তির ক্ষুধা বহন করিয়া তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

দার্শনিকদের মধ্যে তিনি সোপেনহরকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন দিতেন। সোপেনহরের মতে Will to Live জীবনধারণ-ইচ্ছাই জীবজগতের মূল প্রবৃত্তি (Principle)। ডারউইন যাহাকে Struggle for Existence জীবন-সংগ্রাম বলিয়াছেন—ইহা তাহারই রূপান্তর বিশেষ। কিন্তু নিট্‌জির মতে মানুষ কেবল জীবনধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট নহে, সে সকল সময়ই শক্তিপ্রয়াসী, ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রয়াসী, এক জয়ের ও প্রভুত্ববিস্তারের আনন্দের ভাবে সে আজন্ম বিভোর—Will to Power তাহার জীবনের মূলনীতি। তাহার মতে, তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ—যাহাদের ভিতর এই ক্ষমতাপ্রয়াসী প্রবল ইচ্ছাশক্তির Will to Powerর পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে—যেমন নেপোলিয়ন এবং ফ্রেডারিক দি গ্রেট। মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষে স্থানে স্থানে যে সকল মহাবীর সমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাহারাও এই শ্রেণীর। ইহারা নির্ভীক, মহাসাহসী, অদ্ভূতকর্ম্মা, নির্ম্মম, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বস্বপণ, ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ অবতার।

ধর্ম্মযাজকের পুত্র;—বিধির বিড়ম্বনা, নিট্‌জির মত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের এমন শত্রু নাই। তাহার মতে রোমীয় সভ্যতার প্রভাবে ইয়ুরোপে সর্ব্বত্র যে সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল—তাহার প্রধান গুণ ছিল অন্তর্নিহিত শক্তি। প্রাচীন রোমীয়গণ, প্রাচীন গ্রীকগণ, সকলেই শক্তির উপাসক ছিল,—সবল, সুস্থকায়, সুন্দর, দৃঢ়চিত্ত, দৃঢ়পণ মানবই ইহাদের আদর্শ পুরুষ ছিল,—দয়ামায়া জানিত না—স্বকার্য্য সাধনে প্রয়োজন হইলে পরকে নির্দ্দয়ভাবে যন্ত্রণা দিতে ত্রুটী করিত না, নিজেরাও অবহেলায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। শক্তিশালী ছিল বলিয়াই ইহাদের চরিত্রও মহৎ ছিল—দানে মুক্ত ছিল—হৃদয় ঔদার্য্যে পূর্ণ ছিল। অর্থগৃধ্নু য়িহুদীগণ ছিল ইহাদের সম্পূর্ণ বিপরীতচরিত্র। ইহাদের ন্যায় ধর্ম্মযাজকের শাসনাধীনে কোন জাতিই এত অধিককাল বাস করে নাই [বাদ অবশ্য আমরা অধঃপতিত হিন্দু]। সাধারণের গ্রাহ্য রীতিনীতি প্রচলিত করিতেও ইহাদের সমকক্ষ জাতি নাই। ইহারা চিরকালই পরপদদলিত পরপ্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে। তাই গরীবের, নির্য্যাতিতের যাহা বল ও সহায়—সেই সকল সাম্যের ভাব, দয়ার ভাব, একত্রীকরণের ভাবে ইহাদের সমাজ পূর্ণ। কালে রোমীয় সভ্যতা এই য়িহুদী সভ্যতার কাছে পরাস্ত হইয়া গেল। নিট্‌জির মতে তাহার পর হইতে

তিনজন য়িহুদী ও একজন য়িহুদী রমণীর পদতলে সমস্ত ইয়ুরোপ লুটাইতেছে—যীশু, ধীবর পিটার, তাম্বুপ্রস্তুতকারক পল এবং যীশুর মাতা মেরী। এই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, সাম্য ও মৈত্রী, দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি ভাবসমূহের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের ব্যক্তিত্বের (Individuality) বিকাশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে ইউরোপ দুর্ব্বল হইয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তাহার মতে, লোকসমূহকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একশ্রেণী, যাহাদিগকে তিনি aristocratic অভিজাতিক আখ্যা দিয়াছেন—Race of masters—প্রভুজাতি। আর একশ্রেণী Slaves ক্রীতদাস জাতি—পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত, পরপদতলচর। প্রথম শ্রেণীর মতে তিনিই সৎ (good), যিনি মহৎ, নীচাশয়তার গন্ধ যাহাতে নাই, সাহস, বীর্য্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মাভিমান, আত্মসম্মানজ্ঞান, বিপদের প্রতি অবজ্ঞা, বিপদে আনন্দভাব, কঠোরতা, প্রয়োজন বিশেষে নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতা এবং ন্যায়ান্যায়বিচারহীনতা যার চরিত্রাংশ। আর অসৎ (Bad) সে, যে কাপুরুষ, দুর্ব্বল, ভীতিগ্রস্ত, নীচাশয়, সকল বিষয়েই যে নিজ স্বার্থ ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; নিজকে যে অপমানিত হইতে দেয়, তোষামোদী, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী; যে কপটাচারী, সর্ব্বোপরি যে মিথ্যাবাদী। দাসজাতীয় লোকসকলকে অভিজাতবংশের হাত হইতে সর্ব্বক্ষণ আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়। তাই পূর্ব্বোক্ত য়িহুদীদের ন্যায় নিপীড়িত লোকসমূহ যে সকল নীতির সাহায্যে স্বীয় অস্তিত্ব কোন প্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখে, সে সকলই ইহাদের রচিত সমাজে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও সমাজনীতির প্রধান উপকরণ বলিয়া গণ্য হয়—যেমন দয়া, পরোপকার, পরিশ্রমশীলতা, বিনয়, বন্ধুত্ব। ইহারা Ascetic Ideal সন্ন্যাসীর জীবনকে আদর্শ মনে করে, সংসার ইহাদের মতে অসার, জীবন অনোপভোগ্য,—এজীবনে সুখ নাই, সুখ যাহা মৃত্যুর পরপারে, ভবিষ্যজীবনে। এ জীবনকে ইহারা ঘৃণা করে। যে সকল জাতি ঈদৃশ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরই জগতে দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই Ascetic Idealই ইহার অধোগতির কারণ। ভাবিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে, কথাটীর ভিতর বিশেষ সত্য নিহিত রহিয়াছে। যাহারা বীরজাতি, তাহাদের মতে জীবন উপভোগ্য, বর্ত্তমান জীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মৃত্যুর পর কি হইবে তাহার ভাবনায় তাহারা বিচলিত নয়।

জীবন Life অর্থে, তাহার মতে, নিজ সত্ত্বার ভিতর যাহা ক্ষয়শীল, জরাজীর্ণ—তাহার প্রতি কঠিনপ্রাণ ও নির্ম্মম হইয়া সে সকলকে বিতাড়িত করা এবং অন্যের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার। প্রত্যেক নীতির গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে, সমাজের ও মানবের জীবনীশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে তাহার ফলাফল দেখিয়া। সমাজে যাহাতে Superman মানবশ্রেষ্ঠ সমূহের আবির্ভাব হয়—তাহাই তাহার লক্ষ্য হইবে। দৈহিক বলে তাহারা একদিকে যেমন বলীয়ান হইবে, দৈহিক সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইবে, সেই প্রকার মানসিক বলেও শ্রেষ্ঠ হইবে—দৃঢ়চিত্ত, সাহসী, দুর্দ্ধর্ষ ও কর্ম্মঠ হইবে। এই Supermanর আদর্শ মনোবিজ্ঞানরাজ্যে নিট্‌জির শ্রেষ্ঠ দান। ইহার দিকে চাহিয়াই তিনি পুষ্টিকর খাদ্যের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার জন্যই যে পঙ্গু, দুর্ব্বল, পীড়াগ্রস্ত—তাহাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দেওয়ার তিনি বিরোধী—যাহাতে বলিষ্ট, সুসন্তানসমূহে সমাজ গৃহ সুশোভিত হয়—তাহাই তাহার লক্ষ্য। এ সব দেখিয়া তাহাকে কেহ কেহ Science of Eugenics সুপ্রজনন বিজ্ঞানের জন্মদাতা স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত ইয়ুরোপ খুঁজিয়াও যেন তিনি প্রকৃত মানুষ পান নাই—সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলচিত্ত ভাবুক sentimental লোকের সমাবেশ। হার্বার্ট স্পেন্সার তাহার মনোবিজ্ঞান,—Biology প্রাণী বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিট্‌জির দর্শন Biology ও Physiology শারীর বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবজগতে দুর্ব্বল ও অধঃপতিত যাহারা—তাহাদের স্থান নাই; তাহার কল্পিত আদর্শ মানবসমাজেও তাহাদের স্থানাভাব। শক্তি ও উৎসাহের তারতম্যানুসারেই তিনি মানবমণ্ডলীকে প্রভু ও দাস আখ্যায় বিভক্ত করিয়াছেন। সর্ব্ববিষয়ে এক্ষণ Transvaluation of values গুণের প্রকৃত বিচার দরকার। দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি যে সকল গুণ সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে তাহারা সে স্থান পাইবার উপযুক্ত কি না।

এই 'দয়া' Pity তাহার চক্ষুঃশূল স্বরূপ ছিল। দয়া যে অনেক সময় দৌর্ব্বল্যেরই রূপান্তরমাত্র কে অস্বীকার করিবে?

তিনি নাস্তিক ছিলেন, ভগবানে কি আত্মার অমরত্বে ও ভিন্ন অস্তিত্বে তাহার বিশ্বাস ছিল না। পরমাযু অবিনশ্বর এই বিশ্বাস যেমন এতদিন পরে বিজ্ঞানাগার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার মতে কালে আত্মার অবিনশ্বরত্বের বিশ্বাসও দূরীভূত হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া Emilio Boutroux নামক সুবিখ্যাত ফরাসী লেখক বলিয়াছেন যে বিজ্ঞান গৃহে ভগবানের এক্ষণে আর স্থান নাই,—বৈজ্ঞানিক তাঁহার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের জল্পনা কল্পনায় আর মনকে ব্যতিব্যস্ত হইতে না দিয়া স্বীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যেমন দেখিতেছি, কালে নিট্‌জিপ্রমুখ প্রচারিত এই নাস্তিকতাবাদ সভ্য সমাজের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িবে।

নিট্‌জির সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়া অসম্ভব। অভিজাতদিগের উন্নতির দিকে চাহিয়া তিনি ক্রীতদাস প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। কে তাহার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবে? তিনি দয়ার বিপক্ষপাতী কিন্তু এই মৈত্রীভাব হইতেই যে মানব সমাজ ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে ধনে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে—তাহার কি কোনও সন্দেহ আছে? প্রেম, বিনয়, ধৈর্য্য, মৈত্রী ইত্যাদি যে সকল ভাবের তিনি বিপক্ষপাতী, সে সকল খ্রীষ্টের জন্মেরও বহু পূর্ব্বে রাজবংশজাত, নিট্‌জির অভিজাতবংশসম্ভূত রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কর্ত্তৃকই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। নিট্‌জি বিবাহ করেন নাই,—অনেক সময় একাকীই জীবন যাপন করিতেন—সমাজের সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। তাই স্নেহ, মমতা, দাক্ষিণ্য, পরোপকার ইত্যাদি যে সকল গুণের সমন্বয়ে ও ফলে মানবসমাজ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে এত কথা বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাহার গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয়,—অনেক সময়ই তিনি ভাবের প্রাবল্যে যুক্তি তর্ক পরিত্যাগ করিয়া একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাই, তাহার লেখায় নানা প্রকার বিপরীত মত দৃষ্ট হইয়া থাকে—অযথা কটূক্তি বর্ষণেও তাহার গ্রন্থাদি সময় বিশেষে কলুষিত। এই সকল কারণে তাহার ভক্তের যেমন অভাব নাই, নিন্দুকেরও নাই।

শক্তির বিকাশক্ষেত্র ইয়ুরোপে নিট্‌জির দর্শনের* ফলে এই শক্তির চর্চ্চা আরও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ রণদুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মেনিতে—যেখানে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল ইচ্ছাশক্তিরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে—ইহার প্রভাবে দয়া মায়া পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি ভাব বর্জ্জিত হইয়া, জার্ম্মেণগণ স্বীয় শক্তির ও প্রাধান্যের বিস্তার করিতে যাইয়া সমস্ত সভ্য জগতের বিভীষিকা ও মহা উৎপাত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে সকল জাতি দুর্ব্বল—তাহাদের উপর নিট্‌জির দর্শনের ফল অমঙ্গলজনক হইবে বোধ হয় না।

নিট্‌জির পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার যথেষ্ট আছে। তবে বোধ হয়,—এই ভাবুকতার (Sentimentalism) দিনে তাহার দর্শন অনেকটা বীর্য্যবান ঔষধের ন্যায় সমাজশরীরে ফলপ্রসব করিবে; অল্প মাত্রায় গ্রহণ করিলে ইহা হইতে মহা উপকারের সম্ভাবনা, অত্যধিক মাত্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশের বিশেষ ভয়।

১০—৫—১৭। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পদ।

নরিলার ধ্বংসাবশেষ।

পশ্চিম ময়মনসিংহে নরিলা এক সময়ে অতি সমৃদ্ধশালী জন পদ ছিল। নগরটী প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত ছিল। বহু সংখ্যক দেবালয় অতিথিশালা এই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিত। অনেক কারু কার্য্য খচিত সুদৃশ্য অট্টালিকা এই স্থানে বিদ্যমান ছিল। নরিলার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শত বর্ষীয় এক জন প্রাচীনের মুখে শুনিলাম—বাল্যকালে তিনি যখন তাহার পিতার সহিত এই স্থানে আসিয়াছেন তখন এখানে ভগ্ন ও অর্দ্ধ অসম্পূর্ণ প্রায় শতাধিক দেব মন্দির দেখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই বিস্তৃত ভূখণ্ড একেবারে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা সেই স্তূপেরই চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বিস্তৃত নগরীর চতুর্দ্দিকে এখন ও শতাধিক দীঘী পুষ্করিণী বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পাটের কল্যাণে দেশের কৃষকগণ খাঁ খাঁ করিয়া প্রাচীন বিস্মৃত সম্পদের উপর তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়াছে। ফলে, যাহা এত দিন বাত্যা ভূকম্প সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অশিক্ষিত কৃষকের কোদালের আঘাত আর সহ্য করিতে পারিল না।—দেশের প্রাচীন সম্পদ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। নরিলার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যও এইরূপে ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। জমিদারের নিকট হইতে জোত বন্দোবস্ত লইয়া যখন কৃষকগণ এই গ্রাম ধ্বংশ করে, তখন বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা, সোণা রূপার জিনিষ তাহারা পাইয়াছে। আমি যখন এই ধ্বংশাবশেষের আলোক চিত্র সংগ্রহ করি তখন দুটী মাত্র স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়াছি, বাকী সব কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নবাবের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া বৈদ্য জাতীয় জমিদারগণ এই স্থানে বাস করিতেন। সাধারণে ইহারাই রাজা বলিয়া পরিচিত। ইংরেজ আমলের দশশালা বন্দোবস্তে উহা নানা তালুকে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তগত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে "পুষ্করাতে"—নরিলা গ্রাম ২॥ দিনের ভিতর জন শূন্য হইয়া যায়। তাহাতেই নরিলাও শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, বোধহয় এ জেলায়ও সেই হইতে প্রথম কলেরার প্রাদুর্ভাব।

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সহরের নির্জ্জনতা।

যাহারা রাজনীতির প্যাঁচ গোছ বা ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব নিকাশের ধার ধারেন না, সেরূপ সাহিত্যিকের পক্ষে নীরব পল্লী অপেক্ষা জনরব মুখর নগরই অধিকতর নিভৃত মনে হয়। যাহারা বিশেষ সামাজিক নহেন, তাহারা আবার লোক জনের মধ্যে থাকিতে বড় অতৃপ্তি বোধ করেন না; বিরল জন পল্লী অপেক্ষা জন বহুল নগরই তাঁহাদের নিঃসঙ্গ প্রকৃতির শান্তিদায়ক হইয়া থাকে।

সুপণ্ডিত গীবন আড়ম্বর পূর্ণ নগরে তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল তৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—বিশ্বাস এবং সরলতা প্রকৃতির মানবের প্রতি এই যে সুমধুরদান যাহাতে মানবের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় তথায় আমি তাহা স্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম না। যখন বণ্ডষ্ট্রীটের প্রশান্ত বক্ষ কম্পিত করিয়া অশ্বযান সমূহ বিকট শব্দে প্রধাবিত হইত; তৎকালে আমি হয় ত গৃহের কোণে নত শিরে পুস্তক লইয়া কোনরূপে সান্ধ্য নির্জ্জনতা কর্ত্তন করিতাম। নগরের জনতা পূর্ণ অংশ হইতে সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন আমি নির্জ্জনতার নৈরাশ্যপূর্ণ মানসিক অবসাদ সহ্য করিতে না পারিয়া দ্রুতপদে বাস স্থানে আসিয়া হাপ ছাড়িতাম।

গীবনের বিখ্যাত ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পরই তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল কিন্তু তৎকালে ও লণ্ডন সহরের নির্জ্জনতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট দায়ক বোধ হইত। তিনি লিখিয়াছেন আমি ক্লকির বাড়ীতে যে পর্য্যন্ত ছিলাম, অনেকেই তৎকালে আমি যে সেখানে একজন লোক থাকিতাম ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যে দুই চার জনের আমার কথা মনে ছিল তাঁহারাও কাজ কর্ম্মের গতিকে অথবা আমোদ প্রমোদে আবদ্ধ থাকিতেন। কচিৎ সন্ধ্যায় আমার পুস্তক বিক্রেতা এম শ্রির সঙ্গলাভ করিতাম। সেদিন আমার কত আনন্দ।

মিঃ রজার একটি ছোট কবিতায় সহরবাসী ছাত্রের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—

যখন সুযোগ পেয়ে পাঠে ফাঁকি দিয়ে,
রাজপথে জনতায় পড়ে গিয়া ধেয়ে
চারি দিকে পূর্ণতার মহা আড়ম্বরে,
সবে কার্য্যে ব্যস্ত, কেবা লক্ষ করে তারে?
চিন্তা মগ্ন একাকী সে রহে দাঁড়াইয়া
আপনার জন্মভূমে বিদেশী সাজিয়া।

দেকার্ৎ বাণিজ্য প্রধান আমষ্টারডমে বাস কালে তদীয় বন্ধু বালজাকের নিকট লিখিয়াছিলেন—তুমি একটু অবকাশ চাও; তোমার ইচ্ছা বোধ হয়, ফ্রান্স কিংবা ইটালীর কোন নিভৃত রম্য স্থানে যাইয়া বাস করা। যদি তুমি মানব সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াও নির্জ্জনের শান্তির পূর্ণ মাত্রা ভোগ করিতে চাহ, তবে আমি বরং তোমাকে

আমষ্টারডমে আমার সহিত আসিয়া বাস করিতে পরামর্শ দিতে পারি। এমন কি তোমার যে সুরম্য পল্লীবাটিকায় আমি গত বৎসরের অধিকাংশ সময় কর্ত্তন করিয়াছিলাম তদপেক্ষা আমার নিকট এ স্থান প্রীতিদায়ক বোধ হয়। কারণ পল্লীবাস যতই উপভোগ্য হউক ন' কেন, তথায় এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে যাহা কেবল মাত্র সহরেই দূর হইতে পারে। মানুষ যেরূপ মনে করে পল্লীবাস ততটা নিভৃত নহে। উত্যক্ত করিবার উপযুক্ত লোক অবিরত পশ্চাতে লাগিয়াই থাকে। কিন্তু এখানে আমি ছাড়া সমস্তটা জগৎই বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত। জাগতিক বিষয় ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবন যাপন করা এখানে আমার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তুমি তোমার হরিৎ-বন-ভবন পন্থে ভ্রমণে যে শান্তি ভোগ করিয়া থাক, আমি এখানে নানা জাতীয় জন সঙ্ঘেপূর্ণ রাজপথে ভ্রমণ করিয়াও তাহা হইতে বঞ্চিত নহি। উদ্যানের বৃক্ষ রাজি কিংবা চারণ ক্ষেত্রে চরগাণ মেষপাল তোমার মনের উপর যতটুকু কার্য্য করিয়া থাকে, যাহাদের সহিত আমার দৈনন্দিন সাক্ষাৎ ঘটে তাহাদের প্রভাবও আমার মনের উপর তদপেক্ষা অধিক নহে। বণিক্ বৃন্দের কর্ম্ম শ্রমের রোল আমার কর্ণে তোমাদের মৃদু গামিনী তটিনীর কল্লোল অপেক্ষা উদ্বেজক নহে। যে সকল কৃষকেরা তোমার ভূমি কর্ষণ করে তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি যে আনন্দ লাভ কর, কর্ম্মরত জন বৃন্দের ব্যস্ততাপূর্ণ গতি ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে আমি ও তাহা উপভোগ করিয়া থাকি। কারণ, আমার মনে হয় তাহাদের সমস্ত উদ্যমই সহরের গৌরব বর্দ্ধিত করিবার ও আমার আপাত অভাব দূর করিবার জন্য। তোমার উদ্যানের ফলভারানত বৃক্ষরাজী যদি তোমার চিত্তকে প্রাচুর্য্যের পরিতৃপ্তিতে নন্দিত করিয়া তুলে, তবে তুমি কি মনে কর, যে পোতমালা ভারত অথবা আমেরিকা হইতে রত্ন শস্য সম্ভারে ডালা সাজাইয়া আনিয়া আমার দেশ জননীর পাদমূলে অর্ঘ্য দিতেছে তদ্দর্শনে আমার আনন্দের মাত্রা তদপেক্ষা লঘুতর হইবে? উচ্চ আশার আহার যোগাইতে এমন স্থান কি জগতে আর দেখাইতে পার?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

গ্রন্থ সমালোচনা।

পরাবিদ্যার সার—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ৫০ আনা। বেদান্ত প্রতিপাদ্য কতিপয় বিষয় ইহাতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কথা নূতন নহে;—পরোক্ষ জ্ঞানে ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে প্রভেদ, তাহা স্বামীজির পুস্তক হইতে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার বেদান্তের গভীর গবেষণা দ্বারা এবং স্বীয় অনুভূতি দ্বারা যে সীদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—তাহাই বুঝাইতে সবিশেষ চেষ্টা করায় গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

দিনবিচারচন্দ্রিকা—শ্রীশ্যামাকান্ত রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য—এক টাকা। এই পুস্তকে যাত্রা, বিবাহ, দ্বিরাগমন, গর্ভবিধান, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, দীক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্মের শুভদিন দেখিবার প্রণালী সরল বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ইহাদ্বারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও দিন বিবেচনা করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময় মফঃস্বলের অধিকাংশ গ্রামই পণ্ডিত বিহীন; কাজেই এই পুস্তক দ্বারা সে সকল স্থানের ভদ্রলোকগণ অনায়াসে দিন বিচার কার্য্যে সহায়তা পাইবেন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য আমরা গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সাহিত্য সংবাদ।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার লিখিয়াছেন—সাহিত্য পত্রিকায় ২য় বর্ষে তিনি আর একটী নূতন অধ্যায় যোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যে সকল সাহিত্যিক কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই অথচ মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাম ঠিকানা ও যে যে পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন সেগুলির নাম তাঁহার নিকট লিখিয়া পাঠাইলে তিনি তাহা গ্রন্থস্থ করিতে পারেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া পাঠাইলেও তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

সুলেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত এম-এ, বি-এল, মহাশয় 'প্রহেলিকা' নামক একখানা সুবৃহৎ উপন্যাস লিখিয়াছেন। উপন্যাসখানি আকারে প্রায় ৮০০ শত পৃষ্ঠা! এতবড় উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যে বোধ হয় আর নাই। মূল্য কিন্তু মাত্র ২৲ টাকা।

স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।
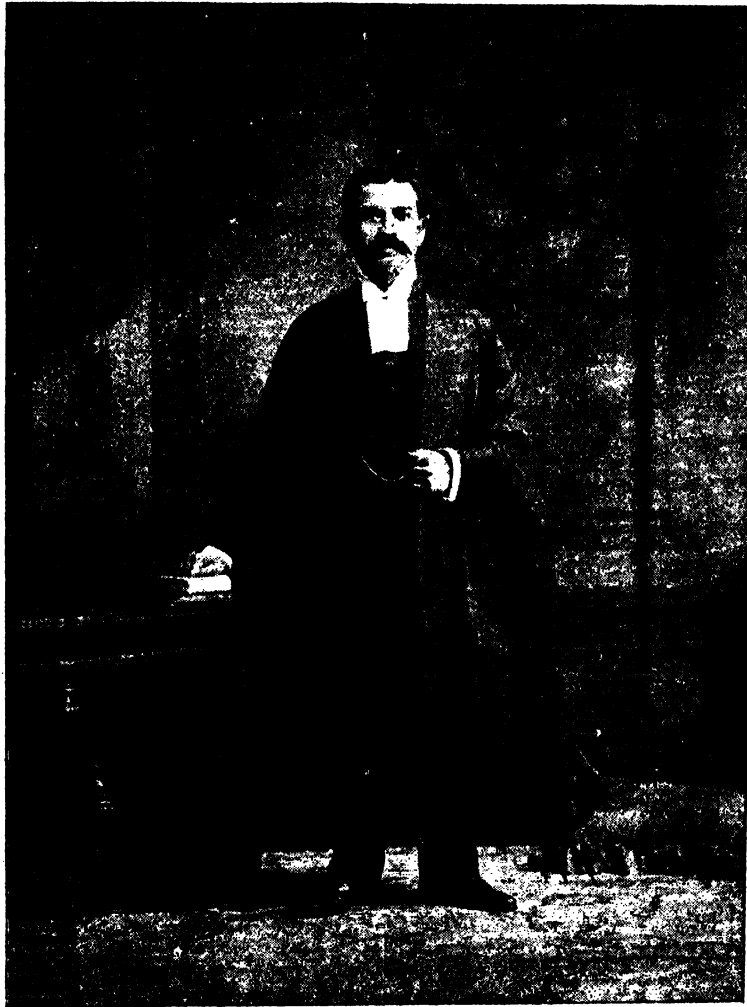
সৌরভ

পঞ্চমবর্ষ। | ময়মনসিংহ, আষাঢ় ১৩২৪ সন। | ১৯ সংখ্যা।

আলোচনা ও মন্তব্য।

পল্লীর শিক্ষা ও উন্নতি—বাঙ্গালী জাতির উন্নতি করিতে হইলে যে বাঙ্গালার পল্লীর উন্নতি করা দরকার ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। অর্থহীনতাই যে বাঙ্গালীকে চির বুভুক্ষিত, কলহপ্রিয় এবং পরশ্রীকাতর করিয়াছে তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই এবং এই অর্থহীনতাই যে পল্লীবাসীকে ঘোর মূর্খতার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়াছে তাহাও কাহাকে বিশদরূপে বুঝাইতে হইবে না। সহরে স্কুল, কলেজ, পাঠশালার বিশেষ অভাব নাই এবং সহরবাসীর সকলেই উপার্জ্জনক্ষম সুতরাং তাহাদের সন্তানেরা সহজেই উপযুক্তরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকে। কিন্তু পল্লীতে বিদ্যালয় অভাবে অধিকাংশ লোকেই আপন সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে অসমর্থ; তাহার পরিণাম অকর্ম্মণ্য অত্যাচারী ও পৈশাচিক প্রবৃত্তিপূর্ণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি। হিন্দুজনসাধারণ সাধারণতঃ দেব প্রকৃতি। শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্যের পেষণে তাহারা পিশাচ প্রকৃতি হইয়াছে। সুতরাং আমাদের প্রধান চিন্তা কিসে পল্লীর আর্থিক উন্নতি হয় কিসে পল্লীবাসী দু'বেলা দু'মুঠা ভাত নিশ্চিন্ত মনে খাইতে পারে এবং কি উপায়ে সন্তানদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষিত করিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা।

আমি এস্থলে বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের কথাই বলিতে চাই। শত শত শতাব্দী ধরিয়া নির্ম্মম সামাজিক নিয়মে নিষ্পেষিত হইয়া তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারা মানুষ—যে তাহারাও সুবিধা সুযোগ পাইলে, যে কোন ধর্ম্মের লোকের সহিত একস্থানে বসিবার উপযুক্ত—তাহারাও উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে যে কোনও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে পারে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় বাহিরে যে আলোক আছে তাহা তাহারা জানে না।

প্রথমতঃ তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে শক্তি আছে, তাহারা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে সেই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করিতে পারে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোক কি প্রকারে শিক্ষার জন্য ব্যগ্র এবং কি প্রকারে সমবেত ও সম্মিলিত চেষ্টায় নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতেছে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে তাহারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সমর্থ তাহারা নিঃসহায় বা সম্বল হীন নহে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে ভগবান গীতায় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াদিয়াছেন এবং তাহারাও সেই পথের অধিকারী। তাহাদের অন্ধকার ঘরে যাহাতে শিক্ষার আলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কি প্রকারে তাহাদিগের ভিতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যাইতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয়। নিম্নশ্রেণীকে যদি আমরা ভালবাসিতে না পারি, তাহাদিগকে যদি প্রেমে আবদ্ধ করিতে না পারি—তবে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইবে। পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণকে মাঝে মাঝে পল্লীতে যাইয়া বাস করিতে হইবে।

নিম্নশ্রেণীদিগের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে তাহাদিগকে একত্র করিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic Lantern) ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া জ্ঞানের ও শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইতে হইবে, ফটোগ্রাফ্ (Photograph) তুলিয়া, গ্লোব দেখাইয়া, দেশবিদেশের এবং বিভিন্ন প্রকৃতি নরনারীর চিত্র দেখাইয়া তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিতে হইবে। কোনও ধর্ম্ম জাতি বা দেশের বিরুদ্ধে বলিবার দরকার নাই, কাহারও নিন্দা প্রচারের আবশ্যক নাই, তাহা হইলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাহায্য পাইবে। কেবল পৃথিবী কত বড়, কত রকমের দেশ, জাতি জন্তু প্রভৃতি আছে, কোন্ জাতি কিরূপভাবে নিজেদের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়া থাকে, কিরূপভাবে পরিষ্কার থাকা যায়, স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের কিরূপে সুব্যবস্থা হইতে পারে এই সব বিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। সকালে হউক, বিকালে হউক, সন্ধ্যায় হউক কিম্বা রাত্রে হউক যখন তাহাদের অবসর হইবে তখই তাহাদের সহিত মিশিয়া এই সব বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। কলেজ এবং স্কুলের ছুটীর অবসরে ছাত্র এবং শিক্ষকগণ, আদালতাদি বন্ধে আদালত সম্পর্কীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, জমিদারের কর্ম্মচারিগণ এবং এবং ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায় উপলক্ষে পল্লীবাসকালে নিজ নিজ পল্লীতে কিম্বা নিকটস্থ পল্লীতে সময় মত গরীব ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণকে একত্র করিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদির দ্বারা ঐ ঐ সব বিষয়ে উপদেশ দিলে যে পরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়া যায় তাহার ফল দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে: কার্য্যের আরম্ভেই অবশ্য ইহার ফল অসামান্য হইবে না; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কিছুদিন কাজ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহার ভিত্তি কতদূর সুদৃঢ় হইয়াছে।

গো জাতির উন্নতি—পল্লীবাসীর আর্থিক উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকিলে নানা প্রকারে আর্থিক উন্নতি হইতে পারে। গোজাতির উন্নতি সাধন করিতে পারিলে যে পল্লীবাসীর অর্থাগমের একটী পথ সুগম হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি গোজাতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে প্রস্তাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে বঙ্গের গো মহিষাদির সংখ্যা আড়াই কোটীর কিছু উপরে হইবে। বাঙ্গলার লোক সংখ্যা ৪॥ কোটীর উপর সুতরাং প্রত্যেক ১০০ লোকের জন্য ৫৬টী গরু মহিষ আছে। ইংলণ্ডে প্রত্যেক এক শতের জন্য ২৬টী মাত্র। ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবী বিধায় ইংরেজ হইতে বাঙ্গালীর গো মহিষাদির সংখ্যা বেশী। কিন্তু বাঙ্গলার গো মহিষ ইংলণ্ডের গো মহিষের তুলনায় ক্ষীণ জীবী। বাঙ্গলার পল্লীতে প্রবেশ করিলেই ক্ষুদ্র, রুগ্ন, শীর্ণ এবং অল্প পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্ত গো মহিষাদি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াই পারে না। কি পূর্ব্ববঙ্গে কি পশ্চিমবঙ্গে গো মহিষাদির অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান। চাষবাসের জন্য বৃষ সাধারণতঃ পশ্চিম হইতে আমদানী করা হয় এবং তাহার সংখ্যা ৮০ লক্ষর মধ্যে শত করা প্রায় ১২। এবং গাভীর সংখ্যা ৭১ লক্ষর মধ্যে শত করা ৩॥। এই সব পশ্চিম হইতে আমদানী বৃষ ও গাভী গুলি হৃষ্ট পুষ্ট, কিন্তু যত্ন অভাবে তাহারা এ দেশে আসিয়া অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তাহারা রীতিমত আহার পায় না, যে পরিমাণ তাহাদের পরিশ্রম করান উচিত, পরিশ্রম করান হয়, তাহাদিগকে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। বঙ্গদেশে চরিয়া ঘাস খাইবার মাঠের ক্রমেই অভাব হইতেছে; পাটের জন্য খড়ের ও বিশেষ অভাব হইয়াছে। চাষ বাস সাধারণতঃ ক্ষীণকায় এবং অল্প বয়স্ক বৃষ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, তাহাতে সেই সব বৃষ বেশী দিন জীবন ধারণ করিতে পারে না। গাভীর অবস্থা ও সেইরূপ শোচনীয়। স্থানীয় গাভী সাধারণতঃ গড়ে প্রত্যহ ৩ সের হইতে কম দুগ্ধ দেয় কিন্তু পশ্চিমে এক একটী গাভী ৭।৮ সের দুগ্ধ অনায়াসেই দিয়া থাকে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বঙ্গে গো জাতির এত দুর্দ্দশার কারণ কি? প্রধানতঃ এখানে চাষীদের জোতের পরিমাণ খুব অল্প। ঢাকা জেলায় গড়ে প্রত্যেক জোতে ৩ বিঘার বেশী জমি নাই এবং ৭.৮ বিঘা জমি চাষ করিবার জন্য মাত্র ২টী বৃষ ব্যবহৃত হয়। অল্প চাষেই জমিতে শস্য উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক জোতে জমির পরিমাণও অল্প সুতরাং কৃষকেরা দুর্ব্বল ও ছোট বৃষ দ্বারাই চাষ

করিতে সমর্থ হয়। বৃথা বেশী দাম দিয়া সবল ও দীর্ঘ কায় বৃষ আনিবার দরকার বোধ করে না। পঞ্জাবে ২টী বৃষ ১৫।১৬ বিঘা জমি সহজেই কর্ষণ করিতে পারে কিন্তু বাঙ্গালায় তাহা পারে না। বাঙ্গালায় সম্মিলিত হইয়া (Co Operative) কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি কাহারও নাই সুতরাং ২।৪।৫ ঘর কৃষক যে একত্র হইয়া সবল, দীর্ঘকায় এবং দীর্ঘায়ু বৃষ আমদানী করিয়া নিজেদের চাষ বাস করিয়া পরে ভাড়া দিয়া যে আরও দু পয়সা উপার্জ্জন করিবে তাহা তাহাদের দ্বারা হইবার উপায় নাই। হিন্দু জাতি চিরকালই স্বাতন্ত্র্য প্রধান সুতরাং কোন কাজেই তাহারা সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্ববাঙ্গলা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গলায় বৃষও গাভীর সংখ্যা বেশী, দেখিতে এবং কাজেও বেশী সবল ও দীর্ঘায়ু, তাহার কারণ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ নিম্ন এবং বৃষ্টি বেশী হওয়ার দরুণ গ্রাম ও জমি গুলি বেশী স্যাঁত সেঁতে থাকে সুতরাং কৃষকেরা নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যা হইতে বেশী গো মহিষাদি রাখিতে পারে না এবং গো মহিষাদি ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। বর্ষাকালে জলে চারি দিক ভাসিয়া যাওয়ায় তাহারা চারি মাস যাবৎ এক জায়গায় আবদ্ধ থাকায় তাহাদের পা শীর্ণ হইয়া পড়ে শরীর দুর্ব্বল হয় সুতরাং পুনরায় সবল হইতে যে সময় লাগে তাহার পূর্ব্বেই পরিশ্রম করিতে হয়—তাহার ফল অকাল মৃত্যু। অনেক সময় বন্যায় গো মহিষাদি ভাসিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে চাষের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে গো মহিষাদি দ্বারা গাড়ী চালাইবার প্রথা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অনেক বেশী হওয়ায় তাহাদের আয়ও বেশী হয় এবং গরুগুলিকে বার মাস রীতিমত পরিশ্রম করাইতে ও খাওয়াইতে সমর্থ হয়।

বাঙ্গলার প্রধান খাদ্য দুগ্ধ কিন্তু গাভী গুলি এই প্রকার দুর্দ্দশা গ্রস্ত হওয়ায় দুগ্ধের পরিমাণ যে অনুপাতে কমিয়াছে তাহাতে বোধ হয় আর ২০।২৫ বৎসর বাদে নিতান্ত ধনী ব্যতীত কেহই দুগ্ধপান করিতে সমর্থ হইবে না। চরিবার মাঠ বেশী পরিমাণ না থাকিলেই যে গো মহিষাদি ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল বা অল্পায়ু হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। কারণ দেখা গিয়াছে যে বিহারে চাম্পারণ জেলায় চরাইবার মাঠ যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও গো মহিষাদির অবস্থা সেখানে তত ভাল নহে, অথচ বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জেলায় চরাইবার মাঠ কম থাকা স্বত্ত্বেও তথাকার গো মহিষাদি অত্যন্ত সুস্থকায়, সবল ও দীর্ঘজীবী। আসাম প্রদেশেও বহু জমি পতিত রহিয়াছে। কিন্তু গো মহিষাদির অবস্থা সেখানেও তত ভাল নহে।

পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে গো জাতির উন্নতি করা দরকার। তাহা কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে তাহা বিবেচ্য। প্রথমতঃ স্থানীয় যে সব গাভী হৃষ্ট পুষ্ট এবং বেশী দুগ্ধ দেয় তাহাদিগকে বাছাই করিয়া পশ্চিম হইতে আনীত ভাল বৃষের সহযোগে যাহাতে ভাল বৎস উৎপাদন হয় তাহা করিতে হইবে। গারো পাহাড়ের বৃষগুলিও সাধারণ বৃষ হইতে অনেকাংশে ভাল। এইরূপ একটী বা ততোধিক ভাল বৃষ প্রত্যেক গ্রামে রাখা উচিত। গ্রামের মধ্যে যাহার অর্থ আছে তিনি বা ৫।৭ জন একত্রে মিলিয়া এইরূপ বৃষ রাখিয়া ব্যবসায় করিতে পারেন। তারপর গাভীর বৎস গুলি যাহাতে স্তন্য পান করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি থাকা উচিত। তৃতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বৃষ দ্বারা চাষ আবাদ না করা। চতুর্থতঃ ভালরূপ খড়ের বন্দোবস্ত করা। সর্ব্বোপরি পশ্চিম দেশীয় হিন্দুদিগের ন্যায় গো জাতির সেবা করা। বাঙ্গলা দেশে প্রবাদ আছে যে "গরুর মুখে দুধ"—অর্থাৎ গরুকে যে পরিমাণ খাওয়াইবে সে সেই পরিমাণ দুধ দিবে। গাভীর যত্ন সেবা ও শুশ্রূষার উপর তাহাদিগের দীর্ঘ আয়ু এবং বেশী পরিমাণ দুধ দেওয়া নির্ভর করে। সুতরাং যাহাতে গো জাতির পরিচর্য্যা হয় তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। ইহাতে চাষ আবাদের সুবিধা হইবে, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী বৎস উৎপাদনের সুবিধা হইবে এবং দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা ধনাগমের সুবিধা হইবে। সুতরাং যাহারা পল্লীর উন্নতি প্রয়াসী তাঁহাদের এই দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

* * * *

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়—যাহাতে পল্লীবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে তাহার ও বন্দোবস্ত করা উচিত। পল্লীতে নারিকেল 'ছোবড়া' লোকে উনান ধরাণ বা তামাক খাওয়া ইত্যাদিতে ব্যবহার করে। কেহ সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া চালান দিলে তাহার একটী সুন্দর ব্যবসা

চলিতে পারে। রাস্তার পাশে, পতিত মাঠে ইত্যাদিতে অনেক পরিমাণে শঠী উৎপন্ন হইয়া জঙ্গলে পরিণত হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া চালান দিলে পল্লীবাসীরা দু পয়সা সহজেই উপার্জ্জন করিতে পারে। খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী চট্টগ্রাম জেলার লোকে সুপারি গাছের বাকল পূর্ব্বে ফেলিয়া দিত। ব্রহ্মদেশ হইতে "মগেরা" আসিয়া সেই বাকলের মধ্যস্থিত যে শুভ্র সুন্দর একটী পাতলা স্তর আছে তাহা কিনিতে আরম্ভ করায় তথায় পল্লীবাসীদের অর্থাগমের একটী সুন্দর ও সহজ উপায় হইয়াছে। মগেরা যে দাম দেয় তাহাতেই পল্লীবাসী দিগকে এই গুলি বিক্রয় করিতে হয়। আমরা এরূপ অলস প্রকৃতি যে ব্রহ্মদেশে যাইয়া তাহার কোন ব্যবসা নিজেরা খুলিতে পারি না। এই শুভ্র-স্তর দ্বারা চুরুটের আবরণ প্রস্তুত হয় সুতরাং মগগণ এক আনা, ছয় পয়সা সের কিনিয়া উহা তথায় চালান দিয়া তাহা হইতে যথেষ্ট লাভবান হয়। মগেরা ঐ স্তরকে "খুঁই" বলিয়া থাকে। বরিশাল প্রভৃতি জেলায় গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক পরিমাণে সুপারি গাছ জন্মায়। কেননা লোনা দেশে সুপারি এবং নারিকেল গাছ সহজে এবং বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভোলা মহকুমায় কার্য্যোপলক্ষে থাকা কালীন আমি নিজে তদন্ত করিয়া জানিতে পারি যে এক বৎসরে তথায় প্রায় একলক্ষ টাকার "খুঁই"—বিক্রয় হইয়াছিল। ভোলার নিকটবর্ত্তী ৫।৭।১০ মাইলের মধ্যে যে সব পল্লী আছে, সেই সব গ্রাম হইতেই মাত্র ঐ "খুঁই" আসিয়া থাকে। কারণ বেশী দূর হইতে আনিতে গরুর গাড়ী ভাড়া ইত্যাদির জন্য যে খরচ পড়ে তাহাতে যে দামে বিক্রয় হয় খরচ পোষায় না। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে Transport এর সুবিধা অর্থাৎ অল্প খরচে দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে এই "খুঁই" আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে পল্লীবাসীরা বহু পরিমাণে লাভবান হইতে পারিবে, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখনও দূর গ্রামের "খুঁই", গাছ হইতে পড়িয়া নষ্ট হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব।

ভারতের অন্যান্য জাতি সকলের সহিত মিলিয়া একটা বিশাল ভারতীয় জাতির অঙ্গ হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে আজ কাল এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে বাঙ্গালী যে পৃথক্ একথা মনে করিবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই হয় না। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এখন এক রাজার অধীন হইয়াছি বলিয়া ইহাদের সহিত একটা একত্ব যদিও আমরা দাবী করিতে পারি, তথাপি চিরকালই এ অধিকার আমাদের ছিল না। ভাষায়, সমাজে, ইতিহাসে সর্ব্বত্রই ইহাদের সহিত তুলনায় নানা রকমের পার্থক্য আমাদের রহিয়াছে; এমন কি কখনও কখনও,—যেমন মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত আমাদের বিরোধও ঘটিয়াছে। সুতরাং আমরা যতটা একতা হইয়াছে বলিয়া মনে করি, ততটা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে, এই আধুনিক রাষ্ট্রীয় একতা ছাড়া একটা প্রাচীনতর গভীরতর একতাও আছে বলিয়া আমরা মনে করি; সেটী সমগ্র হিন্দু জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, ও হিন্দুর একান্ত নিজস্ব বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য। এ সমস্তই হিন্দু মাত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে, সুতরাং সমস্ত হিন্দুই একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

এই ডোরের বন্ধন ছেদন করিয়া ভারতের অন্যান্য জাতি সকল বাঙ্গালীকে আপন বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে না, সত্য; কিন্তু হিন্দুর প্রাচীন-গৌরব নিয়া গৌরব করিবার অধিকার বাঙ্গালীর কতটুকু, বাঙ্গালীর তাহা বিচার করা উচিত।

প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত কোনও এক ধর্ম্মকে নিজের আধ্যাত্মিক পরমার্থ লাভের এক মাত্র পন্থা মনে করিয়া নিজের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ তাহা গ্রহণ করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সেই ধর্ম্মের সংসৃষ্ট সমস্ত বিষয়ই সে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কৃত মনে করিয়া বড়াই করিতে পারে না। কোন হিন্দু বা মুসলমান যদি খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মনে করে, সমস্ত খ্রীষ্টান ইতিহাস

সাহিত্য, শিল্প, ও কলাবিদ্যা তাহার পূর্ব্ব পুরুষের সম্পদ্, তাহা হইলে লোকের কিছু বলিবার নাই, এমন নহে। সুতরাং বাঙ্গালী যখন বেদ উপনিষদের বড়াই করে, তখন তাহার দৃষ্টি রাখা উচিত, যে হিন্দুরা বেদ উপনিষদের সৃষ্টি করিয়াছিল, বাঙ্গালী যে তাহাদেরই বংশধর, তাহার কোন স্পষ্ট, অকাট্য প্রমাণ আছে কিনা।

তাহা ছাড়া, আর একটা কথা। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি নিয়া বড়াই করার অর্থ কি এই নয় যে, সুবিধা পাইলে আমরাও এরূপ কীর্ত্তিমান্ হইতে পারি—শক্তি আমাদের রহিয়াছে, কেবল সুবিধার অভাবে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে না মাত্র? যদি তাই হয়, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর চিন্তা করিবার বিষয় আছে। এক দেশ ছাড়িয়া কোনও জাতি যখন আর এক দেশে যায়, তখন নানা কারণে তাহার শক্তির হ্রাসও হইতে পারে। যবদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশের সংবাদ আমরা পাই; যে সময়ে হিন্দুরা সে দেশে গমন করিয়াছিল তাহার পরেও ভারতে হিন্দুদের সাহিত্যে, শিল্পে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু যবদ্বীপের হিন্দুদের দুই একটা মন্দির নির্ম্মাণ ছাড়া অন্য কোন উল্লেখ যোগ্য কীর্ত্তির কথা আমরা শুনিতে পাই না। এসিয়ার পশ্চিম প্রান্ত ছাড়িয়া গিয়া য়িহুদিরা সুদে টাকা লাগান ছাড়া আর কোন শক্তিরই পরিচয় দেখাইতে পারে নাই। অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে ইংরেজ জাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তেমন কোনও কৃতিত্ব এ সব দেশের ইংরেজেরা এখনও দেখাইতে পারে নাই, ভবিষ্যতে কত দূর দেখাইবে, লক্ষ করিবার বিষয়। উপনিবেশ স্থাপনের সময় প্রায়ই প্রাচীন দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই প্রথমে নূতন দেশে গমন করে। উপনিবিষ্ট জাতির শক্তির অল্পতার ইহাও একটা কারণ। যে কারণেই হউক, পুরাতন দেশ ছাড়িয়া নূতন দেশে গমনের ফলে, জাতির শক্তির হ্রাসের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সুতরাং যদি ইহা সত্যও হয় যে, বাঙ্গালী হিন্দুরা সাম-গায়ক উপনিষদ্-কারক হিন্দুদেরই মুখ্য বংশধর, তথাপি বাংলা দেশে আসিয়া তাহাদের যে শক্তি হ্রাস হয় নাই, তার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।

একথা আজকাল মোটামুটি প্রমাণিত হইয়াছে যে, আদিম আর্য্যজাতি মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে, কাহারও কাহারও মতে উত্তর মেরুদেশে বাস করিত; পরে সেখান হইতে নিম্নতর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের একশাখা ইউরোপেরদিকে আর একশাখা পারস্য ও ভারতে আগমন করে। বেদের কতক অংশ যে এই ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল তাহাও আজকাল মোটামুটি স্বীকৃত। সুতরাং বেদে ইউরোপীয়দের দাবী আমরা মঞ্জুর করিব কি? তাহা যে করি না, সে সম্বন্ধে আমাদের প্রধান যুক্তি এই যে, ইউরোপে ত বেদের এক টুকরাও নেওয়া হয় নাই; যাঁরা ইউরোপে গেলেন তাঁরা বেদে নিজেদের স্বত্ব উপেক্ষা করিয়াই গেলেন; এবং বেদে যে চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেখানে গিয়া তাঁরা তার সম্প্রসারণের কোন চেষ্টাই করেন নাই, বেদে যে ভাবের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল তাহা বর্দ্ধিত করিবার কোন চেষ্টাই তাঁরা করেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান ইউ-রোপীয় জাতিসমূহ কোন মতেই বেদকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব মনে করিতে পারেন না।

সেইরূপ, এ দেশের মুসলমানেরা মুসলমান বলিয়া আরবি ভাষায় প্রকাশিত ভাব ও চিন্তাকে কতকটা নিজস্ব মনে করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা আরবদেশের লোকের পক্ষে যত শোভা পায়, ইহাদের পক্ষে তত নয়। এবং অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার ইংরেজেরা চসার (Chaucer), সেক্সপীয়র প্রভৃতিকে যেভাবে নিজের লোক মনে করিতে পারে, যেভাবে সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যকে নিজের সামগ্রী মনে করিতে পারে, এদেশের মুসলমানেরা পারস্যের সাহিত্যকে এমন কি আরবের সাহিত্য বিজ্ঞানকেও সেভাবে একান্ত নিজস্ব মনে করিতে পারে না। কল্পনা করিলে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, কিন্তু যুক্তি ইহার বিরুদ্ধে।

সুতরাং হিন্দুর প্রাচীন গৌরবে নিজেকে মহিমান্বিত মনে করিয়া বাঙ্গালী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাঙ্গালী হিন্দু সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে গৌরব করিবার মত কি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা দেখা দরকার। অতীত গৌরবের বিচারের উপযোগিতা এই যে, ইহা দ্বারা জাতির ক্ষমতার একটা সাধারণ পরিচয় পাওয়া এবং কোন্‌দিকে সে শক্তি স্বভাবতঃ খেলিতে চায়

তাহাও বুঝা যায়। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত, সকল জাতির শক্তি সকলদিকে সমান খেলে না। রোম যেমন সাম্রাজ্য নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিল গ্রীস তাহা পারে নাই, ভারতবর্ষও তাহা পারে নাই; কিন্তু গ্রীস যেমন সাহিত্য ও কলা শিল্পের উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল, রোমে তাহা সম্ভব হয় নাই; য়িহুদীরা, হিন্দুরা এবং বোধ হয় মিশরবাসীরাও, যেমন ধর্ম্মাচারকে বিধিনিষেধের ছাঁচে ফেলিতে পারিয়াছিল, পৃথিবীর আর কোন জাতি তেমন পারে নাই। এইরূপে প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায় কোন্ জাতির প্রতিভা কোন্‌দিকে সহজে প্রকাশ পায়। আমাদিগকে দেশের শাসন-যন্ত্রের অধিনায়ক করিতে যাঁরা নারাজ, তাঁরাও আমাদের প্রাচীন ইতিহাস দেখাইয়াই বলিয়া থাকেন যে, শাসনের কায়দায় (Art of government) আমরা কখনও পারদর্শিতা দেখাইতে পারি নাই।

সমগ্র ভারতে একটা জাতি এখনও গঠিত হয় নাই। সুতরাং একটা বিশাল জাতির অঙ্গীভূত হইলে যে সকল দাবী আমরা করিতে পারিতাম, তাহা করা আমাদের পক্ষে এখনও শোভন নহে। অথচ খুব বড় বড় দাবী আমরা ইতিমধ্যেই করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের দেখা উচিত, আমরা বাঙ্গালাবাসীরা অতীতে কোন্‌দিকে কিরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অবশ্যই, একথা বলা সঙ্গত নয় যে, যে জাতির অতীত নাই, তাহার ভবিষ্যৎও নাই; যে জাতি অতীতে কোন শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইতে পারে নাই, কোন দর্শন বিজ্ঞান, কোন সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও সে তাহা পারিবে না। এই সকল বিষয়ে জর্ম্মেনীর স্থান যে খুব উচ্চে, আমাদের সঙ্গে হাজার শত্রুতা থাকিলেও আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। স্পেন, পর্ত্তুগাল, এমন কি ওলন্দাজদের তুলনায়ও জর্ম্মেনী অতি অর্ব্বাচীন দেশ; "ফরাসী জননী" ইহার তুলনায় অনেক বর্ষীয়সী, ইংলণ্ডও প্রাচীনা। কোন গৌরব-মণ্ডিত অতীত নাই বলিয়া জর্ম্মেনীর বর্ত্তমানত অনুজ্জ্বল নহে। আর, ইংলণ্ড ফরাসী প্রভৃতি বর্ত্তমান ইউরোপের সমস্ত প্রধান দেশেরই ত ইতিহাসের আরম্ভ আমরা জানি। রুষিয়ার অতীত কিছুই নহে, তথাপি সেই রুষিয়ায়ওত সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। অতীতে সে দেশে এরূপ শাসনপ্রণালী কখনও ছিল না বলিয়া বর্ত্তমানে ত তাহা আটকাইয়া যায় নাই। সুতরাং অতীত না থাকিলেই যে ভবিষ্যৎ নাই, এমন কথা বলা চলে না। বর্ত্তমানেও আরম্ভ হইতে পারে।

তথাপি যে জাতির অতীত রহিয়াছে এবং জানা যায়, তাহার সেই অতীত ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাহার শক্তির একটা ধারণা করিয়া নেওয়া সঙ্গত। তাহা হইতে বুঝা যাইবে, সে জাতি বর্ত্তমানে যাহা চায় তাহা লাভ করিবার এবং ভোগ করিবার শক্তি তাহার আছে কি না। না থাকিলেই তাহা হইতে পারিবে না, একথা আমরা বলি না; কিন্তু আছে কিনা জানা দরকার, এবং না থাকিলে সেই শক্তি লাভের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুতরাং আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বাঙ্গালীর অতীত কেমন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাঙ্গালী প্রাচীন কালে এমন সব বিদ্যা জানিত যাহা ভারতের অন্য কোন জাতি জানিত না, যথা—হস্তী চিকিৎসা। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এরূপ যুক্তিতে খড় দিয়া দালান তৈয়ার করার মত একটা আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। হস্তী চিকিৎসা কি একটা খুব বড় বিদ্যা? এরূপ বিশেষ দ্বারা যদি কোন জাতিকে বিশেষিত করার চেষ্টা হয়, তবে বাঙ্গালীর বোধ হয় আরও অনেক গুণ ছিল। সাপের মন্ত্র এবং বিষহরীর পূজাও কি বাংলায়ই বিশেষভাবে প্রকটিত হয় নাই? নিতান্তই একটা জাতিকে বড় প্রতিপন্ন করিতে না হইলে এরূপ উদাহরণের বিশেষ আদর হওয়ার কারণ নাই।

বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি যে সমস্ত নিতান্তই হিন্দুর নিজস্ব বিশেষ, তাহাদের একটিও বাংলা দেশে উৎপন্ন হয় নাই। উজ্জয়িনী কবে নবদ্বীপে আসিবে জানি না, কালিদাসকে বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কবে সফল হইবে জানি না; ইতিহাসের বিশিষ্ট জ্ঞান আমাদের নাই; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, তাহাতে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যেও এক জয়দেব ছাড়া বাঙ্গালীর উল্লেখযোগ্য দান কিছুই নাই। বিদেশীরা যখন জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের বেদ উপনিষদ্, সাংখ্য বেদান্ত, কাব্যপুরাণ কোথায় সৃষ্ট

হইয়াছিল, তখন বাংলা দেশের জন্য কিছুই দাবী করিতে সাহস পাই না।

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার "বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপচয়" সম্বন্ধে একটা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাই নিয়া অনেক কথা কাটাকাটিও হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে, তিনি এই অপচয়ের একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন রঘুনন্দনের স্মৃতি, যাহাতে বিশেষ সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হইয়াছে নবমীতে অলাবু ভক্ষণ উচিত কিনা, কিম্বা কয়দণ্ড একাদশী থাকিলে সেদিন উপবাস করিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র একটা ভুল করিয়াছিলেন; রঘুনন্দন যদিও বাঙ্গালী, তথাপি স্মৃতিশাস্ত্র বাঙ্গালার জিনিস নহে। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক সংহিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও বাঙ্গালী বলিবার কারণ নাই। স্মৃতির সংগ্রহ বা নিবন্ধ গ্রন্থ আরও আছে, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব তাহাদেরই অন্যতম। যে কারণেই হউক বাংলা দেশে রঘুনন্দনের সংগ্রহ ও ব্যাখ্যাই চলিয়া গিয়াছে, যদিও দায় বিভাগে রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্ব' অপেক্ষা জীমূতবাহনের 'দায়ভাগই অধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুতরাং শ্রুতি যেমন বাঙ্গালার জিনিস নয়, স্মৃতি ও তেমনই বাঙ্গালীর নহে। এমন কি, রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা প্রণালীতেও কোন নূতনতা নাই; মিতাক্ষরা প্রভৃতি অন্যান্য টীকা হইতে তাঁহার ব্যাখ্যা ভিন্ন হইলেও, প্রণালী একই। সুতরাং স্মৃতিতে ও বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস কিছুই নাই।

সম্পূর্ণ বাঙ্গালার জিনিস, সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার জলবায়ুতে তিনটী উৎপন্ন জিনিসের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা অল্প বিস্তর এখনও এদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাহা হইতে অতীতযুগের বাঙ্গালীর শক্তির কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বাড়ী ঠিক বাঙ্গালায় না হইলেও বাঙ্গালার খুব কাছেই ছিল; ইনি জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির চেষ্টায় বাঙ্গালার যে একটা দার্শনিক বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে বোধ হয় বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব মনে করা যাইতে পারে। ইহারই নাম নব্য ন্যায়। জ্ঞানচর্চ্চার এই একটা নূতন, বিশিষ্ট পথ বাঙ্গালী ধরিয়াছিল তা ছাড়া, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা ধর্ম্মে ও সমাজ সংসারে বাঙ্গালী এই দুইটী বিশিষ্ট প্রচেষ্টা দেখাইয়াছে। এই তিনটীর লাভালাভও মূল্যামূল্য হইতে অতীত যুগের বাঙ্গালীর শক্তি পরিমিত হইতে পারে।

এই তিনটীর কোনটীরই সূক্ষ্ম বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। দেশের কিরূপ অবস্থায় কি কারণে এই সকল আবির্ভূত হইয়াছিল এবং ইহাদের দ্বারা কি ফল কি অপকার উপকার হইয়াছিল, ঐতিহাসিক ভিন্ন আর কাহারও তাহা বলিবার অধিকার নাই। যদিও আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা সে দিকে বড় দৃকপাত করিতে চান না, তথাপি সকল বিষয় তাঁহাদেরই বিচার্য্য। এইরূপ সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিচারে নব্য ন্যায়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও কৌলিন্য প্রথার মূল্য কি দাঁড়াইবে জানি না। কিন্তু কয়েক শত বৎসর যাইতে না যাইতে যে ইহাদের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে হইয়াছে তাহাতেই মনে হয়, ইহাদের মধ্যে স্থায়ী মূল্যবান্ পদার্থ তত বেশী নাই।

নব্য ন্যায়ের প্রধান বিচার্য্য বিষয় প্রমাণ। প্রমেয়ও প্রমাতাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া শুধু প্রমাণের বিচার—অর্থাৎ কাজের কথা সব পিছনে রাখিয়া কেবল বাজে কথায় এত পটুত্ব, শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর আর কোন জাতি দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানেই আগুন রহিয়াছে—এইরূপ একটা ব্যাপ্তি না পাইলে ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে, তাহা অনুমান করা যায় না। এই ব্যাপ্তির বিচার ইউরোপীয় দর্শনে যথেষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালী দার্শনিক যেমন ভাষ্য, টীকা, কারিকা, দীপিকা দিয়া ইহাকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, তেমনটী নাই। তথাপি ইহা বাঙ্গালীর একটি প্রকাণ্ড কৃতিত্ব কি না সন্দেহ। কারণ, উদাহরণ ছাড়া ব্যাপ্তি নির্দ্ধারিত হইতে পারে না; এবং এই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইলে, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক চেষ্টা—পদার্থবিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা প্রভৃতির চর্চ্চা করিতে হয়; এই চেষ্টা বাঙ্গালী মোটেই করে নাই; কাজেই, শুধু মহানসাদির দৃষ্টান্ত হইতেই সর্ব্বপ্রকার ব্যাপ্তির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছে। ফলে নব্য ন্যায় শুধু বাজে তর্কই করিয়াছে, পরমার্থতত্ত্বের কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই, সাংখ্যবেদান্তের মত জগতের একটা ব্যাখ্যাও করিতে পারে

নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক কৌতূহল চরিতার্থ করা ভিন্ন নব্যন্যায় আমাদের কোন উপকারে আসিবে কি না সন্দেহ,—তাহার কাজ ইউরোপীয় লজিক বা তর্কশাস্ত্রই ভাল করিবে, কিন্তু সাংখ্যবেদান্ত স্বতন্ত্র দার্শনিক মত হিসাবে জগতে টিকিয়া থাকিবে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও কৌলিন্য প্রথার আবির্ভাব যখন হইয়াছিল, তখন দেশের কোন উপকার হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু এত সহজে এ উভয়ের মধ্যেই কদাচার ঢুকিয়াছিল এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, চারিদিক ভাবিয়া কোন স্থায়ী কাজ বাঙ্গালী করিতে পারে, ইহা হইতে তাহা মোটেই প্রমাণ করা যায় না। এখনকার দিনে যেমন কত শিল্পসমিতি, সমবায়সমিতি, লিমিটেড্ কোম্পানী প্রভৃতি আমরা গড়ি, এবং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সেগুলিকে আবার ভাঙ্গি,—মনে হয়, অতীত ইতিহাসেও তার চেয়ে খুব বড় কাজ বিশেষ কিছুই আমরা করিতে পারি নাই।

বাঙ্গালার অতীত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস উদ্ধারের খুবই চেষ্টা হইতেছে; এবং অনেক রাজারাজড়ার নামও আমরা পাইতেছি কিন্তু কয়টী পরগণা নিয়া তাঁহাদের রাজত্ব ছিল এবং এখনকার বড় বড় জমিদারের জমিদারীর চেয়ে সে সব রাজ্য কত বড় ছিল, সব সময় তাহা ঠিক করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, এই সব রাজাদের কাহারও কাহারও আমলে প্রজারা প্রচুর স্বায়ত্বশাসন ভোগ করিত, এমন কি, কোন কোন রাজা প্রজাগণ কর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সেসব অনেক প্রাচীনকালের কথা। এসব তথ্যের মূল্যবিচার করিবার অধিকার রাখি না। কিন্তু আমরা জানি, আজ যেমন বাঙ্গালী বহুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা পরীক্ষা পরিচালনে অসমর্থ হইয়া এক জন সাহেবের করুণার ভিখারী হইয়াছেন, কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তেমনই রাজ্যশাসনের জন্য বাঙ্গালী ইংরেজের সাহায্য চাহিয়াছিল।

অতীত কালের একটা বিশাল সাহিত্যের উদ্ধারও ঐ দেশে হইতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় সে সাহিত্যের মূল নির্দ্ধারণের চেষ্টা এখনও হয় নাই। ইহাতে বাঙ্গালীর নিজস্ব কতটুকু আর কতটুকু পশ্চিম ভারতে উৎপন্ন রামায়ণ মহাভারতের নিকট ধার করা, তাহাও বিচার করিতে হইবে। তাহা করিলে বোধ হয় দেখা যাইবে, বাঙ্গালী শনি-সত্যপীরের পাঁচালী যত সৃষ্ট করিয়াছে, কালিদাস-ভবভূতি বা ব্যাস-বাল্মীকির সাহিত্যের মত সাহিত্য তত পারে নাই।

সুতরাং অতীত নিয়া গৌরব করিতে হইলে, হস্তী চিকিৎসাকে একটি মস্ত জিনিষ মনে করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই। হিন্দু বলিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের একটা সাধারণ গৌরব আমরা করিতে পারি; তা ছাড়া বাংলা দেশের একান্ত নিজস্ব জিনিস বড় বিশেষ কিছু নাই। কেহ কেহ বলেন, উড়িষ্যায় যে স্থাপত্য বিদ্যার মহৎ চিহ্ন রহিয়াছে, বাঙ্গালীরই মাথায় তাহা উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহা কতদূর সত্য, বিচার করিবার ক্ষমতা রাখিনা। কিন্তু বাংলা ভাষা যেখানে কথিত হয়, সেই প্রকৃত বঙ্গদেশে তাহা নির্ম্মিত হইতে পারে নাই কিংবা নির্ম্মিত হইলেও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, ইহা ত বাঙ্গালীর লক্ষণ নহে!

সুতরাং অতীতের বড়াই করিয়া, পূর্ব্ব পুরুষের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া জগতের সম্মুখে নিজেকে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বাঙ্গালীর পক্ষে তত শোভন নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতীত না থাকিলেই ভবিষ্যৎ ও থাকিবে না, এমন নয়। চেষ্টা করিয়া শক্তিলাভ করিতে হয়; সে চেষ্টা পূর্ব্বে কেহ করে নাই বলিয়া এখনও কেহ করিতে পারে না; এমন নহে। কিন্তু বাঙ্গালী যে মনে করিবেন, সমস্ত মহৎ কাজ করিবার শক্তি তিনি পূর্ব্ব পুরুষের নিকট পাইয়াছেন এবং তাহার ভিতরে যে শক্তি রহিয়াছে, এব কাজে লাগাইয়া দিলেই তিনি তাহা করিতে পারিবেন, ইহা ঠিক নয়। তাহাকে সাধনা করিতে হইবে, তপস্যা করিতে হইবে, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে; তবে ত তিনি একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করিতে পারিবেন। কিসে পৃথিবীতে বড় হওয়া যায়, কিসে মহৎ কাজ করা যায় জগতের ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই হ্রদগর্ভের মধ্যদিয়া গমনকালীন, আর একদিনকার ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাত্রি তখন বোধ হয় ১০টা। চারিদিকে বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। আমাদের নিয়ম ছিল যে সন্ধ্যার পর আমরা গমন স্থগিত রাখিতাম। সে দিনও আমরা ঠিক সন্ধ্যার সময় নোঙ্গর করিয়াছিলাম। আমাদের নৌকা তীর হইতে প্রায় তিনপোয়া মাইল দূরে ছিল। আহারাদি শেষ করিয়া আমি ও রতি পাশাপাশি বসিয়া চুরুট টানিতেছি ; অন্য নৌকায় সাহেব (কাপ্তেন) বসিয়া একখানা বেহালা বাজাইতেছেন, ডাক্তার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিয়াছেন।

এমন সময় অদূরে সজোরে জল আন্দোলনের এক অদ্ভুত রকম ও অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিতে পাইয়া আমরা দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেবেরা ঐ শব্দ শুনিয়াছিলেন ; তাঁহারাও দুইজনে দাঁড়াইলেন এবং কাপ্তেন সাহেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সর্দ্দার! জলহস্তী নিকটেই কোথাও আছে। তোমার নৌকার মাঝিকে সাবধান থাকিতে বল। তোমরাও সাবধান থাক। বন্দুক আর বড় বরছাগুলা ঠিক রাখিও।" সাহেব নিজের নৌকার মাঝিকেও ঐ ভাবে সাবধান করিয়া দিলেন।

শব্দ কিন্তু ক্রমেই আমাদের নিকটে আসিতে লাগিল। এইবার আমরা স্পষ্ট দেখিলাম, বোধ হয় ১৪।১৫টা জলহস্তী (hippopotamus) খেলা করিতে করিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কোনটা ডুবিতেছে, কোনটা উঠিতেছে, কোনটা অপরের উপর যাইয়া পড়িতেছে। এক একটা খুব বৃহৎ বোধ হইল, একটা পূর্ণকায় মহিষের মত। আমরা নীরবে তাহাদের জলখেলা দেখিতে লাগিলাম।

অনেকেই হয়ত জানেন, ইহারা জলের মধ্যে ডুবিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই বাহিরে আসিয়া নিঃশ্বাস লইতে হয়। ইহারা প্রায়ই আহারাদির অন্বেষণে ডাঙ্গায় উঠে। তবে ডাঙ্গার উপর ইহারা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকে ; সামান্য শব্দ শুনিলেই জলের মধ্যে চলিয়া যায়। বাচ্চা হইবার সময় ইহারা ডাঙ্গায় আসে, এবং জলের খুব কাছে কোনও ঝোপ বা গর্ত্তের মধ্যে প্রসব করে। ইহারা উদ্ভিদভোজী। প্রায়ই কাহাকে হিংসা করে না। তবে অনেক সময় ইহারা নৌকা বা ডোঙ্গা দেখিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং সদলবলে উহা আক্রমণ করে। সময় সময় ইহারা নৌকার তলায় যাইয়া উপস্থিত হয় এবং স্বীয় সুদীর্ঘ দন্ত দ্বারা উহার তলা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। ইহারা অনেক সময়ে ষ্টীমার পর্য্যন্ত আক্রমণ করে।

ক্রমেই উহারা আমাদের খুব নিকটে আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা খেলায় মগ্ন থাকাতে, আমাদিগের প্রতি লক্ষ্য করে নাই। এইবার একটার দৃষ্টি আমাদের নৌকার উপর পড়িল। সে এক ভীষণ চীৎকার করিয়া আমাদের নৌকার দিকে ধাবিত হইল। তাহার ঐ চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া আরও দুইটা জন্তু উহার সঙ্গ লইল। ভাগ্যক্রমে অপরগুলা খেলা করিতে করিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

আমাদের মাঝি মাল্লারা এ সব বিষয়ে যথেষ্ট নিপুণ ছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বরছা লইয়া একবারে নৌকার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরাও বন্দুক লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে একটা আমাদের নৌকা ও দুইটা সাহেবদের নৌকা সবেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু তিনটাই বরছার প্রচণ্ড আঘাতে জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল। মাল্লারা তৎক্ষণাৎ নৌকা দুইখানা তীরের দিকে লইয়া চলিল। ২।২॥ মিনিট পর্য্যন্ত আমরা আর তাহাদের কোন চিহ্ন দেখিলাম না। তাহার পর উহারা নৌকার প্রায় ১৪।১৫ হাত দূরে ভাসিয়া উঠিল। সাহেবদের বিশেষ আদেশে আমরা উহাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নৌকা খুব দ্রুতবেগে কিনারার দিকে লইয়া চলিলাম। ৩।৪ মিনিট এই ভাবে চলিল। তাহার পর উহারা তিনটাই ডুব দিল। এই সময় কাপ্তেন সাহেব মাঝীদিগকে বলিলেন "নৌকা ডানদিকে চালাও। উহারা নৌকার তলায় না যায়।" উহাদিগের অভিপ্রায় কি ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু মাঝীদিগের নিপুণতা বশতঃ কোনও বিপদ ঘটিল না।

আমরা তখন প্রায় কিনারার নিকট আসিয়াছি বলিয়াই বা অন্য যে কোনও কারণে হউক, উহারা আর আমাদিগের নিকটে আসিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভিক্টোরিয়া বন্দর ছাড়িবার ৫ দিন পর আমরা কাবো নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা হ্রদের একবারে উপরে অবস্থিত। চারিদিকে অতি গভীর জঙ্গল। মধ্যস্থলে ঐ গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা ৭০০।৮০০ অধিক হইবে না। আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম যে, এই স্থানে একজন সাহেব বাস করেন। যেখানে এই হ্রদের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদী আসিয়া মিলিতেছে ঠিক সেই সঙ্গম স্থানে একখানি ক্ষুদ্র বাংলা নির্ম্মাণ করাইয়া সাহেব বাস করিতেছেন। বাংলাখানি ছোট হইলেও বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং চারিদিককার দৃশ্য বড়ই সুন্দর বলিয়া স্থানটী অত্যন্ত মনোরম বোধ হইতেছিল।

সাহেব এই অঞ্চলের ফরেষ্ট রেঞ্জার (Forest Ranger) বা জঙ্গলা বিভাগের এই জেলার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৯০ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী জঙ্গলা ইঁহার অধীনে। ইঁহার অধীনে আরও তিনজন কর্ম্মচারী আছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন ইংরাজ ও একজন ভারতের য়ুরেশীয়। সাহেবের সহকারীরা এই রেঞ্জের (জঙ্গল বিভাগ) অন্যান্য স্থানে বাস করেন। তবে কর্ম্মোপলক্ষে ইঁহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়। সাহেবের নাম—বরি।

কাপ্তেন সাহেব এই কজবা গ্রামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এখানে তিন দিন বাস করিলেন। ইহার মধ্যে দুইদিন শিকারে ও একদিন গল্প গুজবে অতিবাহিত হয়। এই গল্পের মধ্যে বরি সাহেব তাঁহার কার্য্য জীবনের অনেক কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। আমি উহা সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত করিলাম। পাঠক ইহার মধ্যে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

ইঁহাদের কাজগুলিকে আমরা এই কয়ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। মনে রাখিবেন আমরা আফ্রিকার জঙ্গল বিভাগের কথা বলিতেছি। ভারতের জঙ্গল বিভাগ সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই। (১) জঙ্গলকে আকস্মিক অগ্নির উৎপাত হইতে রক্ষা করা। (২) জঙ্গলের পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদির হেপাজত করা। (৩) জলের মৎস্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখা। (৪) পুলিশের কাজ করা। ইহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, ইঁহাদের দায়ীত্ব কি প্রকার। খুব কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী লোক না হইলে এ বিভাগে চলিতে পারে না। তা' ছাড়া খুব চটপটে ভাল শিকারী ও উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হওয়া চাই। এক এক দিনে ইঁহারা ৮০।৯০ মাইল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রাণের মমতা একপ্রকার ছাড়িয়াই এ বিভাগে ঢুকিতে হয়। ইঁহারা যে প্রতিনিয়ত কত প্রকার বিপদের সম্মুখীন হন তাহার সংখ্যা করা যায় না।

গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিবার সময় বরি সাহেব প্রায়ই একজন না একজন সহকারীকে সঙ্গে লইয়া যান। কারণ, এ দেশে এখনও এমন অনেক স্থান আছে যেখানে আজ পর্য্যন্তও কোন সাহেব গমন করেন নাই। ঐ সকল গভীর জঙ্গলে যে কি আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না।

জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন বড় বিপদে পড়িতে হয়। যে দিকে হাওয়া বহিতেছে, প্রধানতঃ সেই দিকের বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিয়া আগুনের তেজ কমাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। কখন কখন কিছুতেই কিছু হয় না। আগুন হু হু করিয়া বৃদ্ধি হইয়া ২৫।৩০ মাইল স্থান একবারে ছাই করিয়া ফেলে। এ প্রকার ঘটনায় কত যে পশু, পক্ষী মারা যায় তাহার সংখ্যা হয় না। অনেক সময় নর নারীও মারা পড়ে। শুনিলাম ৩।৪ মাইল দূরে আগুন লাগিলেও, জঙ্গলের লোকেরা পলাইতে পারে না। খুব দ্রুতগামী ঘোড়ার সাহায্যেও তাহারা আগুনের হাত এড়াইতে পারে না। জঙ্গলের আগুন ঘণ্টায় প্রায় ৮০।৯০ মাইল গমন করে। তাহার নিকট হইতে পলায়ন করা প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এইসব জঙ্গলে শিকার করিতে হইলে প্রথমে বরি সাহেবের হুকুম লইতে হয়। কিন্তু চোর শিকারীর আমদানী প্রায়ই হয়। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সাহেব ও তাঁহার সহকারীদিগকে বিলক্ষণ সতর্ক থাকিতে হয়। ইঁহাদের অধীনে জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ৪০০ প্রহরী আছে।

ইহারা সকলেই এই দেশীয় লোক। ইহারা সর্ব্বদা জোড়া জোড়া থাকে। একজনকে দিনের বেলায় ও অপরকে রাত্রে চৌকি দিতে হয়। ইহাদের প্রত্যেককে একটা বন্দুক ও বরছা দেওয়া হয়। শুধু যে এ দেশের লোকেই চুরী করিয়া শীকার করে তাহা নয়। অনেক সময় য়ুরোপীয়েরাও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেহ এই কার্য্যে ধৃত হইলে তাহাকে খুব কঠিন সাজা দেওয়া হয়। এই প্রকার চোর ধরিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ১০। ১৫টা বুলডগ রক্ষিত আছে। ইহারা এমন নিপুণ যে, চোর শিকারীরা প্রায়ই ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না।

খাদ্যাদি সম্বন্ধে এই কর্ম্মচারীদিগকে প্রায়ই কষ্ট সহ্য করিতে হয়। অনেক সময় ১৫। ২০ দিন পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে কেবল জঙ্গলের শিকারের মাংস খাইয়া থাকিতে হয়। চাল, ডাল, আটা, আলু প্রভৃতি প্রায়ই ইঁহারা খাইতে পান না। জলও নানা প্রকারের পান করিতে হয়। এই জন্য ইঁহাদের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি হইতে প্রায়ই আত্মরক্ষা করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের নিয়ম, এই বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে প্রত্যহ ৩ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাইতে হয়।

বরি সাহেবের জীবনের একটী ঘটনা আমি এই স্থানে তাঁহার নিজের কথায় বিবৃত করিতেছি:—একদিন আমি সংবাদ পাইলাম যে একদল শিকারী জঙ্গলের একদিকে বিনা অনুমতিতে কয়েকদিন হইতে শিকার করিতেছে। আমার সহকারী পিটর তখন এই স্থানে উপস্থিত ছিল। তাহাকে ও ৪ জন চৌকিদারকে লইয়া আমি রওয়ানা হইলাম। দুই দিনের পর আমরা জঙ্গলের এক স্থানে দেখিলাম, একদল লোকের ঐখানে রন্ধনাদি করিবার চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান। তাহারা সেই স্থানে যে তাঁবু খাটাইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। ইহার পর উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা বিশেষ দুরূহ হইল না। কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলাম। এই হ্রদের অনেক স্থানে আমরা ছোট ডিঙ্গি গোপন করিয়া রাখিয়া থাকি। এমন স্থানে রাখা থাকে যে, অল্পক্ষণের মধ্যে উহা জলে ভাসাইতে পারি। আমরা যেখানে উপস্থিত হইলাম, সেইখানেই আমাদের একখানা ডিঙ্গি ছিল। আমরা ডিঙ্গি বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় হ্রদের জলে দাঁড় ফেলিবার 'ঝপ্ ঝপ্' শব্দ শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি এক ঝোপের আড়ালে লুকাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি একখানা বড় নৌকা আমাদের দিকে আসিতেছে। নৌকায় ছাত ছিল বলিয়া আমরা প্রথমে আরোহীর সংখ্যা বুঝিতে পারি নাই। যখন সম্মুখে আসিল তখন দেখি উহার ভিতর ৩ জন ইংরাজ, দুইজন জার্ম্মণ ও তিনজন ডচ্ বসিয়া আছে। তাহারা আমাদের অল্প দূরে আসিয়া নৌকা তীরে লাগাইল এবং সকলে উপরে উঠিয়া ঠিক হ্রদের ধারে তাঁবু খাটাইল। তাহারা যে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকদিন হইতে শিকার করিতেছে, তাহা তাহাদের নৌকা বোঝাই শিকারের জন্তু ও কয়েকটা হাতীর দাঁত দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল। কিন্তু এখন করা যায় কি? উহারা সকলেই সশস্ত্র। চুরি করিলে শিকারীর যে কঠিন সাজা হয় তাহা উহারা ভাল করিয়াই জানিত। সেই জন্য উহারা যে সহজেই ধরা দিবে এমন আশা আমার ছিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিলাম।

আমার চৌকিদারদের মধ্যে অনেকে পশু পক্ষীর আওয়াজকে সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে। চৌকিদার নিযুক্ত করিবার সময় এই গুণটা এ দেশে আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়া লই। আমার সঙ্গী দুইজন চৌকিদার এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। উহাদিগকে আমি উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া পাঠাইলাম। তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইল। ইহার ৪। ৫ মিনিট পরে তাঁবুর একদিকে জঙ্গলের মধ্যে আমরা নীলগাভীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। বলা বাহুল্য ইহা আমাদেরই একজন চৌকিদারের কাজ।

শিকারীদের নিকট ঐ শব্দ উপস্থিত হওয়াতে বেশ একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিনজন লোক তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য তিনজন তিনদিকে রওয়ানা হইল। আমরাও তাহাই চাহিতেছিলাম। ইহার পর ১০ মিনিটের মধ্যে আমরা ঐ তিনজনকে পৃথক পৃথক স্থানে গ্রেপ্তার করিলাম

ও তিনটা গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্তও ইহাদের কোনও সাড়া শব্দ না পাইয়া তাঁবু হইতে আরও ৩ জন লোক উহাদের সন্ধানে বাহির হইল। ইহাদের দলেরও অবস্থা অবিকল ঐ প্রকার হইল। ইহার পর বাকী দুইজনকে ধরা অবশ্য কঠিন হইল না।”

১৫। ২০ বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকার জঙ্গলে যে সে যাইয়া যথেচ্ছা শিকার করিতে পারিত। কিন্তু ইহাতে লাভ এই হইল যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে দলে দলে লোক যাইয়া রাশি রাশি জন্তু নিহত করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন এই ভাবে চলিলে সমস্ত জঙ্গল অচিরে প্রাণীহীন হইয়া পড়িবে। অগত্যা তখন আদেশ হইল যে, বিনা আদেশে কাহাকেও শিকার করিতে দেওয়া হইবে না। এই প্রকার রক্ষিত জঙ্গলকে রিজার্ভ (Reserve) বলে। আফ্রিকার অধিকাংশ জঙ্গলই আজকাল রিজার্ভ।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

জয়পুর।

চারিদিন বৃন্দাবন বাসের পর বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামির পরিবর্ত্তে বৃন্দাবন ত্যাগের বাসনাই আমাদের মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল; আমরা অমনি জয়পুর যাওয়া ধার্য্য করিয়া ফেলিলাম।

বৃন্দাবনে আমরা দিনাজপুরের শ্রদ্ধেয় রায় রাধাকান্ত রায় সাহেব বাহাদুরের কুঞ্জে পরম যত্নে অবস্থিতি করিতেছিলাম, বিগ্রহ দেব মদনমোহনের ভোগের ক্ষীরিকা আমাদের রসনার যে তৃপ্তি প্রদান করিতেছিল, তাহা এ জন্মে ভুলিবার কথা নয় সুতরাং আমাদের বৃন্দাবন ত্যাগ যে শ্রীচৈতন্যদেবের সংসার ত্যাগ অপেক্ষা কোন অংশে কম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল না, তাহা যিনি রসগ্রাহী তাঁহার বুঝিতে আর বিলম্ব হইবেনা। কুঞ্জের কামদার অর্থাৎ কার্য্যকারক ধরণীবাবু আমাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা দলে একটুকু পুরু হইলাম।

বৃন্দাবনে জয়পুর ষ্টেটের মাধোবিলাস মন্দির দেখিতে যাইয়া তত্রত্য সুবাদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল; অপরিচিত স্থানে যাইতেছি, তাই তাঁহার নিকট হইতে তাহার ভ্রাতা জয়পুর ষ্টেটের কার্য্যকারক হারাণ বাবুর নামে একখানা চিঠি নিতে কসুর করিলাম না। এই চিঠি উপস্থিত করিলে হারাণ বাবু আমাদের দেখা শুনা, থাকা মেলার সর্ব্ব প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, এইরূপ আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া চিঠি খানি অমূল্য পদার্থ জ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করিলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল অপরিচিত ব্যক্তি বর্গের স্বাধীন ভবে দু চার দিন বসবাস করিবার জয়পুরে একমাত্র যোগ্য স্থান গোপালজিউর মন্দির, তাই এ চিঠি খানির সম্মান আমাদের নিকট আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রত্যূষে কাক-কলরবের সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া হাত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক গাত্রে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে কূপোদকে স্নান করিয়া ফেলিলাম। পশ্চিমের হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে আমার এমন অসম সাহসের কার্য্য দর্শন করিয়া বন্ধু বর্গ ত অবাক্ হইলেন। অচল হইতে অরুণ দেবের রাঙ্গা মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে না হইতে ক্ষীর-সর-ননীর গোকুলে কফি ইত্যাদি ও বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত সংযুক্ত আতপান্ন, গলাধঃ করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

যথাসময়ে ব্রজবাসী ও যাত্রীবর্গের “রাধারাণী কি জয়” ধ্বনি সহ গাড়ী, মথুরা হইতে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ মাতান, যমুনা ফিরান, বংশী শ্রবণে উৎকণ্ঠ বৃন্দাবনে বিকট আওয়াজ করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। আমরাও এই ধ্বনিকেই বংশী ধ্বনির ন্যায় সুমধুর বোধে বিহ্বল চিত্তে ইহারই অঙ্গে গা ঢালিয়া দিলাম, এবং অল্প সময় মধ্যে গাড়ী আমাদিগকে সেই কুব্জা সুন্দরীর মথুরায় আনিয়া ফেলিল। গোয়ালার ছেলেরও কিন্তু এখানে রাজত্ব সমেত সব মিলিয়াছিল! সবই অদৃষ্ট! আমাদের ভাগ্যে কিন্তু শুধু ঘণ্টাব্যাপি রৌদ্র ভোগ ব্যতীত আর কিছুই ফলিল না। নিরূপিত সময়ে গাড়ী পঁহুছিলে আমরা ভালরূপে চাপিয়া বসিতে না বসিতে গাড়ী আচনাড়া পঁহুছিল আবার সেই হুরহুর। এবারে গাড়ী চাপিয়া নিরুদ্বেগে ভারতপুর পর্য্যন্ত বেশ যাওয়া গেল। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ—সেইলর্ড কমবরমিয়র—কত পুরাতন কথা—মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িতে বড় দেৌড় হইতে লাগিল আমরাও ভারী দিকসিক্ বোধ করিতে লাগিলাম, এমন সময় সুন্দর ষ্টেট ইউনিফরম পরিহীত একটী সুশ্রী যুবক গাড়ীর সহস্র লোক উপেক্ষা করিয়া স্মিত মুখে বন্ধু ভাবে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের নাম ধাম পিতার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর গুলি নোট করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের এ ট্রেণ খানিতে বোধ হয় আমরাই কয়টী বাঙ্গালী ছিলাম। সুতরাং আর বুঝিতে বাকী রহিল না—কেন আমাদের এ সম্মান? মুষ্টিমেয় অপরিণত মস্তিষ্ক কয়টী যুবকের কার্য্যতায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতির উপর কি কলঙ্কের ছায়া পাতই না হইয়াছে! প্রশ্নোত্তর গুলি পুলিস আফিসে গেল। অফিসারটী গাড়ীর সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, আফিস হইতে আমাদের লাইন ক্লিয়ার আসিল, তারপর গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমরাও হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সন্ধ্যার প্রাকালে আমরা ভারতের নন্দন-কানন —জয়পুরে উপনীত হইলাম।

গাড়ীতেই শুনিয়াছিলাম জয়পুরে আগন্তুক ভদ্র লোক দিগের বাসের জন্য সুন্দর একখানি নূতন বাড়ী হইতেছে এবং ইহাতে থাকা মেলার বন্দোবস্তাদি সমুদয়ই ষ্টেট হইতে হইতেছে। ষ্টেসনে পঁহুছিয়া কয়েকটী বাঙ্গালী বালকের সাক্ষাৎ লাভে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসায় ওকথার যথার্থ্য সপ্রমাণ হইল। আমরা গোপালজিউর প্রসাদ উদ্দেশ্যে মস্তকে ধারণ করিলাম এবং আমাদের ফিটন মেমোরিয়াল অভিমুখে হাঁকাইতে বলিয়া দিলাম।

জয়পুর নগর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে সাতটী আগম ও নিগম দ্বার। প্রাচীরের এই বেষ্টনী মধ্যে রাজ প্রাসাদ, আফিস আদালত, বাজার দোকান পসার যত কিছু। রাত্রি ৯ টার তোপের সঙ্গে দ্বার গুলি রুদ্ধ হয়, আবার ভোর সারে চারিটায় উদঘাটিত হয়। দরজা গুলি বন্ধ হইলে আর নগরে গমনাগমনের কোন উপায় থাকেনা। কিন্তু ট্রেনে রাত্রি সর্ব্বদাই গমনাগমন করিয়া থাকে; তাই আগন্তুক দিগের জয়পুরে থাকিবার অসুবিধা দূরীকরণ মানসে বর্ত্তমান মহারাজা আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় ভূতপূর্ব্ব সম্রাট এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষা কল্পে প্রস্তর মূর্ত্তি বা তদনুরূপ কোন প্রকার বহ্বাড়ম্বরে অর্থব্যয় না করিয়া নগরের বহির্ভাগে বহু অর্থব্যয়ে এই পরম রমণীয় বাড়ী খানি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। ইহাতে সম্রাটের স্মৃতিও যুগাযুগান্তরে যেমন রক্ষিত হইবে অপরিচিত আগন্তুক, দেশীয় পর্য্যটক গণের থাকার অসুবিধাও তেমনই দূর হইবে। এইরূপ ভাবে স্মৃতি রক্ষা করিতে আমাদের দেশে অর্থশালী ব্যক্তিদের কয়জনে জানেন? আমরা যখন গিয়াছিলাম বাড়ী খানি তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। উপরে পশ্চিম দিকে মাত্র চারি খানি ঘর হইয়াছে; নীচেও অনেক ঘরের কাজ সমাধা হয় নাই। সমস্ত বাড়ী খানিই দোতালা হইবে জানিয়া আসিয়াছি। এই বাড়ী সম্পূর্ণ হইলে উপরে ও নীচে পঞ্চাশ খানি প্রশস্ত কক্ষে সুখে সচ্ছন্দে দুইশত লোকের একত্রে স্থান সমাবেশ হইতে পারিবে।

আমাদের গাড়ী খানি মেমোরিয়ালের প্রশস্ত ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র ম্যনেজার সাহেব স্বয়ং বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের মাল পত্র উপরে লইয়া যাইতে মেমোরিয়ালের ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন। তাহারা আমাদের মাল পত্র দোতালায় একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে ঘর দেখাইয়া দিল। আমরা ঘরে যাইয়া বিশ্রামের পথ খুজিতেছি, এমন সময় ম্যানেজার সাহেব আসিয়া আমাদের সহিত শিষ্টাচার সূচক আলাপ আপ্যায়ন করিয়া গেলেন। এখানে পাচক ব্রাহ্মণ আছে; আহার্য্য জিনিষপত্র কিনিয়া দিলে বা মূল্য দিলে ইহারা সংগ্রহপূর্ব্বক সমুদয় তৈয়ারি করিয়া দিয়া থাকে। ইহাদিগকে ।/০ এবং গাইড দিগকে ৸০ মেমোরিয়ালের বন্দোবস্ত নিয়মানুসারে দৈনিক পারিশ্রমিক, দিতে হয়। কক্ষ গুলির ভাড়া দৈনিক ॥০ আট আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত আছে।

জয়পুর চির দিনই বাঙ্গালী হিন্দুর প্রধান্য ছিল। বর্ত্তমান মিনিষ্টার মুসলমান, সেই সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু এখানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরে কোনরূপ বিদ্বেষ থাকা জানা গেল না। যদিও শ্রদ্ধেয় সংসার বাবুর পুত্র রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র সেন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং বাবু রামচন্দ্র সেন মিউনিসিপাল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট তবুও বাঙ্গালীর আর সে প্রাধান্য নাই, এখন বাঙ্গালীর সংখ্যাও অনেক হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীর গৃহে নিমন্ত্রণে মেয়ে পুরুষে চারিশত

পাতা পড়িত; এখন আর তিন শতের অধিক হয় না। সন্ধ্যায় পহুছিয়া সে দিন আর কিছু হইল না; আমরা শ্রমোপাদনেন্দ্রপ্রয়াস পাইতেছি, ইত্যবসরে আমাদের সঙ্গীয় ভৃত্যটী আহার্য্য আহরণ পূর্ব্বক ঠাকুর দ্বারায় তৈয়ারি করাইয়া খবর দেওয়া মাত্র নীচে যাইয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার সমাধান্তে আমাদের নিদ্দিষ্ট ঘরে বিছানায় গা ঢাকিয়া দিয়া দিনব্যাপী পথ শ্রান্তি রাত্রি ব্যাপী সুনিদ্রায় অপসারিত করিলাম।

পরদিন ৯ই অগ্রহায়ণ প্রাতে উঠিয়া ছাদে দাঁড়াইয়া বালরবির নব কিরণ উপভোগ করিলাম। এখানে সেখানে আমাদের দেশের কাক চিলের মত সুপুচ্ছ ময়ূর গুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—যেন ভয় ভীতির লেশমাত্র নাই। দূরে বলয়াকৃতি উন্নত শীর্ষ রমণীয় পাহাড়ের দৃশ্য, ইহারই মধ্যে প্রাচীন রাজধানী অম্বর যেন ছবি খানি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। বিস্ময়েও পুলকে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। যে দেশে ময়ূরগণ পুচ্ছের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার পূর্ব্বক পথে ঘাটে চড়িয়া বেড়ায়, হাত হইতে নিঃশঙ্কে আহার্য্য খুটিয়া খায়, যে খানে পার্ব্বত্য পথে রংবেরঙ্গের নয়নঅভিরাম কুরঙ্গিনী কুল বাঁকা চঞ্চল চক্ষের প্রখর শর নিক্ষেপ করিয়াই ছুটিয়া পালায়, সে দেশ বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং কবিজনেরই উপভোগ্য।

এখানে যাহা কিছু দেখা শুনার বন্দোবস্ত ম্যানেজার সাহেবই করিয়া দিবেন বলায় আমাদের হারাণ বাবুর কিম্বা আরকাহারও দ্বারস্থ হইতে হইলনা। আজ বেলা এগারটায় রাজ প্রাসাদ দেখিবার পাস আসিয়াছে; রাজ বাড়ী দর্শনান্তে অনাহারে গোবিন্দজিউ দর্শন করিতে হইবে বন্দোবস্ত হইল; সুতরাং প্রাতে আমরা সামান্য মত এদিক সেদিক একটুকু বেড়াইতে বাহির হইলাম। নগরটী বড়ই সুন্দর। সরল প্রশস্ত রাজ পথের উভয় পার্শ্বে একই ভাবের, একই রঙ্গের হর্ম্মাবলিতেই আরও সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছে। চারি দিক হইতে চারিটি রাস্তা যে স্থানে মিলিয়াছে সেই খানেই একটী বাগান ও একটী ফোয়ারা। এ দৃশ্য বড়ই হৃদয় গ্রাহী মনে হইল। কত স্থানে সহস্র সহস্র কবুতর, কণ্ঠ নিসৃত মধুর ধ্বনিতে দিক মাতাইয়া আপন মনে আহার্য্য সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছে। যাহা যেখানে দেখিয়াছি তাহাতেই মন মুগ্ধ হইয়াছে। সব দিক দিয়া দেখিলে জয়পুর নগর খানিকে একখানি ছবি বলিলেও যেন অত্যুক্তি হয় না।

বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়াছে। আমাদের গাইড পাস সহ হাজির, আমরা রাজবাড়ী দর্শনে বহির্গত হইলাম। রাজবাড়ীতে নগ্ন মস্তকে গমনাগমন নিষিদ্ধ; সুতরাং আমাদের চির নগ্ন বাঙ্গালী মস্তক গায়ের আলোয়ানে প্রস্তুত সুবৃহৎ পাগরি দ্বারা ঢাকিয়া লইতে হইল, চুনটকরা কোচার বাহার নষ্ট করিয়া পশ্চাদ্দেশে গুজিয়া লইতে হইল। যে প্রবেশ দ্বার দিয়া রাজবাড়ী প্রবেশ করিতে হইল তাহা অতি সুবৃহৎ ও পিত্তল নির্ম্মিত, ইহার সন্নিকটস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে আফিস আদালত ইত্যাদি। সময়াভাবে বিচার কার্য্যাদি কিরূপে নির্ব্বাহ হয় দেখিবার জন্য বধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। জয়পুর রাজ ষ্টেটের আইন কানুন আছে। রাজকার্য্যাদি রাজার স্বেচ্ছামত চলিতেছে বটে কিন্তু যথেচ্ছাচার নাই, আইনানুযায়ীই কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রবেশ দ্বারটীর পার্শ্বভাগ নানাপ্রকার সুন্দর চিত্রে চিত্রিত। রাজা রামসিংহের বৈঠকখানা ইত্যাদি দেখিয়া হাওয়া মহাল দেখিতে গেলাম। হাওয়া মহাল এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে তাহাতে কোন সময়েই সূর্য্যোত্তাপ নিবন্ধন কষ্ট অনুভূত হয় না। দূর হইতেই ইহার সৌন্দর্য্য ভালরূপ উপভোগ করা যায়, ঠিক একখানি সাজান রথের মত দেখা যায়। জয়পুরের সমুদয় জিনিস কেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া যথাযথ বর্ণনা করিতে সক্ষম হইবেন, আমার ত মনে হয় না। যে দিকে চাহিয়াছি সেখানেই বুঝিয়াছি মানুষ এবং ভগবান যেন একত্রে যুক্তি করিয়া সে স্থানের সৌন্দর্য্য বিধানে ব্রতী হইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের বিদ্যাধর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে সবাইজয়সিংহ এই নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে নিজ নাম যোগ করিয়া নিজ নামকেও অমরত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রমহাল প্রাসাদে বর্ত্তমান মহারাজা কর্ণেল হিজ হাইনেস সার সবাই মাধো সিং বাহাদুর বাস করেন। এই প্রাসাদ ইংরেজী ধরণে নির্ম্মিত এবং তদনুরূপ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। দেওয়ানআম ও দেওয়ানখাসও দেখিবার জিনিষ। এই সব দেখিতে দেখিতে অন্তঃকরণ আনন্দে প্লুত হইয়া উঠিল। এমন সময়

গোবিন্দজিউর মন্দিরে শাক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; আমরা চন্দ্রমহাল প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে গোবিন্দজিউর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মূর্ত্তিখানি বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়া এখানে স্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তিখানি মোটের উপর বেশ সুশ্রী, কিন্তু দিনাজপুরে কান্তজিউর মূর্ত্তির মত সুন্দর মধুর মনোমোহন মূর্ত্তি—কি বৃন্দাবনে কি প্রস্তর শিল্পের আবাস ভূমী জয়পুরে—কোন স্থানেই যেন একটী আর চক্ষে পড়িল না। আমাদের ভক্তি প্রবন বন্ধুটী যাষ্টাঙ্গে দীর্ঘ প্রণিপাতান্তে উটীয়া ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টিতে ভাবে বিভোর হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। গোবিন্দজিউর মন্দিরের পুজারী বাঙ্গালী। তাঁহার সহিত কিছু কাল বাক্যালাপের পর চরণ তুলসী ও চরণামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রমহাল প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। ইহাকে উদ্যান কে বলে ? এযে নিকুঞ্জবন ! ইহা গরমের সময় কি আরামের, তাহা যাঁহাদের উপভোগের জন্য তৈয়ারি হইয়াছে, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। ইহার পুষ্পবৃক্ষে ও লতাকুঞ্জে ফুল ফুটিয়া যখন অমরাবতীর পারিজাতের গন্ধ উৎকীর্ণ করিতে থাকে, ভ্রমরকুল ফুলে ফুলে গুঞ্জরণপূর্ব্বক মধুপানে মত্ত হয়, পুষ্প গুচ্ছগুলি যখন নায়ক করস্পর্শে সলজ্জভাবে সুখে ঈষৎ কম্পান্বিত হইতে থাকে, ফোয়ারা নিসৃত স্নিগ্ধবারিকণা পত্র হইতে পত্রান্তরে এবং তাহা হইতে গাত্রে পতিত হইয়া কণাবৃষ্টিপাতের স্পর্শসুখ অনুভূত হয়, তখন নাজানি মনে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবেরই উদয় হয়। আমরা বাগানে প্রবেশ করিবা মাত্র উদ্যানরক্ষক অলক্ষ্যে ফোয়ারার মুখ খুলিয়া দিয়াছিল ; আর শিরোপরি লতায় মণ্ডিত নলগুলির সহস্র সহস্র ছিদ্র নিসৃত জলকণাতে স্পৃষ্ট হইয়া কি আনন্দ যে উপভোগ করিলাম তাহা আর বলিবার নহে। এখানে উদ্যান রক্ষককে কিছু বকসিস দিয়া জগদ্বিখ্যাত মানমন্দির দেখিতে চলিলাম।

জয়পুরের অন্যতম মহারাজ সবাইজয়সিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি নিজ উদ্ভাবিত নানা প্রকার যন্ত্রাদির সাহায্যে বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা দি, লা, হায়রের ও নাকি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা অজ্ঞ, আমরা এখানে কি বুঝিব ? নিজ ঘড়ীটি সূর্য্যঘড়ী দৃষ্টে মিলাইয়া লইলাম এবং মেষ বৃষ মিথুন কর্কট ইত্যাদির রঙ্গে চিত্রিত ছবি দেখিলাম।

ইহার পর গোপালজিউর মন্দিরে গেলাম। সেখানে তখন ভোগ হইতেছে। আমরা শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অঙ্গনে জোড়াসন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি। একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমরা প্রসাদ লইব কিনা ? আমরা অসম্মত হওয়ায় তাহাদের প্রাপ্যের ব্যাঘাত হইল বলিয়া বোধ হয় আমাদের প্রতি আর গোপালজিউর কৃপা হইল না—ঘণ্টাব্যাপী বসিয়া থাকিয়া ডাক হাঁক করিয়াও আর মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করাইতে পারিলাম না। আমরা আর কি করিব বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। এসব বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একটুক নজর থাকা আবশ্যক। দেবতার মন্দির—সেখানে, এতটা স্বার্থের হিসাবে কাজ চলিলে বোধ হয় দেবতার তুষ্টি সাধনেও ব্যাঘাত জন্মে।

শীতকাল হইলেও দুপ্রহরের রৌদ্র বেশ প্রখরই বোধ হইতে লাগিল। আমরা অনন্যোপায় হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিবার পরে রামনাথ উদ্যান দেখিতে গেলাম। এত বড় সুসজ্জিত উদ্যান খুব কম দেখা যায়। উদ্যানভূমি যেন ঘাসের শ্যামল ফ্রেমে আটা। সুরকীর কুচি দেওয়া রক্তরাগে রঞ্জিত আঁকা বাকা রাস্তাগুলির দৃশ্য বড়ই মনোহর। এই উদ্যান মধ্যেই আলবার্ট হল নানারূপ মূল্যবান প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার বারেন্দায় জয়পুরের ভূপতিবর্গের তৈলচিত্র বিদ্যমান। প্রত্যেকখানি চিত্রের নিম্নে নাম ইত্যাদি লিখা আছে। এই গৃহেই দরবার হল অবস্থিত। এই ঘরের সংলগ্ন রামনাথ মিউজিয়ম। এই মিউজিয়ম এমন সুন্দর ভাবে সজ্জিত এবং ঘরে এত জিনিষের সমাবেশ যে কলিকাতার যাদুঘরও ইহার নিকট বোধ হয় হার মানে।

দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল, মিউজিয়মের দরজা বন্ধের সাড়া পড়িয়া গেল ; আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। বিস্তীর্ণ উদ্যান লোকে ভরিয়া গিয়াছে, ব্যাণ্ডষ্টাণ্ডে ব্যাণ্ড বাজিতেছে, আকাশে নক্ষত্র সমন্বিত চাঁদের আলো, নীচে বৈদ্যুতিক আলো, উভয়ে মিশিয়া পত্রপুষ্পের উপর পড়িয়া কি সুন্দর শোভাই

হইয়াছে। রাত্রি সাতটায় বাসায় ফিরিয়া জয়পুরে দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করা গেল।

পরদিন প্রভাতে আমরা অম্বর দেখিতে যাইব। রাত্রি কোনরূপে প্রভাত হইতে না হইতে আমরা হাত মুখ ধুইয়া তৈয়ারী হইয়াছি। ম্যানেজার সাহেব বড় ভদ্র, আমাদের পাস আসে নাই; বেলা৭ হইতেছে অথচ আসিতেছে না দেখিয়া তিনি সওয়ার পাঠাইলেন। পাস আসিল। আমরা রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া চারিদিক দেখিয়া যাইব বলিয়া একখানি ফিটন লইলাম। পূর্ব্বে অম্বরের রাস্তা যেরূপ শ্বাপদশঙ্কুল, দুরারোহ ও দুর্গম ছিল এখন আর তাহা নাই। বর্ত্তমান মিনিষ্টরের কার্য্যকালে পাহাড় কাটিয়া অম্বর দুর্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত গাড়ী চলার উপযুক্ত সুন্দর ক্রমোন্নত যে রাস্তাটী নির্ম্মিত হইয়াছে তজ্জন্য মিনিষ্টর সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবেই পর্য্যটকগণের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। রাস্তার সমুদয় কাজ এখনও শেষ হয় নাই। বহু ভারবাহী উষ্ট্র কর্ত্তিত প্রস্তর সমূহ স্থানান্তরিত করিতেছে। এ সব দেশে ভার বহন কার্য্য সাধারণতঃ উষ্ট্র দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্ত্রীলোক পুরুষকে একত্র যাতায়াত করিতেও দেখিলাম।

রাজপুতনার গৌরব অম্বর নগরীর রাজসিক আড়ম্বর কালের স্রোতে ধুইয়া গিয়াছে। শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজধানী সুরক্ষিত করিবার মানসেই বোধ হয় এই দুর্গম স্থানে মানসিংহ তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালের বশে ক্রমে শত্রুভয় কমিয়া আসিলে, অম্বর ত্যাগ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে বর্ত্তমান জয়পুর নগরী বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নত পথে আমরা বেলা সাড়েদশটার সময়ে অম্বরে পঁহুছিলাম। যে সমস্ত পাহাড় উচ্ছিন্ন করিয়া অম্বরের রাস্তা হইয়াছে, তাহা বৃক্ষলতাদি শূন্য। রাজধানী থাকা কালে যে শোভা সম্পদ ছিল, তাহা অবশ্যই নাই; কিন্তু তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য হরণ করে এমন সাধ্য কার? যে যে জিনিসে সৌন্দর্য্যের ললিতকলা প্রকৃতির হস্তে অঙ্কিত, তাহার সৌন্দর্য্য আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়া চক্ষুশালী ব্যক্তির প্রাণ মন: বিমোহিত করে। আমরা চারিদিকে চক্ষুরোচক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ক্রমে উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

দেওয়ানআমের সাজসজ্জা কিছুই নাই, কিন্তু শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভগুলিই ইহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ স্তম্ভগুলির গঠন ও কারুকার্য্য চক্ষু ভরিয়া দেখিলেও যেন তৃপ্তি হয় না। দেওয়ানখাসও দেখিলাম। এ বাটীকার দু একটী কক্ষে—ছাদও দেয়ালগুলি আয়নার ফ্রেমে বাঁধা। একস্থানে আয়নাগুলি এমন কৌশলে সজ্জিত যে কোনস্থানে দাঁড়াইলে নিজেরই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাংমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এইরূপ কোন যাদুবলেই হয়ত একক্লষ্ণ এক সময়ে ষোড়শ সহস্র গোপীকার প্রত্যেকেরই নিজ আরাধ্য দেবতা স্বরূপে পূজা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐশী শক্তিতেই বা আমাদের অবিশ্বাস করিবার কি আছে?

এখন আমরা সোহাগ মন্দির দেখিতে যাইব। ভাবিয়াছিলাম যাইয়া যেন কত সোহাগ ছড়ান দেখিতে পাইব। ও হরি! একটী শ্বেত প্রস্তরের জালে নির্ম্মিত ঘর। এই জালের ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়া সোহাগের পাত্রী, অন্তঃপুর মহিলাবর্গ, দরবার দর্শন করিতেন; তাই ইহার নাম সোহাগ মন্দির। অন্দর মহালের স্নানাগার ইত্যাদিও দেখিতে ছাড়িলাম না। অন্য স্থান হইতে নলের সাহায্যে স্নানাগারস্থিত সুবৃহৎ মার্ব্বেল নির্ম্মিত চৌবাচ্চায় জল আনীত হইত। ইহাতে পুরস্ত্রীবর্গ পরমানন্দে অবগাহন করিয়া শরীর শীতল করিতেন। স্নানান্তে এ জল বাহির করিয়া দেওয়া হইত। কালের কি গতি—যেখানে সূর্য্য রশ্মিরও প্রবেশাধিকার ছিল না, আমরা সেখানে অবাধে বিচরণ করিয়া আসিলাম। সেদিন থাকিলে কাহারও কি এখানে প্রবেশ করিবার শক্তি হইত, না, করিলেই সমস্তক বাহির হইবার সাধ্য হইত? কুন্তলগড় ও ভূতেশ্বর মন্দির দুরারোহ ও দূরে বলিয়া আমাদের আর দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না। দূর হইতেই পর্ব্বত শিখরোপরি তাহা ছবির মত দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। ইহার পর শিলাদেবী বা বাঙ্গালা দেশ হইতে নীত কালী দর্শনে চলিলাম। এই মূর্ত্তি বঙ্গদেশের বারভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে

বিরাজমান ছিলেন। কেদার রায়ের রাজ্যলক্ষ্মী মানসিংহের অঙ্কশায়িনী হইলে তিনি জয়চিহ্ন স্বরূপে এই অষ্টভুজা মূর্ত্তি বাঙ্গালা হইতে একবারে নিজ রাজধানী অম্বরে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে পূজার জন্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। সেবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বে কেদার রায়ের বাড়ীতে যে ভাবে চলিত জয়পুরের রাজন্যবর্গও পুরুষানুক্রমে ঠিক সেই ভাবেই বহাল রাখিয়াছেন। জয়পুরের রাজবংশ পরম বৈষ্ণব, কিন্তু এখানে দৈনিক ছাগ বলির ব্যবস্থা আছে এবং মাংসাদি দ্বারা দেবতার ভোগ হইয়া থাকে।

এখানে আসিয়া জানি না কেন আমাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আমরা আর দাঁড়াইয়া দেখিয়া ছুটিয়া পলাইতে পারিলাম না; সকলেই মায়ের চরণ তলে বসিয়া পড়িলাম এবং অনিমিষে প্রাণ ভরিয়া আমাদের সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লইলাম। এত দূরে আসিয়া যেন কতবড় আপনার জনেরই সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

এখানে আমার একটি কথা বলিবার আছে, যদি কেহ ভারত ভ্রমণে বাহির হন, তবে তিনি যেন আগ্রা যাইতে না ভুলেন। দাম্পত্য প্রেমের এমন পবিত্র চিত্র আর কোথাও মিলিবেনা, আর যেন জয়পুরে একবার অবশ্যই পা দেন এবং জয়পুরে আসিয়া যেন অম্বর না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করেন। অম্বরে আসিলে এই পাষাণী মায়ের চরণ তলে বসিয়া দু'দণ্ড যেন বাঙ্গালার পূর্ব্বাবস্থার বিষয় একটুক চিন্তা করেন। আমরা আস্তে ধীরে "বহু পতেঃ ক গতা" ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া কেমন উন্মনস্ক ভাবে জয়পুরে আসিয়া পঁহুছিলাম।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদি শেষ করিয়া আমরা প্রস্তর শিল্পের মাতৃভূমী জয়পুরের আর্টস্কুল দেখিতে গেলাম। আমরা যাওয়া মাত্রই বাঙ্গালী বাবুটী (নামটী ভুলিয়া গিয়াছি)—যাঁহার তত্ত্বাবধানে এই স্কুল আছে তিনি অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সমুদয় দেখাইলেন। কাশীর চকে যে সমুদয় জিনিষ সাজান দেখিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করি, তাহার অধিকাংশ জয়পুরে তৈয়ারি হয়। সোনা রূপার কাজ, সোনার উপর মিনার কাজ, প্রস্তরের মূর্ত্তি, নানা প্রকার থালা বাসনের কাজ, পিত্তলের উপর খোদাই ইত্যাদি অনেক রকমের কাজ হইতেছে দেখিলাম। দিল্লীতে ভাইসরয়ের দরবার হলের দেয়ালের সজ্জাজন্য তাম্রফলকে যে কারু কার্য্য খচিত রূপার হল হইতেছে, তাহা দেখিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করা গেল। এখানকার দ্রষ্টব্য যথা সাধ্য সব দেখিয়া যথা সময়ে জয়পুর পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন।

বন্ধু।

নাজির মণ্ডলের মৃত্যুর রাত্রে কেমন করিয়া কোন ভোজবাজীতে যে তাহার সিন্ধুকের ভিতর হইতে টাকা ভরা থলি দুইটী অন্তর্হিত হইল, তাহা জানিল কেবল দুই জন। যাহার বাক্সে টাকাগুলি স্থানান্তরিত হইয়াছিল সে, আর যাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে মানুষের হাতের কোনও প্রকার কচ্ছরৎই ছাপাই থাকে না। পরদিন তাহার কবর দেওয়া হইয়া গেলে পর বাক্স খোলা হইল। তখন দেখা গেল টাকা নাই। সংবাদটা ক্রমে শাখা পল্লব যুক্ত হইয়া গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িয়া একটা মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। কামারের দোকানে, তাসের আড্ডায়, তামাকের মজলিসে—কেবল এই চুরির বিষয়ই আলোচনা হইতে লাগিল। পাড়ার নিষ্কর্ম্মাদের বদহজমের খুব উপাদেয় একটা ভেষজ আবিষ্কৃত হইয়া গেল।

এই পলাসপুরের অধিবাসীরা প্রায়ই সরল গ্রাম্য লোক। সুতরাং উকীলের পেট ভরান যে তাহাদের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে জ্ঞানও তাহাদের ছিল না। তাই এই চুরির ব্যাপার লইয়া থানা-পুলিশ-হাঙ্গামা ইহার কিছুই হইল না। বিকাল বেলায় মণ্ডলের বহির্ব্বাটীর আটচালায় পাড়ার মাতব্বরদের একটী বৈঠক বসিল। বৃদ্ধ নাছির মণ্ডল তাহার দীর্ঘ দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে রাত্রে রোগীর শয্যা পার্শ্বে কে কে ছিল?" রহিম উত্তর করিল যে সে রাত্রে সে ও হোসেন সে গৃহে ছিল—রাত্রি দুপরে হোসেন চলিয়া যায়। তারপর সে একাই কেবল পাহারায় ছিল। বৃদ্ধ মণ্ডলের নিকট ব্যাপারটা জলের মত যেন পরিস্কার হইয়া গেল। বৃদ্ধ এবার একটু

মাথা নাড়িয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিলেন "তবে এ কাণ্ডটা কাহার তাহা তো বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—অন্ততঃ এই জন্য তুমি এখন দায়ী। যাই হউক, ঘটনা অধিক না গড়াইতে—তাড়াতাড়ি টাকাগুলি বাহির করিয়া দেও।"

ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় রহিমের মুখে কথা বাহির হইল না। বিশেষতঃ চারি দিক হইতে তখন যে সকল বাক্য বান বৃষ্টি হইতেছিল, সে গুলি সুতীক্ষ্ণ শল্যেরই মতন তাহাকে বিঁধিতে লাগিল। উন্মাদ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল "আমি কিছু জানি না, আমি টাকা নেই নাই, আপনারা আমার বাড়ী খুজিয়া দেখিতে পারেন—পাট বিক্রির ২৭।৴৹ সাতাইশ টাকা নয় আনা ছাড়া আমার ঘরে আর কোন টাকা পয়সা নাই"। তখন স্থির হইল "এ উত্তম কল্প—আচ্ছা তাই হোক।"

সভা ভাঙ্গিল। রহিম, হোসেন ও অন্যান্য মাতব্বরদের সঙ্গে তাহার বাড়ীর দিকে চলিল।

পথে রহিম হোসেনকে বলিল "ভাই তোমার কি এ বিশ্বাস হয়?" হোসেন রহিমের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। দুজন সর্ব্বদা একত্র থাকিত বলিয়া তাহাদিগকে লোকে মাণিক জোড় বলিয়া ডাকিত। অন্যে হোসেনের যে দোষই দেখুক না কেন রহিমের চক্ষে সে নির্দ্দোষ। সে বন্ধুকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাই মনিয়া কোন দিন তাহাকে একটু হাসিয়া একটু ভালবাসার কথা বলিলেও সে তাহা হোসেনকে না বলা পর্য্যন্ত তাহার একটুও শান্তি বোধ হইত না। হোসেন কহিল "কি জানি ভাই, শয়তানের অসাধ্য কিছুই নাই, সয়তান মানুষকে কখন কি ভাবে চালায় কে বলিতে পারে।" একটু সহানুভূতির আশায়, একটু জুড়াইবার জন্যই সে বন্ধুকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখন তাহার উত্তর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তবে তাহার বন্ধুও তাকে চোর মনে করে—তা করুক; মনিয়া বোধ হয় তাহাকে অবিশ্বাসী মনে করিবে না।

সকলে আসিয়া রহিমের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহার বাড়ীর সকল স্থানেই তালাস করা হইল। রহিমের কথিত সাতাইশ টাকা নয় আনা ব্যতীত বাস্তবিকই তাহার ঘরে আর কোন টাকা পয়সা পাওয়া গেল না। এই সময় হোসেন একটা বাক্সের পিছন হইতে একটা থালি থলিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। সকলে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "পাওয়া গিয়াছে," "পাওয়া গিয়াছে।" বৃদ্ধেরা যখন দেখিলেন যে কেবল খালি থলিটী পাওয়া গেল তখন তাহাদের উৎসাহটা একটু দমিয়া গেলেও রহিমের দোষ সম্বন্ধে যে সন্দেহটুকু ছিল, তাহা নিঃশেষে কাটিয়া গেল। হোসেন রহিমকে চুপি চুপি বলিল "বন্ধু, আর কেন, আর লুকাইতে চেষ্টা করিও না, তাতে পাপের বোঝাটা আরও একটু ভারী করিয়া তো া ছাড়া আর কোনও লাভ নাই। খোদার কাছে ক্ষমা চাও—অনুশোচনা দ্বারা মনের ময়লা সরাইয়া ফেল। আর গোলমালটা এই খানেই থামাইয়া দেও।"

হৃদয়ের মধ্যে বিরুদ্ধভাবগুলির যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল প্রাণপণ শক্তিতে তাহা চাপিয়া রাখিয়া রহিম চীৎকার করিয়া উঠিল "খোদা নাই, খোদা মিথ্যা কথা—আছে কেবল শয়তান; সে নির্দ্দোষীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহে ব্যস্ত।" সকলে জিভ কাটিয়া 'তোবা' 'তোবা' করিয়া খোদার উদ্দেশ্যে আভূমি নত হইয়া সেলাম করিলেন। বৃদ্ধ নাছির মণ্ডল কহিলেন—"রহিম এই কাফেরের মত কথাগুলি বলিয়া পাপের বোঝা আর বাড়াইও না।" কথাগুলি তাহার কাণে পৌছিল কিনা তাহা বুঝা গেল না। নিশ্চল স্থাণুর মত রহিম যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে প্রস্থান করিলেন।

যাইবার সময় তাহারা বলিয়া গেলেন যে, যেরূপ অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাহারা আর রহিমের কোনও ওজর আপত্তি শুনিতে রাজি নহেন। সে এখন যেমন করিয়া হউক টাকাগুলি কেন দিয়া ফেলে।

রহিম অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল—"এই খোদার সৃষ্টি, আর এরাই আবার মানুষ?" সে তখনও ভরসা ছাড়ে নাই। এখনও তাহার বিশ্বাস আছে—সকলে তাহাকে চোর মনে করে করুক; কিন্তু অন্ততঃ একজন আছে যে তাহাকে ভালবাসে, ভক্তি করে—সে মনিয়া। তাহার মনে হইল তখনই একবার তাদের বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসে। কিন্তু লজ্জা সঙ্কোচ আসিয়া পথে দাঁড়াইল। ইহার পর যাই যাই করিয়াও সে কয়েক দিন মনিয়াদের বাড়ী যাইতে পারিল না। তারপর একদিন সে সকল সংশয়, দ্বিধা, দমন করিয়া মনিয়াদের বাড়ীর উদ্দেশে

বাহির হইয়া পড়িল। পথে কত জন তাহাকে দেখিয়া নাক সিটকাইয়া, কতজন হাসিয়া বেশ একটু আমোদ করিল। বৌ ঝিরা কলসী কাঁকে জল আনিতে যাইতে যাইতে ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাহাকে দেখিল ও পরস্পর গা টিপাটিপি করিয়া ফিসফিস করিয়া কত কি বলিল—তাহা সে মোটেই লক্ষ্য করিল না।

মনিয়া তখন গোয়াল ঘর হইতে ধামায় করিয়া গোবর গুলি ফেলিয়া দিয়া সবে মাত্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রহিম পশ্চাত হইতে ডাকিল মনিয়া! মনিয়া ফিরিয়া দাড়াইল। অগ্রসর হইয়া রহিম দেখিল—পূর্ব্বে তাহাকে দেখিলে চিত্ত-চাঞ্চল্য জনিত মনিয়ার মুখের যে পরিবর্ত্তন ঘটিত তাহা আর নাই, সে একদৃষ্টে রহিমের দিকে চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টিতে না ছিল প্রাণ, না ছিল ভালবাসা—ছিল কেবল ঘৃণা ও বিরক্তি। মনিয়ার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে রহিমের মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। সংসারের প্রতি একটা অবিশ্বাসে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মনিয়াও তবে তাহাকে ঘৃণা করে! হা অদৃষ্ট!

রহিম ফিরিয়া গেল। যাইতে যাইতে পথে হোসেনের সঙ্গে দেখা হইল। হোসেন তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। শিশ দিয়া যুবক মহলে সুপরিচিত একটা গানের সুর ভাজিতে ভাজিতে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

সে দিন রাত্রে যখন চন্দ্র সুধার ধারা বর্ষণ করিতেছিল আর রহিমের হৃদয়ের গুমট অন্ধকার জমাট বাধিতেছিল সেই সময় হোসেনের সঙ্গে মনিয়ার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল রহিমের শূন্য কুটীর খাঁ খাঁ করিতেছে।

(২)

গলা টিপিয়া ভাই ভাইকে মারিয়া ফেলিতে পারে, ছলে বলে কলে কৌশলে বন্ধুকে গৃহত্যাগী করা চলে, কিন্তু মানুষের বুকের ভিতর যে একজন আছেন, তাঁহাকে টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলা চলে না। চুরির অপরাধে সকলে রহিমকে দোষী সাব্যস্ত করিল, মনিয়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইয়া হোসেনের সঙ্গে হইল। দুঃখে ক্ষোভে রহিম গৃহত্যাগী হইল। সকলই হইল—কিন্তু হোসেনের মনে সুখ হইল না। বিবেকের দংশন, মানসিক অশান্তি সর্ব্বদাই তাহাকে এতদূর ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে আর্থিক স্বচ্ছলতা, রূপসী পত্নী মনিয়া, কিছুই তাহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারিল না। এই সকল অরুন্তুদ দুঃখ ব্যথার কথা যে কাহারও নিকট বলিয়া তাহার মনের ভার একটু লাঘব করিবে তাহারও সুবিধা নাই—আর বলিবেই বা সে কি?

যে দিন মণ্ডলের অপহৃত টাকার দায়ে রহিমের পরিত্যক্ত বাড়ী জমি নিলাম হওয়ার কথা—তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে হোসেন স্বপ্ন দেখিল—বৃদ্ধ নাজির মণ্ডলের প্রেতাত্মা তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "বল টাঁকা বাহির করিয়া দিবে কি না।" চীৎকার করিয়া হোসেন শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল—তাহার চীৎকারে মনিয়া জাগিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে—এমন চীৎকার করলে যে?" ভীত হোসেন বুঝিল উহা স্বপ্ন। কিন্তু ভয়টা দূর হইল না। পত্নীর কথার উত্তরে সে কহিল "মণি, আমার সুখ শান্তি সকলই গিয়াছে। আমি তোমাকে পাইয়া একদিনের তরেও সুখী হইতে পারি নাই। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে কেবলই পুড়িয়া মরিতেছি। বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তোমার বিরাগ ভাজন হইবার ভয়েই এতদিন কিছুই বলি নাই কিন্তু আজ বড় দুঃখেই তোমাকে সকল কথা বলিতেছি।" হোসেন সকল কথা বলিল।

নিশ্চল পুত্তলিকার মত নিঃশব্দে মনিয়া সকল কথা শুনিল। কিন্তু বিস্তর চেষ্টায়ও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও কথা বলিতে পারিল না। কতক্ষণ পরে সে বলিল "যা হবার তা হইয়াছে কিন্তু এখন আমাদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কল্যই টাকা দিয়া তার জমিগুলি রক্ষা কর। অনুশোচনার মত আর প্রায়শ্চিত্ত নাই—সেই প্রায়শ্চিত্ত কর। আর যেখান হইতে হৌক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। সে উন্নত চরিত্রের লোক, নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা করিবে। আর আমিও চিরদিন তুষানলে জলিব—তাই আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

পরদিন হোসেন বন্ধুর খোজে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অদ্ভূত সামুদ্রিক জন্তু।

পৃথিবীতে যুক্তরাজ্যের এলব্রেটম্ জাহাজের মত অদ্ভুত সামুদ্রিক মৎস্য শিকার আর কোন জাহাজই করে নাই। বহু যাদুঘরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই জাহাজে সমুদ্রের অতি ভীষণ স্থান সমূহ বিচরণ করিয়াছেন। এই জাহাজের মৎস্য ধরিবার তীর নির্ম্মিত রজ্জু ৫।৬ মাইল কিম্বা ততোধিক লম্বা। ইহা অত্যন্ত মজবুত এবং ইহা একটী ক্ষুদ্র ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। ইহাতে এক একবারে প্রায় ১০০ শত মণ ওজনের সামুদ্রিক মৎস্য, কাঁকড়া, মৃত হাঙ্গরের দাঁত, মৃত তিমি মৎস্যের হাড় ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

প্রায় ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ এই জাহাজ অন্য মৎস্যজীবিদের অগম্য স্থান হইতে বৃহৎ সুরাপাত্রে রক্ষিত করিয়া নানাবিধ মৃত জীব জন্তু আনিয়া বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করিতেছে।

ইহাতে নানারূপ জাল ব্যবহৃত হয়। একরূপ জাল আছে উহা মুখ বন্ধ অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে যতদূর ইচ্ছা নামাইয়া দেওয়া যায় এবং তথায় ইচ্ছামত মুখ খুলিয়া সমুদ্রের যে কোন স্তর হইতে মৎস্য ধরিয়া জালের মুখ বন্ধ করিয়া পুনরায় উত্তোলন করা হয়।

এই এলব্রেটম্ জাহাজে যে টানা জাল আছে তাহার ওজন প্রায় ৩ মণ। ইহা ২৩ ফিট লম্বা এবং ১২ ফিট চওড়া। ইহা একটী ১২ ফিট লৌহদণ্ড দ্বারা বিস্তারিত করিয়া রাখা হয়। জলে নিমজ্জিত করিবার জন্য প্রায় ৬ মণ ওজনের লোহার কতগুলি বল জালের কাঠিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গুরুভারে জাহাজের গতির সময়ে জালটীকে সমুদ্রের তলে সমভাবে টানিয়া আনে।

সমুদ্রের ১, ২, ৩ কিম্বা ৪ মাইল নিম্নে জাল ফেলিয়া কয়েক ঘণ্টা টানার পরে উহা উপরে উঠান হয় এবং জালে উত্তোলিত পদার্থ একটা ভিন্ন জলপাত্রে ফেলিয়া কর্দ্দমাদি ধৌত করিয়া ফেলা হয়। ৩।৪ মাইল গভীর জলে অনেক অদ্ভুত জিনিস পাওয়া যায়। কখন কখন মাংস ভোজী মৃণাল ও নানা বর্ণে রঞ্জিত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট গুল্মাকৃতি বুভুক্ষু প্রাণী বিশেষ উত্তোলিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের তলদেশে এই গুল্ম বহু মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কোথাও ইহাদের রং লাল কোথাও বা হলুদে। ইহাদিগকে সমুদ্রের গভীর প্রদেশে পাওয়া যায়। ইহা হইতে কম গভীর জলে নানারূপ বিচিত্র রঙ্গের গুল্ম পাওয়া যায়। এই অদ্ভুত প্রাণী সাক্ষাৎ ভাবে কোন কাজেই আসে না। ইহারা নড়িতে পারে না, চক্ষুহীন, কাহাকেও আক্রমণ এবং অনিষ্ট করে না। ইহারা কেবল আহার করে। সমুদ্রের তলদেশে সে জান্তব পদার্থ থিতাইয়া পরে ইহারা তাহাই আহার করে। একভাবে বলিতে গেলে ইহা সমুদ্রের তলদেশে মেথরের কার্য্য করিয়া থাকে। সমুদ্রের এই জীব গুল্মকে কোনও প্রাণী খাদ্যরূপেও ব্যবহার করে না। এই সুবিশাল গুল্মক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে নানারূপ বিচিত্র রঙ্গের চারা গাছ ও ঝোপ জঙ্গল দেখা যায়। ইহারাও একজাতীয় জীব। জাল দ্বারা ইহাদিগকে উপরে উঠাইলেও ইহাদের শাখা প্রশাখা হইতে একরূপ মৃদু জ্যোতিঃ বাহির হইতে থাকে এবং উহাতে এমোনিয়া সংযোগ করিলে উজ্জ্বল জ্যোতি বাহির হয়। সম্ভবতঃ স্বাভাবিক অবস্থাতেও উহারা উজ্জ্বল জ্যোতি বিকিরণ করিয়া থাকে, এবং জাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া উপরে উঠার সময়ে ভয়ে ম্লান হইয়া পরে। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহারা এই জ্যোতি বিকিরণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া নিকটে আনে এবং উহাদিগকে আহার করে। কোন প্রবল শত্রু আসিলে এই আলোর প্রভাবে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া আত্মরক্ষা করে।

ডাক্তার ক্লার্ক বলেন মৎস্যের বাহিক যদিও কোন কর্ণ নাই কিন্তু ইহাদের কর্ণ কুহর আছে এবং কোন কোন মৎস্য একরূপ শব্দ করিয়া থাকে।

কোন কোন মৎস্যের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। আবার কেহ কেহ দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার তত না করিয়া পঙ্কিল জলে কেবল স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়া চলাফেরা করিয়া থাকে।

সমুদ্রের ১ মাইল কিম্বা ততোধিক নিম্ন প্রদেশে ঘোর অন্ধকার। তথায় সূর্য্যের আলো কোনরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। ফটোগ্রাফের প্লেট তথায় সুদীর্ঘ সময় উন্মুক্ত রাখিয়াও তাহাতে কোনরূপ আলোর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই।

সমুদ্রের গভীর প্রদেশে যে সকল মৎস্য থাকে তাহারা ক্ষুদ্রাকার এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের অধিকাংশই অন্ধ। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এই গভীর চির অন্ধকার প্রদেশের সকল জীবই অন্ধ হইবার কথা। কিন্তু তাহা সত্য নহে। এখানেও চক্ষুষ্মাণ মৎস্য আছে এবং তাহারা চক্ষের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

এখন কথা এই সমুদ্রের তলদেশের অন্ধ মৎস্যগুলি কি উপায়ে জীবন ধারণ করে? প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ইহারা সমুদ্রের তলদেশের কর্দ্দম ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৩। ৪ মাইল গভীর সমুদ্রের তলদেশের মৃত্তিকাতে যথেষ্ট জান্তব পদার্থ আছে। কাজেই ঐ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইহারা সক্ষম।

এইত গেল অন্ধ মৎস্যের কথা। এখন দেখা যাক্ এই চির অন্ধকার প্রদেশে চক্ষু বিশিষ্ট মৎস্য কিরূপে তাহাদের চক্ষের কার্য্য করিয়া থাকে।

লেপ্টেনেন্ট বোড়ি এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে গ্রীষ্মকালে হিরণ্ ভেলী কিম্বা প্রিন্স এলিস্ জাহাজে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে সামুদ্রিক মৎস্য হয়ত সমুদ্রের উর্দ্ধস্তরে, যেখান পর্য্যন্ত সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে অথবা একেবারে নিম্নস্তরের ঘোর অন্ধকার প্রদেশে—অবস্থান করে। কিন্তু বোড়ি সাহেব ইহা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে সমুদ্রের এই মধ্যস্তরের সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপী স্থান কিছুতেই জীব শূন্য হইতে পারে না। তিনি ইহার পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। ইহা করা বিশেষ কিছু শক্ত নহে, কেবল মাত্র একটা টানা জাল সমুদ্রের নিম্নে মাইল দুই নামাইয়া টানিলেই হইল। একদা সন্ধ্যা সময়ে জাহাজে এক ভোজ হয়। যখন সকলে সেই ভোজের আমোদে ব্যস্ত, তখন লেঃ বোড়ি অধ্যক্ষকে না জানাইয়া মধ্য সমুদ্রে এক জাল নামাইয়া কয়েক ঘণ্টা টানিয়া উঠাইলেন। উহাতে সমুদ্রের নিম্নস্তরের বহু মৎস্য উত্তোলিত হইল। পূর্ব্বে যে সকল মৎস্য সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল যে উহারা সর্ব্বদাই সমুদ্রের নিম্নস্তরে থাকে সেরূপ মৎস্যও প্রচুর উত্তোলিত হইল। ইহা দেখিয়া জাহাজের সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উহাতে এরূপ মৎস্য ছিল যেগুলি সেই দিবসেই সমুদ্রের তলদেশ হইতে প্রায় দুই মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

এলব্রেটস্ জাহাজে, অধ্যাপক এগেসিস্ প্রভৃতি সমুদ্র তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমুদ্রের তলদেশের বহু জাতীয় মৎস্য দৈনিক সমুদ্রের তল হইতে উপরে যাতায়াত করিয়া থাকে। দিবাভাগে ইহারা সমুদ্রের তলে এবং রাত্রিতে উপরে উঠিয়া থাকে। আহার সংগ্রহ করাই এই যাতায়াতের উদ্দেশ্য। রাত্রিতে উপরে উঠা ইহাদের পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। কারণ উপরের বৃহৎ মৎস্য সকল রাত্রিতে চক্ষে দেখিতে পায় না। কাজেই নিম্নস্তরের ক্ষুদ্র মৎস্য সমূহ সমুদ্রের উপরিভাগের ভাসমান মৎস্য ডিম্ব ইত্যাদি নির্ভয়ে আহার করিয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না পারিলে উপরের বৃহৎ মৎস্যগণ আবার ইহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। সমুদ্রের নিম্নস্তরের এই ভ্রমণকারী মৎস্যগুলির দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। ইহারা ঘোর তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে বাস করে বলিয়া সমুদ্রের উর্দ্ধস্তরে আসিয়া চন্দ্র কিম্বা নক্ষত্রের ক্ষীণ আলো যাহা জলের ভিতর দিয়া প্রবেশ করে তাহাতেই পরিষ্কার দেখিতে পায়।

রাত্রিচর মৎস্যের মধ্যে এক জাতীয় মৎস্য আছে যাহাদিগকে লণ্ঠন মৎস্য বলে। ইহাদের সমস্ত শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরূপ বৈদ্যুতিক আলোর বিন্দু আছে। ইহাদের দুই পার্শ্বে উজ্জ্বল আলোকমালা কখন ক্ষীণ, কখনও বা প্রবল আলো বিকীরণ করিতেছে। ইহাদের নাসিকার অগ্রভাগে Search light এর মত একটা তীব্র আলো থাকে। দেখিলে মনে হয় যেন একটা ক্ষুদ্র ডুবরি জাহাজ চলিয়াছে। সমুদ্রের নিম্নস্তরে কোন প্রবল শত্রুর সম্মুখে পরিলে হঠাৎ আলো বিকীরণ করিয়া শত্রুকে ভয় প্রদর্শন করে এবং আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। রাত্রিতে সমুদ্রের উর্দ্ধস্তরে এই আলোকের সাহায্যে অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া ভক্ষণ করে।

অপর এক প্রকার মৎস্য আছে যাহাদের পৃষ্ঠের উপরে বড়শির ছিপের মত একটা দণ্ড আছে এবং তাহার অগ্রভাগে পতাকার মত একটা উজ্জ্বল পদার্থ ঝুলিতে থাকে। এই জাতীয় মৎস্যের মুখগহ্বর অত্যন্ত বিস্তৃত এবং

দেহটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা কর্দ্দমের মধ্যে দেহটী প্রোথিত করিয়া বিশাল মুখগহ্বর ব্যাদন করিয়া থাকে এবং ঐ উজ্জ্বল পদার্থটী মুখের সম্মুখে ধরিয়া শিকারের প্রত্যাশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আলোতে প্রলুব্ধ হইয়া শিকার মুখের সম্মুখে আসিলে ভক্ষণ করে। এই জাতীয় মৎস্য সমুদ্রের তিন মাইল কিম্বা ততোধিক গভীর প্রদেশে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকারের মৎস্য আছে, যাহাদের দন্তপাটির নির্ম্মাণ বড়ই আশ্চর্য্য জনক। উহাতে কব্জার মত বন্দোবস্ত আছে। উহারা মুখ ব্যাদন করিলে দন্তপাটি সরিয়া মাড়ির সঙ্গে যাইয়া লাগিয়া থাকে এবং মুখের ভিতরে তালুর নিকটে একটী স্থান উজ্জ্বল জোনাকির মত জ্বলিতে থাকে। ঐ আলোর প্রলোভনে কোন প্রাণী মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে দন্তপাটি কব্জার মত ফিরিয়া আসিয়া উহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ বন্ধ করিয়া দেয়: এইরূপে ইহাদের আহার সংগ্রহ হইয়া থাকে।

সমুদ্রের মধ্যে নানারূপ উজ্জ্বল পোকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা কেহবা সমুদ্রজলে চলাফেরা করে, কেহবা পাহাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করে, কেহবা অপর কোন মৃতের কঙ্কালের ভিতরে অবস্থান করে। ইহাদের এক জাতীয় পোকা লম্বায় প্রায় ১৫ ফিট, প্রস্থ ২ আঙ্গুল এবং ১ আঙ্গুল স্থূল হইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত ভগ্নপ্রবণ এবং সামান্য আঘাত মাত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। তখন ইহাদের এক একটী খণ্ডে এক একটী নূতন পোকার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

জালের প্রতি উত্তোলনে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশ হইতে অনেক আশ্চর্য্যজনক প্রাণী উত্থিত হইয়া থাকে। একরূপ সর্প জাতীয় মৎস্য আছে দেখিতে অত্যন্ত কদাকার অধিকন্তু উহাদের দন্ত দুইটী বরাহ দন্তের মত বাহির হইয়া থাকে। ইহা যে কিরূপ বীভৎস দৃশ্য তাহা কল্পনাকরা সহজ।

পেলিকান নামে একরূপ মৎস্য আছে। তাহারা তাহাদের দেহ হইতে অনেক বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আহার করে। ইহা বস্তুতঃই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বোধ হয় ক্রমে ক্রমে হজম করে বলিয়াই এইরূপ আহার করা সম্ভব হয়।

কখন কখন একরূপ মৃত ফিতা মৎস্য পাওয়া যায়। উহারা লম্বায় ২০ ফিট, চওড়া ১ ফুট এবং ১ ইঞ্চি মাত্র স্থূল।

সময়ে সময়ে জলে এক প্রকার লাল জেলি মৎস্য পাওয়া যায়। উহাদিগকে স্পর্শ করা মাত্র উহারা একরূপ বিষাক্ত স্রাব নিক্ষেপ করে।

নদী কিম্বা পুকুরে আমরা যেরূপ অনায়াসে জাল হইতে কর্দ্দম, লতা, গুল্ম ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিয়া থাকি সমুদ্রে ইহা তত সহজ নহে। হয়ত জলে একরূপ ক্ষুদ্র লাল চিংড়ি কিম্বা কাল বাইম জাতীয় মৎস্য ও কিছু গুল্ম উঠিয়াছে—ইহা ধরিলেও বিপদ হইতে পারে। কারণ ইহাদের গাত্রে যে শেওলা আছে তাহাতে হয় ত একরূপ বিষাক্ত জেলী মৎস্যের নিসৃত স্রাব তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় বিষাক্ত জেলী মৎস্যের স্রাবে বহু সুদক্ষ সন্তরণকারীর জীবনান্ত হইয়াছে। এই জেলী মৎস্যকে পর্ত্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজ বলে। ইহাদের ৫।৬ হস্ত লম্বা বাহু কিম্বা দলে মানুষের অঙ্গ স্পর্শ করিলে শরীর অবশ ও অসার হইয়া পরে।

সমুদ্রে প্রায় ৩ ইঞ্চি বড় একরূপ কাঁকড়া জাতীয় বিষাক্ত জন্তু আছে। ইহাদিগকে সহজে চক্ষে দেখা যায় না কারণ ইহারা স্বচ্ছ। যে চিনামাটির কলাইকরা পাত্রে জালে উত্তোলিত মৎস্যাদি রাখিয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে এই অদৃশ্য মৎস্যের অস্তিত্ব স্থির করা ভার। কেবল ইহাদের সংলগ্ন অপর মৎস্যের যন্ত্রণা ব্যঞ্জক আলোড়নে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া নিতে হয়। চিমটা দ্বারা ধরিয়া উপরে উঠাইলে ইহাদিগকে কাঁচ নির্ম্মিত কাঁকড়া বলিয়া মনে হইবে। মারিয়া ফেলিলে ইহাদের রং সাদা হইয়া যায়। এলব্রেটম্ জাহাজ জাপান সমুদ্রে এই জাতীয় মৎস্য যথেষ্ট পাইয়াছিল।

ডাক্তার ক্লার্ক বলিয়াছেন যে, কোন কোন মৎস্য যে স্থানে বাস করে প্রয়োজন হইলে শরীরের রং সেই স্থানের অনুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং এই উপায়ের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। কোন কোন মৎস্য দেখিতে বিচিত্র রামধনুর মত; দেখিলে সহজেই অপর মৎস্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অথচ তাহারা নির্ভয়ে চলাফেরা করে। কারণ

তাহাদের বিশ্বাস আছে যে দ্রুত গতিতে অপর কেহ তাহাদের সহিত পারিবে না। কাজেই আত্মরক্ষা করার কোন চিন্তা নাই। এইরূপে ভগবান জীবকে আত্মরক্ষার নানা পন্থাই করিয়া দিয়াছেন।

সামুদ্রিক সর্প সম্বন্ধে চিরকাল নানরূপ মতবাদ চলিতেছে। ১৮৫২ সনে ভারতগামী মাল জাহাজের কাপ্তান ষ্টিল সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন তাহার জাহাজ আফ্রিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে উপস্থিত হয় তখন তাহারা একদিন জাহাজের সম্মুখে একটী বিশাল সর্প দেখিতে পান। উহার মস্তক প্রায় ২০ ফিট ভাসমান ছিল। উহা চলিবার সময়ে প্রায় ৫০। ৬০ ফিট জল আংশিক আলোড়িত হইয়াছিল। সেই সময়ে উহার উপরে শত শত পাখী উড়িতে দেখিয়া নাবিকগণ উহাকে একটী মৃত তিমি মৎস্য মনে করিয়াছিল। কিন্তু জাহাজ যখন উহার ২০০ হস্ত নিকটে আসে তখন উহা ডুবিয়া যায়। এখন কথা এই—কোন জীবিত প্রাণীর নিকটে ঐরূপ পাখী উড়িবার কারণ কি? কেহ কেহ মনে করেন উহা কেবল কতকগুলি সামুদ্রিক সেওলা ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাতে কোনরূপ সামুদ্রিক বস্তু ছিল যাহা মৎস্য ও পাখী উভয়েই ভক্ষণ করিয়া থাকে। সে জন্য উপরে যেরূপ পাখিগণ উহার মধ্যে খাদ্য অন্বেষণ করিতেছিল সেইরূপ সামুদ্রিক মৎস্যও উহাতে প্রবেশ করিয়া আহার খুঁজিতেছিল। জাহাজ নিকটে আসা মাত্র মাছগুলি ভয় পাইয়া ডুবিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে সেওলার চাপটীও ডুবিয়া যায়। নাবিকগণের শেওলার চাপটীকে সর্প বলিয়া দৃষ্টি ভ্রম হইয়াছিল মাত্র।

পুরাতন নাবিকদিগের এইরূপ বহুবিধ সামুদ্রিক সর্প দর্শনের আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাহার বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহারা নানারূপ ভ্রম প্রমাদ গ্রস্থও হইয়াছেন।

ডাক্তার ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তিনি সামুদ্রিক সর্প সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে পারেন কি না। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে যখন দুইটী স্ত্রী ও পুরুষ হাঙ্গর এক সমসূত্রে সমুদ্রের উপরে চলিতে চলিতে রৌদ্র পোহাইতে থাকে, তখন তাহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০। ৫০ ফিট হয় এবং সে সময়ে উহাদিগকে বিশাল সামুদ্রিক সর্প বলিয়া ভ্রম হয়।

এলব্রেটস্ জাহাজ গভীর সমুদ্র জলের বহু মাপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার আর এক কার্য্য ছিল সমুদ্রজলের বিভিন্ন প্রদেশের লবণাক্ত পদার্থ নির্ণয় করা ও গভীরতা নির্ণয় করা। এই স্থলে তৎ সম্বন্ধে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কেহ কেহ গণনা ক'রয়া স্থির করিয়াছেন যে যদি সমুদ্রের লবণ উঠাইয়া শুষ্ক করিয়া যুক্তরাজ্যে ছড়াইয়া দেওয়া যায় ত'হা হইলে উহার উচ্চতা দেড় মাইল অপেক্ষা অধিক হইবে।

গ্রেটব্রিটেন এবং আইরলণ্ড, মহাপ্রদেশের এরূপ একটী স্তরে অবস্থিত যে আইরলণ্ডের পশ্চিমে ঐ স্তরটী এরূপ বিস্তৃত যে উহাতে অপর একটী আইরলণ্ডের স্থান হয় এবং তাহার পরেই গভীর আ্টলাণ্টিক মহাসাগরের ১০৫০০ ফিট গভীর প্রদেশ বর্ত্তমান।

এই গ্রেটব্রিটেন যে কিরূপ অগভীর স্তরে অবস্থিত তাহা বুঝাইবার জন্য কেহ কেহ এইরূপ দেখাইয়াছেন—মনে কর যদি আমরা সেণ্টপল গির্জ্জা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণদিকে কিম্বা ডোভার প্রণালীতে দাঁড় করাইয়া দেই তাহা হইলে গির্জ্জার অর্দ্ধেকের বেশী অংশ জলের উপর দৃষ্টিগোচর হইবে। কারণ ঐ গির্জ্জার উচ্চতা ৪০৪ ফিট এবং ঐ স্থানের সমুদ্রের গভীরতা মাত্র ১৮০ ফিট। উত্তর মহাসাগরের গভীরতা গড়ে ২৮৮ ফিট। উত্তরদিকে ইহার গভীরতা অত্যন্ত অধিক। আইরিস্ সাগরের গভীরতম প্রদেশের গভীরতা প্রায় ৩০০ ফিট। প্লাইমাউথের দক্ষিণে ইংলিশ প্রণালীর গভীরতা ২৬৪ ফিট। যে স্থানে জগৎ বিখ্যাত লুসিটেনিয়া জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল সেই স্থানের গভীরতা ৩০০ ফিট। যদি জাহাজটী দাঁড় হইয়া ডুবিত, তাহা হইলে জাহাজের প্রায় ⅝ অংশ জলের উপর ভাসমান থাকিত। কারণ এই বিশাল জাহাজটি প্রায় ৮০০ ফিট লম্বা ছিল।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

ভারতী ঠাকুর।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর পরগণার সামন্তসার নামক গ্রামে পরমারাধ্য স্বামী শ্রীরামানন্দ ভারতী ওরফে রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় বাস করিতেন এবং তদানীন্তন বিদ্বৎ সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। ফরিদপুর জেলায় একটি প্রবাদ আছে যে—ঠাকুর দাদার করা বাগান, বাপের করা পুষ্করিণী এবং নিজের করা বাড়ী ভাল। ইঁহার ঠাকুরদাদা একটি বাগান করাইয়াছিলেন, কিন্তু পৌত্রের জন্ম পত্রিকা দেখিয়া ঐ বাগানের সব গাছ কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। ঠাকুর দাদা মহাশয় বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার পৌত্র সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিবেন।

বার বৎসর বয়সে রামানন্দ কলিকাতায় আইসেন। ঐ বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নি বিধবা হওয়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকেও কলিকাতা আনাইয়া স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিলেন এবং বালক রামকুমারকে টোলে পড়াইতে লাগিলেন। মেধাবী রামকুমার টোলের পাঠ শেষ করিয়া বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করিলেন, এবং তৎপর কিছু দিন কলিকাতার সন্নিকট Weslyan Mission স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করেন। ঐ স্কুলে আনন্দসিংহ নামক একজন পণ্ডিত খ্রীষ্টান হেডমাষ্টার ছিলেন। হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত এই দুইজনে সর্ব্বদাই হিন্দুধর্ম্ম লইয়া তর্ক করিতেন। এ তর্কের পরিণাম এই হইল যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মন হইতে জাতি ভেদ সংস্কার চলিয়া গেল, এবং তৎসঙ্গে আরও কতকগুলি হিন্দু সংস্কারও অন্তর্ধান করিল। এ দিকে আনন্দসিংহের মনের খ্রীষ্টানী ভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন—আর আনন্দসিংহ হিন্দু পন্থায় সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। দুই জনেরই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন—কেহ কাহারও দিকে গেলেন না। কিন্তু উভয়ের ভাব মিশ্রণে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ছেলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন মহাশয়কে নিজের কাছে রাখেন। ইহার পূর্ব্বেই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার প্রথমা পত্নী বিবাহের অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করেন। তৎপর তিনি খ্যাত নামা সিদ্ধাবধূত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ অচলানন্দ স্বামীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করার কিছুকাল অন্তে তিনি একদিন পৈতৃক গৃহে গিয়া তাঁহার পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমার সহিত আসিতে পার।" সাধ্বী বালিকা হইলেও তৎক্ষণাৎ পতির অনুগামিনী হইলেন।

যখন কেশব বাবু কোচবিহারের মহারাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনেক লোক কেশব বাবুর দল ছাড়িয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সমাজে যে কয়েক জন ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হন তন্মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী এবং শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, ছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নির্ব্বাচনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গে এবং আসাম প্রদেশে তাঁহাকে প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রচার কার্য্যে তাঁহার একনিষ্ঠা স্বার্থত্যাগ ও অসীম ক্লেশ স্বীকার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে উজ্জ্বলাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু চিরদিন আধ্যাত্মিকতার সহিত মানব হিতৈষণা সংযুক্ত হইয়া তাঁহার জীবনের এক অপূর্ব্ব শোভা সাধন করিয়াছিল। যখন আসামে ছিলেন তখন চা বাগানের কুলিদের প্রতি পশু প্রকৃতি চা বাগানের সাহেব প্রভুদের ও বাবুদের অত্যাচার কাহিনীতে তাঁহার কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। এই সকল বিষয় ভাল করিয়া জানিবার জন্য তিনি দিনে জঙ্গলের ভিতর ঝোপে লুকাইয়া থাকিয়া স্বচক্ষে সমস্ত অত্যাচার দেখিতে লাগিলেন, ও রাত্রিতে অন্ধকার হইলে কুলিদের কুটিরে কুটিরে বেড়াইয়া তাহাদের নিকট নির্য্যাতনের বিবরণ শুনিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ের "সঞ্জীবনী" ও "রেইস্‌ এণ্ড রেইয়ৎ" সংবাদ পত্রে লিখিতে লাগিলেন।

নির্য্যাতিত কুলীরা যাহাতে পলায়ন করিয়া অত্যাচারীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তিনি তাহারও উপায় করিয়া দিতে লাগিলেন। ঐ প্রদেশে একটী কয়লার খনি ছিল। সেখানেও সাহেব, বাঙ্গালী ডাক্তার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে খনির কুলীরা নিষ্পেষিত হইত। বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ দুই সংবাদপত্রে তাহাদের অত্যাচারের কথাও লিখিতে লাগিলেন। তখন সদাশয় লর্ড রিপণ ভারতের বড়লাট। ক্রমে এই সকল ব্যাপার লর্ড রিপণের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি আসামের চিফ কমিশনার সাহেবকে উহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হুকুম দিলেন এবং অসত্য হইলে সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে শাস্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় চা বাগানের সাহেবরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত,—সর্ব্বদাই তাঁহাকে জব্দ ও নির্য্যাতন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল,—এমন কি তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কাও ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে সাবধানে থাকিতে হইত। তদুপরি ঐ সরকারী হুকুম আসায় তাদের জুয়াচুরী হিসাবের কাগজপত্রও তাঁহাকে কোন ও উপায়ে সংগ্রহ করিয়া কমিশনার সাহেবকে দিতে হয়। প্রচুর ক্ষমতাশালী সাহেবদিগের সহিত একজন দরিদ্র নিঃসহায় বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারকের এই যুদ্ধ কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ ও আশঙ্কাজনক হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক কমিশনর সাহেবের অনুসন্ধানে সব সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হওয়ায় দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ কাজ হইতে বিতাড়িত হইল এবং কুলীদিগের প্রতি অত্যাচার কমিয়া গেল।

এক সময়ে একটী অত্যাচার পীড়িত পঞ্জাবী পরিবারকে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নৌকা করিয়া সন্ধ্যাবেলা তাহাদিগকে রওয়ানা করিয়া দিলেন, এবং নিজে দ্রুতবেগে গৌহাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নদীতে বান দেখিয়া নৌকা না থাকায় সাঁতার দিয়া অনেক কষ্টে অপরপারে এক বনের মধ্যে উঠিলেন। পথ না জানায় ডাক-রাণারদের সঙ্গে দৌড়িয়া গৌহাটী পৌছেন। পথে তিনজন ডাক রাণার বদলি হয়। কিন্তু তিনি একাকী তিন জনের সহিত সমানভাবে দৌড়িয়া গৌহাটী পৌছেন, এবং সেই দিনই তথায় এক সভায় বক্তৃতা করেন।

কুলীদিগের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি "কুলী-কাহিনী" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ কুলী-জীবনের একটী সজীব চিত্র। এই হিসাবে এবং ইহা দ্বারা সমাজের যে কল্যাণ সাধিত হয় তাহা বিবেচনা করিলে ইহাকে বাঙ্গালার "Uncle Tom's Cabin" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা Howard Wilber Forceএর কথায় মুগ্ধ হইয়া যাই, কিন্তু আমাদের একজন স্বজাতীয় মহাত্মা কুলীদিগের জন্য, আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা কি আমরা ভুলিয়া যাইব?

বীরভূম দুর্ভিক্ষের সময় ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আদেশ করেন যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে উত্তর বঙ্গে যাইতে হইবে। ঐ দিন সন্ধ্যায় Wellington Squareএ বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার কাণে গেল কে যেন বলিয়া গেল,—"তোমার ঘরের কাছে এত অন্নকষ্ট ও হাহাকার,—ইহার কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া তুমি কোথায় যাও?" তিনি সেই দিনই ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর নিকট আবেদন করিলেন,—"আমাকে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের কার্য্যে নিযুক্ত করুন, এবং কমিটীর যদি সেরূপ অভিপ্রায় না হয়, তাহা হইলে আমাকে ছয় মাসের ছুটী দেওয়া হউক।" কমিটী মন্তব্য করিলেন যে আধ্যাত্মিক অভাব হইতে দৈহিক অভাবের দিকে ইঁহার দৃষ্টি বেশী। এবং তাঁহাকে দুর্ভিক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটী দিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের পত্নীর নিকট দুর্ভিক্ষ চাঁদা ১০৲ টাকা মাত্র সাহায্য পাইয়া বীরভূম যাত্রা করিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য সৈদপুর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য লইয়া সেই সামান্য আয়ে সংসার চালাইতে লাগিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সমস্ত দিন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন, এবং সন্ধ্যার ট্রেণে আজিমগঞ্জ গিয়া সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া প্রাতে ফিরিয়া আসিতেন। পরে বুধসিংহ নামক এক ধনী মহাজনের সাহায্যে দুইশত লোক খাইতে পারে এমন একটী অন্নসত্র খুলিলেন এবং ধনপৎ লক্ষ্মীপৎ সিংহ রাও আর একটী ঐরূপ অন্নসত্র করিয়া দিলেন। ক্রমে বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট (Mr, W. Fediam) সাহেবের কৃপাদৃষ্টি

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কার্য্যের উপর পতিত হইল। এবং তিনিও বিদ্যারত্ন মহাশয়কে খুব সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সময় সময় সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু এমন অভাব হইত যে নলহাটি হইতে আজিমগঞ্জ যাইবার পাথের পর্য্যন্ত তাঁহার জুটিত না। একদিন ঐরূপ অবস্থায় তিনি বসিয়া ভাবিতেছেন—আগামী কল্য কি করিয়া চলিবে, এমন সময় একজন পিয়ন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর নলহাটি ষ্টেশনে তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে চাহেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ট্রেণে নলহাটি পৌছিয়া নবাব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবা মাত্র নবাব প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার অর্থের সংস্থান কেমন?" বিদ্যারত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন,—"অবস্থা কি বলিব, কাল কি করিয়া অন্নসত্র চলিবে তাহা জানি না।" নবাব বাহাদুর বলিলেন "এখন সঙ্গে বেশী টাকা নাই, এই ৩০০৲ শত টাকা লউন, পরে আমি আরও সাহায্য করিব।" নবাব বাহাদুর তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া ও উৎসাহিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপস্থিত হয়, এবং কলিকাতা হইতে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা ব্রাহ্ম তদুপলক্ষে রামপুর হাটে আইসেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে না গিয়া দুর্ভিক্ষের কার্য্যে আসাতে অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার প্রতি এতদূর বিরূপ হন যে আনন্দমোহন বাবু ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই। উৎসবান্তে তিনি আনন্দ বাবুকে বন্ধুস্বরূপ একবার তাঁহার দুর্ভিক্ষের কার্য্য কিরূপ চলিতেছে দেখিতে বলেন। তদনুযায়ী আনন্দ বাবু সমস্ত কার্য্য দেখিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে ভবিষ্যতে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে সাহায্য করেন, তজ্জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিবেন। ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সমাজ-সমিতি এবং অপর সাধারণ সকলে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে এক গাছের তলায় বসিয়া হিসাবের কাগজপত্র দেখিতেছেন এমন সময় তাঁহার ভাবী গুরুদেব দ্বিতীয় বার (প্রথম বার বোধ হয় আসামে সাক্ষৎ হয়) তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন,—"আমি তোমার কর্য্যে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং ইহা যাহাতে সুচারুরূপে চলে তাহার চেষ্টা করিয়া যাও।"

এইরূপ নিষ্কাম মানব-হিত-ব্রত তাঁহার জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমি তাহার জীবনের সকল কার্য্যের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এবং তজ্জন্য দুঃখিত। যদি কেহ এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারেন, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

তাঁহার প্রচারক জীবন অধিকাংশ সুদূর আসাম প্রদেশে ও উত্তরবঙ্গে অতিবাহিত হইয়াছিল। এজন্য আসামের চিরমনোহর পার্ব্বত্য শোভা তাঁহার ভগবৎ সাধনার বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল. এবং তাহার স্বাভাবিক, উদাসীন ভাবকে বৈরাগ্যের দিকে এবং তাঁহার আরাধ্য চির সুন্দরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিতেছিল। তিনি সেই সময় হইতেই গৈরিকধারী উদাসীন সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার আসামবাসের একটি ফল, যাহা তিনি সমাজকে উপহার দিয়াছেন, তাহা তাঁহার "সত্যশ্রবা উদাসীন প্রণীত আসাম ভ্রমণ"। ইহার পুর্ব্বে এরূপ ধরণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য ইহা খুবই আদৃত হইয়াছিল।

এই সময়ে একদিন তিনি সমাজের কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে তাঁহার সাধ্বী পত্নী কোন দুর্ঘটনার সূচনা আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহাতে কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আর পত্নীকে পাইলেন না, সাধ্বী অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার চিত্তে একদিকে তীব্র বৈরাগ্যের অন্যদিকে একটী প্রশ্নের উদয় হইল। তাঁহার স্ত্রী ভাবী ঘটনার পুর্ব্বাভাস কি করিয়া পাইলেন? এই অবস্থায় তাঁহার গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং কাশী ও প্রয়াগ হইয়া শেষে আদেশ-নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গুরু সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। তাঁহাকে এই অযাচিত গুরুকৃপা-কথা সাশ্রুনেত্রে বর্ণন

করিতে শুনিয়াছি। তথায় তিনি পুনরায় উপবীত গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া বিধিমত সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত হইলেন। বলা বাহুল্য এক সময়ে যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম তিনি জীবনের রক্তপাত করিয়াছিলেন, নব সত্যের আলোকে আর তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি শ্রীমৎস্বামী রামানন্দ ভারতী নামে পরিচিত হইলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামীজী নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। তবে উত্তরাখণ্ড ও হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশেই তিনি অধিক সময় যাপন করিতেন।

শেষ জীবনে তিনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতের কৈলাস ও মানসসরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত ও কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ "সাহিত্য" পত্রিকার "হিমারণ্য" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ-মালায় বিবৃত হইয়াছে। এক সময়ে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত জলধর সেন স্বামিজীর সহিত হিমালয়ের কতক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জলধর বাবু এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার হিমালয় নামক উপাদেয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে স্বামিজীর মহান চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

হিমালয় হইতে পুরী পর্য্যন্ত নানাস্থানে স্বামিজীর শিষ্য ও কৃপাপাত্র সকল বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্ম বা অতিমাত্রায় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন তাঁহাদেরও অনেকে আছেন, আবার টোলের উপাধিধারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন। আমরা দেখিয়াছি ৺কাশীধামের সন্ন্যাসী, সাধু, সাধক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, এবং এরূপ বহুলোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন। তিনি নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া হিন্দুসমাজকে পুনরায় সেই ঋষি প্রদর্শিত পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। একদিকে পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন, অন্যদিকে স্বামিজীর জীবনের পরিবর্ত্তন ব্যাপারে হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় সমাজের যেন চোখের ধাঁধাঁ ঘুচিতে লাগিল। টোলের একজন ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পৈতা ছিঁড়িয়া ঘোরতর ব্রাহ্ম হইলেন, আবার কি বুঝিয়া শেষে হিন্দুমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেব দেবীতে ভক্তি ও সমাজ রক্ষার বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন! অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মে সারবান পদার্থ আছে—দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার পক্ষে ইঁহার জীবন কম কার্য্যকরী হয় নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়া তিনি 'চিরযাত্রী', 'অলর্কচরিত', 'যাজ্ঞবল্ক্য চরিত', 'চারু দত্তের গুপ্তধন আবিষ্কার', সাধনতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ ব্রাহ্ম থাকা কালীন রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সব গ্রন্থই উদাসীন প্রণীত। তাঁহার এই সকল গভীর আধ্যাত্মিক ভাবমূলক গ্রন্থ পড়িয়া অনেকেই উপকৃত হইয়াছেন, কিন্তু এই উদাসীন কে? তাহা অল্প লোকেই জানেন। নিজের কথা বলা যদি মার্জ্জনীয় হয়, তবে বলিতে পারি আমিও এই উদাসীনকে চিনিতাম না, কিন্তু যখন আমি বালক মাত্র, তখন তাঁহার 'চিরযাত্রী'-গ্রন্থখানি পড়িয়া উহাকে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে মহোপদেশকের স্থান দান করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার Pilgrim's Progress, কিন্তু 'চিরযাত্রী'র চাল-চল, বেশ-ভূষা, আশা আকাঙ্খা সমস্তই আমাদের স্বজাতীয়, সুতরাং তাহার সহিত চলিতে কোন ভয় নাই।

সন্ন্যাস জীবনেও তিনি পূর্ব্বোক্ত 'হিমারণ্য' ব্যতীত 'শঙ্কর চরিত' ও ব্রাহ্মাবস্থায় লিখিত 'কবিরে'র পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ লিখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ অদ্যাপি ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

১৩০৮ সালের পৌষ মাসে তিনি ৺কাশীধামে দেহ রক্ষা করেন, এবং তাঁহার দেহ সাধুভক্তগণ দ্বারা পূজিত হইয়া কীর্ত্তন সমারোহের সহিত মণিকর্ণিকার গঙ্গায় সমাহিত হয়।

তদানীন্তন 'বসুমতী' পত্রের সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত জলধর সেন মহাশয় স্বামিজীর দেহাত্যয়ের সংবাদে লিখিয়াছিলেন—

"প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক রামানন্দ ভারতী মহাশয় গত ১লা পৌষ বারাণসীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ভারতী মহাশয়ের শেষ জীবন তীর্থ পর্য্যটন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যৌবনকালে ইনি ব্রাহ্ম প্রচারব্রত লইয়া দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। আসামের কুলিদিগের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য এক সময়ে ইনি অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে সুদূর হিমালয়ের গিরি গুহায় বসিয়া এক এক

দিন আসামের কুলিদিগের দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইত। অল্পদিন হইতে সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় ইহার লিখিত 'হিমারণ্য' নামক প্রসিদ্ধ তথ্যপূর্ণ তিব্বত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নই এই রামানন্দ ভারতী, "উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ" লেখকই ভারতী রামানন্দ,—আর এখন বলিতে বাধা নাই, —আমাদের 'হিমালয়' নামক ভ্রমণ পুস্তকের স্বামীজীই রামানন্দ ভারতী। তাঁহার জীবনের অনেক কথা আমরা জানি, শিশুর সরলতা, যুবকের উৎসাহ, বৃদ্ধের অভিজ্ঞতায় তাহা অলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার সহিত হিমালয়ের অনন্ত তুষার রাশীর মধ্যে আমাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনের দীর্ঘ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই উদার ধর্ম্মভাব, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য, সমাচ্ছন্ন মানব-হিত-ব্রত ভুলিবার নহে। ভগবান তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, তাঁহার পবিত্র আত্মা অনন্ত শান্তি লাভ করুক।"

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

নিঃস্বার্থ দান।

ছায়া সম্বোধিয়া হাসি কহিল পথিক,
"পরের পশ্চাতে ফির,—ধিক্ তব ধিক্।
আপনার স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই
পরের অধীন থাকা—মরণ বালাই।"
"হাসি পায় কথা শুনে, 'নিমক হারাম',
মোরে পেয়ে লভ নিত্য কত না আরাম!
রৌদ্রক্লান্ত কলেবর যখন তোমার,
তখন কি নাহি কর সন্ধান আমার!
পরের পশ্চাতে ফিরি নিঃস্বার্থ হইয়া—
আপনার স্বাধীনতা দেই বিলাইয়া।"

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ সমালোচনা।

দেবগণের অভিনব ভারত দর্শন।

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী, কলিকাতা—দেশের সমাজিক ও অধ্যাত্মিক অধঃপতন দর্শনে ব্যথিত হইয়া সমাজের মঙ্গল কামনায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার দেবগণে মুখে লোক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই প্রাচীন পন্থা আধুনিক রুচি বাগীশ দিগের মনোরঞ্জন করিবে কিনা জানিনা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য ও সমাজে যাহা সচল ছিল, আজ তাহা বাধ্য হইয়া অনেকস্থলে অচল হইয়া পড়িয়াছে। দেশের অবস্থার সহিত সমাজিক রীতিনীতি ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে লেখককে অনেকটা সাহসিকতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাঁহার লেখায় আন্তরিকতা দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থের যে বিলুপ্ত ঋষি মাহাত্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কামনায় এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে তাহা সার্থক হউক ইহাই আমরা কামনা করি। ভাষা মার্জ্জিত।—মাধবাচার্য্য।

ময়মনসিংহ লিপিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতৃগণ।

স্যার চার্লস মেটকাফ্।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক।　　　　লর্ড অক্ল্যাণ্ড।

লর্ড মেকলে।

(বাঙ্গালা "সাময়িক সাহিত্য" হইতে গৃহীত।)

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

পঞ্চমবর্ষ। | ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩২৪ সন। | নবম সংখ্যা।

আলোচনা ও মন্তব্য।

আমাদের আলাপ—আলাপ করার মধ্যেও যে একটা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আমরা সব সময় মনে রাখি কি না সন্দেহ। ইউরোপের অন্য সাহিত্যে যাহাই হউক না কেন, ইংরেজী সাহিত্যের আসরে এক সময় যে আলাপ করার শক্তিকে খুব বড় মনে করা হইত, এমন কি, মৌলিক সাহিত্য গ্রন্থ লিখার চেয়ে ইহাকে যে কোন মতেই কম মনে করা হইত না, তাহা সকলেই জানেন। বেকন (Bacon) বলিয়াছিলেন যে, লেখা যেমন শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ, দুই চার জন একত্র হইলে ভদ্রলোকের মত কথা বলিতে পারাও তার একটা অঙ্গ। শুধু তাই নয়, অধ্যয়ন দ্বারা পণ্ডিত হওয়া যায়, লেখার অভ্যাস হইতে মনের ভাব সম্যক প্রকাশ করিতে পারা যায়, কিন্তু পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় আলাপ। —(Reading makes a wise man, writing makes an exact man, conversation makes a *perfect* man).

কোনও সাহিত্য পত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে অনেকে ইহাকে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের সামিল মনে করিবেন। কিন্তু শৈশবে আমাদের এসব শিক্ষা হয় নাই বলিয়াই যৌবনে এ কথা বিচার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, একেবারে না হওয়ার চেয়ে বরং দেরীতে হওয়াও ভাল।

আমাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, চাকুরেদের মধ্যে 'বড় সাহেবের' কথা একটা মস্ত আলোচ্য বিষয়। সাহেব কাল কি বলিয়াছিল, পরশু কি করিবে ইত্যাদি গবেষণা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, অনেকেরই আলাপ শুনিলে এমন সহসা মনে হইবে না। আর, যাঁরা যে বিভাগের চাকুরে তাঁরা সেই বিভাগের 'বড় সাহেব' ছাড়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আর কোন বস্তুর সত্তা সহজে স্বীকার করিতে চান না।

ফলে হয় এই, যে পত্নী বা পুত্র বিয়োগ বিধুর বন্ধুকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে যাইয়া বহু বিভাগের বহু ব্যক্তি যদি একত্র হন তখনও একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করিবার কোন বিষয়ই খুঁজিয়া পান না। অগত্যা বড় সাহেবের কথা লইয়াই আলোচনা সুরু করিয়া দেন। ফলে আর্ত্তের প্রাণ শীতল হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহা গুরুতর উষ্ণ হইয়া উঠে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট কিংবা কমিশনরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনিও যদি কেবলই ফৌজদারী বা বাটোয়ারা মোকদ্দমার গল্প করিতে চাইতেন তাহা হইলে না জানি আমরা কি মনে করিতাম। অথচ আমাদের আলাপে এই সকল এক ঘেয়ে কথা ছাড়া আর কিছু থাকে না কেন? ঐহিক পরমার্থ চিন্তা কি আমাদের বুদ্ধিটাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে?

অন্য এক জনের সঙ্গে কথা বলিবার সময় নিজেকে একটু চাপিয়া রাখা দরকার। তা না করিয়া আমরা নিজের অস্তিত্বটা—বিশেষ করিয়া নিজের ব্যবসায়টাকে এত বড় করিয়া তুলি যে, অনেকের নিকট তাহা অসহ্য হইয়া পড়ে। আলাপের যে একটা সার্ব্বজনীন বিষয় আছে, অন্ততঃ যাহার সঙ্গে আলাপ করা হয় তাহার বিষয়েও যে কিছু বলা যায়, এটা আমরা মোটেই স্মরণ রাখিতে চাই না;

সাহিত্যে হাসি—দূর হইতে কেহ যদি বাঙ্গালার সাহিত্য পড়িয়া বাঙ্গালীর চরিত্র বুঝিতে চায়, বিশেষতঃ যদি মাসিক সাহিত্যই তাহার একমাত্র কিংবা প্রধান অবলম্বন হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মনে করিবে, বাঙ্গালীর মত গভীর চিন্তাশীল, অমন কঠোর সত্যানুসন্ধিৎসু, অমন নির্ম্মল তত্ত্বাণ্বেষী জাতি আর দ্বিতীয় নাই। কারণ, বাঙ্গালী, সাহিত্যে হাসি ঠাট্টা কদাচিৎ ভালবাসে। তাহার সাহিত্যে হয় 'গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে' এক ভীম সেন আসিয়া প্রবেশ করিবেন এবং বড় বড় কথার ভরা একটা লম্বা বক্তৃতা করিয়া দুর্যোধনের উরুদেশে সটান এক ঘা বসাইবেন—নয়, প্রমাণের নিক্তি হাতে ঐতিহাসিকের প্রবেশ হইবে এবং তিনি কয়েকটা তাম্রলিপি ও শিলালিপি মাপিয়া ঠিক করিবেন যে বলদেব বর্ম্মার রাজ্যের পরিমাণ সাড়ে পাঁচ পরগণা ছিল এবং সমতটের অর্থাৎ কিনা সুন্দরবনের কয়েক হাত তাহার অন্তর্গত ছিল। আর তা না হয়তো যদি উপন্যাস লিখেন তবে আরম্ভ করিবেন এই বলিয়া যে 'কলনাদিনীর একটী মাত্র বালিকা পরমার বিবাহ রমেশের সঙ্গে ঠিক হইয়া গিয়াছে, বিবাহের শুভ দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময় দারুণ কলেরা মায়ের বুক শূন্য করিয়া, রমেশের জীবন অন্ধকার করিয়া পরমাকে হরণ করিল'——ইত্যাদি। শুধু অন্ধকার ও শূন্য; আলো ও হাসি তার মধ্যে মোটেই নাই! কেন? বাঙ্গালী কি হাসে না? কলম ধরিলেই আমরা এত গম্ভীর হইয়া যাই কেন?

সমাজ ও ব্যক্তি— ব্যক্তি বড় না সমাজ বড়? উত্তর দেওয়া সহজ না হইতে পারে কিন্তু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সকলেই এক একটী ব্যক্তি, কেহই সমাজ নই; এবং আমরা সকলই পাশা পাশি বাড়িতে থাকি, পরস্পর কথা বার্ত্তা বলি এবং পরস্পরের মধ্যে একটা আদান প্রদান রহিয়াছে বলিয়া যে একটা সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফল সমাজ। এখন এই আসল বস্তু আমি বড়, না আমার সমাজ বড়!

একটা কথা সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, মানুষের জীবনের ষোল আনাই সমাজে আবদ্ধ নয়; সমাজের বাহিরে ও তাহার জীবনের অনেক অংশ রহিয়াছে। ব্যক্তিত্ব সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারি যে, সামাজিক বন্ধন যখন ছিন্ন হইয়া যায় তখনও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না—ব্যক্তি তখনও জীবিত থাকে। য়ীহুদীদের সমাজ ছারখার হইয়া গেলে তাহারা যখন বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখনও তাহারা এক এক জন এক একটী ব্যক্তিই ছিল।

রাষ্ট্রের বন্ধনের চেয়ে বোধ হয় সমাজের বন্ধন দৃঢ়। সেই সমাজের বন্ধনেরই যখন এই অবস্থা, তখন রাষ্ট্রের বন্ধন সম্বন্ধে যে তাহা অধিক সত্য, ইহা বলাই অনাবশ্যক। সাম্রাজ্যের লোপ হইলেও ব্যক্তি নষ্ট হইয়া যায় না। অশোকের সাম্রাজ্য গেছে বলিয়াই অশোক যেদেশে রাজত্ব করিতেন সে দেশে আর লোক নাই, এমন নহে। সুতরাং ব্যক্তিত্বের হানি করিয়া সাম্রাজ্য সৃষ্টিধ্রুব পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুব নিষেবণের তুল্য।

মানুষে মানুষে যত সব বন্ধন আছে, তাহার মধ্যে সকলের চেয়ে স্থায়ী, সকলের চেয়ে উপকারী-পরিবার। সুতরাং ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের হানি কোনও মতেই শ্রেয়ঃ নহে। কিন্তু আমাদের নায়কেরা বাহবার জন্য যে কলেজের ছোকড়া দিগকে পিতামাতাকে অগ্রাহ্য করিয়া দেশের কাজ করিতে উপদেশ দেন, সেটা কি তাঁহারা বুঝিয়া করেন? না সেটা নীতি?

পারের যাত্রী।

আমি কেমন করে হব সাগর পার!
বোঝাই তরী বাইতে নারি আর।
কালের স্রোতে কত ঘূরণ পাকে,
কত মোহের কত ভুলের বাঁকে,
সঙ্গী সাথীর কত পিছন ডাকে,
হারিয়ে ফেলি আমায় বারে বার।

ছিন্ন পালের জীর্ণ তরী হায়!
আশায় বেঁধে ক'দিন রাখা যায়?
মেঘ করেছে আমার চিদাকাশে,
তুফান বেগে বইছে হা হুতাশে,
চৌদি ক'মোর আঁধার ঘিরে আসে,
বারণ নাহি মানে অশ্রুধার।
আমি কেমন করে হব সাগর পার?

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

কবি কঙ্ক ও তাঁহার বিদ্যাসুন্দর।

(লীলার বারমাসী অবলম্বনে লিখিত)

কঙ্কের জীবনী।

প্রেম, ভক্তি ও মাধুর্য্যের লীলা নিকেতন, নবদ্বীপ যখন ভগবানের প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের খোল করতাল ও মধুর হরিনাম ধ্বনিতে, মুখরিত হইতেছিল, যখন বিশ্বপাবন হরিবোল ধ্বনিতে দিগদিগন্ত পুতকৃত করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের বিপুল দূরতা যুক্ত করিয়া দেবতা ও মানুষের মাঝখানে একটি অপূর্ব্ব সংযোগ রেখা টানিয়া দিতেছিল—ঠিক্ সেই সময় ময়মনসিংহের জলা ভূমিতে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ অবির্ভূত হন তাহার নাম কঙ্ক। ঠিক্ কত খৃষ্টাব্দে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে, এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, ময়মনসিংহকে ধন্য করিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা সুকঠিন। কেন না, ময়মনসিংহ তাহার নিজের সাহিত্যের, ধারাবাহিক ইতিহাস, লিপিবদ্ধ করে নাই। তবে কবির নিজ কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ও প্রচলিত লীলার বারমাসী হইতে, আমরা তাঁহার যথা সম্ভব পরিচয় প্রদান করিব।

বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরই কঙ্কের প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রাচীন অন্যান্য কবিগণের ন্যায় কঙ্ক একটি ধারাবাহিক বন্দনা গীতি গাহিয়াছেন। প্রথম গণেশ বন্দনা, তারপর শিব দুর্গা প্রভৃতি অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা কিন্তু এই সকল বন্দনা গীতিতে আপাততঃ আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং সেই সুদীর্ঘ বন্দনা গীতি হইতে আমরা কবির জীবনের আবশ্যক উপাদান গুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়া দেখাইব।

বন্দনার এক স্থানে আছে,

"নদী মধ্যে বন্দি গাই রাজরাজেশ্বরী।
তিরাস লাগিলে যার পান করি বারি॥
তাহার পাড়েতে বইসে সুন্দর গেরাম।
জন্মভূমি বন্দি গাই নাম বিপ্রগ্রাম ॥"

*　　*　　*

"পিতা বন্দো গুণরাজ মাতা বসুমতী।
যার ঘরে জন্ম লইলাম আমি অল্পমতি॥
শিশুকালে মাওমৈল বাপ গেলা ছাড়ি।
পালিলা চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি॥
জ্ঞানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে।
চণ্ডালিনী মাতা মোর পালিলা সাদরে॥
গঙ্গার সমান তার পবিত্র অন্তর।
সেওত রাখিল মোর নাম কঙ্কধর॥"

*　　*　　*

গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখা আছে,

*　　*　　*

"জনম অবধি না হেরি বাপ মায়।
শিশু থুইয়া মোরে তারা স্বর্গপুরী যায়॥
মুরারী চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া।
পালিলা কৌশল্যা মাতা স্তন্য দুগ্ধ দিয়া॥

কৃতজ্ঞ কঙ্ক তাঁহার চণ্ডাল পিতার উদ্দেশে, শেষ বন্দনা গীতি গাহিয়াছেন—

"মুরারী আমার পিতা, ভক্তির ভাজন
বার বার বন্দি গাই তাঁহার চরণ।

বন্দনা গীতিতে যে রাজরাজেশ্বরী নদীর উল্লেখ আছে, তাহা বর্ত্তমান কেন্দুয়া থানার, প্রান্ত ভাগে অবস্থিত; কঙ্ক তাহাকে সুগভীরা, স্বাদুক্ষীরধারাময়ী, পরিপূর্ণা স্রোতস্বিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"বাঁশ ঝাড় দুই ধারে　　পাখীরা গাহানা করে
　　মধ্যে নদী বহে খরস্রোতে।
তৃণ কুটা নাহি তায়　　ঢেউ খেলে সর্ব্বদায়
　　পাহাড় ভাসিয়া যায় সুখে।
গ্রীষ্ম বর্ষা নাহি তায়　　সদাই পূর্ণিত কায়
　　ডালিমের রস যেন পানি।
পাড়ে অধিবাসী যারা,　　সানন্দ অন্তরে তারা
　　সুখে কাটে দিবস যামিনী।"

যে স্রোতে পাহাড় ভাসিয়া যাইত, কাল বিগুণে আজ সেই ক্ষীরধারা স্রোতস্বিনী [illegible] কুণ্ডির ন্যায়, চিহ্ন মাত্রে [illegible]। [illegible], [illegible] আছে। সে তরঙ্গ নাই, সে কল [illegible] নাই, আজ [illegible] বিস্তৃত গোচার ভূমিতে পরিণত। অধুনা [illegible] [illegible] [illegible] পড়িয়া, সেই বিপুল [illegible] নদী, [illegible]

নাম ধারণ করিয়াছে; তাহার বর্ত্তমান নাম রাজীনদী বা রজী গাং।

কঙ্কের বন্দনা গীতিতে, যে বিপ্রগ্রামের উল্লেখ দেখা যায়, অতি প্রাচীন কালে তাহাতে বহু ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বসতি ছিল, বোধ হয় এ জন্যই উহার নাম বিপ্রগ্রাম।

প্রাচীন অনেক দলিল পত্রে ঐ গ্রাম বিপ্রবর্ণ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্রবর্ণ বা বিপ্রগ্রামে বর্ত্তমানে বিপ্রগণের বাসের চিহ্নমাত্রও নাই। উক্ত গ্রামের অধিকাংশ ভূমি কৃষকের শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটীকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সঙ্গে মিশাইয়া প্রাচীন বিপ্রবর্ণের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমান কেন্দুয়া থানার সন্নিকটে, আমরা এই বিপ্রবর্ণ, ব বিপ্রগ্রামের, চিহ্ন দেখিতে পাই। গ্রন্থের আরও দুই এক স্থানে এই গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। কবি তাঁহার বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে এই গ্রামকেই স্বীয় জন্ম ভূমি বলিয়া ভক্তি-ভরে, পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিয়াছেন।

তাঁহার পিতার নাম গুণরাজ, মাতার নাম বসুমতী। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পিতা মাতা কোন্ জাতীয় ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে গ্রন্থের একস্থানে "তিনি লিখিয়াছেন—দ্বিজ কবিকঙ্ক ভনে বসুমতী সুতে"; এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অদৃষ্ট দোষে কবি অতি শৈশবেই মাতৃহীন হইয়া পরেন। "শিশুকালে মাও মৈল বাপ গেলা ছাড়ি" এই শ্লোকে যদিও বুঝাযায়, শোক দুঃখ জালা যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য গুণরাজ অনাথ শিশু পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়াছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকেই আবার দেখা যায়—

"জনম অবধি না হেরি বাপ মায়,
শিশু থুইয়া মোরে তারা স্বর্গপুরী যায়।"

দেখা যায়—কঙ্কের পিতাও অনাথ শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, রাজ রাজেশ্বরী তট সৈকতে শেষ শয্যা পাতিয়াছিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর দুঃসহ বিচ্ছেদ জ্বালা গুণরাজকে অধিক দিন সহ্য করিতে হয় নাই।

এই মাতৃপিতৃহীন অনাথ শিশুকে আপন কোলে তুলিয়া লয়, পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজে এমন কি কোন সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন না? সে কথার উত্তর আমরা কবির বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। "জ্ঞানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে" এই শ্লোক হইতে দেখাযায়, কবি কঙ্ক মাতৃপিতৃ হীন হইবার পরে তাঁহার চণ্ডাল পিতার অন্নেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মুরারী, চণ্ডাল হইলেও সদাশয়তায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। কবি তাঁহার চণ্ডাল পিতার গুণ রাশি, গ্রন্থের স্থানে স্থানে শত মুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৌশল্যাও দয়াময়ী স্নেহময়ী-সরলা-জননী। মাতৃপিতৃ হীন হইলেও দেখা যায়, কঙ্ক তাহার চণ্ডাল পিতার আশ্রয়ে বাল্য জীবন সুখেই কাটাইতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য কঙ্কের অদৃষ্টে সে সুখ চিরস্থায়ী হয় নাই। অদৃষ্ট লাঞ্ছিত পুরুষের সুখ সৌভাগ্য মহাস্রোতে নিপতিত বালীর জাঙ্গালের মত ক্ষণস্থায়ী, শৈশব উত্তীর্ণ হইতে না হইতে কঙ্কের চণ্ডাল পিতাও ইহ সংসার হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন। কঙ্কের শোকাতুরা চণ্ডাল জননী স্বামী শোক সহ্য করিতে না পারিয়া অচিরেই তাহার অনুগমন করিলেন। হতভাগ্য কঙ্ক দ্বিতীয়বার মাতৃপিতৃ হীন হইলেন।

"মরিল চণ্ডাল পিতা আমারে থুইয়া।
কেহ নাহি পুছে মোরে আপনা বলিয়া॥
শ্মশানে পড়িয়া কাঁন্দি কপালের লেখা।
কৌশল্যা মায়ের সঙ্গে আর না হবো দেখা॥"

এই সমস্ত শোক গীতির বর্ণনা করিয়া কবি তাঁহার স্বীয় জীবনের অনেক করুণ ঘটনার বিবরণ গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রদান করিয়াছেন।

যে দিন এই মাতৃপিতৃ হারা অনাথ বালক, রাজরাজেশ্বরীর তীরে, তাঁহার চণ্ডাল পিতার শ্মশানে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল, পৃথিবী শূন্যময় ভাবিয়া,আকুল অন্তঃকরণে এক বার আকাশ পানে চাহিয়া এক হস্তে অশ্রু মোচন করিতে ছিল, সেই দিন আর এক মহাপুরুষ দয়া পরবশ হইয়া, অনাথ কঙ্ককে, আশ্রমে লইয়া যান। ইনি ঋষি প্রতিম মহাপুরুষ-গর্গ।

গর্গের জীবনের সঙ্গে, কঙ্কের জীবনের অস্থি মাংস সম্বন্ধ। আমরা সংক্ষেপে, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ গর্গের পরিচয় প্রদান করিব। কঙ্ক তদীয়, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার কথা উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি গর্গের চরণ।
যাঁর সম জ্ঞানি নাই এ তিন ভুবন॥
বেদ পুরাণ সার কণ্ঠে যাঁর গাঁথা।
সাধনায় ঘরে বান্ধা সরস্বতী মাতা॥
বেদ বিধি শাস্ত্রে যার ক্ষেমতা অপার।
আর বার বন্দি গাই চরণ তাহার
* * * *
গর্গ পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় যে মনু।
যার আশ্রমে থাকি আমি চড়াইতাম ধেনু॥

কৃতজ্ঞ কঙ্ক গ্রন্থের আর একস্থানে লিখিয়াছেন—

"শ্মশানের বন্ধু মোর দুঃসময় পাইয়া।
জীবন করিলা দান পদে স্থান দিয়া॥
দুই দিন নাহি খাই অন্ন আর পানি।
হাতে ধরি আশ্রমে লইলা মোরে মুনি॥
ক্ষীর সর দিলা মাতা গায়ত্রী জননী।
মরিবার কালে মোর বাঁচাইলা প্রাণী॥
কাঁদিয়া কহিছে কঙ্ক সভার চরণে।
শোধিতে মায়ের ঋণ না পারি জীবনে॥"

পণ্ডিত গর্গ একটু উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন; তিঁনি নিজে যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাই করিতেন; পরের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তৎকালে 'গর্গরী' পণ্ডিতের বাক্য জ্বালায় তদানীন্তন পণ্ডিতগণ পরিত্রাহি ডাকিতেছিলেন। তিনি স্বীয় অসামান্য প্রতিভার বলে অনেকগুলি গবেষণা মূলক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি অনেক স্থলে স্বীয় সিদ্ধান্ত বজায় রাখিয়া প্রাচীন রীতি নীতি যুক্তি বলে উড়াইয়া দেন। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, তখন এতদঞ্চলে গর্গপণ্ডিতের দোহাই দিয়া অনেক নিম্ন-জাতীয় লোক বিধবার বিবাহ করিতে এবং বিধবাকে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হয়। এই বিবাহের নাম ছিল 'সাঙ্গা'। পণ্ডিত গর্গ উচ্চ জাতি সমূহেও এই বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে একদল লোক তাঁহার উপর মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠে এবং প্রকাশ্যে কিছু করিতে না পারিয়া, সর্ব্বদা তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে ষড়যন্ত্র করিতে ছিল। এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফল অতি ভয়াবহরূপেই তাহাকে আক্রমন করিয়াছিল।

কঙ্ক তৎকৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"হায়রে বিধবা নারী সংসারের মাঝে।
ঝড়ে পড়া বাসী ফুল নাহি লাগে কাজে॥
কেউ না সম্ভাষে তারে না জিজ্ঞাসে কেহ।
আবরণ হীন তার সুকোমল দেহ॥
শ্মশানে বাসর শয্যা চিতা সাজাইয়া।
অল্পকালে স্বামী গেল সংসার ছাড়িয়া॥
মায়ের হইল আক্ষি শূল বাপ হৈলা বৈরী।
কাঁদিয়া কাটায় দিন পতিহীনা নারী॥
সংসারের সুখ আশা তার কাছে বৃথা।
এমন অভাগা জাতি সৃজিলা বিধাতা॥
শুন শুন সভাজন কঙ্কের মিনতি।
করিও করুণ দৃষ্টি বিধবার প্রতি॥
সভার চরণে আমি মিনতি জানাই॥"
বিধবার বিয়া দিতে শাস্ত্রে মানা নাই।

কিন্তু এই নূতন বিধবা বিবাহ পদ্ধতি এতদঞ্চলে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। গর্গের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা এতদঞ্চল হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণের সেই যুক্তি তর্ক সঙ্কলিত গ্রন্থ সকল ময়মনসিংহের অন্যান্য বহু মূল্য রত্নরাজির সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহের রত্নভাণ্ডার হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে, বহু খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

যৎকালে সেই মাতৃপিতৃহারা অনাথ কঙ্ক, তাহার চণ্ডাল পিতার শ্মশানে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সেই সময় ঋষি প্রতিম মহাপুরুষ গর্গ শিষ্যালয় হইতে নিজ আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, গর্গ তাহার নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দয়া পরবশচিত্তে হাত ধরিয়া, চণ্ডাল বালককে আপন আশ্রমে লইয়া যান এবং তাহাকে আপন গাভীর পরিচর্য্যার্থে, রাখাল নিযুক্ত করিয়া দেন। কঙ্ক সেইদিন হইতে, গর্গের আশ্রমে থাকিয়া, তাঁহার ধেনু চড়াইতে লাগিল।

বালক কঙ্কের উজ্জল সৌম্যমূর্ত্তি ও বিনীত স্বভাব দেখিয়া, গর্গ অচিরেই মোহিত হইয়া পরিলেন। ক্রমে কঙ্ক তাহার অসামান্য প্রতিভা ও স্মরণ শক্তির প্রভাবে, সংস্কৃত শাস্ত্রের সুদীর্ঘ শ্লোকগুলি, অচিরেই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তখন গর্গের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চণ্ডাল বালকের হাতে খড়ি তুলিয়া দিলেন।

"দশনা বৎসরের কালে গুরু গো হাতে দিলা খড়ি।
গুরুর কৃপায় আমি লেখা পড়া করি॥

সেই সময় কঙ্কের বয়স ১০ বৎসর; কঙ্ক তখন হইতে গর্গ পণ্ডিতের ধেনু রাখিত ও অবসর কালে তাহার নিকট পাঠ শিক্ষা করিত।

গর্গ পণ্ডিতের বাড়ীতেও কঙ্কের দিন সুখেই কাটিতে-ছিল, গর্গের সহধর্ম্মিণী গায়ত্রীদেবীকে কঙ্ক ধর্ম্মমাতা বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। এই গায়ত্রীদেবী অতি ধর্ম্মশীলা কোমল স্বভাবা ও স্নেহপরায়ণা রমণী ছিলেন; তিনি বালক কঙ্ককে, নিজ গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা স্নেহ করিতেন, আদর করিয়া তাহাকে গোপাল বলিয়া ডাকিতেন।

"গোপাল বলিয়া মোরে ডাকিতা জননী।
খাইতে দিতেন মাতা ক্ষীর সর ননী॥

স্নেহশীলা গর্গ পত্নী ক্ষীরসর নবনীত দ্বারা কঙ্ককে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। খাবার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া কঙ্ককে নিকটে না পাইলে তাহা সিকায় তুলিয়া রাখিতেন এবং বারংবার ঘরের বাহির হইয়া তাহার প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া থাকিতেন। গর্গের বাড়ীতে কঙ্কের শয়ন ভোজনের কোন ক্লেশই ছিল না। কঙ্ক দধিদুগ্ধ ক্ষীরসর দাতৃ গর্গ পণ্ডিতের সুরভী গাভীকেও বন্দনা গীতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু এই সময় আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। দুরন্ত বসন্ত রোগ গর্গ পণ্ডিতের গৃহ লক্ষ্মী শূন্য করিয়া দিল। গর্গের ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী পতির চরণধূলি মাথায় করিয়া ইহসংসার হইতে মহাযাত্রা করিলেন। হতভাগ্য কঙ্ক তৃতীয়বার মাতৃহীন হইল। কঙ্ক লিখিয়াছেন—

"দুঃখের লাগিয়া মোরে সৃজিলা বিধাতা।
সেইজন মরে মোর যে হয় অন্নদাতা॥
কপালের দোষে পুনি হারাইলাম মায়।
যে তরীতে করি ভর সেই ডুবে যায়॥
যেই বৃক্ষের তলে যাই ছায়া পাইবার আশে।
পত্র ছেদি রৌদ্র লাগে আপন কর্ম্মদোষে॥"

কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যে পড়িয়াও কঙ্কের আর এক সঙ্গিনী জুটিল, সে গর্গের অষ্টম বর্ষিয়া বালিকা কন্যা লীলা। উভয়ে আজ মাতৃহীন, উভয়ে উভয়ের দুঃখ বুঝিল। এই মহাবিপদ ঝটিকায় পড়িয়া ভাই বোনের মত উভয়ে তাহাদের প্রণয় বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় করিয়া তুলিল।

বালিকা লীলার সরল স্বভাব ও সৌজন্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কঙ্ক লিখিয়াছেন—

"কণ্বের আশ্রমে যেমন দেবী শকুন্তলা।
গর্গের কুমারী কন্যা নাম তার লীলা॥
বিরিঞ্চি তনয়া সেই স্বাহা স্বরূপিণী।
স্নেহের ভগিনী মম ভক্তির জননী॥"

লীলা কঙ্কের বাল্যসঙ্গিনী। কঙ্ক গরু চড়াইয়া আসিত, বালিকা লীলা শীতল জল, মিষ্ট অভ্যার্থনায় তাহার রৌদ্র তাপিত দেহের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দিত; সরল স্বভাবা বালিকা কখন কখন তালের পাখা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কঙ্কের মাথার উপর বাতাস করিত।

"বাথান হইতে কঙ্ক ধেনু লইয়া আইসে।
আবের পাখা লইয়া লীলা বইসে তাহার পাশে॥"
(লীলার বারমাসী)

রোদের বেলা কঙ্ককে ধেনু চড়াইতে মানা করিত, কঙ্কের ক্ষুধা পা'ক্ আর নাই পা'ক্ লীলা ক্ষীরসর ও শালী ধানের চিড়া লইয়া হাজির। কখন কঙ্ক সুরভীকে লইয়া, মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিবে, লীলা প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া আছে; কঙ্ক নদীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতে না আসিতে বালিকা তাহার খাবারগুলি গুছাইয়া রাখিত; সুরভীর জন্য ভাতের ফেন লইয়া দাঁড়াইয়া ২ তাহার কোমর ধরিয়া গিয়াছে বলিয়া, কঙ্ককে বাহিরে রাগ দেখাইয়া তিরস্কার করিত, পরক্ষণেই আবার সেই মুগ্ধা বালিকা কঙ্কের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

এইরূপে হাস্য পরিহাসে উভয়ের দিন সুখেই কাটিতে-

ছিল। কঙ্কও তাহার প্রতিদান স্বরূপ, বালিকার মনোরঞ্জনার্থে বনের ফুল, ঝিলের পদ্ম কুড়াইয়া আনিয়া দিত, বালিকা লীলা অবসর কালে বনফুলে মালা গাঁথিয়া আপন খোপায় জড়াইয়া রাখিত; আবার কঙ্ক যখন ধেনু লইয়া আশ্রমে ফিরিত, তখনই সেই সস্মিত বদনা সরলা বালিকা নিজের খোপা হইতে গাঁথা মালাটী খুলিয়া লইয়া কঙ্কের গলায় পড়াইয়া দিত। আবার কখন কৃত্রিম কোপের সহিত কঙ্কের গলদেশ হইতে মালাটী খুলিয়া লইয়া আপনি বনদেবী সাজিয়া বসিত।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কঙ্ক চণ্ডাল বালক; গর্গের পূজার ফুল স্পর্শ করিবার অধিকার তাহার ছিল না। কিন্তু কঙ্ক অতি প্রত্যুষে উঠিয়া লীলাকে লইয়া ফুল তুলিতে যাইত; লীলা ফুল তুলিত, বালক কঙ্ক তাহার সহযাত্রী ছিল। সে—কোন্ ফুলটী কিরূপে তুলিতে হইবে, নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিত। এই শাখাটী নত করিয়া ধর, এই তোমার হাতের কাছে অপরাজিতা ফুলটী দেখিতে পাইতেছ না—বলিয়া লীলাকে মাঝে মাঝে সাড়া দিত। এইরূপে ফুল তুলিয়া, ভ্রমর উড়াইয়া—উভয়ে আশ্রমে ফিরিত। অবসরকালে কোন কোন দিন বাঁশী বাজাইয়া গান গাহিয়া সেই মাতৃহীন বালিকার চিত্ত হইতে তাহার মায়ের অঙ্কিত শোকের রেখাটী, মুছিয়া ফেলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিত।

কঙ্ক ধেনু চড়াইতে যাইত, লীলা একাকিনী কুটীর প্রান্তে বসিয়া আপন সুখ দুঃখের স্মৃতিটুকু ভুলিয়া গিয়া, কেবলি সেই অনাথ বালকের কথা ভাবিত। এসংসারেত কঙ্কের আপনার বলিবার কেহ নাই, সে মাতৃপিতৃহীন, সে ইহ সংসারে স্রোত তাড়িত শৈবালবৎ। যখনই লীলা কঙ্কের অতীত জীবনের কথা ভাবিত, তখনই যেন তাহার নিজের অজানা মতে তাহার সুন্দর নয়ন দুটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। কুটীর প্রান্তে আন মনে সেই কন্টকপুলিতা বালিকা বাষ্পগদগদ কণ্ঠে গাহিত—

"নাহি মাতা নাহিরে পিতা নাহি বন্ধু ভাই।
এমনি অভাগা করি সৃজিলা গোসাঞি॥
কেমন সে বিধাতারে জানি পাষাণে বান্ধা হিয়া।
স্রোতের শৈবাল করি দিল ভাসাইয়া॥"

প্রাণের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত সহানুভূতি টুকু এইরূপে কঙ্কের উপর ঢালিয়া দিয়া সেই সম দুঃখভাগিনী বালিকা নিজের মর্ম্মভেদী মাতৃ শোকটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা পাইত।

হতভাগ্য কঙ্কের অদৃষ্ট লাঞ্ছিত জীবন যখনই সুখ দুঃখের বিপুল তমসায় আচ্ছন্ন হইত, সরল প্রাণা লীলা তখনই আপন সস্মিত মুখের হাসির আলো টুকু লইয়া, তাহার জীবনের সমস্ত অন্ধকার রাশি, জোর করিয়া দূরে সরাইয়া দিত; লীলা বুঝিত, এসংসারে কঙ্কের আপনার বলিবার কেহ নাই। কঙ্ক ভাবিত, এ সংসারে, তাহার সুখ দুঃখের মানস-সঙ্গিনী একজন আছে, সে--লীলা।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল, লীলা ধীরে ধীরে কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিতেছিল—কৈশোরে বসন্তের নব মুকুলিতা মাধবীলতার ন্যায়, লীলার ক্ষীণ তনু ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছিল, ক্রমে তাহা কুসুমিত হইয়া উঠিল। সুন্দরী লীলা এক্ষণে কৈশোর যৌবনরূপ গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে উপস্থিত। লীলা নিজেও তাহা বুঝিতে পারিতেছিল, ধীরে ধীরে স্বভাব-লজ্জা আসিয়া, তাহার মুকুলিত সৌন্দর্য্যের উপর কোথা হইতে যেন একটী আবরণ টানিয়া দিতেছিল; লীলা কলসী লইয়া জলের ঘাটে যাইত, নিস্তরঙ্গ নদী জলে তাহার যৌবনের ছায়াটী অঙ্কিত হইত, ব্রীড়াময়ী সুন্দরী অমনি জলে তরঙ্গ তুলিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া, গৃহপানে চলিয়া আসিত। লীলার বারমাসীর কবি গাহিয়াছেন—

"কলসী লইয়া লীলা যায় নদীর জলে।
উজান বাহিয়া নদী যায় কল কলে॥
নদীর কিনারে কন্যা গো কলসী রাখিয়া।
চাহিল নদীর জলে আঁখি ফিরাইয়া॥
হেরি সে সুন্দর রূপ চমকে সুন্দরী।
শীঘ্র গতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরী॥"

লীলা প্রত্যুষে উঠিয়া বকুলের ফুল কুড়াইয়া কুটীর প্রান্তে আনমনে মালা গাঁথিতে বসিত, তখনই

"পিক ডাকে ডালে বসি হাতের মালা ভূমে খসি
পড়ে কন্যা চমকিয়া চায়।

আঁচল তুলিয়া শিরে লীলাবতী পশে ঘরে
আউলকেশ চরণে লুটায়।

লজ্জাবতী লীলা অমনি আধ গাঁথা মালা ভূমে ফেলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিত।

তখন হইতে বসন্ত সমীর স্পর্শে লীলার সর্ব্বাঙ্গে রুমাঞ্চ ধরিত।

"মলয়ের সমীরণ শিহরে সোণার তনু
ভাবে কন্যা কি হবে উপায়।
বসন টানিয়া হায় ঢাকিছে কাঞ্চন কায়
ঢাকিলেও ঢাকা নাহি যায়।"

সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়াও লীলা ভয়শীলা চকিতা।

আগে বনফুলে ভ্রমর বসিলে, চঞ্চলা লীলা তাহাদিগকে করতালি দিয়া উড়াইয়া দিত।

"বনফুলে বসে অলি হেরে লীলা কুতূহলী
উড়াইত করতালি দিয়া।
উড়িয়া ভ্রমর যায় লীলাবতী পিছে ধায়
ধরিবারে হাত বাড়াইয়া।

সে বাল্য জীবনের অসংযত ভাব এক্ষণে আর নাই।

এক্ষণে—"ভ্রমর গুঞ্জন শুনি,
লাজ বাসে সিমন্তিনী
মুখ ফিরাইয়া যায় চলি।"

অনাবশ্যক ফুল তোলা, অনাবশ্যক কথা বলা, লীলা ধীরে ধীরে সমস্ত বাল্য জীবনের চপলতা সকল দূরে সরাইয়া দিতে ছিল। পিতা গর্গ যখন কুটীরে আসিয়া ডাকিতেন, "লীলা!"—তখনই সে ত্রস্ত ভাবে সমস্ত দেহ বসনাবৃত করিয়া পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত; গর্গের সমস্ত কথা লীলা তখন হইতে নীরবে শুনিয়া যাইত, নীরবে আদেশ পালন করিত। বাল্যের সেই চিরচঞ্চলা লীলা কৈশোর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আজ গাম্ভীর্য্যময়ী রমণী। লীলার বারমাসীকার এই কয়েকটী চরণে, তাহার লজ্জাবনত জীবনের সরল সৌন্দর্য্য টুকু সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কাব্যাংশে এই সকল সঙ্গীত অতুলনীয়! লীলার বারমাসীকার আরও অনেক স্থলে সামান্য দুই একটী রেখা পাতে সেই ইষদোদ্ভিন্ন-যৌবনা লীলার সুকোমল চরিত্রটী উত্তমরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দেখা যায় তখন হইতে লীলা অন্যমনস্কা গাঢ় চিন্তা নিমগ্না। দিবস রজনীর প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন তাহার কাছে তাহার নিজের অজানিত মতে চলিয়া যায়। কঙ্ক ধেনু লইয়া বাগানে যাইত, সেই অন্যমনস্কা সুন্দরী, তখন—

"ভূতলে আচল পাতি, শুয়ে কন্যা লীলাবতী
একেলা শুইয়া নিদ্রা যায়।
ঘুমে নাহি ঢুলে আঁখি উঠে বইসে বিধুমুখী
পালটিয়া পন্থ পানে চায়।

আবার যখন—"ফুকারে কঙ্কের বাঁশী শিউরিয়া উঠে বসি
জল ভরন্তে যায় লীলা।
মনে ভাবে সুন্দরী কি জানি কেমন করি
আজি বা হইল এত বেলা।"

নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য গুলি আজকাল লীলা তেমন করিয়া সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না, বেলা চলিয়া যায়। কেমন করিয়া বা চলিয়া যায়, লীলা তাহা আপনিই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সে নিজের ত্রুটির জন্য নিজেই লজ্জিত, সে প্রত্যহ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করে "কি জানি কেমন করি, আজি বা হইল এত বেলা।" কিসের চিন্তা, কেন চিন্তা, লীলা তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বুঝিতে পারে না যে—বর্ষার মেঘ ও যৌবনের চিন্তা বিধাতার স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আসিয়া উদয় হয়, ইহাদিগকে সাধিয়া আনিতে হয় না।

আর কঙ্ক,—কঙ্ক আর এখন বালক নহে, সে যুবক, সে তাহার গুরুর নিকট হইতে, যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার শিখিয়াছে।

"পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার।
শিখিয়াছে যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার॥
ফেরুয়াই বারমাসী সঙ্গীত যে কত।
শিখিয়াছে কঙ্কধর তাহা শত শত॥
কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাকে।
সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে॥
ভাটিয়াল গানেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা।
এক মনে শুন কহি তাহার বারতা॥"

লীলার বারমাসী।

সেই সময় হইতে কঙ্ক ধেনু চড়াইতে যাইয়া কবিতা

লিখিত। এই সময় কঙ্ক "মলয়ার বারমাসী" বলিয়া একটী সুদীর্ঘ গীতি কবিতা রচনা করেন।

কঙ্ক কৃত এই মলয়ার বারমাসী, আজও এতদঞ্চলে, আবাল-বৃদ্ধ বণিতার মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কবিতা বা বারমাসী, কঙ্ক হাতে কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, ইহা একটী প্রচলিত সঙ্গীত মাত্র; রাগিনী ভাটিয়াল, স্থানে স্থানে ভনিতায় কবি কঙ্কের নাম পাওয়া যায়। আজও এতদঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর লোকগণ, অবসর কালে, এইরূপে বাঁশী বাজাইয়া, মলয়ার বারমাসী গাহিয়া থাকে। গভীর রাত্রে বর্ষার ভরা নদীর উপর মাল্লাগণ যখন ভাটিয়াল রাগিনীতে অভাগিনী মলয়ার মর্ম্ম স্থল স্পর্শী করুণ কাহিনীটী গাহিয়া যায়, তখন সত্য সত্যই তাহা যেন বহু দিনের অতীত জীর্ণ স্মৃতি, কত রজনীর কত বিস্মৃত স্বপন—এক দুই করিয়া ধীরে ধীরে মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলে।

কাব্যাংশে ইহা একটী মধুর শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতা। পতিপ্রাণা সাধ্বী খুল্লনার সঙ্গে, মলয়ার প্রথম জীবনের তুলনা করা যাইতে পারে। মলয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভাগিনী। রাজকন্যা, রাজমহিষী হইয়াও অভাগিনী মলয়া, বিশ্বাস ঘাতকের কুমন্ত্রণায়, স্বামী কর্ত্তৃক মহাবনে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন। রাজোদ্যানের সেই সুরভি কুসুম, বনে ফুটিয়াও রক্ষা পায় নাই। সেক্সপিয়ারের মূঢ় ওথেলোর হস্তে দিসডিমোনার ন্যায়, হিংস্র জন্তুর নখরাঘাত ছিন্ন বনলতার মত, এই অসহায়া রমণী স্বামী কর্ত্তৃক অতি বিভৎসরূপে নিহত হইয়াছিলেন। মলয়ার এই বারমাসীটি একটী অশ্রুজলে গাঁথা সকরুণ মর্ম্মস্পর্শী গীতি কবিতা। কিন্তু কঙ্কের জীবনোপাখ্যানের আবশ্যক উপাদান মলয়ার বারমাসীতে নাই। আমরা প্রবন্ধান্তরে কবির নিজ কৃত গ্রন্থ ও মলয়ার বারমাসী সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব। মলয়ার বারমাসীতে তখন ভাটিয়াল নদী উজান, বহিত, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িত, আকাশের মেঘ কাঁদিয়া বর্ষিত।

কবির জীবনের এই প্রথম উদ্যম নিস্ফল হয় নাই। সুকণ্ঠ কঙ্ক এই বারমাসী গাহিয়া অচিরেই জন সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

পাখীর প্রয়োজনীয়তা।

পৃথিবীতে মানুষ নিজকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলিয়া মনে করে। ক্ষুদ্র কীটের যে শক্তি অনেক স্থলেই মনুষ্যের সে শক্তিও নাই, ইহা শুনিতে আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মানব নিজ শক্তি বলে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর উপরে—এমন কি ভীষণ সর্পাদির উপরে ও আধিপত্য করিতেছে, কিন্তু কীট কুলের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে যে তাহার সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হইয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কত অসংখ্য জাতীয় কীট আছে এবং তাহাদের কিরূপ প্রবল শক্তি তাহা অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। পৃথিবীর জীবিত জন্তুর সকল শ্রেণী একত্র করিলেও কীট জাতির সহিত তুলনা হয় না। কীটতত্ত্ববিদেরা তিন লক্ষ শ্রেণীর উপরে কীটের বর্ণনা করিয়াছেন, এই সংখ্যার দ্বিগুণ এখনও তাঁহাদের আলোচনার বাকি আছে। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে পৃথিবীর সমস্ত জীব এবং অধিকাংশ উদ্ভিদ্ এই অসংখ্য কীটের খাদ্য।

কোন কোন কীটের বংশ বৃদ্ধি এত অধিক যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একরূপ কীটের বৎসরে ১৩ পুরুষ পর্য্যন্ত জন্ম হইয়া থাকে। ইহাদের বংশ বৃদ্ধি দেখিয়া পণ্ডিত ফরবুস হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে যদি ইহাদের এক বৎসরের কয়েক পুরুষকে একত্রে সারি করিয়া প্রতি ইঞ্চিতে ১০টী কীট দাঁড় করান যায়, তাহা হইলে ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলো আসিতে ২৫০০ বৎসর লাগে। ইহা মনে রাখা উচিত যে আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার মাইল এবং সূর্য্য মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে। তাহা হইলে দেখা যায় যে ঐ কীট শ্রেণী সৌর জগৎ ছাড়াইয়া কোথায় যাইয়া পড়ে, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

মিঃ কির্কলেণ্ড (Kirkland) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে যদি সিপসি নামক কীটকে ৮ বৎসর নির্ব্বিবাদে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহারা উক্ত ৮ বৎসরে সমস্ত যুক্ত রাজ্যের লতা, পাতা, গুল্ম খাইয়া ফেলিতে পারে।

কেনেডার একজন কীট তত্ত্ববিদ পণ্ডিত গোল আলুর এক জাতীয় কীট সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে—যদি গোল আলুর এক জোড়া কীটকে নির্বিবাদে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এক ঋতুতে উহাদের সংখ্যা কোটিতে পরিণত হইবে। এবং এই হারে এই কীট-কুলকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দিলে, আলু পৃথিবী হইতে লোপ পাইতে অধিক সময় লাগিবে না।

যাহারা সূর্য্যমণ্ডল অন্ধকার করিয়া পঙ্গপাল চলিতে দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে যদি ইহাদের আণ্ডা, বাচ্চা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে পায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয়।

কীটের বংশ বৃদ্ধি যেরূপ প্রচুর, উহাদের আহারও তদনুরূপ প্রচুর। পতঙ্গ জাতীয় কীট দৈনিক তাহার ওজনের দ্বিগুণ পাতা আহার করিয়া থাকে। একটি ঘোটককে ঐ অনুপাতে খোরাক যোগাইতে হইলে সে দৈনিক প্রায় ২৮ মণ ঘাস ভক্ষণ করিত। পণ্ডিত ফরবুস বলেন যে মাংস ভোজী এরূপ কীটাণু আছে যে দৈনিক তাহাদের শারীরিক ওজনের ২০০ শত গুণ আহার করিয়া থাকে। মানব জগতে এরূপ হইলে আমাদের একটি সদ্যজাত শিশু জন্মিবার দিন হয় ত ১৮।১৯ মণ মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। এবং এইরূপ আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইত।

এখন দেখা যাক কে এই ক্ষুদ্র রাক্ষস দলকে দমিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আহার্য্য রক্ষা করিয়া থাকে? মানব ইহাদের হাত হইতে আহার্য্য রক্ষা করিতে অপারগ। মানুষ হয় ত তাহাদের বহু ব্যয় সাধ্য রাসায়নিক প্রস্তুত বিষ আদি দ্বারা কোনরূপে তাহার ফুল কিংবা ফলের বাগানটি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে কিম্বা বন প্রদেশে এই সকল কীটের ক্রিয়া আংশিক দেখিবা মাত্র মানব ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে। তবে জিজ্ঞাস্য, এস্থলে রক্ষা কর্ত্তা কে? আমি বলিব পাখী। সে জন্যই বোধ হয় ভগবান কীট পতঙ্গকে পাখীর প্রধান আহার করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানব অন্ধের মত গত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে প্রকৃতির এই হিতকারী পক্ষী বধ করিত যেন বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। মানুষ বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াই এইরূপ ধ্বংস সাধন কার্য্যে রত, যাহা প্রকৃতি হয় ত শত শত বৎসরেও করিত না। সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাহাকে রাখিতে হইবে, কাহাকে মারিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কর্ত্তা মানব নহে।

জীবগণ সকলেই নিজ নিজ বংশ বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত। আবার তাহার সমতা রক্ষা করিতে তাহার পার্শ্বেই অপর জীব বর্ত্তমান। প্রকৃতির এই সমতা রক্ষার কোন ব্যতিক্রম ঘটাইলে বিষম অনর্থ সঙ্ঘটন হওয়া সম্ভব। মানুষ কীট ভক্ষণকারী পাখী মারিয়া পৃথিবীতে কতবার যে শস্য বনাশ-কারী কীটের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়া ফসল জন্মিবার বিষম অনর্থ সংঘটন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমি একবার সরকারী কৃষি বিভাগের প্রচারিত ইন্দুর মারিবার একটী সহজ উপায় দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছিলাম। কারণ সে সময়ে আমার গৃহাদি গর্ত্তের ইন্দুরে পরিপূর্ণ ছিল। অদৃশ্য অপকারের ত কথাই নাই এমন কি আমাকে ইন্দুরের সহিত প্রকাশ্য লড়াই করিয়াই আহারাদি করিতে হইত। একটু উন্মনস্ক হইলেই পাতের মৎস্যটুকু পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইত। সেই সময়ে রিপোর্টে দেখিলাম—কার্ব্বন বাইসালফাইড (Carbon Bisulphide) গর্ত্তে দিয়া একটু অগ্নি সংযোগ করিলেই গর্ত্তের ইন্দুর শেষ হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ Carbon Bisulphide আনাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। তাহাতে আমাদের গৃহের ইন্দুর মরাত দূরের কথা ইন্দুরের উপদ্রব যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে একটি বিড়াল শাবকের আবির্ভাবে ইন্দুরের সর্ব্ববিধ উৎপাত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যে কার্য্য আমি টাকা ব্যয় করিয়া করিতে পারি নাই, তাহা এখন বিনা ব্যয়ে সম্পন্ন হইল। ঢাকা বিক্রমপুর এবং ময়মনসিংহের কোন কোন স্থানে কচুরি নামক জলজ গুল্মের প্রভাবে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। কিছুদিন হয় ঢাকায় গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগ এই গুল্ম হইতে কোনরূপ সার বাহির করিয়া গুল্ম দমনের উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত ছিলেন। হয়ত বহুব্যয়ে এই গুল্ম হইতে সার প্রস্তুত হইবে কিন্তু তাহাতে এই কচুরির বংশ বৃদ্ধি বন্ধ হইবে কিনা সন্দেহ। আমাদের মনে হয় কচুরি গুল্ম

ভোজী জীব আবিষ্কার করিতে না পারিলে, ইহাদের উচ্ছেদ সহজ হইবে না :

কতিপয় বৎসর হয় হাঙ্গেরির (Hungary) কৃষকগণ মূর্খতা ও কুসংস্কার বশতঃ গভর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়া তথাকার চরুই পাখী ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে ৫ বৎসরের মধ্যে কীটের উপদ্রব এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে তাহারাই আবার উন্মত্তের মত চরুই পক্ষী রক্ষা করিতে আবেদন করিতে লাগিল। সেবার চরুই পাখী রক্ষা করায় তাহাদের দেশ রক্ষা পায়।

১৮৬১ সনে ফরাসি গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ তথাকার শস্য অপচয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশন স্থির করেন যে একরূপ পাখী ধ্বংসই এই কীট বৃদ্ধির কারণ এবং তাহাতেই শস্য বিনষ্ট হইতেছে। কমিশনের নির্দ্দেশ মত সে সময় বন্য পাখী বধ বন্ধ করিয়া কোনরূপে শস্য রক্ষা করা হয়। ১৮৭৭ সনের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ক্ষেত্রের গম নষ্ট করে বলিয়া একরূপ কাল পাখী বিষ প্রয়োগে বধ করা হয়। এইরূপ বহু পাখী বধ করার পরে ১৮৭৭ সনে তথায় ভগবানের অভিশাপ উপস্থিত হয়। সে সময়ে তথায় অসংখ্য পঙ্গপাল দেখা দেয় এবং তাহাদিগকে ভক্ষণ করার জন্য কোন পাখী না থাকায় নেব্রেস্কার লোকদিগকে বিশেষ ভাবে অনুতপ্ত হইতে হইয়াছিল।

মরমনগণ (Mormons) যখন উটাহ (Utah) প্রদেশে অধিনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহাদের প্রথম বৎসরের ফসল নিকটস্থ পাহাড় হইতে একরূপ পোকা বাহির হইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। প্রাতে যে ক্ষেত্র হরিৎ বর্ণে সুশোভিত হইত অপরাহ্নে তথায় শস্যের চিহ্ন মাত্র থাকিত না। প্রথম বৎসর এরূপ ভাবে শস্য নষ্ট হওয়ার পরে দ্বিতীয় বৎসর আবার শস্য রোপন করা হইল এবং উহা সুন্দর ভাবে অঙ্কুরিত হইল কিন্তু পোকায় উহা পূর্ব্ব বৎসরের মত সমূলে ধ্বংস করিল। ইহার ফলে তথায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল। এই সঙ্কট সময়ে তথায় সহস্র সহস্র পাখীর (Franklin's Gull) আবির্ভাব হইল এবং তাহারা কীট ধ্বংস করিয়া দেশ রক্ষা করিল। তদবধি তথাকার অধিবাসীরা এই পাখীকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া মনে করে এবং তাহারা এই পাখীকে রক্ষা কর্ত্তা মনে করিয়া সল্ট লেইক সিটিতে (Saltlake City) এই পাখীর জন্য একটী স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মান করিয়া রাখে।

কোন নূতন দেশে লোক গেলে, তাহারা নির্দ্দয়ভাবে সেই স্থানের পাখী বধ করিতে থাকে। তাহার ফলে তথাকার কীটকুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নব রোপিত শস্যে নূতন খাদ্য পাইয়া তথায় আসিয়া বাস করিতে থাকে।

যখন নিউজিলেণ্ডের কৃষকগণ মাটী কর্ষণ করিয়া শস্য রোপন করিতে আরম্ভ করিল, তখন একরূপ নূতন পোকা তাহাদের পুরাতন সল্প লভ্য নববস্তিত্যাগ করিয়া প্রচুর লভ্য নবোদ্গত শস্যক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিল। ইহারা হরিৎ শস্যক্ষেত্রকে পাটকিলে রং করিয়া ফেলিত। তারপর এক শস্যক্ষেত্র নির্ম্মূল করিয়া অপর শস্যক্ষেত্রে গমন করিত। তখন ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য দলে দলে মেষ আনিয়া ইহাদিগকে পদদলিত করা হইত। একস্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়ার সময়ে অশ্বচালিত বহু রোলার আনিয়া ইহাদিগকে মর্দ্দন করা হইত। বড় বড় নালা কাটিয়া ইহাদের গতিবিধি রোধ করার চেষ্টা করা হইত। এই সমস্ত চেষ্টাই একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল। যখন রেল লাইনের উপর দিয়া ইহারা গমন করিতে থাকিত, তখন ইহাদের মৃতদেহে গাড়ীর চাকা এরূপ পুরু হইয়া যাইত যে তাহাতে গাড়ী চলা বন্ধ হইয়া যাইত।

সময়ে ইহা প্রতীত হইল যে কীটের উপদ্রব এরূপ ভাবে থাকিলে নিউজিলেণ্ডে কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইবে। এই কীটের সহিত সংগ্রামের সমস্ত চেষ্টাই যেন ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইল। তখন কৃষকগণ প্রাকৃতিক উপায়ে পক্ষী দ্বারা এই কীটের হাত হইতে অব্যাহতির চেষ্টা দেখিতে লাগিল। সে সময়ে একরূপ চরুই পাখীর আমদানী করিয়া দেশ রক্ষা করা হয়।

এক সময়ে স্কটলেণ্ড হইতে একরূপ গুল্ম আসিয়া নিউজিলেণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে ছিল। আমাদের দেশের কচুরি বৃক্ষের মত এই গুল্ম দমনের জন্য অর্থব্যয় বহু করা হইল। কিন্তু তাহাতে কিছুই সুফল হইল না। অবশেষে একরূপ চরুই পাখী এই মারাত্মক গুল্মের হাত হইতে দেশ রক্ষা করে। সে সময়ে এই পাখী না আসিলে নিউজিলেণ্ডের যে কি দশা হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

বিদেশ হইতে পাখী আমদানী করিলে তাহারা হয়ত প্রথম প্রথম আমাদের মন মত কার্য্য করিয়া আমাদের উপকার করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাদের দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হওয়াও বিচিত্র নহে। কাযেই যে স্থানের কাজ সে স্থানের পাখী দ্বারা সম্পন্ন করাই বাঞ্ছনীয়। তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলা কখনও উচিত নহে। এক শ্রেণীর শিকারী আছেন যাহারা কাক, শকুন ইত্যাদি বধ করিয়া তাহাদের হস্ত কণ্ডুয়ন নিবারণ করেন এবং মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন; আমাদের অনুরোধ তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া তাহা করিবেন।

পাখী না থাকিলে কীটের দ্বারা পৃথিবীর অনেক বনভূমি নষ্ট হইত। পোকে কোন কোন বৃক্ষের পত্র খাইয়া ফেলিলে বৃক্ষ মরিয়া যায়; আবার কোন বৃক্ষের ত্বকে ছিদ্র করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। এই সকল অপমৃত্যুর হাত হইতে পাখীই বৃক্ষকে রক্ষা করে। চেপম্যান (Chapman) সাহেব ঠিক বলিয়াছেন যে "আমরা পাখী হারাইলে আমাদের বৃহৎ বনানী হারাইব।" ইহা প্রমাণ করা অতি সহজ।

বৃহৎ বনানীর মত ফলের বাগানে পাখীর কার্য্যের তত বিকাশ পায় না। কারণ সেখানে পতঙ্গ হইতে বৃক্ষ ও ফল রক্ষা করিতে মানুষ সর্ব্বদা যত্নবান। কিন্তু এই ব্যয়-সাধ্য যত্ন কেবল ধনীদের দ্বারাই সম্ভবপর, গরীবদিগকে অনেক সময়ে পাখীর উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত ফ্রেডারিক দি গ্রেট (Frederick the Great). এক সময়ে এক ঝাঁক চরুই পাখী তাঁহার চেরিফল ঠোকরাইয়াছিল বলিয়া তিনি ক্রোধে সমস্ত ক্ষুদ্র পক্ষী বিনাশের হুকুম দিলেন। তাহার ফলে দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার চেরি বৃক্ষ কেবল যে ফল শূন্য হইল তাহা নহে, উহারা পোকার ভাড়ে অবনত হইয়া পড়িল।

তরিতরকারীর বাগানে বিশেষ ভাবে পোকার আবির্ভাব হইয়া থাকে। কারণ সেখানে নবজাত শস্যে তাহারা তাহাদের প্রচুর আহার্য্য পাইয়া থাকে। ঐ ক্ষুদ্র কীটদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য এক রূপ বড় জাতের শুয়া পোকা আছে। উহারা দিনের বেলা ঘাস কিম্বা মাটির নীচে পলাইয়া থাকে এবং রাত্রিতে বাহির হইয়া ঐ ক্ষুদ্র কীটদিগকে ভক্ষণ করে। অতি প্রত্যুষে উহারা পলাইবার পূর্ব্বে চুপে চুপে পাখী আসিয়া কিছু কিছু শুয়া পোকা ভক্ষণ করে। এক দিন হয়ত বাগানের মালিক আসিয়া দেখিলেন যে পাখী যেন কি ভক্ষণ করিতেছে। তিনি হয়ত মনে করিলেন যে পাখী তাহার বাগান নষ্ট করে। কাযেই তিনি পাখী মারিতে যত্নপর হইলেন এবং কিছু পাখী সংহারও করিলেন। কিছুদিন পরে যখন মনের আনন্দে বৃহত্তম কফি চয়ন করিতে বাগানে গেলেন তখন তাহার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। কারণ তাহার কফি শুয়া পোকায় একরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তখনই তাহার বোধগম্য হইল যে প্রাকৃতিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করাতে তাহার বড় সাধের কফির এই পরিণতি হইয়াছে।

কেবল মাত্র কীটই যে শস্যের শত্রু তাহা নহে। ইন্দুরও শস্যাদির এক মহা শত্রু। ইন্দুরে ক্ষেত্রের শস্য, গোলার শস্য, তরিতরকারী বহু জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলে; ইহাদের হাত হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করিতে বাজ ও পেচক বর্ত্তমান। শস্য নষ্ট ব্যতীত কোন কোন ইন্দুর নানারূপ রোগের বীজ বহন করিয়া থাকে। পেচক কিরূপে ইন্দুর নষ্ট করে তাহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি না। একবার কোন এক গৃহ হইতে এক জোড়া পেচক চলিয়া যাওয়ার পরে সেই গৃহে ৪৫৪টি ইন্দুরের মস্তক পাওয়া গেল। কখন কখন পেটের দায়ে পেচকগণ ২।১টি গৃহ পালিত পাখীও ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু সেজন্য তাহাদিগকে বধ করিলে মনে করিতে হইবে যে প্রকারান্তরে সহস্র সহস্র টাকার শস্য নষ্ট করা হইল। হিন্দু শাস্ত্রেও বোধ হয় এই জন্যই পেচককে লক্ষ্মীদেবীর বাহন বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং তাহার বিনাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যে সকল পোকা মাকর ধান্য নষ্ট করিয়া থাকে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য শ্বেত বক সর্ব্বদাই জলের নিকটে বিচরণ করিয়া থাকে। এই বকের দ্বারা রক্ষিত হয় বলিয়াই ভারতবর্ষে ও চীন দেশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা শস্যের কোন অপচয় না করিয়া কেবল পোকা মাকড়ই ভক্ষণ করিয়া থাকে। ১৯১২ সনের ইজিপ্টের রিপোর্টে লর্ড কিচনার লিখিয়াছিলেন যে ইহাদিগকে বধ করায় পোকার উপদ্রব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহার

প্রতিবিধান করা নিতান্ত প্রয়োজন। তদনুসারে তথায় খেদিব এক হুকুমনামা প্রচার করিয়াছিলেন যে সেখানে আর কেহ পোকা মাকড় ভোজী পক্ষী বধ করিতে পারিবে না। শ্বেতবলাকা যে আমাদের কত উপকারী তাহা অনুসন্ধান না করিলে বুঝা কঠিন। আমাদের একদল শিকারী এই বক বধ করিয়াই তাহাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

শকুনী, গৃধিনী ও কাক যে আমাদের কত উপকার করিয়া থাকে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের পল্লী গ্রামে ডোম মেথরের কাজ ইহারাই করিয়া থাকে। অনেক বন্দরে সামুদ্রিক চিলও অনেকটা ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র মৎস্যাদি এবং যতরূপ আবর্জ্জনা, উহারাই ভক্ষণ করিয়া পরিস্কার করে। কোন কোন স্থলে ইহাদিগকে বধ করিয়া দেখা গিয়াছে যে সেখানে নানারূপ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ ময়লাতেই সকল রোগের সৃষ্টি হয়।

অবিবেচক শিকারীদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে ভগবান অকারণে কোন জীব সৃজন করেন নাই। এবং মানুষের হাতেও জীব বধের অধিকার তিনি প্রদান করেন নাই।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাবোয় অবস্থান কালীন আমরা দুই দিন শিকারে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম দিন একটা হরিণ ছাড়া আর কোনও জন্তু আমাদের সহিত দেখা করে নাই। একটা গণ্ডারকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে এমন দ্রুতবেগে পলায়ন করিল যে, আমরা কোনও মতে আর তাহার নাগাল পাইলাম না। অগত্যা ঐ হরিণকে স্কন্ধে লইয়া আমরা সে দিন ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন আমাদের দুরবস্থার সীমা রহিল না। কথাটা একটু ভাল করিয়াই বলি।

৩।৪ মাইল যাইবার পর আমরা একদল হাতীর পায়ের নিশান দেখিয়া বুঝিলাম যে তাহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সেই স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা তখন অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। হস্তীর শ্রবণ ও ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বহুদুর হইতে ইহারা শিকারীর অস্তিত্ব জানিতে পারে। যাহা হউক, খানিক দূর যাইবার পর বরি সাহেব আমাদিগকে দাঁড়াইবার জন্য সঙ্কেত করিলেন, তাহার পর বলিলেন যে, ৩০।৪০ গজ দূরেই হাতীগুলি রহিয়াছে; আমরা যেন বিশেষ সাবধান হই। আমাদের মধ্যে এক বরি সাহেব ভিন্ন জীবনে আর কেহ বন্য হস্তীর সন্মুখীন হয়েন নাই। ইহা যে কি বিপদ জনক ব্যাপার তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই জানেন না। হাতীর চামড়া অত্যন্ত শক্ত এবং ইহা প্রকাণ্ড জন্তু বলিয়া নিতান্ত মর্ম্ম স্থলে না মারিতে পারিলে এক গুলিতে তাহার কিছুই হয় না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ৭।৮টী গুলি খাইয়াও উহারা শিকারীকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিয়াছে ও মারিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা এমন জোরে দৌড়ায় যে, ভাল ভাল ঘোড়াকে পর্য্যন্ত ধরিয়া ফেলে। আহত না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা মানুষ দেখিলে প্রায়ই পলাইয়া যায়। কিন্তু একবার গুলি খাইলে উহাদের ভাব অত্যন্ত ভীষণ হয়। তখন সবেগে শিকারীর দিকে ধাবিত হয়।

হাতী সচরাচর দল বাঁধিয়া থাকে। এক এক দলে ১৪।১৫ হইতে ১০০।১৫০ পর্য্যন্ত বাস করে। দলের মধ্যে মাদী হাতীর সংখ্যাই অধিক হয়। পুং হাতী দলের মধ্যে ৩,৪ টার অধিক থাকে না। যখন চরিতে থাকে, তখন কয়েকটা প্রহরীর কাজ করে। কোনও প্রকার বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই উহারা এক প্রকার শব্দ করে। তখন বাচ্চা হাতীগুলিকে মাঝ খানে রাখিয়া উহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কখন কখন দুই একটা হাতী দল ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং একা থাকে। ইংরাজিতে ইহা দিগকে রোগ (Rogue) বা গুণ্ডা হাতী বলে। উহাদের স্বভাব অত্যন্ত দুর্দান্ত হয়। নূতন শিকারীর পক্ষে এই হাতীর সম্মুখে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আমরা হাতী শিকার কখনও করি নাই বটে, কিন্তু আমাদের সকলের নিকটই হাতী শিকারের ভাল বন্দুক

ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এ কার্য্যে অনভিজ্ঞ বলিয়া বরি সাহেব অগ্রসর হইতে চাহিলেন। কিন্তু কাপ্তেন সাহেব এ সুযোগ ছাড়িতে চাহিলেন না। তিনি এক রকম জেদ করিয়া সকলের আগে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর কাপ্তেন সাহেব দাঁড়াইলেন। তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমরা দেখিলাম—এক সুবৃহৎ দন্তী বোধ হয় আমাদের ১৫।১৬ হাত দূরে আমাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এক একটা দাঁত লম্বায় বোধ হয় আড়াই হাত হইবে। বরি সাহেব চুপে চুপে কাপ্তেন সাহেবকে হাতীর ঠিক ললাট লক্ষ্য করিতে বলিলেন। তদনুসারে তিনি প্রায় এক মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া গুলি ছাড়িলেন। হাতীটার কোথায় লাগিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সে, কিন্তু একবার ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার পরই সে আমাদিগকে দেখিতে পাইল। পুনরায় চীৎকার করিয়া সে আমাদের দিকে ছুটীল। তখন বরি সাহেব উহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়িলেন। ফল কিছুই হইল না। জানোয়ারটা তীরের মত আসিতে লাগিল। তখন বরি সাহেব 'পালাও' বলিয়া একদিকে দৌড়াইলেন; আমি ও রতিকান্ত অন্য দিকে ছুটিলাম। কাপ্তেন ও ডাক্তার সাহেব যে কি করিলেন তাহা জানিতে পারিলাম না।

বহুক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে আমরা অনেক কষ্টের পর বরি সাহেবের বাংলায় উপস্থিত হইলাম। দেখি বরি ও ডাক্তার সাহেব এবং আমাদের সঙ্গের অন্যান্য লোক আমাদের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু কাপ্তেন সাহেবের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। আমরা আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া শেষে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলাম। বেলা তখন প্রায় ৩টা। সঙ্গে আমাদের প্রায় ৩০ জন লোক চলিল। যে স্থান হইতে আমরা পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম সেইখান হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ২০। ২২ মাইল স্থান আমরা তন্ন২ করিয়া খুজিলাম, কিন্তু সাহেবের কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। তখন আমরা তাঁহার জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িলাম।

বরি সাহেবের উদ্যোগে আর একদল লোক মশাল লইয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত পুনরায় খোঁজ করিল, কিন্তু তাহারাও শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিল। রাত্রিটা কোনও মতে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে সামান্য জলযোগ করিয়াই আমরা আবার বাহির হইলাম। আমরা পুনরায় সেই পলায়নের স্থান হইতে সন্ধান আরম্ভ করিলাম। আজ অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর বরি সাহেবের দৃষ্টি একটা বড় মৃত গাছের উপর পড়িল। সহসা তিনি সেইখানে দাঁড়াইলেন। উহার একটা শাখায় একটা কোটের খানকটা অংশ ঝুলিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে একটা হুইসিল সজোরে বাজাইলেন। আমরা অল্প দূরেই ছিলাম। অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সাহেব আমাদিগকে ঐ কোটের টুকরা দেখাইলেন। উহা যে কাপ্তেন সাহেবের কোট তাহা আমি ও বরি তৎক্ষণাৎ চিনিয়া লইলাম। বরি সেই মুহূর্ত্তে কোট ও জুতা খুলিয়া ঐ বৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। আরও দুইজন চৌকিদার তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ৫। ৬ মিনিট পরে বরি বলিলেন, "সাহেব এইখানেই আছেন। গাছে একটা বৃহৎ কোটর আছে। সাহেব উহার মধ্যে রহিয়াছেন।"

প্রায় একঘণ্টা কাল বিশেষ পরিশ্রমের পর আমরা সাহেবকে ঐ গহ্বর হইতে উদ্ধার করিলাম। গাছের গুঁড়িটা জমি হইতে ১২। ১৪ হাত চলিয়া গিয়া তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঠিক এই জায়গায় গাছটার মধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত হইয়াছে। উহা প্রায় ১২ ফুট গভীর এবং বেড় প্রায় ৪ ফুট। বুঝুন ব্যাপার কি বৃহৎ।

যখন আমরা সাহেবকে উদ্ধার করিলাম, তখন তিনি অচৈতন্য। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বাংলায় লইয়া যাওয়া হইল, এবং কিয়ৎক্ষণ সেবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। ইহার পর ঘটনাটা তাঁহার মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"আমি সকলের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। খানিক দূর যাইবার পর আমি পড়িয়া যাই। উঠিয়া দেখি হাতীটা আমার ৮। ১০ হাত দূরে আসিয়াছে। আমি তখন হাতের বন্দুক একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম এবং

কাছেই ঐ গাছটা দেখিয়া উহার উপর আরোহণ করি। গাছটা একটু হেলান বলিয়া উঠিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। গাছে যে এমন একটা মানুষ ধরা কল আছে, তাহা অবশ্য আমি জানিতাম না। ঐ ফাটালের কাছে আসিয়া সামলাইতে না সামলাইতে আমি উহার ভিতর পড়িয়া গেলাম। প্রথমে এই ঘটনায় বরং নিজকে ভাগ্যবান ভাবিয়াছিলাম। মনে করিলাম, এইভাবে অদৃশ্য হওয়াতে হাতীটা খুব বেকুব বনিবে। কিন্তু ৫।৭ মিনিট পরেই নিজের ভ্রম বুঝিলাম। যখন উহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলাম, তখন দেখি, ঘটনাটা বড় বিষম হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ২।২॥ ঘণ্টা নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও যখন আমি বাহিরে আসিতে পারিলাম না, তখন আমি খুব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলাম। অবশ্য উহা আমার পক্ষে প্রকৃতই "অরণ্যে রোদন' হইল। কি করিয়া যে আমি সময় কাটাইয়াছি তাহা বোধ হয় ঈশ্বর ও আমি ভিন্ন আর কেহই ধারণা করিতে পারিবে না কখনও চীৎকার, কখন বাহিরে আসিবার চেষ্টা, কখনও। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, কখনও একবারে হতাশ হইয়া পড়া, কখনও নীরব নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকা প্রভৃতির কথা যখন আমার মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। এমন যন্ত্রনা জীবনে আর কখনও ভোগ করি নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যেন এমন যন্ত্রনায় আর না পড়িতে হয়। ওঃ! কি ভীষণ রাত্রি! রাত্রি যে এত দীর্ঘ হয়, তাহা আমার ধারণাই ছিল না। মনে হইতেছে যেন কত দীর্ঘকাল ঐ গাছের মধ্যে বাস করিয়াছি।"

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

দীনের আশ্রয়।

(১)

তখনও মণিকর্ণিকার ঘাটে হর-রাজধানীর জন মানবের নিত্যমান সমাধা হয় নাই। সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে সুরধুনী নীরে যে স্নানার্থীদিগের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে তাহা সমভাবেই চলিয়াছে। ঘাটের অগণিত সোপানাবলীর উপরে অজস্র জনস্রোত চলিয়াছে —বহু নরনারী স্নান, মার্জ্জন, সন্ধ্যা আহ্নিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। গঙ্গাতীরে নিত্য এই অগণিত জীব সমাগমের আনন্দময় অপূর্ব্ব শোভা চক্ষু ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী, প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবার বস্তু। এক সময়ে এক স্থানে এক উদ্দেশ্যে এত লোকের একত্র নিত্য সমাগম ভারতের আর কোথাও নাই—বুঝি জগতে আছে কি না সন্দেহ।

তখনও কত পুণ্যাভিলাষী অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধা নিমিলিত নেত্রে একমনে গঙ্গাস্তব আবৃত্তি করিতেছে, কত অন্ধ, খঞ্জ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দৈনিক উপার্জ্জনের আশায় দাতার প্রতীক্ষায়, 'মাই একটী পয়সা,' 'বাবা একটী পয়সা,' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। আবাল বৃদ্ধ বণিতার, সম্মিলিত কলকণ্ঠে মণিকর্ণিকার জল স্থল অতি মাত্রায় মুখরিত। সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাহার ক্ষুদ্র ঘটটী জলপূর্ণ করিয়া লইয়া শম্ভুনাথের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিবার জন্য নিতান্ত ক্লেশে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতেছিল। এমন সময় একদল যাত্রীর প্রবল তাড়নায় বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে গিয়া সোপানোপরি গড়াইয়া পড়িল। রমণীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সহসা দুইখানি সস্নেহ হস্ত আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধা উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল একটী প্রৌঢ়া আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। সে প্রৌঢ়া যেন করুণা ও মমতার প্রতিমূর্ত্তি। বৃদ্ধার ভীতিবিহ্বল করুণ প্রার্থনায় যেন সত্য সত্যই পাষাণ তনয়া বিরূপাক্ষের বক্ষোবিহারিণী অন্নপূর্ণা নামিয়া আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। বৃদ্ধার শরীর তখনও কাঁপিতেছিল, চক্ষু হইতে ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল।

প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা তোমার খুব লাগিয়াছে কি?"

বৃদ্ধা কোন উত্তর করিতে পারিল না, সে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আগন্তুক প্রৌঢ়ার প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন—"তোমার আত্মীয় স্বজন নিকটে কে আছে, কাকে ডাকিব? বাড়ী তোমার কোন মহল্লায় মা?"

ব্যথিতের বেদনায়ক্লিষ্ট করুণামাখা স্বর শুনিয়া বৃদ্ধার হৃদয় খুলিয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিল "আমার এ সংসারে কেউ নাই মা; আমার কেউ নাই।"

রমণী তেমনি স্বরে বলিল—"যার কেউ নাই তার যে তিনিই আছেন মা"।

সেই বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তিনি কি আছেন মা; তবে আজও কি দুঃখিনীর শাস্তি শেষ হইত না।"

খুব করুণ স্বরে রমণী বলিলেন—"মা এমন কথা কেন বলিতেছ? তোমার এমন কি কষ্ট; আমায় বলিতে কোন দোষ নাই মা! যদি কোন কিছু করিতে পারি।"

"তুমি আমার কি করিবে মা, বহু দূরদেশ হইতে, পরম দেবতা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার শ্রীপাদ দর্শন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া যাইব ভরসাতেই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম কাশীতে অনেক ছত্র আছে, তাহাতে কায়ক্লেশে চলিয়া যায়; এখন দেখিলাম, সে আমার ভাগ্যে নাই; বিশ্বেশ্বর দর্শনই আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না—অনাহারে মৃত্যুই আমার অদৃষ্টে লেখা আছে। অন্নপূর্ণা দয়া করিয়া যাহার জন্য দুটী অন্ন রাখেন নাই, বিশ্বেশ্বর যাহাকে দর্শন দিতে কুণ্ঠিত, মানুষ তাহার কি করিতে পারে মা!"

প্রৌঢ়া সম্ভ্রম ভাবে বলিলেন—"এ কথা কেন মা।"

নিজ উদর দেখাইয়া বৃদ্ধা বলিল "আজ তিনদিন এ উদরে কিছুই স্থান পায় নাই মা। হতভাগিনী আমি—"

"কেন? কোন্ ছত্রে তুমি যাও নাই মা? সেগুলি যে কেবল দীন দরিদ্রের জন্যই খোলা আছে। অন্নপূর্ণার দ্বারে আসিয়া আজ মা তুমি অন্নের জন্য হাহাকার করিবে, একি সম্ভব?"

"ছত্রে কি মা আমাদের ন্যায় দীন দুঃখীর স্থান আছে? আমি দুদিন সেখানে গিয়াছি কিন্তু কেউ মুখ তুলিয়া চায় না। পশ্চিমা দারোয়ানগুলা ছত্রে ঢুকিতে দেয় না। কিছু না দিলে কি মা বড় লোকের বাড়ীর চাকর পথ ছাড়ে। আমি পয়সা কোথা পাব মা।"

"আচ্ছা আমি তোমায় আজ এক ছত্রে ভর্ত্তি করিয়া দিতে চেষ্টা করিব; সে জন্য তোমাকে আর ভাবতে হবে না। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর আমরা স্নান করিয়া আসি।"

স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়া প্রৌঢ়া হাত ধরিয়া বৃদ্ধাকে লইয়া চলিলেন। কতদূর যাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন "মা এই বাড়ীতে আমি থাকি।"

প্রৌঢ়া বলিলেন "তবে মা তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি তোমার কি করিতে পারি তাহার জন্য এখনই চেষ্টা করিতেছি। আশাকরি বিশ্বেশ্বরও অন্নপূর্ণার কাশীতে তোমাকে আর উপবাস থাকিতে হইবে না।" প্রৌঢ়া সঙ্গিনীগণের সহিত চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা গৃহে আসিয়া ভাবিতে লাগিল এ রমণীর হৃদয়ে কত দয়া—কিন্তু সে আমার জন্য কি করিতে পারিবে? অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে যার অন্ন নাই, মানুষ তাহার কি করিতে পারে?

কিছুক্ষণ পরেই এক বিশালকায় পাঁড়ে ঠাকুর এক ভার-বাহকের স্কন্ধে ভার বোঝাই করিয়া চাউল, দাইল, তরি তরকারী, প্রভৃতিতে এক বিধবার সপ্তাহের আহার্য্য লইয়া আসিয়া সেই জীর্ণ বাড়ীর সম্মুখে ডাক হাঁক করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দরজা খুলিলে সে সেইগুলি তাহার জন্য রাখিয়া চলিয়া গেল। অযাচিত অপরিমিত দান সামগ্রী সম্মুখে দেখিয়া বৃদ্ধার দুই চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে বিশ্বেশ্বরের পরম মহিমা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া ভাবিল, এতদিনে সত্যসত্যই বুঝি মা অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

(২)

কাশীর বিশ্বেশ্বরের আরতি এক দর্শনীয় বস্তু। এমন হিন্দু নাই যে কাশীতে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শনের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে। হিন্দুর চির আকাঙ্খিত বস্তু——বিশ্বেশ্বরের আরতি। এই আরতির সময় বিশ্বনাথের প্রাঙ্গন, নাটমন্দির, সর্ব্বত্র লোকে লোকারণ্য হয়—তিল রাখিবার স্থান থাকে না। অযুত কণ্ঠের সমস্বরে সমতানে উচ্চারিত 'শিব শিব শম্ভো' রবে বিশাল পুরী মুখরিত হয়। বালক, বালিকা যুবকযুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা নানা বয়সের নানা প্রকারের অসংখ্য নরনারী তাহাদের হৃদয়ের দুঃখ শোক, ব্যথা বেদনা, আদিব্যাধি সেই পাষাণ দেবতার চরণ তলে নিবেদন করিয়া, ফল কামনায় নানারূপ মানত করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তখন অসংখ্য লোক মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করে।

কেহ কেহ বা বিফল মনোরথ হইয়া দূর হইতে বিশ্বনাথের চরণ উদ্দেশে বিল্বদল ছুড়িয়া দিয়া দিনকৃত্য শেষ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রবেশ ও বহির্গমনের জন্য যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োগে মাঝে মাঝে সেই জনসমুদ্র ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে। সে বিশাল জন সঙ্ঘ না দেখিলে অনুভব করিবার উপায় নাই।

বিশ্বেশ্বরের এই সান্ধ্য ধূপারাত, সমবেত বহু সহস্র নর-নারীর আর্ত্তকণ্ঠে উচ্চারিত 'শিব শিব শম্ভু' রব এবং তাহাদের অশ্রুভারাকুল বেদনাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি, দেখিলে, এধরণী যে ব্যথা বেদনা, দুঃখ শোকে, কত কাতর তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। দেবতার সম্মুখে উচ্ছ্বসিত পুত্র-হারা জনক জননীর শোকসন্তপ্ত আনন, প্রিয়জন বঞ্চিত, বিদীর্ণ-বক্ষ বিরহীর মুখচ্ছবি, বাঞ্ছিত লাভে বঞ্চিত জনের অরুন্তুদমূর্ত্তি এক মহান ভাব জাগাইয়া দেয়। দেবতার নিকট বেদনাক্লিষ্ট ব্যথিত প্রাণের দুঃসহ দুঃখের তপ্ত অশ্রুজল নিতান্তই ব্যর্থ হয় কি না জানি না, অন্নক্লিষ্ট অসহায় দরিদ্রের অশ্রুপাতে অন্নপূর্ণার মন করুণায় দ্রব হইয়া যায় কিনা বলিতে পারি না কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে, যখন মানুষের সকল উদ্যম, সকল যত্ন, ব্যর্থ হইয়া যায় তখন মানুষ একমাত্র আশাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া জীবন পথে চলিতে থাকে।

আমাদের সেই বৃদ্ধাও আজ বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া—ভগ্ন মনে চির আকাঙ্ক্ষিত তাহার দেবতা বিশ্বেশ্বরের দ্বারে ঢুকিতে না পারিয়া আশার পানে চাহিয়া বসিয়া আছে; যদি সময় হয়, সে দুঃসহ বেদনা বার্ত্তা কোন দিন শম্ভুনাথের চরণ তলে পঁহুছে, তবে কালে দেবানুগ্রহে তাহার দুঃখের আনন্দময় পরিসমাপ্তির দিন আসিবেই আসিবে।

আরতি শেষ হইয়াছে। একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে উঠিয়া নিরাশ হৃদয়ে বুক ভাঙ্গা দুঃখের বোঝা বহন করিয়া কম্পিত পদে ফিরিয়া যাইতে ছিল—হায় বহুদিন ঘুরিয়াও যে সে বিশ্বেশ্বরের কৃপা কণা লাভ করিতে পারিল না—চর্ম্ম চক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিল না—তাহার মতন হতভাগিনী কে?

আবার সেই ভিড়ের গোলমাল। বৃদ্ধা সঙ্কুচিত হইয়া এক দিকে সরিতে সরিতে পড়িতেছিল এমন সময় তাহাকে সতর্ক হস্তে সরাইয়া লইল—একটী স্ত্রীলোক। বৃদ্ধা দেখিল সে স্ত্রীলোকটী তাহার পরিচিতা। মণিকর্ণিকার ঘাটে পৌঁছার সঙ্গে সে ইহাকে দেখিয়াছিল। বিধাতা যেন এ বৃদ্ধারই রক্ষণাবেক্ষণে ইহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন।

স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল—"মা তুমি বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে পারিলে কি?"

বৃদ্ধা নিরাশ ব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিল— "না মা আমার অদৃষ্টে বুঝি শম্ভুনাথ দর্শন নাই।"

স্ত্রীলোকটী একটু নরমসুরে বলিল—"ব্যস্ত হইও না মা, নিরাশ হইবার কোন কথা নাই। কাল আমাদের রাণী মা অর্ঘ্য লইয়া মন্দিরে আসিবেন, তখন আমি তোমাকে লইয়া আসিব। নিরাশ হইও না মা, কায়মনোবাক্যে শম্ভুনাথের চরণে নির্ভর কর, দেখিবে শম্ভুনাথই দয়া করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন আশায় বৃদ্ধার প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গেল। সে তাহার দুই খানি হাত ধরিয়া বলিল—'মা তোমাদের দয়ার কথা আমি ভুলিতে পারিব না। বাবা বিশ্বনাথ তোমাদের ও রাণী মার মঙ্গল করুন।

স্ত্রীলোকটী বৃদ্ধাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—"আজ কি আহার করিলে মা?"

বৃদ্ধা তাহার মনোগত কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে স্ত্রীলোকটীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা তোমাদের কৃপায় আজ তিন দিন পরে পেট ভরিয়া খাইতে পারিয়াছি—জীবনটা মা তোমরাই রাখিলে।"

স্ত্রীলোকটী লজ্জিত হইয়া বলিল—"আমরা কি করিয়াছি মা, রাণী বিদ্যাময়ীর এ দান? আমরা রাণীমার দাসী; তাঁহার নিকট তোমার হাল জানাইয়াছি মাত্র। রাণী মা তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীতে এরূপ কত লোক তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। যা হউক মা, এখন আর অন্ন বস্ত্রের ভাবনা না ভাবিয়া কায়মনোবাক্যে বিশ্বনাথের চরণে স্মরণ লইয়া থাক।"

বৃদ্ধা গদগদ কণ্ঠে বলিল—'মা এমন করুণার মানুষ না হইলে কি রাজরাণী হওয়া যায়। বাবা বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে

অমর করুন, মা অন্নপূর্ণা তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখুন—"বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধা গৃহে আসিয়া শুনিল—কাল রাজ বাটীতে অন্যান্য ব্রাহ্মণ মহিলা ও কুমারীগণের সহিত তাহারও ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনের ন্যায় দীনের আশ্রয় রাণী বিদ্যাময়ীকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া রহিল।

(৩)

রাণী বিদ্যাময়ীর গৃহে মহোৎসব। আজ রাণী বিশ্বেশ্বরের চরণে সাপ্তাহিক অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। দ্বিপ্রহরে রাজবাটীতে বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। চারিদিকে আন—দাও—খাও—ব্যতীত আর অন্য কথা নাই। অন্ন, বস্ত্র ও অর্থের যেন লুট পড়িয়াছে।

বৃদ্ধা যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকেই লোকের কোলাহল। বাহিরে ব্রাহ্মণ ভোজন, ভিতরে কুমারী ভোজন,—সধবা ভোজন, বিধবা ভোজন। কেহ খাইতেছে, কেহ খাওয়াইতেছে—কার্য্যের বিরাম নাই। একদিকে অন্ধ আতুর অর্থ ও বস্ত্র লইতেছে, অন্য দিকে দীন দরিদ্র ভিখারীর দল ইচ্ছানুরূপ খাইতেছে ও খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইতেছে। এই অজস্র দান ও গ্রহণের দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া বৃদ্ধার প্রাণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। বৃদ্ধা তখন তাঁহার সেই হিতৈষিণী প্রৌঢ়া রমণীকে ও তাঁহার মুনিব, দীনের আশ্রয় রাণী বিদ্যাময়ীকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার নিকট প্রাণের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য আকুল ভাবে তাঁহাদিগকে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নানাদিক ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ সে এক স্থানে দেখিল তাহার সেই পরম হিতৈষিনী প্রৌঢ়া রমণীটী এক স্থানে দাঁড়াইয়া দরিদ্র স্ত্রীলোক ও বালঃবালিকা দিগকে দান করিতেছেন।

বৃদ্ধার দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র প্রৌঢ়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মা তোমার আহার হইয়াছে কি?

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার ধারা দরদর ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রৌঢ়ার হাত দুখানা ধরিয়া বলিল—"মা আর জন্মে তুমিই আমার মা ছিলে মা,—মার কাজ করিলে, অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিলে। এখন মা, এ দীনের আশ্রয় সেই রাণীমাকে একবার দর্শন করাইয়া দাও তাঁহাকে না দেখিলে আমার আহার হইবে না।"

প্রৌঢ়া তাহাকে আহারের জন্য লইয়া চলিলেন এবং যাইতে যাইতে বলিলেন—'তুমি আহারাদি শেষ করিয়া এই স্থানে অপেক্ষা করিও। ততক্ষণে রাণীমারও স্নান পূজা শেষ হইবে। তখন তাঁহার সহিত সুবিধা মত সাক্ষাৎ হইবে। আমিই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।'

বৃদ্ধা আহারে বসিলে, প্রৌঢ়া পরিবেশনকারীদিগকে এটা দাও—সেটা দাও বলিয়া বৃদ্ধাকে তৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন। বৃদ্ধা জীবনে এত আত্মীয়তা তাহার পরমাত্মীয়গণের নিকটও কখন প্রাপ্ত হয় নাই।

* * * *

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন ঝি আসিয়া বলিল "রাণী মা এখন অর্ঘ্য লইয়া যাইবেন, আপনাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছেন।"

বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। সে আনন্দ যেন তাহার হৃদয়ে ধরিতেছিল না। চলিতে চলিতে দুইবার পড়িয়া যাইতেছিল। ঝি তাহাকে ধরিয়া লইল।

প্রশস্ত কক্ষ আলোক-মালায় উদ্ভাসিত, তাহারই এক পার্শ্বে একখানা গালিচার আসনে নামাবলী গায়ে উপবিষ্টা দীনের আশ্রয়—রাণী বিদ্যাময়ী—হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর এখন—ব্যাপার সুনির্ব্বাহ করিয়া—রাণী মালা জপ করিতেছিলেন। কি সুন্দর সে রূপ—নাকে মুখে যেন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের ছায়া খেলা করিতে ছিল। পুণ্যের বিমলপ্রভায় সে আলোকদীপ্ত কক্ষকে যেন আরও উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে।

বৃদ্ধা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়িল। তার পর ঝি যখন তাহাকে রাণীর সম্মুখে আনিয়া বসাইল তখন বৃদ্ধা রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া দুই চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুধারা ত্যাগ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দেখিল—রাণী বিদ্যাময়ীই তাহার সেই মণিকর্ণিকা ঘাটের প্রৌঢ়া হিতৈষিণী। "মা তুমিই কি দীনের আশ্রয়—রাণী বিদ্যাময়ী"—বলিয়া বৃদ্ধা তাঁহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িল। রাণী তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি।

'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ' এই শ্লোক বাঙ্গালা দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী যে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয় নাই, ইহা একটী সত্য কথা। ব্যবসায় প্রবৃত্ত না হইলে যে ধনী হওয়া যায় না সে বিষয়ে কাহার ও দ্বিমত নাই। কিন্তু বাঙ্গালী তথাপিও ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয় না কেন? তাহার কারণ বাঙ্গালীর যে ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব তাহা নহে। বাঙ্গালীর যে ব্যবসায় বুদ্ধি আছে, তাহা বলাই আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইংরাজ এদেশে আগমন করিবার বহু পূর্ব্বে এবং মুসলমান আমলের ও পূর্ব্বে বাঙ্গালী যে ছোট ছোট তরী আরোহণ করিয়া সিংহল, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপে এবং চীন ও জাপানে কিছু কিছু পরিমাণে বাণিজ্য করিতে যাইত তাহার কতক কতক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রাম ও তমলুক বন্দর হইতে যে ঐ সব দেশে যাতায়াতের জন্য বন্দর রূপে ব্যহৃত হইত তাহাও ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। চীন দেশীয় "শ্যামপুন" নামক নৌকা এখনও চট্টগ্রাম জেলায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং চট্টগ্রামের "শুলুক" এখনও আকিয়াব ইত্যাদি স্থানে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা জাভা, সুমাত্রা, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর দেব মন্দির আবিষ্কার করিয়া অনেক পুরাতন কাহিনী লোক সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃতে রেশমের নাম "চীনাংশু"; তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চীন দেশীয় রেশম ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইত; সুতরাং ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ব্যবসায় উপলক্ষে চীন দেশের সহিত ভারতবর্ষের আদান প্রদান ছিল। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে এখনও বহু হিন্দুর বসতি আছে। যদি ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে তথায় গমনাগমন না থাকিত তাহা হইলে এই হিন্দুর বসতি এবং হিন্দুর দেব মন্দির প্রতিষ্ঠার কোনই উপায় দেখা যায় না। সুতরাং আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে বাঙ্গালী পূর্ব্বে ব্যবসায় বাণিজ্যে সুদক্ষ ছিল। বাঙ্গালার চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য কাহিনীও ইহার পোষকতা করিয়া থাকে।

মুসলমান রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালী ব্যবসায় বাণিজ্যে যে কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহার কোনও সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় ধীরে ধীরে তাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি তখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছিল। উপর্য্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণে এবং তৎকালীন রাজ্য শাসনের বন্দোবস্তের জন্য বোধ হয় বাঙ্গালী ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে আর অগ্রসর হইতে সক্ষম না হইয়া রাজকার্য্যে এবং বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া অবস্থার উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করিয়াছিল। চারি পাঁচ শত বৎসর এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ায় ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ইংরাজদিগের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইল না।

ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালী জাতিই প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিল এবং ইংরাজের অধীনে চাকুরি স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগের বাণিজ্য-প্রসারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। হুগলি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইরাজদিগের যে কুঠী ছিল তাহাতে বাঙ্গালী তাঁহাদিগের প্রধান সাহায্যকারী ছিল। কলিকাতায় যখন ইংরাজ প্রথম কুঠী স্থাপন করেন, তথায়ও তাহাদেরই বাঙ্গালীর সাহায্য লইতে হইয়াছিল। ইংরাজ বাঙ্গালা দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং তাহার পরিচালনার জন্য ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে বাঙ্গালীকে নানা ভাবে তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু এইরূপ একটী বাণিজ্য প্রধান জাতির সহিত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংস্পর্শিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালী "কেরাণীজাতিই" রহিয়া গেল, ব্যবসায় বাণিজ্যে বুদ্ধি পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে বহুদূর দেশ হইতে মাড়োয়ারীগণ আসিয়া ইংরাজদিগের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহারাই কলিকাতা সহরে ধনী ব্যক্তিসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তখনকার বাঙ্গালীগণ এমন সুন্দর সুযোগ অবহেলায় পরিত্যাগ করায় তাঁহাদিগের বংশধরগণকে যে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা এখনকার মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদিগের অবস্থার বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে

পারিবেন। পূর্ব্ব পুরুষগণ যে চাকুরির পন্থা ধরাইয়া দিয়া গেলেন, ভবিষ্যদ্ বংশীয়গণ সেই পথই অনুসরণ করিতে লাগিলেন, অর্থোপার্জ্জনের কোনও নূতন পন্থা অবলম্বন করার সাধ্য আর তাঁহাদের থাকিল না। এইরূপে একটী বুদ্ধিমান জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার রহিয়া গেল।

কিন্তু ইংরাজদিগের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে একেবারেই কোনও রূপ ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হই নাই একথা বলা চলে না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজগণ বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলে নীলের কুঠী স্থাপন করিয়া নীলের চাষ প্রবর্ত্তন করেন। নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলায় অনেক নীলের কুঠী স্থাপিত হয়। তাঁহাদিগের দেখা দেখি অনেক বাঙ্গালী স্বয়ং অথবা যৌথ কারবার স্বরূপ নীলের কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ই, বি, এস, রেলওয়ের কুষ্টিয়া ও পাংসা ষ্টেসনের নীচ দিয়া যে গড়াই এবং চন্দনা নদী প্রবাহিত, তাহার দুই ধারে এক সময়ে বাঙ্গালীদিগের নিজের নীলের কুঠী ছিল এবং তাহা হইতে তৎকালীন তাহাদিগের স্বত্বাধিকারীদিগের প্রচুর পরিমাণে আয় হইত। সাহেব দিগের বিরুদ্ধে যশোহরে যে নীল বিদ্রোহ হয় এবং দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণের" ইংরাজী অনুবাদ করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হন, তাহার ইতিহাস বোধ হয় অনেকেই জানেন। তাহার ফলে সাহেব দিগের নীলের ব্যবসায় বাঙ্গালাদেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহার অনেক বৎসর পর পর্য্যন্তও নীলের কারবার চালাইয়া আসিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৯৩—৯৪ সাল পর্য্যন্তও আমাদিগের নিজের নীলের কুঠী ছিল; কিন্তু জার্ম্মনীর বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক উপায়ে নীলের রঙ্গের মত রং প্রস্তুত করিতে সক্ষম হওয়ায়, অতি সস্তাদরে তাহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং আসল ভেষজ হইতে নীল উৎপন্ন করিতে যে পরিমাণে ব্যয় বাহুল্য হইত, তাহা জার্ম্মণীর রসায়ণ শাস্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত নীল রংয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইল না। আমাদিগের নিকটবর্ত্তী কুঠী সমূহের নীল প্রতি মণ ৪০০৲ টাকার পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নীল অতি অল্প দামে বিক্রয় হওয়ায় বাঙ্গালী দিগকে এই ব্যবসা আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করিতে হইল। যৌথ কারবারের পরিসর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ার যে আশা ছিল তাহা নিভিয়া গেল। হঠাৎ তাহাদিগকে কারবার বন্ধ করিতে হইল। তাহার ফলে বহুশত পরিবার অন্য কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে না পারিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইল। রাসায়নিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়াও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালাদিগকে নীলের চাষ ও সেই ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতে দেখা গিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি নাই, এ কথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নাহি।

নীলের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবার পর বাঙ্গালী জাতি এখন চায়ের ব্যবসায় যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বোধহয় অনেকে অবগত নহেন। জলপাইগুড়ি জেলার তিস্রোতা নদীর অপর পারস্থিত ডুয়ার্স নামক স্থান ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভুটান রাজকে পরাজিত করিয়া অধিকার করিয়াছেন। প্রথমে ইংরাজগণ সেস্থানে কতকগুলি চা বাগান প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার পর হইতে অনেক বাঙ্গালী উকীল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ নিজেদের মধ্যে যৌথ কারবার গঠন পূর্ব্বক অনেক গুলি চা বাগান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই বাগান গুলি এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতেছে, এবং তাহার যশ এরূপ ভাবে চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে এবং এইরূপ বিশ্বস্তার সহিত তাহার কার্য্য কলাপ চলিতেছে যে বহু ইংরাজ সেই সব কারবারের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। কোনও নূতন যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার অংশ গ্রহণের জন্য লোক এত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে স্বল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার সমস্ত অংশ বিক্রয় হইয়া যায়। এক মাস মধ্যেই ৫০৲ টাকার অংশ ৬০৲ টাকার বিক্রীত হইতে থাকে। এই কারবারের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন আয় বার্ষিক শত করা ৩০৲ টাকার কম নহে। কোনও কোনও যৌথ কারবার বার্ষিক শতকরা দেড় শত টাকা দুই শত টাকা মুনাফা দিয়া থাকেন। জলপাইগুড়িতে এমন কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন, যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও চায়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া গুলি অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং এই সমস্ত

রাসায়নিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে তাঁহারা ইংরাজ কার্য্য দক্ষগণ হইতে কোনও অংশে হীন নহেন। তাঁহারা চা বাগান সম্বন্ধে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন যে ইংরাজ কার্য্য দক্ষগণও তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং তাঁহাদিগের বাগানে অংশ গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা বাঙ্গালীদিগকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। জলপাইগুড়ি জেলায় অনেকগুলি চা বাগান এইরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বাঙ্গালীর যৌথ কারবারের গৌরব দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যে কেহ ঐ সমস্ত বাগান পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গালী কিরূপে যৌথ কারবার চালাইতে সক্ষম তাহার পরীক্ষা করিতে পারেন। জলপাইগুড়ি অবস্থান কালীন ঐ সমস্ত বাগান সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি নাই এবং বাঙ্গালী ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি করিতে সক্ষম নহে, একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। দার্জ্জিলিঙ্গে ও আসাম প্রদেশে বাঙ্গালীদিগের কতকগুলি চা বাগান আছে। সে গুলিরও অবস্থা ভাল; সুতরাং এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে যে বাঙ্গালীর আয়ের পথ সুগম হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। জলপাইগুড়ির চায়ের বাগানে যাঁহাদের দুই হাজার টাকার অংশ আছে, তাঁহারা ঘরে বসিয়া অতি সহজেই তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা বাৎসরিক মুনাফা পাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে বাগানগুলি কিরূপ সুন্দর ভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বাঙ্গালার অনেক জেলার সদরে যে লোন আফিস (Loan office) বা ব্যাঙ্ক (Bank) আছে সেই গুলি অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। বর্দ্ধমান ইত্যাদি জেলায় অনেক বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার ব্যবসায় আছে; তাঁহারা নিজেদের কয়লার কুঠী স্থাপন করিয়া কয়লার ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। কেহ কেহ বা যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়া কয়লার কুঠী পরিচালনা করিতেছেন। বীরভূম, গিড়িডি প্রভৃতি স্থানে অনেকে গালার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের ব্যবসাতে ও অনেক বাঙ্গালী নিযুক্ত থাকিয়া নিজেদের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আসাম প্রদেশে অনেক বাঙ্গালী এণ্ডী ও মুগার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। বাঙ্গালী সেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইলে বোধ হয় এণ্ডী ও মুগা ইত্যাদির ভদ্র সমাজে প্রচলন এত সহজে সাধিত হইত না। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল যে রেশমী রুমাল ব্যবহার করিতেন এবং যাহার প্রশংসা করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হয়েন নাই সেই রেশমের ব্যবসায় ও বহরমপুরে বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দৌল্লার সময়ে এই বহরমপুরেই রেশমের ব্যবসায়ের জন্য ইংরেজ দিগের কুঠী ছিল। বাঙ্গালী একটু যত্ন করিলেই এই রেশমের ব্যবসায়কে পুনরায় ইহার পূর্ব্ব স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। বাঙ্গালী যেরূপ ভাবে উপর্য্যুক্ত ব্যবসায় পরিচালন করিতেছেন তাহাতে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি নাই ইহা বলা চলে না।

পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ভোলা বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। যতদূর জানি ভোলা মহকুমার সেই ক্ষুদ্র কল ও ব্যবসায় দেখিয়া বঙ্গের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল, ঢাকা ডিভিসনের কমিশনর, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ হর্ণেল প্রমুখ বড় বড় রাজ কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। সেই কলের পরিচালক অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত নহেন এবং কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ না করিয়া তিনি সেই কল যেরূপ ভাবে চালাইতেছেন তাহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে বাঙ্গালী কোন ও কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে সহজেই আপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারে।

পাবনা শিল্প সমিতির কার্য্য বেশ সুন্দররূপে চলিতেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় দ্বারা বাঙ্গালীর যে বহু পরিমাণে উপকৃত হওয়ার কথা তাহাতে দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। উপরি উক্ত ব্যবসায় গুলি ব্যতীত কয়েক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবনীর দিকে লক্ষ্য করিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি এখনও লুপ্ত হয় নাই। সর্ব্বাগ্রে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম অতি গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সামান্য ওভারসিয়র (Overseer) হইতে 'মার্টিন কোম্পানী' নামক

বিখ্যাত ব্যবসায়ীর একজন বিশিষ্ট অংশীদার হইয়াছেন। স্বকীয় চরিত্র এবং ব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধিই তাঁহার এই উন্নতির মূল। বিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পালের জীবনী হইতেও কি প্রকারে সামান্য অবস্থা হইতে একজন প্রতিভাবান্ ব্যবসায়ী পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় তাহা অবগত হওয়া যায়। বটকৃষ্ণ পালের ঔষধের দোকান শুধু বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই বড় দোকান বলিয়া পরিগণিত নহে। শুনিতে পাই অনেক সময়ে অনেক বড় বড় ইংরেজ ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারিগণও অভাবে বটকৃষ্ণ পালের দোকান হইতে ঔষধ লইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের এইচ, বসু এবং কুমিল্লার মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম অনুল্লেখযোগ্য নহে। বাঙ্গালী ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া কি প্রকারে ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করিতে সক্ষম হয়, উক্ত বসু মহাশয় এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। কলিকাতার লাহা এবং ভাগ্যকুলের কুণ্ডু বংশও ব্যবসায়ে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এই সব হইতেই সহজে প্রতীয়মান হয় যে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাঙ্গালীর ব্যবসা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এবং 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ' জানিয়াও বাঙ্গালী ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে না কেন? তাহার কতকগুলি কারণ আছে; যথা—(১) অর্থহীনতা,(২) সমাজের চক্ষে ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ীর অনাদর এবং সমাজে তাহাদের নিম্নস্থান, (৩) একতার ও বিশ্বস্ততার অভাব এবং সর্ব্বোপরি (৪) অলসতা।

পরের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয়, যদি বাঙ্গালী সেই পরিমাণ পরিশ্রম নিজের ব্যবসায়ের জন্য করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের উপর কঠোর শাস্তির বিধান না করিলে আমরা পরিশ্রম করিতে বিমুখ। যে সমাজে দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসায়কে উচ্চস্থান দেওয়া না হয়, সে সমাজের স্বাস্থ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে সমাজের মতি গতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

বাঙ্গালীর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, সমবায় ইত্যাদি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না তাহার কারণ বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব নয়—একতা ও বিশ্বস্ততার অভাব। আমরা যে কাপড়ের কল চালাইতে সক্ষম তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্। সেটীও একটী যৌথ কারবার। কেহ কেহ নিজের স্বার্থ সাধন করিতে যাইয়া জাতীয় উন্নতির গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়া যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালীর যে কলঙ্ক ঘোষিত হইয়াছে সে কলঙ্ক মোচন করিতে বাঙ্গালীকে অনেক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

হোয়াইট্ওয়ে লেড্ল, রেলি ব্রাদার্স ইত্যাদির অংশীদার ও স্বত্বাধিকারিগণ সাত সমুদ্র তের নদী পারে ইয়োরোপে বসিয়া আছে, আর এখানে তাহাদের ব্যবসায় সুন্দররূপে চলিতেছে। তাহার কারণ শুধু যে ব্যবসা বুদ্ধির প্রখরতা তাহা নহে, কর্ম্মচারিগণের বিশ্বস্ততা এবং স্বত্বাধিকারীগণের সেই বিশ্বস্ততার উপর নির্ভরতা। আমরা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশ সাধন করি এবং হয়ত কিছু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া নিজেরা ধনী হই। কিন্তু তাহাতে দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ হয়। বিদেশী বণিকগণের কর্ম্মচারিগণ যে কিছু আত্মসাৎ না করে তা নয়, কিন্তু তাহারা ব্যবসায়ের মূলচ্ছেদ করে না। তাহারা ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ সাধন না করিয়া যাহা আত্মসাৎ করে তাহাতেও স্বত্বাধিকারিগণের আয় বজায় থাকে। আমাদের এই সব দোষ ক্ষালন না হইলে ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব না এবং এখন যে দরিদ্র ও পরসেবী জাতি সেই দরিদ্র ও পরসেবী জাতিই থাকিয়া যাইব। একতা এবং বিশ্বস্ততায় কি পরিমাণে সফলতা লাভ করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙ্গালীর চক্ষের উপরে ইংরেজদিগের ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই দৃষ্টান্তের যদি কোনও অনুকরণ আমরা না করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগের শিক্ষার কোনও ফল হয় নাই বুঝিতে হইবে। অর্থহীনতা অবশ্য বাঙ্গালীর আছে কিন্তু একাগ্রতা ও উদ্যোগে সেই অসুবিধার দূরীকরণ হইতে পারে। বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি আছে কিন্তু ব্যবসায়ীকে উচ্চস্থান দেওয়ার প্রবৃত্তি নাই; সুতরাং বাঙ্গালী ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে না। উপর্য্যুক্ত বাধা বিঘ্নগুলি দূরীভূত হইলে বাঙ্গালী অনায়াসেই ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। এখন এই বাধাগুলি যাহাতে দূরীভূত হয় বঙ্গ-সমাজের তাহা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

রুশ-রমণী।

সম্প্রতি রুশিয়াতে রমণীগণ পুরুষদের সহিত সমভাবে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য তুমুল আন্দোলন করিতেছেন। কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রুশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডের "সিটিহলে" রমণীদের একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে রমণীগণ মিউনিসিপালিটী ও মন্ত্রণা সভা প্রভৃতির নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন। রুশিয়ার বর্ত্তমান অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট যদিও এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই, তথাপি মন্ত্রিদের অনেকেই রমণীদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আশা করা যায় যে, রমণীগণ অচিরেই ভোট দিবার অধিকার লাভ করিবেন। স্ত্রী স্বাধীনতা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটী বিশেষত্ব। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রমণীগণ আন্দোলন করিয়াও এ পর্য্যন্ত তেমন কোন সুবিধাজনক অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। রুশিয়াতে রমণীগণ পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার পাইলে কিরূপ ফল প্রসব করে সমগ্র সভ্যজগৎ তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে।

রুশিয়ার নারীজাতির বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার গোড়া খুজিতে গেলে আমাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ রুশ সম্রাট পিটারের (Peter the Great) রাজত্বকালে উপস্থিত হইতে হয়। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে রুশিয়ার রমণীদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। পিটার জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণকালে ঐ সকল দেশের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বপ্রকারের সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি তৎকালে রমণীদের অবরোধপ্রথা ও ঘোমটা দেওয়ার নিয়ম উঠাইয়া দেন এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন করেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে রুশিয়াতে স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। রুশিয়ায় এতকাল যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী প্রচলিত থাকিলেও ইউরোপের পশ্চিমাংশের দেশগুলির চেয়ে অনেক পূর্ব্বেই রুশিয়াতে রমণীগণ উচ্চ শিক্ষার অধিকার লাভ করেন। বাস্তবিক অনেককাল ধরিয়াই তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং পুরুষদিগের সহিত একযোগে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপি যে মহাসমর চলিতেছে, তাহার প্রারম্ভ হইতেই রুষ রমণীগণ নিজেদের শক্তি ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতেছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হইতেই রুশ রমণীগণ প্রকৃত মাতার কাজ করিয়া আসিতেছেন। রাজবিধির সহায়তা গ্রহণ করিয়া নগরে নগরে তাঁহারা মদের দোকান উঠাইয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে সর্ব্বসাধারণ বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া মিতব্যয়ী হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ফলতঃ রুশ-রমণীগণের চেষ্টায় রুশিয়া হইতে এখন অনেক পাপের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধে তাঁহারা বিশেষ বীরত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন। অনেক রুশ-রমণী ছদ্মবেশে—পুরুষের সাজ ধরিয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। শত শত রমণী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল রমণীর মধ্যে কষাক বালিকা হেলেন ডোবা ও কুমারী টমিলক ক্ষয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিগত রুশ রাষ্ট্র বিপ্লবে ও রুশ রমণীগণ বিদ্রোহীদের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। যে সকল রমণী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, অথবা যাঁহারা গোলা বারুদের কারখানায়, যৌথ ভাণ্ডার প্রভৃতিতে নিযুক্ত ছিলেন বা পরিচারিকার কাজ করিতে ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ বিপ্লববাদীদের সহায়তা করিতে অগ্রসর হন।

বিদ্রোহের দিনে রমণীগণ সৈন্য ও শ্রমজীবীদের সহিত শোভা যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় যোগদান করিয়াছিলেন। আর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের বেশ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে তাঁহারা ডোমাতে যাইয়া পুরুষদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রেসকো বেস্কভেইয়া নাম্নী জনৈক রমণী বিপ্লবে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া "বিপ্লবের পিতামহী" ("Grand-mother of revolution") আখ্যালাভ করিয়াছেন। শত শত রমণী সৈন্যদের সহিত ডোমাতে যাইয়া সমবেত হইতেন ও মন্ত্রণা সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন। অনেক অল্প বয়স্কা রমণী রাজপথে দাঁড়াইয়া উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিদ্রোহী সৈনাদের আহার যোগাইবার জন্য স্থানে স্থানে অস্থায়ী ভোজনাগার স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল ভোজনাগারে শত শত রমণী পরিচারিকার কার্য্য করিয়াছেন এবং একজন সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা ইহাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিটিকাউনসিলে (City Council) কয়েক জন রমণী সদস্যা নিযুক্তা হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কাউণ্টেস পেনিন, শ্রীমতী মিলিউকোভা, টিরকোভা ও সিসকিনা মভিনের নাম উল্লেখ যোগ্য। সকলশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যেই সভা সমিতির একটা ধুম পড়িয়া যায়। স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে অনবরত সভার অধিবেশন চলিতে থাকে এবং মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলের মধ্যে বিতর্কের ঝটিকা বহিতে থাকে। মধ্যপন্থীগণ স্ব স্ব কার্য্য গ্রহণ করতঃ অপ্রতিহত বেগে যুদ্ধ চালাইতে ও অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হন এবং পরিশেষে তাঁহাদের মতই পরিগৃহীত হয়।

বয়স্কা নারীদের যেমন রাজনীতি আলোচনার জন্য সভা সমিতি আছে। বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদের মধ্যে ও শিক্ষকদের নিকট নিজেদের অসন্তোষ ও অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য প্রতিনিধি সভা আছে। রাজধানী পেট্রগ্রাডে বালিকাদের একটী সম্মিলনী আছে। তাহার কোনও একটী অধিবেশন উপলক্ষে একটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ের বালিকাকে প্রতিনিধি পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এক নোটীশ দ্বারা পূর্ব্বাহ্নেই জানাইয়া দেন যে, যদি কেহ ঐ সভায় যোগ দানের জন্য পেট্রগ্রাডে যায় তবে তিনি বিদ্যালয় হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু এই বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও বালিকারা ঐ সভায় যোগদানের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে। অবশেষে শিক্ষয়িত্রী তাহাদের অবাধ্যতা ক্ষমা করিতে বাধ্য হন।

বর্ত্তমান রুশিয়ার সকল শ্রেণীর নারীদের মধ্যেই একটা জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় অচিরেই নব্য রুশ গভর্ণমেণ্ট রুশ রমণী দিগকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। এবং রুশিয়াতে সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রাধান্য লাভ করিবে। কিন্তু তাহাতে সমাজ কতদূর লাভবান হইবে এক মাত্র ভবিষ্যৎই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক।

গ্রন্থ সমালোচনা।

আদালত প্রবেশিকা—শ্রীমঙ্গলানন্দ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।১০ পাঁচ সিকা।

আজকাল সকলের পক্ষেই কিছু কিছু আইন কানুন জানা থাকা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আইন সংক্রান্ত সামান্য কোন বিষয়ের জন্য যাহাতে উকীল মোক্তারের নিকট দৌড়িতে না হয় গ্রন্থকার সেই অভাব দূরীকরণমানসে এই গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের এই খণ্ডে তিনি দলিল সংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দেখিয়া সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও অনায়াসে দলিল সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি পরিস্কার ভাবে বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থের একটী বিষয় নির্ব্বাচন সূচী দিলে ইহার সৌষ্ঠব আরও বৃদ্ধি পাইত।

মাধবাচার্য্য।

কর্ম্মখালি।

ময়মনসিংহ সিটিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ভাদ্র ১৩২৪ সন। একাদশ সংখ্যা

আলোচনা ও মন্তব্য।

জীবনের মূল্য— সম্প্রতি কাগজে দেখা গেল, অধ্যাপক বার্ণেট্ (Prof. Burnet of St Andrews), নামক একজন ইংরেজ একখানি বইয়ে জার্ম্মণীর শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন। মূল বইখানা দেখিবার সুবিধা আমাদের হয় নাই। তবে, সমালোচনায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটা আভাস দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মণীর অন্যান্য লোক অপেক্ষা স্কুলের শিক্ষকেরা, গড়ে চার বৎসর পূর্ব্বে মারা যায়; বিশেষতঃ স্কুলে যারা ভাষা শিক্ষা দেয়, তাহাদের আয়ু অন্যান্যের আয়ু অপেক্ষা গড়ে দশ বৎসর কম। আমাদের দেশে শিক্ষকদের আয়ু গণনা করা লোকে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না; করিলে ফল কি দাঁড়াইবে, বলা কঠিন।

বার্ণেট যে আর একটী কথা বলিয়াছেন তাহা আরও গুরুতর; এবং সে বিষয়ে আমাদের দেশের অবস্থাও আমাদের একেবারে অজ্ঞাত নহে। তথাকার ইস্কুল সমূহে নাকি পড়ার এমনই চাপ যে, যে সকল ছেলের তেমন বুদ্ধি শুদ্ধি নাই তারা এই পড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গলায় ছুড়ি দেয় কিংবা ফাঁস দিয়া মরে। সত্যই যদি শিক্ষারূপের "নির্ম্মম চক্রপেষণে বালকদের জীবন এই রূপে বিনষ্ট হয়, তবে যে কোন দেশের পক্ষে সেটা অমঙ্গলের লক্ষণ। আত্মহত্যার সংখ্যা দেখিতে দেখিতে এ দেশেও অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। এদেশে শুধু খাটিতে খাটিতে হয়রাণ হইয়াই যে ছেলেরা গলায় দড়ি দিয়া কিংবা আফিং খাইয়া দুর্ব্বহ জীবন শেষ করে, ইহা বলা কঠিন। যে পরিমাণ পাঠ আমাদের ছেলে দিগকে করিতে হয়, মাঝারি রকমের বুদ্ধিমান্ ছেলেদের পক্ষে তাহা যে খুব বেশী, এ কথা এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই। তবে যে এরূপ আত্মহত্যা হয় তাহার কারণ অন্য।

আমাদের সমাজে লোকের জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ, করিবার একটা নূতন প্রণালী গৃহীত হইয়াছে। যাহারা স্কুলের কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে না, তাহাদের জীবনের কোন মূল্য আছে, এ কথা যেন সচরাচর লোকে স্বীকার করিতে চায় না। ছেলেদের মধ্যে যে এত আত্মহত্যা হয়, ইহাই বোধ হয় তাহার অন্যতম কারণ। একটা পরীক্ষায় ফেল হইলেই ছেলে মনে করে তাহার জীবন বৃথা। যেহেতু সে বলিতে পারে না, মিলটন কোন একটা কথা কয়বার ব্যবহার করিয়াছেন কিংবা 'কারণ' বলিতে মিল কি বুঝেন, কিম্বা ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন্ কেন জিতিতে পারেন নাই,—সুতরাং তাহার বাঁচিয়া থাকা বৃথা। ঠিক এই একটা ধারণা দেশে ঢুকিয়াছে বলিয়াই দেশের ছেলেদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব এত বেশী। এজন্য শুধু ছেলেদিগকে দোষী করা ভুল; ছেলেদের পিতা মাতাই এর জন্য বেশী দায়ী। পয়সা খরচ করিয়া অতি কষ্টে পিতা ছেলেকে স্কুলে কিম্বা কলেজে পড়ান; তারপর, ছেলে যদি পরীক্ষাটা পাশ করিতে না পারে, পিতা মনে করেন তাঁহার পুত্র নিতান্তই কুসন্তান; এত এত ছেলে তরিয়া গেল, সে পারিল না, সুতরাং সে যে একটী গর্দ্দভ সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

কিন্তু বাস্তবিক কি ইহা ঠিক? আমাদের দেশে সম্প্রতি নানা বিষয়েই সব বিপরীত বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছে ; এই ধারণাও তাহাই প্রমাণ করে। একটা মানুষের জীবনের মূল্য একটা বইয়ে কি লেখা আছে তার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে—এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা! অথচ ইহা যে ভুল তাহা আমাদের মনে হয় কি?

পিতা হয়ত মনে করিবেন, এত এত ছেলে যাহা পারে, আমার ছেলে তাহা পারিবে না কেন? এতজনে যাহা পারে তাহা যখন সে পারে না, তখন সে নিশ্চয়ই ভৎ'সনীয়, —তাহার জীবনের আবার মূল্য কি? সে করিবে কি? ছেলেও হয়ত মনে করে, এত লোকে যাহা করিতে সমর্থ তাহা যখন আমি পারিলাম না, তখন ভগবান আমাকে নিশ্চয়ই কোন ক্ষমতা দেন নাই ; আমার এই ব্যর্থ জীবন—পরিবার এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই একটা দুর্ব্বহ ভার মাত্র। কিন্তু পিতা পুত্র উভয়ই ভুলিয়া যান যে, ভগবান সকলকে ঠিক একই কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া পাঠান নাই। পাখীর মত আকাশে উড়িতে পারে না বলিয়া সকল মানুষই যদি মন খারাপ করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে কি চমৎকারই না হইত? অথচ কোনও একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না বলিয়া ছেলের জীবন যে কেন মূল্যহীন হইবে তাহা বুঝা কঠিন।

এই ভুলের কারণ হয় ত ব্যর্থকাম পিতা পুত্রের চিন্তা-শক্তির ন্যূনতাই শুধু নয় ; সমস্ত সমাজ বন্ধনের মূলে হয় ত ইহার শিথর রহিয়াছে। কেহ যদি একটী প্রকাণ্ড চৌতালা বাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহাতে একটী মাত্র দরজা রাখে। তবে সকলেই তাহাকে বেকুব বলিবে। অথচ আমাদের এত বড় সমাজের এত সব ব্যবসায় প্রভৃতিতে ঢুকিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নামক একটী মাত্র দরজা যে আমরা করিয়া রাখিয়াছি, তাহা কি খুব বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? যে ব্যক্তি কালেক্টরীর জমা খরচের হিসাব রাখিবে তাহার পক্ষে ডল্‌টনের (Dalton) পরমাণুবাদ কিংবা বৃত্তকে চতুর্ভুজে পরিণত করিবার চেষ্টা কি কাজে আসিবে বলা কঠিন। অবশ্যই একটা শিক্ষা তাহার হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার চিত্তবৃত্তি সমূহ মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয়, এবং যাহাতে তাহার বুদ্ধি বিকশিত হইবার অবকাশ পায়। কিন্তু তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত না গেলেও চলে। এইরূপে আবশ্যক অনাবশ্যক, অধিকার—অনধিকার, ক্ষমতা—অক্ষমতার বিচার না করিয়া সকলকেই যে এক গোয়ালে পুরিয়া দিয়া বাছনীর যে একটী মাত্র পন্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা একটা অতি গুরু ভুল। এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য গবর্ণমেন্টের দপ্তরে তাহার বিচার চলিতেছে, কিন্তু দেশের লোকে একটুও ভাবে না, ইহাই আশ্চর্য্য। দেশের লোকে শুধু বলে আরও কলেজ চাই ; কলেজে ঢুকিয়া যারা ফিরিয়া যায় এবং ব্যর্থ কাম হইয়া হয় ত বা আত্মহত্যাও করে, তাদের সেখানে ঢুকিবার কি যে প্রয়োজন ছিল, তাহা কেহ বিবেচনা করে না।

এই হইল সমস্ত ভাবে সমাজের দিকের কথা। কিন্তু ব্যস্ত ভাবে ব্যক্তির ধারণার মূলেও যে একটা প্রকাণ্ড ভুল রহিয়াছে তাহাই অধিক অনিষ্ট কর। পরীক্ষায় দুই নম্বর কম পাইলে ছেলে আসিয়া শিক্ষকের কাছে যে ভাবে করুণার আকাঙ্ক্ষী হয়, ফাঁসির হুকুম হইলে আসামী তাহার জীবনের জন্যও রাজার নিকট তেমন ভাবে করুণা ভিক্ষা করে না। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়া আসিয়াছে? একটা চেষ্টা করিলাম ; পরীক্ষায় বুঝা গেল, আমার তাহাতে সাফল্য হয় নাই ; অবসর বা ক্ষমতা থাকিলে আবার করিব ; নয় ত, অন্য দিকে মন দিব ; একটা পরীক্ষায় সুবিধা হয় নাই বলিয়াই সমস্ত জীবনটা আমার শূন্য হইয়া গেল, এমন নয় ; কিংবা আমি সব বিষয়ে সকলের কাছে হীন হইয়া গেলাম, এমনও নয়। এই হইল স্বাভাবিক চিন্তার গতি। অভিভাবক এবং অভিভাবক কর্ত্তৃক অভিভূত ছাত্র, কেহই একথা মনে করে না বলিয়াই, দেশে অনর্থক কতকগুলি মূল্যবান জীবন বছর বছর নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কবি কঙ্ক ও তাহার বিদ্যাসুন্দর।

কঙ্কের জীবনী। (২)

এই সময় গোচারণ ভূমির এক পার্শ্বে, এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ তলে, পাঁচ জন শিষ্য লইয়া এক পীর আসিয়া "দরগা" স্থাপন করিলেন।

পীরের চরণ দর্শনার্থ বহু হিন্দু মুসলমান, সেখানে যাতায়াত করিত, অনেকে দরগায় সিন্নি মানত করিত। কঙ্ক প্রত্যহ গোচার ভূমিতে সুরভিকে ছাড়িয়া দিয়া, অন্যান্য রাখাল বালকগণের সঙ্গে পীরের চরণ দর্শনার্থ যাইতেন। ক্রমে পীরের সঙ্গে কঙ্কের পরিচয় হইল। এই পরিচয়ের প্রথম এবং প্রধান কারণ কঙ্কের সুমধুর কণ্ঠস্বর ও বাঁশীর গান। কঙ্কের সুমধুর বংশী ধ্বনিতে তখন গোষ্ঠ ভূমি মুখরিত। যে বৃক্ষতলে তাহার সেই কিন্নর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, আকাশ ছাড়িয়া উড়ন্ত পাখী সকল নীরব কাকলীতে সেই বৃক্ষ ডালে আসিয়া উড়িয়া বসে।

"রাখানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন বেণু।
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ছুটে আসে গোষ্ঠের যত ধেনু॥
আহা রে কঙ্কের বাঁশী ধরে কত মধু।
কাঁকের কলসী ভূমে থুইয়া শুনে কুলবধূ।"

কবলিত তৃণরাশি ফেলিয়া, উৎকর্ণ, ধেনু সকল স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসে। কাঁকের কলসী ভূতলে রাখিয়া, মুগ্ধা কুলবালাগণ সেই সুমধুর স্বর সুধা পান করিয়া বিভোর, নিস্পন্দ হইয়া পড়ে।

কঙ্ক একদিন, তাহার স্বরচিত মলয়ার বারমাসীটী গান, করিয়া পীরকে শুনাইলেন। শুনিয়া পীর মোহিত হইয়া পড়িলেন।

"জহুরী জহর চেনে বেনে চেনে সোণা।
পীরপ্যাগাম্বরে চেনে সাধু কোন জনা।"

একেত কঙ্কের দেব তুল্য উজ্জ্বল সৌম্য মূর্ত্তি, তদোপরি তাহার সম্মোহন কণ্ঠস্বর, সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির সমাবেশ; মণিকাঞ্চনের অভূতপূর্ব্ব সম্মিলন সন্দর্শনে, পীর তাহাকে শিষ্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কঙ্কও পীরের আশ্চর্য্য ক্রিয়া কলাপ দর্শনে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার অদ্ভুত মোহিনী মন্ত্রে এমন মোহিত হইয়া পড়িলেন, যে অচিরেই জাতি ধর্ম্ম ভুলিয়া, কঙ্ক ফকিরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কথাটা কিন্তু গর্গ পণ্ডিতকে জানিতে দেওয়া হইল না।

"দীক্ষিত হইলা কঙ্ক * * * পীরের স্থানে।
সর্ব্বনাশের কথা গর্গ কিছুই না জানে॥
জাতি ধর্ম্ম নাশ হইল রটিল বদনাম।
পীরের নিকটে কঙ্ক শিখিছে কালাম॥"

কিন্তু গোপনে—অতি সংগোপনে, কঙ্ক অতি অল্প দিন মধ্যেই তাহার গুরুর পদে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া বসিলেন।

এই পীরের আদেশে কবি বিদ্যাসুন্দর বা সত্যপীরের পাঁচালী রচনায় ব্রতী হইলেন। সত্যপীরের পাঁচালীই বিদ্যাসুন্দর। বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলন কাহিনী লইয়া এই কাব্য রচিত হইয়াছে। এই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রচলিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

সেই সময় হইতে কঙ্কের যশ বেল ফুলের সুমিষ্ট গন্ধের ন্যায়, চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতিভার জ্বলন্ত আলো, এতকাল কোনও কঠিন আবরণের ভিতর রুদ্ধ থাকিয়া নিবনিব করিতেছিল; সময় পাইয়া তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। শোক দুঃখ দৈন্য দাসত্ব প্রভৃতি পৃথিবীর চির কলুষিত আবিল ভস্মরাশিতে, সে প্রতিভার জ্বলন্ত অগ্নি অধিক দিন ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। বরং তাহা মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায়, ক্রমেই বিকাশ হইয়া পড়িল। কঙ্ক এখন আর রাখাল কঙ্ক নহে, কঙ্ক এখন কবি কঙ্ক নামে জন সমাজে পরিচিত। স্বয়ং পণ্ডিতাভিমানী গর্গ পর্য্যন্ত, তাঁহার গুণে মুগ্ধ। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই তাহার সমান প্রতিপত্তি। কেন না সত্যপীর উভয় সমাজেরই অভীষ্ট দেবতা।

এই সময় পণ্ডিতম্মন্য গর্গ, এক বিষম চাল চালিয়া বসিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, যে—কঙ্ক ব্রাহ্মণ কুমার, অজ্ঞানাবস্থায় যদিও সে চণ্ডালের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানবান হইয়া, সে আর তাহা স্পর্শ করে নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ সমাজের তাহাকে, নিজ অঙ্কে স্থান দিতে; কি আপত্তির কারণ হইতে পারে?

আপত্তির কারণ অনেক ছিল। এক দল গোঁড়া হিন্দু, কঙ্ককে সমাজে স্থান দিতে নারাজ। তাহারা বলিতে লাগিল —

"জন্মিয়া চণ্ডাল অন্ন খায় যেই জন।
যে তারে সমাজে তুলে সে নহে ব্রাহ্মণ॥
অনাচারে জাতি নষ্ট নষ্ট হয় কুল।
মাটীতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে ফুল॥"

পূজার ফুলও যদি কোনও কারণে মাটীতে পড়িয়া যায়, দেবপূজায় আর সে ফুল ব্যবহৃত হয় না। এমন যে গঙ্গাজল, এমন যে শালগ্রাম, তাহাও চণ্ডাল স্পর্শে অপবিত্র হয়। কঙ্ক ব্রাহ্মণ বালক সত্য; কিন্তু সে জাতিভ্রষ্ট, চণ্ডাল অন্নে প্রতিপালিত।

আর একদল ভয়ে ভয়ে পণ্ডিত গর্গের কথায় সায় দিল। সায় দিল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে না পারিয়া, পরোক্ষভাবে তাহারা গোঁড়া হিন্দুর দলে যোগদান করিল।

এদিকে প্রতিপক্ষদল ক্রমে গর্গের অসামান্য অদ্ভুদ বিচার শক্তির প্রভাবে, পরাস্ত হইয়া, অন্তরে অন্তরে এক বিজাতীয় প্রতিহিংসা জাগাইয়া তুলিল। সে প্রতিহিংসানল গর্গের মত মহাপুরুষের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না। কিন্তু সে আগুণে পুড়িল কে? কঙ্ক।

"চারি দিকে দাউ দাউ অনল জ্বলিল।
জ্বালিলেন গর্গ মুনি কঙ্ক ভস্ম হইল॥
এমন সুখের ঘর পুড়ে হলো ছাই।
নিয়তি খণ্ডিতে পারে হেন সাধ্য নাই॥"

গর্গের দিক হইতে চাপা পড়িয়া, সে জ্বলন্ত অগ্নি নিরপরাধ কঙ্কের দিকে সহস্র শিখায় ধাবিত হইল। সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রাশি হইতে, সে যাত্রা কঙ্ক আর অব্যাহতি পাইলেন না।

প্রতিহিংসাকারী দুর্ব্বৃত্তগণ রটাইয়া দিল, কঙ্ক চণ্ডাল পুত্র, শুধু চণ্ডাল পুত্র নয়,—সে মুসলমান গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্রমে সত্যপীরের পূজায়, কঙ্কের বিরচিত পাঁচালী বা বিদ্যাসুন্দর পাঠ করার বিধি নিষিদ্ধ হইয়া পড়িল। অনেকে হস্ত লিখিত বিদ্যাসুন্দর ছিঁড়িয়া ফেলিল, কেহ বা আগুণে পুড়াইয়া দিল। ফলে সেই উপাদেয় গ্রন্থ খানা কোথাও বা অঙ্গহীন হইয়া রহিল, কোথাও অনলকুণ্ডে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিল। এমন কি শেষ ইহাও প্রচারিত হইল যে, বিদ্যাসুন্দর যাহার ঘরে থাকিবে সে মুসলমান বলিয়া হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে। তদানিন্তন ধর্ম্মভীরু নিরীহ হিন্দুজনসাধারণ, স্বস্ব গৃহের সযত্ন রক্ষিত, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ, এইরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এই ঘোর বিপ্লবের মধ্যে মুসলমান সমাজ কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরকে, গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। সত্যপীরের পাঁচালী, তাহাদের কুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্গে, একাসনে স্থান পাইয়াছিল। কঙ্ককৃত এই বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের জন্য, ময়মনসিংহের ভাষা সাহিত্য মুসলমান সমাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

কিন্তু ইহাতেও কঙ্ক গর্গের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেন না। গর্গ তখন পর্য্যন্ত কঙ্ককে, পুত্রজ্ঞানে, সমাজে তুলিয়া লইতে বিস্তর যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতেছিলেন।

গর্গের অসামান্য প্রতিভার কাছে নতশিরে হার মানিয়া তাহারা মনে মনে আর এক ফন্দি আটিল,

"আছিল চণ্ডাল কঙ্ক হইল ব্রাহ্মণ।
কঙ্কেরে নাশিতে যুক্তি করে দ্বিজগণ॥
নানা মত ভাবি তারা উপায় করিল।
সাপের চখেতে যেন ধূলাপড়া দিল॥"

সে প্রপঞ্চে নাগপাশের ন্যায়, মহাপণ্ডিত গর্গকেও জড়াইয়া ফেলিল, কে শক্র কে মিত্র সেই অন্ধকারে গর্গ কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন না। সেই মহা-বিষধর ভুজঙ্গকে মন্ত্রৌষধিতে বশীভূত করিতে না পারিয়া, তাহারা এইরূপে তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিল।

দুর্ব্বৃত্তগণ রটাইয়া দিল যে, গর্গের কুমারী কন্যা লীলা, জাতিভ্রষ্ট কঙ্কের প্রতি আসক্ত। কঙ্কের প্রতি, গর্গের ক্রোধ বহ্নি আরও বিশেষ ভাবে প্রজ্জলিত করিবার জন্য, তাহারা ইহাও প্রকাশ করিল যে, কঙ্ক গান গাহিয়া, বাঁশী বাজাইয়া, সেই অনাঘ্রাত যৌবনাকুলপুষ্প স্বরূপিনী গর্গ-দুহিতার মন হরণপূর্ব্বক, তাহার ধর্ম্মনাশ করিয়াছে। গর্গ এই কথা শুনিলেন। আগ্নেয়গিরির মহাশৃঙ্গ হইতে, হুহু করিয়া প্রলয় বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বহ্নিতে পুড়িল কে? কঙ্ক আর লীলা।

গর্গ প্রথমে কঙ্ককে নিজ গৃহ হইতে, তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রলয়কারী প্রতি-

হিংসানল নির্ব্বাপিত হইবে কি? না। সেই ভুর্ব্বৃত্ত যাহাকে দুগ্ধ দিয়া এতকাল কালসর্পবৎ পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলাম, পুষ্পমালা জ্ঞানে এতকাল যে বিষধরকে, কণ্ঠহাররূপে স্থান দিয়া আসিতেছিলাম, ইহ সংসারে সে জীবিত থাকিতে আমার এ কলঙ্ক দূর হইবে না। যে অস্পৃশ্য ভূলুণ্ঠিত অনাদৃত পারিজাতকে আমি দেব পূজায় উৎসর্গ করিব মনে করিয়াছিলাম; আজ সেই পুষ্পাবরণে লুক্কায়িত কালভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিল! মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইলেও আমার এ কলঙ্ক দূর হইবে না। আগে কঙ্ককে ভস্ম করিব, তারপর দুহিতারূপিনী কাল-ভুজঙ্গিনীকে অনলে পুড়াইয়া নিজেও অনলে প্রবেশ করিব। ঐ শুনা যায় দুষ্টগণের অট্টহাসি টিট্‌কারী দাঁড়াও কঙ্ক দাঁড়াও লীলা!

ক্ষিপ্ত গ্রহের মত গর্গ একবার নদীতটাভিমুখে, ছুটিয়া গেলেন, পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। কুটীর প্রান্তে আসিয়া ডাকিলেন—লীলা!

লীলা এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। পিতার আহ্বানে অন্যান্যদিনের মত, তেমনি সস্মিতমুখে শালতরুপার্শ্বে, ক্ষুদ্রকায় বনলতাটীর মত আসিয়া দাঁড়াইল। হায়! হতভাগিনী জানিতে পারে নাই, যে সেই স্নেহবারিগর্ভমেঘ, আজ তাহার কপাল দোষে বজ্রাগ্নিতে পূর্ণ।

বুভুক্ষু শার্দ্দুল যেমন শিকার লক্ষ্য করিয়া তাকায়, মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে গর্গ তেমন করিয়া লীলার পদনখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একে একে লক্ষ্য করিতেছিলেন। লীলা নির্ব্বাক নিস্পন্দ, এ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না।

কম্পিত কণ্ঠে গর্গ বলিলেন,

শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
ঝাটহ জলের ঘাটে করহ গমন॥
শীঘ্রগতি আন জল কলসী ভরিয়া।
দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হইয়া॥
কুস্বপন দেখিয়াছি কালি নিশাভাগে।
দেবতা চলিয়া যান তেই সে বিরাগে॥

কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমার পূজার মন্দির অপবিত্র হইয়াছে। তুমি জল লইয়া আইস, আমি নিজ হস্তে দেব মন্দির ধৌত করিব। তারপর জন্মের মতন একবার শেষ পূজায় বসিব! লীলা পিতার এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইল না; কেবল মনে মনে আপনাকেই প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"দৈবেতে ঘটাইল কিবা অঘট ঘটন।
আজি কেন পিতা গর্গ হইলা এমন॥"

মনের ভিতর খুঁজিয়াও একথার কোনও উত্তর পাইল না। তখন তাড়াতাড়ি,—

"গাগরী তুলিয়া কাঁকে লীলা যায় জলে।
পথ নাহি দেখে লীলা নয়নের জলে॥

কৈ আমি ত ভ্রমে ও কোন দিন পিতার চরণে অপরাধ করি নাই, তবে—

"এমন হইলা পিতা কিসের কারণ
কোন দিন দেখি নাই বিরস বদন"

কত কি ভাবিতে ভাবিতে লীলা আপন ক্ষুদ্র কলসীটী কাঁকে করিয়া ঘাটের পথে চলিতেছিল। এমন সময় গর্গ আবার ডাকিলেন,

"শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
আমিই আনিব জল দেবের কারণ॥
কলসী রাখিয়া তুমি যাও নিজ ঘরে।
দেবের নৈবেদ্য মোর খাইল কুকুরে॥"

স্রক্‌চন্দন-পূত কৃত যজ্ঞ বেদী আজ চণ্ডালের কর স্পর্শে কলঙ্কিত! আমি এ সংসারে আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। লীলা তুমি ঘরে যাও, আমার দেব পূজার নৈবেদ্য কুকুরে গ্রাস করিল। চণ্ডাল কর স্পর্শে আমার পূজার ফুল অপবিত্র হইল। লীলা ফিরিয়া আসিল, গর্গ তখন উন্মত্তের মত প্রাঙ্গণ জুড়িয়া ছুটাছুটী করিতেছিলেন। ভয়ত্রস্তা বিস্মিতা লীলা কলসী রাখিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ছুটিয়া গেল।

গর্গ নদীতে গেলেন। নিজ হস্তে কলসী ভরিয়া জল আনিলেন। নিজ হস্তে দেবের মন্দির পবিত্র করিলেন। লীলার চয়িত পূজার ফুল বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। সিংহাসন, শালগ্রাম শিলা সমস্ত ধৌত করিলেন। করিয়া পূজায় বসিলেন। আজিকার পূজায় ফুল নাই, নৈবেদ্য

নাই, বুঝি ভক্তিও নাই। আজিকার পূজা শেষ পূজা ; এ পূজায় আবাহন নাই, কেবলি বিসর্জন। প্রতিহিংসা তাহার ধূপ ধুনা, হৃদি রক্ত তাহার স্রক চন্দন, আত্মগ্লানির তোষানলে দগ্ধিভূত জীবনের নয়নাশ্রু সে পূজার ফুল ; আর, আর সেই অবিশ্বাসিনী হতভাগিনী কন্যা ও অকৃতজ্ঞ নরাধম কঙ্কের নিধন তাহার মূল মন্ত্র।

পূজা শেষ করিয়া গর্গ ভোজন গৃহে গেলেন। অন্যান্য দিন পূজা সমাপ্ত করিয়া গর্গ লীলাকে ডাকিতেন, লীলা হাসি মুখে খাবার দ্রব্য লইয়া পিতার কাছে উপস্থিত হইত। কিন্তু আজ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কঙ্কের প্রত্যহ গোষ্ঠ হইতে, সুরভিকে লইয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইত, লীলা কঙ্কের আহার্য্য অন্ন তাহার আগমন অপেক্ষায় গৃহের এক কোনে যত্নপূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিত। গর্গ তাহা জানিতেন। ইতঃস্তত চাহিয়া গর্গ কঙ্কের সেই আহার্য্য দ্রব্যে

"কৌটা খুলি কাল জর অন্নে মিশাইলা।
গোপনে থাকিয়া লীলা সকল দেখিলা॥
দেখিয়া শুনিয়া লীলার উড়িল পরাণ।
নিদয় হইয়া পিতা হইলা পাষাণ॥"

লীলা ভাগ্য ক্রমে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পাইয়াছিল।

অন্যান্য দিনের মত কঙ্ক সুরভিকে লইয়া আশ্রমে ফিরিল। অন্যান্য দিনের মত স্নান করিয়া আহার করিতে গেল। কঙ্ক গর্গের সেই ধূমায়মান হিংসা-বহ্নি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। গর্গ ও ছল সহকারে কঙ্কের প্রাণ বিনাশ হেতু বাহিরে সেই ক্রোধ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিয়া, আগ্নেয় গিরির মত তাহা অভ্যন্তরে এমনি ভাবে লুকাইয়া রাখিলেন; ইচ্ছা রহিল যে সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিয়া কঙ্কের জীবন ভস্মীভূত করিয়া দিবেন।

এক হস্তে অন্ন ব্যঞ্জন, অপর হস্তে অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে, সরলা লীলা আসিয়া কঙ্কের সম্মুখে দাঁড়াইল। কঙ্ক লীলাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিত। আজও সেইরূপ সম্বোধন করিল, দেবী ! তুমি কাঁদিতেছ।

"কঙ্ক বলে লীলা দেবি কান্দ কি কারণ।
আশ্রমে ঘটিল কিবা অঘট ঘটন॥
গোষ্ঠ হতে ফিরি পথে দেখি অমঙ্গল।
সুরভি মুখেতে নাহি লইল তৃণ জল॥
বায়স ডাকিছে বসি শুষ্ক তরু ডালে।
না জানি আজিকে মোর কি আছে কপালে॥"

গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার কালে পথে নানাবিধ অমঙ্গল দেখিয়াছি। ঐ দেখ আশ্রম পার্শ্ববর্ত্তী শুষ্ক নারিকেল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া, বায়স সকল খা খা শব্দে উজার করিয়া তুলিতেছে। আজ উৎকর্ণ চঞ্চল চিত্ত সুরভি ত্রস্তপদে কেবল শস্প ভূমি পদবিদলিত করিয়া গিয়াছে। তৃণ জল কিছুই গ্রহণ করে নাই।

"আর দিন আমি যবে গোষ্ঠ হতে আসি।
জিজ্ঞাসেন কত কথা নিকটেতে আসি॥
আজি কিবা অপরাধ করিনু চরণে।
জিজ্ঞাসিয়া উত্তর না পাই তে কারণে॥

বিরস বদনে, নিতান্ত অনুতপ্তের মত, পিতা কেন আজ পাশ কাটিয়া সরিয়া গেলেন। আমি আশ্রমে আসিতে না আসিতেই সেই দেব মূর্ত্তির অন্তর্ধ্যান ! দেবি ! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জানি না এ দুঃখের কপালে আমার আরও কত দুঃখ আছে।

লীলা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। নীরব নির্ঝরিনীর মত তাহার দুই চক্ষু ভাসিয়া জল ধারা বহিতেছিল।

"পাষাণের মূর্ত্তি লীলা দাণ্ডায় অচল।
দুই চক্ষু বহি তার ঝড়ে অশ্রু জল॥

কঙ্ক আবার জিজ্ঞাসা করিল। স্তিমিতা তরুণী লীলা তখন ও মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় বাক্য বিরহিতা। কঙ্ক ও নীরব। কেহ কাহাকে কিছু বলিতে পারিতেছে না, যেন এই পৃথিবী আকুল প্রলয়াবর্ত্তে পড়িয়া জীব জন্তু সহ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, বাকি মাত্র তাহারা এই দুইটী ভয়াতুরা প্রাণী।

লীলার চক্ষে জল ধারা, কঙ্ক অবাক হইয়া তাহার অশ্রু মুক্তা ভূষিত চক্ষের পানে চাহিয়া আছে।

অনেক্ষণ পরে কঙ্কের কথা ফুটিল—

"আর বার বলে কঙ্ক দেবী তোমারে সুধাই।
কোন দিন তোমাকে কান্দিতে দেখি নাই॥
আজি কেন বসুমতী কাঁন্দিয়া ভাসাও।
কথা যদি নাহি বল মোর মাথা খাও॥

জানিত কি অজানিত অথবা স্বপনে।
করিয়াছি অপরাধ নাহি আইসে মনে॥"

জানিত কিম্বা অজানিত, কোনও অপরাধ তোমাদের কাছে, করিয়াছি, কৈ এমন ত আমার মনে আসে না, অথবা স্বপ্নেও তাহা ভাবিয়াছি মনে হয় না। তবে—

একটী করুণ জীর্ণ বীণার তারে বহুদিনের অতীত স্মৃতি লইয়া শোকের গানটী ধ্বনিয়া উঠিল। কঙ্ক পালাও পালাও ঐ দেখ তোমার মাথার উপর কালসর্প, তোমাকে দংশন করিতে আসিতেছে, তুমি শীঘ্র পালাও—

"আমার মিনতি রাখ শুন কঙ্কধর।
পলাইয়া যাও গো তুমি ভিন্ন দেশান্তর॥
মনুষ্য বসতি নাই নাহি মাতা পিতা।
যে দেশে বান্ধব নাই তুমি যাও তথা॥"

তুমি সেই মরুভূমির দেশে যাও, যে দেশে মনুষ্যের বসতি নাই, মাতা পিতা নাই, বান্ধব নাই, মরিলে কাঁদিবার নাই, সেই দেশে যাও; অথবা সাগরতীরে কোন নিভৃত পর্ব্বত গহ্বরে হিংস্রজন্তু সহ সখ্যতা করিয়া বাস কর। এ লোকালয়ে আর আসিও না।

কথার অর্থ কঙ্ক কিছুই বুঝিল না। চারিদিকে বিপদার্ণব, রক্তবীজের মত রাশি রাশি শত্রু যে তাহার বিনাশ হেতু চারিদিক হইতে মাথা তুলিয়াছে, কঙ্ক তাহা জানিত। কিন্তু জানিলেও সে নির্ভয়। সে যে মহাগিরির আশ্রয়ে আছে; কোনও বজ্রাঘাত, কোনও ঝঞ্চাবাত তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে যে সুধাসমুদ্রে ডুবিয়া আছে, এমন কোনও জীবনঘাতী হলাহল নাই যদ্দ্বারা তাহার অনিষ্ট হইতে পারে। সে দেবতার পদে আশ্রয় পাইয়াছে, প্রেত পিশাচে তাহার ভয় কি?

কিন্তু হায়, কঙ্ক জানিতে পারে নাই যে, সে যে দেবতার পদে আশ্রয় লইয়াছে, অদৃষ্ট দোষে সেই দেবতাই আজ তাহার প্রতি বিরূপ। যে চক্র তাহাকে সমস্ত চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবে, আজ সেই চক্র তাহাকে কাটিতে অগ্রসর। দহ্যমান তরুতলে আশ্রয়প্রার্থী পথিকের ন্যায় তাহার জীবন বিপন্ন।

সরলা লীলা কঙ্কের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিল। পিতা কতকগুলি চক্রান্তকারীর চক্রান্তে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, তোমার আহার্য্য অন্নে বিষ মিশাইয়া দিয়াছেন, সেই বিষ হাতে করিয়া এই আমি আসিয়াছি, তুমি পালাও আমি তাহা খাইয়া মরিব।

"কাল গরল বিষ অন্নে মাখাইয়া।
আসিছে রাক্ষসী লীলা তোমারে খুঁজিয়া॥
নাহি দয়া নাহি মায়া পাষাণ তার হিয়া।
রাক্ষসী হইয়াছে লীলা মনুষ্য হইয়া॥
কেমন করিয়া কিবা পরাণে ধরাই।
নিজ হস্তে বিষ দিয়া তোমাকে খাওয়াই॥
আজি তুমি ভিন্ন দেশে যাওরে পলাইয়া।
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়া॥
শুন শুন শুনরে কঙ্ক আরে কঙ্ক আমার বচন।
যাইবার বেলা দেখে যাহ লীলার মরণ॥"

সহসা বজ্রাহত হইলে মনুষ্য যেমন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জ্বলিতে থাকে, কঙ্কের অবস্থাও তেমনই হইল, চারিদিক অন্ধকার। মাথার উপর একবারে যেন সহস্র অশনি গর্জ্জিয়া উঠিল।

ক্ষণেক পরে কঙ্ক নিজকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, লীলা ভয় পাইও না, পাপিগণের পাপ চক্রান্তে যদিও পিতা ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন কিন্তু এ অবস্থা তাঁহার অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। তিনি পরম জ্ঞানী, ধর্ম্মশীল, সূর্য্যকিরণ সম তাঁহার সেই অসামান্য জ্ঞানের আলোকে অচিরেই সকল অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। দুরন্ত রাহুগণ সেই মধ্যাহ্ন তপনকে অধিককাল কবলিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না। আমি ইতিমধ্যে কিছুকালের জন্য স্থানান্তরে গমন করিব, তুমি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিও। তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইলে আবার আসিব।

এক নিশ্বাসে কঙ্ক এই কথাগুলি বলিয়া গেল। লীলা কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছিল। যেন কোনও নৈসর্গিক উৎপাতে এই বিপুল বিশ্ব জীব জন্তু তরু লতা সহ কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিল, লীলা কেবল দাঁড়াইয়া তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। কঙ্ক আবার বলিল, দেবি! এ বিষ খাইয়া মরিতাম, কিন্তু আমাদের মনে কোন পাপ নাই। স্বপ্নেও কোনও দিন পিতার কাছে অপরাধ যোগ্য কোন কাজ করিয়াছি কিম্বা মনে স্থান দিয়াছি, স্মরণ হয় না।

"অপরাধ করিয়াছি পিতার চরণে।
স্বপনেও হেন কথা নাহি পড়ে মনে॥"

ইহার পর আমরা মরিলে, পিতা যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া শাবক হারা বিহঙ্গের মত আমাদের অন্বেষণ করিবেন তখন যেখানেই থাকি স্থির থাকিতে পারিব না।

"অপরাধ যোগ্য কার্য্য কিছুই না জানি।
সাক্ষী আছে চন্দ্র সূর্য্য দিবস রজনী॥
মনে করি বনে করি যত অনাচার।
দেবতা ধরম দেখ সাক্ষী হয়রে তার॥

ধর্ম্ম আছেন, জগতে চন্দ্রসূর্য্য আছে, তাহারা সাক্ষী। প্রবল ঝঞ্চাবাতে আজ মহাগিরি বিচলিত। এ'র পরই দেখিব দিব্য জ্যোতি সম্পন্ন মহাপুরুষের জ্ঞানালোক, আমাদের অন্ধকার পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে, আমি চলিলাম।

"মেলানি মাগিছে কঙ্ক লীলা তোমার কাছে।
আবার হইবে দেখা প্রাণে যদি বাঁচে।
কিছু কাল ঘরে লীলা তুমি রহ একাকিনী,
সুরভি পাটলী তোমার রহিল সঙ্গিনী।
ঘরে আছে পোষারে পাখী হীরা মন শারী
তাহারে ডাকিও রে লীলা কঙ্ক নাম ধরি।
নাহি মাতা নাহি রে পিতা আমার নাহি বন্ধু ভাই
যে দিকে কপালে নেয় তথি চইলে যাই।
আর এক কহিব লীলা গো আমার নিবেদন,
অভাগা বলিয়া কঙ্কে রাখিও স্মরণ।"

কঙ্ক যখন লীলার নিকট হইতে, এইরূপ কিছু কালের জন্য, কিম্বা নিয়তির কুট চক্রান্তে ইহ জীবনের জন্য শেষ বিদায় প্রার্থনা করিতেছিলেন। তখন গর্গ, কঙ্কের প্রাণ বিনাশের পথ পরিস্কার করিয়া, কিরূপে সেই বিশ্বাসঘাতিনী কন্যার প্রাণ বিনষ্ট করিবেন, তাহার উপায় স্থির করণার্থ রাজ রাজেশ্বরীর তটে, উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্ঞান নাই। দেব পূজায় মন নাই, বিগত সারা রজনী বিনিদ্র নয়নে কেবলই সেই অবিশ্বাসিনী কন্যার প্রাণ নাশের জন্য, নিজ মনোবৃত্তি গুলির সঙ্গে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কাটাইয়াছেন। একবার ভাবিয়াছেন আগুণে পুড়াইয়া মারি। আবার ভাবিয়াছেন বিষ দ্বারা, না—না—রাজ রাজেশ্বরীর তরঙ্গে ভাসাইয়া দেই, মরুক সে দুর্ব্বিনীতা—আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি।

বিদায়ের প্রাক্কালে কঙ্ক লীলাকে অনেকগুল কাজের কথা বলিল—

রৈল রৈল লীলা তোমার তোতা শারী
ক্ষীর সর দিয়া তারে পালিও যত্ন করি।
রইল রইল রে লীলা পুষ্পতরু যত
জল সেচনি দিয়া পালিও অবিরত।
রইল রইল রে লীলা মালতীর লতা
আজি হতে রইল পইরা তোমার মালাগাঁথা।
সুরভি পাটলী রইলরে লীলা প্রাণের দোসর,
তৃণ জল দিয়া সবে করিও আদর।
আমার লাগিয়া তারা যদি হয়রে দুঃখমনা
গায়ে হাত বুলাইয়া করিও সান্ত্বনা।
গৃহের দেবতা রৈল রে লীলা শালগ্রামশিলা
শুদ্ধমনে পূজা তারে করিও তিন বেলা।
দেবের পূজায়ে লীলা হেলা না করিও
সর্ব্বনাশ ঘটিবে তবে নিশ্চয় জানিও।
তোমার আমার গুরু রে লীলা রহিলেন পিতা
জীবনে মরণে যিনি সাক্ষাত দেবতা।
এমন দেবের পূজায়ে লীলা না করিও হেলন
ইহ পরকাল নষ্ট নিশ্চয় মরণ।
অত্যাচার করেন যদি লইও শিরপাতি
নারায়ণে স্মরিও সদা অগতির গতি।
দুখ না করিও রে লীলা আমার লাগিয়া
আবার হইবে দেখা থাকিলে বাঁচিয়া।
আজি হ'তে মনে কইর কঙ্ক আর নাই
বিপদে করুন রক্ষা তোমাকে গোসাঞি।"

আমার অনুপস্থিতিতে যেন দেবতুল্য পিতার কষ্ট না হয়, শত উৎপীড়ণেও স্থির চিত্তে তাহার সেবা করিও।

ইহার পর কঙ্ক নিজের কথা ভাবিতেছিল,

"আবার ভাবেরে কঙ্ক আপনার মনে
কিরূপে বিদায় হব পিতার চরণে॥"

যাইবার সময় তাহার পূজনীয় পিতা, একদিন যিনি তাহার শ্মশান বন্ধু ছিলেন, তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, কিন্তু এ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইল না।

"ক্রমে বেলা হইল গত রবি অস্ত যায়
আশ্রমে না ফিরে মুনি ঘুড়িয়া বেড়ায়।"

ক্রমে বেলা অপরাহ্ন হইতে চলিল। গর্গ তখনও লীলার প্রাণ বিনাশের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারেন নাই। সুতরাং আশ্রমেও ফিরেন নাই। উরগক্ষত-অঙ্গুলির ন্যায় দুহিতার সঙ্গে জীবনের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

সাগরতীরে মহাবনে নির্ব্বাসিত বৃদ্ধ প্রস্পেরুর ন্যায় গর্গ সংসারে একমাত্র অবলম্বন স্বরূপিনী কন্যাকে লইয়া সুখী হইতে চাহিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাহার সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এই কি সেই লীলা ; যাহার জন্য সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াও পুনঃ সংসারী হইয়াছিলেন, যে লীলার জন্য তিনি পত্নীহারা-শূন্যগৃহে আবার সংসারের খেলা পাতিয়া বসিতেছিলেন, যাহার জন্য তিনি নিজ হস্তে সুরভির সেবা করিয়াছেন, নিত্য প্রাঙ্গণে শির লুটাইয়া যাহার জন্য তিনি আরাধ্য দেবতার চরণে মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, সেই লীলা! কতবার ভাবিয়াছেন, আর কেন? যাই, তীর্থাশ্রমে চলিয়া যাই, কিসের সংসার কিসের বাসনা! আবার ভাবিয়াছেন, কোথায় যাইব, সেই মাতৃহারা আজন্ম-দুখিনী উপেক্ষিতা রত্নটীকে আমার কোথায় রাখিয়া যাইব, আমার সংসার নন্দনের সোহাগ পারিজাতটী কাহার গলে গাঁথিয়া দিয়া যাইব। যাইব, সেই দিন যাইব—যে দিন এই প্রাণসমা দুহিতাকে সুপাত্রে অর্পণ করতঃ সংসারের সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তি পাইয়া মহাযাত্রা করিব, বানপ্রস্থের সেইত উপযুক্ত সময়, সেদিন কবে আসিবে!

সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় গর্গ এতকাল যাপন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত! সেই লীলা অবিশ্বাসিনী! বসুমতী দ্বিধা হও, কিম্বা দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হও।

"দেবের মন্দির হইল পিশাচের থানা।
এমন পূজার ফুলে কীট দিল হানা॥
কলঙ্কে দাটিয়া নিল চাঁদের পসর।
দেবের অমৃত ফল খাইল বানর॥
আর না ফিরিব আমি আশ্রমে আমার।
আগুনে পুড়াইয়া সব করি ছারখার॥
মনেতে করিনু স্থির ভাবিয়া চিন্তিয়া।
মারিব পাপিষ্ঠা কন্যা জলে ডুবাইয়া॥"

গর্গ আজ দয়া মায়া শূন্য পাষাণ। যে লীলাকে দেখিবা মাত্র তাহার অন্তঃকরণ স্নেহরসে সিঞ্চিত হইয়া উঠিত, আজ সেই লীলার জন্য তাহার প্রাণে একটুও মমতা নাই।

"পাষাণও দয়াল হয় হেরিলে লীলায়।
দুষমনও ফিরিয়া আঁখিপালটিয়া চায়॥"

এমন যে লীলা, গর্গ আজ তাহার প্রাণ বিনাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প। মৃত্যুকালে গায়ত্রী দেবী, গর্গের অন্ধকারময় শূন্য সংসার আলোকিত করিবার জন্য, যে স্নেহের দীপটী জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, আজ গর্গ তাহা ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

কঙ্ক যখন এইরূপে তাহার নিজের স্থানান্তরে যাওয়ার চিন্তা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই মুহুর্ত্তে আশ্রমে এক নিদারুণ ঘটনা ঘটিয়া গেল।

ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত লীলা ছুটিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, কঙ্ক কঙ্ক শীঘ্র এস, আমাদের সুরভি কেন ধুলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে!

"দৌড়িয়া আসিয়া লীলা সুধায় কঙ্করে
আউল মাথার কেশ বাক্য নাহি সরে।
আমার বচন লহ শীঘ্র গতি আস
আশ্রমে ঘটিল আজি কিবা সর্ব্বনাশ।
সুরভি ভূয়েতে পড়ি হইল অচেতন
বুঝি তারে কাল সাপে করিল দংশন।
কাল গরল বিষে সুরভি ঢলিল
আজি হতে আমাদের কপাল ভাঙ্গিল।
বিচারিয়া আন তুমি ওঝা এক জন
সুরভির কাছে আমি যাই ততক্ষণ।"

কঙ্ক ও লীলা উভয়ে দৌড়িয়া গেল। কঙ্ক দেখিল সুরভি সত্য সত্যই মাটীতে পড়িয়া বিষের জ্বালায় ছটফট্ করিতেছে। কঙ্ক ত্রস্ত গতিতে যাইয়া সুরভির মাথা আপন কোলে টানিয়া লইল, সুরভি তখন স্থির, কেবল এক দৃষ্টে, আপন প্রতিপালকের মুখ পানে চাহিয়া, যেন অন্তিম বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।

"মনে মনে ভাবে কঙ্ক কি হইল হায়।
কালেতে খাইল যারে কি করে ওঝায়॥"

কঙ্ক বলিল লীলা, সেই বিষ মিশ্রিত অন্ন কোথায় রাখিয়াছিলে? স্রোত তাড়িত বেতস লতার মত কম্পিতা লীলা মুখে কিছুই বলিল না, স্থানটী মাত্র অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল। কঙ্ক বলিল, সর্ব্বনাশ করেছ দেবি! এ বিষ খাইয়া আমরা মরিতাম ভাল ছিল, কিন্তু দেবতা আমাদের উপর বিরূপ, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে আর শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে না। দেবি! মহাপুরুষের আশ্রমে গো হত্যা হইল।

শেষ নিশ্বাসের সহিত সুরভির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা মিলাইয়া আসিতেছে। গর্গ তখনও আশ্রমে ফিরেন নাই। লীলা সুরভির জন্য আকুল হইয়া কাঁদিতে ছিল। আজ যেন সে সত্য সত্যই, তাহার খেলার সঙ্গিনী বোন্‌টীকে হারাইয়া ফেলিল। রন্ধনশালার এক কোনে যাইয়া বাণবিদ্ধ হরিণীর মত লুটাইয়া পড়িল। কঙ্ক সে রাত্রে আর গৃহে গেল না, সুরভির মৃত দেহের নিকট একটী নিম্ব বৃক্ষ তলে, অনাবৃত দেহে শষ্প রাজির উপর পড়িয়া রহিল। তারপর—

"প্রভাতে উঠিয়া লীলা কঙ্কের উদ্দেশে
আলুই মাথার কেশ পাগলিনী বেশে।
পরথমে পশিল লীলা কঙ্কের শয়ন ঘরে
শূন্য শেষ পড়ে আছে কঙ্ক নাহি ঘরে।
গোয়াল ঘরেত লীলা ধায় পাগলিনী
শূন্য গৃহ পড়ে আছে দেখে অভাগিনী।
নয়নেতে নিদ্রা নাই পেটে নাইক অন্ন
সর্ব্ব স্থান খুঁজে লীলা করি তন্ন তন্ন।
হেমন্তে জোয়ারে নদী বায় উজানিয়া
তথাতে বেড়ায় লীলা কঙ্কেরে খুঁজিয়া।
মালতী বকুলে লীলা জিজ্ঞাসে বারতা
তোমরা নি দেইখাছ, আমার কঙ্ক গেল কোথা।
এক স্থানে শত বার করে বিচরণ
কোথা কঙ্ক বলি লীলা ডাকে ঘন ঘন।
পোষমানা পাখীগণে লীলা কাঁন্দিয়া সুধায়
তোমরা নি জান গো কঙ্ক গিয়াছে কোথায়।
উড়িয়া ভমরা বইসে মালতী বকুলে
তাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা ভাসি আঁখি জলে।
বস্ত্র না সম্বরে লীলা, নাহি বান্ধে চুল
আজি হ'তে আশা ভরসা সকলি নির্ম্মূল।
আজি হইতে গেল রে কঙ্ক সন্ন্যাসী হইয়া
অভাগিনী লীলার না বুকে শেল দিয়া।
যাইবার কালেতে আমার নাহি দিলা দেখা
এহি ছিল অভাগি লীলার কপালের লিখা।"

বহু অনুসন্ধান করিয়াও কঙ্ককে আর পাওয়া গেল না।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।

গত আষাঢ়ের 'সৌরভে' সুলেখক বাবু উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'বাঙ্গালীর কৃতিত্ব' নামক প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে বাঙ্গালীর 'অকৃতিত্বের' পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতের গৌরবোজ্জল পূর্ব্ব ইতিহাসে বাঙ্গালার স্থান নাই।

লেখক খাঁটি বাঙ্গলার জিনীষ তিনটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নব্য ন্যায়, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা। তাঁহার সহিত একমত হইয়া বলিতেছি—ইহাদের কোনটীরই ভিতর উন্নতিসূচক বা গৌরবজ্ঞাপক বিশেষত্ব কিছু নাই।

নিতান্ত টোলের পণ্ডিত ব্যতীত বর্ত্তমানে নব্য ন্যায়ের কে সংবাদ নেয়? জগতের জ্ঞানভাণ্ডারেই বা তাহার দান কতটুক?

চৈতন্যের ধর্ম্ম বীর্য্যহীন বাঙ্গালীকে আরও নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণব, গোপিনীগণের অনুকরণে কৃষ্ণ রাধিকার পূজা করিতে যাইয়া, স্ত্রীজন সুলভ প্রেম, দয়া, ধৈর্য্য, বিনয়, শান্তিপ্রিয়তার ভাবকে যে পরিমাণে নিজ চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, সে পরিমাণে শক্তি সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। অত্যধিক রমণী সেবা হইতে সমাজে নানাপ্রকার

দুর্নীতির ও আবির্ভাব হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী চৈতন্যের অনুকরণে 'সংসার অসার' এই ভাব, বাঙ্গালীর সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে অসারত্ব প্রদান করিয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'হরির লুটের গান' বাঙ্গালীর সমাজে বিষবৎ ফল প্রসব করিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে চৈতন্যের ধর্ম্মে কতকটা সাম্যের ভাব, জাতিভেদ লোপের চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে,—কিন্তু মূলতঃ তাঁহার শিষ্যেও শৈবেতে এ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। জাতিভেদ দুই অংশেই প্রায় সমান ভাবে বর্ত্তমান।

কৌলীন্য প্রথা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। শুধু-ভাবের উপাসক হিন্দু, যাহা করিবে তাহার বাপান্ত না করিয়া ছাড়িবে না। সত্যবাদিতা সৎগুণ কিন্তু তাহার অনুসরণ করিতে যাইয়া অল্পমতি নিরক্ষরা, বিষয়-বুদ্ধি বিহীনা, ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রীর কথায় প্রাণপ্রিয় পুত্ররত্নকে কে কোথায় বিসর্জ্জন দিয়াছে? পিতৃবাক্য পালন পুত্রের কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্যত্র কোথায় আসন্নমৃত্যু, স্ত্রীর হস্তে ক্রীড়নক, বৃদ্ধ পিতার আজ্ঞায় অম্লানবদনে রাজঐশ্বর্য্য পরিত্যাগান্তে পুত্র বনে চলিয়া গিয়াছে? অতিথিসেবা সৎপ্রথা কিন্তু তাহার জন্য এক হিন্দুস্থান ব্যতীত অন্য কোথায় অতিথির করে স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়া, স্বামী নিজকে সৎক্রিয়ান্বিত মনে করে? দান করিতে যাইয়া স্ত্রী পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র হিন্দু সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন। কিন্তু এই যে সকল অমানুষিক কীর্ত্তি ইহাদের ভিতর হিন্দুর সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভাবেরই পরিচয় পাই; হৃদয়ের মহত্ত্ব ও দৃঢ়তার অপেক্ষা ও শক্তির অপব্যয় ও কুআদর্শেরই ইহারা নিদর্শন। কি কারণে, কোন্ সময়ে চারি জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল বলা দুষ্কর কিন্তু যখন হইতে আবির্ভূত হইয়াছে—তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এই কুপ্রথাকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিবার জন্য কত চেষ্টাই না হইয়াছে? কত মিথ্যা গল্প, অসার যুক্তি, কত মনঃকল্পিত চরিত্র ও উপাখ্যানই না রচিত হইয়াছে? চারি জাতি হইতে কালে কত হাজার জাতির না উদ্ভব হইয়াছে। কৌলীন্যপ্রথা রূপান্তরে এই জাতিধ্বংশকারী জাতিভেদ প্রথারই বিশেষ সংস্করণ।

এক জয়দেব ব্যতীত বাঙ্গালী কোনও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ, লেখক উচিত মনে করেন নাই। শনি সত্যপীরের পূজোপলক্ষে যে সকল নামোল্লেখেরও অযোগ্য গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহাই আমাদের প্রায় একমাত্র মৌলিক দান ইহাই ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের ভক্তিভাবোদ্দীপক অপূর্ব্ব সঙ্গীতাবলী, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি মহৎ জীবনী বা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, তাঁহার দৃষ্টি একেবারেই আকর্ষণ করে নাই। পদাবলী সাহিত্য জগতের যে কোনও সাহিত্যের গৌরব। সংস্কৃত ভাষায় যদি এসকল কবিতা রচিত হইত, তাহা হইলে সমস্ত ভারত, জগৎ ব্যাপিয়া বাঙ্গালীর সুখ্যাতি ধরিত না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে যে মধুর ভাষায় প্রেমের ভাব ও প্রাণের ব্যাকুলতা বিবৃত হইয়াছে, সংস্কৃত কোন্ গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হইবে? সংস্কৃতকবি জয়দেব ভারতবিখ্যাত কিন্তু তাহার অপেক্ষাও কি ইঁহারা কবিত্বসম্পদে শ্রেষ্ঠ নহেন? ইঁহাদের দোষ, নিজ নিজ সরল মাতৃভাষায় প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এমন মধুর প্রেমগীতি জগতের কোন্ সাহিত্যে আছে? বিদ্যাপতিকে মৈথিল বলিয়া পরিত্যাগ করিলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ডীদাস প্রমুখ পদ-কর্ত্তাগণ রচিত এমন সব কবিতা রত্ন ছড়াইয়া রহিয়াছে, যে তাহাদের তুলনায় সংস্কৃত সাহিত্যও সকল সময় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে না।

বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট, তাহার জাতীয় ইতিহাস এখন পর্য্যন্তও লিখিত হয় নাই কিন্তু ইহা কি ঠিক নহে বাঙ্গালারই রাজ-পুত্র কর্ত্তৃক সুদূর সিংহল-বিজয় সংসাধিত হইয়াছিল? জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি স্থানে দুর্দ্ধর্ষ বাঙ্গালী নাবিকগণ কর্ত্তৃক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল? বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক জাপান, চীন, ব্রহ্ম নানা স্থানে ভারতের ভাবও মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল? বাঙ্গালী দীপাঙ্কর তিব্বতে এখনও দেবতার পূজা পাইতেছেন; বাঙ্গালী শীলভদ্র এক সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যরূপে জগতের ভক্তি-অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিহাসের আলোচনায় ইহাও দেখা যাইবে, আমরা এখন যে স্থানকে বাঙ্গালা বলি, সময় সময় এস্থান হইতে উদ্ভূত রাজন্যবর্গ পূর্ব্ব-ভারতে শৌর্য্য বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

সে যাক্। যতই কেন না বলি, স্বীকার করিতেই

হইবে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে আমাদের তেমন কোনও স্থান নাই। কিন্তু নিরাশ হইবার কারণ নাই। ইংরাজ আগমনের পর হইতে বাঙ্গালী যাহা সাধন করিয়াছে, সে কথা লেখক একটুকও বলেন নাই। সে কাহিনী এত গৌরবময়, যে তাহার তুলনায় প্রাচীন ভারতের যে কোন প্রদেশের যে কোন স্বর্ণযুগও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে না। শুভক্ষণে, রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন— নব্য-ভারতের মহাজ্যোতিষ্ক,—যার দিব্যালোকচ্ছটা তাহার তিরোধানের প্রায় একশতাব্দী পরেও ভারতবক্ষোপরি পুর্ব্বেরই ন্যায় সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিচ্ছুরিত হইতেছে। বাঙ্গালী জীবনের নবযুগের অবতার; যে সকল ভাব ও আকাঙ্ক্ষা আজ সমগ্র ভারতকে আলোড়িত বিলোড়িত করিতেছে, অল্লাধিক পরিমাণে সকলই তাঁহার জীবন ও কার্য্যে আভাস দিয়া গিয়াছেন। অতীত ও বর্ত্তমান এই দুইএর সঙ্গম স্থলে দাঁড়াইয়া কি ভাবে সমাজ তরণীকে চালিত করিতে হইবে, এখনও তিনি নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষার প্রভাবে ভীষণ সতীদাহ প্রথা দুরীভূত হইয়াছে, জাতিভেদ অনিষ্টকারী এভাব সমাজে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে, পৌত্তলিকতার স্থলে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতেছে, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে, ধীরে ধীরে এক সাম্য ও মৈত্রীর ভাব সমাজে ছড়াইয়া পড়ায় আমাদের মিলনের পথ সুগম হইতেছে। এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব জগতে অত্যল্পই হইয়াছে। জীবদ্দশাতে তাঁহার শত্রুসংখ্যা, বিপক্ষবাদীদের সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বলিতে গেলে শিক্ষিত সমস্ত ভারতবাসীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার ও তাঁহার ভাবসমূহের ভবিষ্য প্রচারক কেশবচন্দ্রের অল্লাধিক পরিমাণে শিষ্যানুশিষ্য বিশেষ।

যুগাবতার মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের পর হইতে কি ধর্ম্ম-জগতে, কি সামাজিক রাজনৈতিক বা সাহিত্যক্ষেত্রে, যে কোনও নূতন ভাব ভারতেতিহাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এই 'অকৃতিত্বের' আবাসস্থল বঙ্গভূমি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ; হরিশচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, উমেশচন্দ্র, মনোমোহন, লালমোহন, আনন্দমোহন, রমেশচন্দ্র, শিশিরকুমার, সুরেন্দ্রনাথ; মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কত নাম করিব, অদ্ভূতকর্ম্মা অপূর্ব্বপ্রতিভাসম্পন্ন ইহাদের তুলনায় সময় বিশেষে প্রাচীন ভারতের কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, সাহিত্য-সেবিগণও ম্লান বোধ হইবে। যে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় পৃথিবী আলোকিত এই পুণ্যস্থানই তাঁহার জন্মভূমি। যে চিত্রশিল্পীর গৌরব আজ ভারত ছাড়িয়া ইয়ুরোপ ও জাপানে বিকীর্ণিত হইতেছে, সেই অবনীন্দ্রনাথ এই স্থানের সন্তান। জ্ঞানযোগী বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের তুলনা কোথায়? সর্ব্বোপরি জগদীশচন্দ্র, বিরাট পুরুষের ন্যায় যাঁহার ঐশী প্রতিভা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে বঙ্গভূমি এ হেন রত্ন সমূহের আকর, তাহার অতীতের জন্য চিন্তায় উদ্বিগ্নমনা হওয়ার কারণ নাই।

এখানেই বাঙ্গালার ইতিহাসের শেষ নহে। 'বাঙ্গালী' জাতি কখন সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সম্যক অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। তবে ইহা সুনিশ্চিত, এই সর্ব্বপ্রথম আমরা 'বাঙ্গালী' রূপে একটী বিশিষ্ট ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। প্রাচীন ভারত সময় সময় যে সকল জাতির আবির্ভাব হইয়াছে, ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য ও আদর্শে এই নব অভ্যুত্থিত জাতি সে সকল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। শুধু হিন্দু লইয়াই এ জাতি গঠিত নহে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, বাঙ্গালা নামক স্থানের ভিতর যাহারা বাস করিতেছে, বাঙ্গালাকে যাহারা মাতৃভূমি জ্ঞান করে, সকলেই ইহার অঙ্গীভূত; ধর্ম্ম নহে, স্বদেশপ্রীতিই ইহার মূলনীতি।

যত প্রধান জাতি, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব মহিমা, প্রভাব ও সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া প্রচার করিতে সমুৎসুক। যেমন ব্যক্তির স্ফূর্ত্তি আনন্দ ও জীবনের চরিতার্থতা, স্বীয় শক্তির উন্মেষে ও প্রচারে; তেমন জাতির ও আনন্দ এবং বিকাশ ঈদৃশ প্রতাপ ও মহিমা বিস্তারে। যত পরাক্রান্ত জাতিই এ পন্থা অনুসরণ করিয়াছে এবং যখনই ভ্রমবশে স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, মৃত্যু ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। কি ব্যক্তি সম্বন্ধে, কি জাতি সম্বন্ধে স্থিরাবস্থা, মৃত্যুর পুর্ব্বাবস্থা। আজ বহু ভাগ্য বলে, ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণেও অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতের এক প্রান্তে 'বাঙ্গালী'

নামে যে জ্ঞান-গুণে ভূষিত নূতন জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা কি শুধু স্বীয় ক্ষুদ্র পরিসরটুকুর মধ্যেই কিয়ৎকালের জন্য দিব্যালোক প্রদান করিয়া, চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে? বহুবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গ কবিকে' লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন

"বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি।
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান করে দেও তুমি।"

কবিবরের আজীবন সাধনার ফলে, বঙ্গভাষার জগৎ সভায় স্থান হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গভূমির হয় নাই। বঙ্গ ভাষার যদি বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই হইল, বাঙ্গালী জাতির কি হইবে না?

'বাঙ্গালী' নাম জয়যুক্ত করিতে হইবে। এই নব গঠিত বাঙ্গালী জাতি যে বুদ্ধি বিদ্যায়, ধনে জ্ঞানে গুণে, সাহসে বীর্য্যে জগতের অন্যান্য জাতির সমকক্ষ তাহা দেখাইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া এ অসাধ্য সাধন সম্পন্ন হইবে?

বহু শতাব্দীর জ্ঞান চর্চ্চার ফলে যে অপূর্ব্ব দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল, পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত সে সকল রত্নরাজিতে ভারতবাসীর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ। দার্শনিক নিট্‌জির মতে—চিন্তারাজ্যে ভারতবাসী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু বহির্জগতের কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত। এ পর্য্যন্ত জগতের কোনও দুর্দ্ধর্ষ জাতির সহিতই আমরা জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া উঠিতে পারি নাই। অতি পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শক, হুন, পর্ত্তুগীজ, ওলান্দাজ, দিনেমার, পাঠান, মোগল, মগ, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশ হইতে যখন যে জাতি ইচ্ছা করিয়াছে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কাষ্ঠখণ্ডে পচনক্রিয়া আরম্ভ হইলেই কীট প্রবেশ করে। আমাদের সমাজ এবং জাতির ভিতরও যুগ যুগান্তর হইতে এমন সকল পচনক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার জন্য আমরা মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছি এবং কাহারও সহিত জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিতেছি না।

এক মনোরাজ্য লইয়াই যদি মানুষকে চলিতে হইত তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার কারণ ছিল না। বহির্জগতের দিকে এ পর্য্যন্ত আমরা এক প্রকার দৃষ্টিই করি নাই। ফলে, আধ্যাত্মিকতা ও চিন্তাশীলতায় যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি, সংসারের কঠিন মাটীতে লোক জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্মঠ ও কার্য্যক্ষম হইবার তেমন চেষ্টা করি নাই। আমাদের শিক্ষা অন্তর্মুখী; আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বাহিরের সুখ দুঃখ ধনমান ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তির দিকে দৃষ্টি করি নাই। অথচ, এই বাহিরের সংসার, যাহাকে আমরা এতদিন ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি তাহাই মানবের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র, লীলাভূমি। বাহির বজায় না রাখিতে পারিলে, অন্তর রাজত্ব ঠিক রাখাও দুষ্কর।

আমাদের আদর্শপুরুষ সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী। ঈদৃশ জীবনালেখ্যের প্রভাবে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার আমরা কখনও চেষ্টা করি নাই। নিজ নিজ মুক্তিলাভের জন্যই যত্ন করিয়াছি, ইংরাজ বা ফরাসীর ন্যায় সমবায় সম্মিলনের সাহায্যে সমাজের সকলকে বড় করিয়া, উন্নত করিয়া, দেশকে বড় করিবার চেষ্টা করি নাই। হিন্দু, নামতঃ একটী জাতি কিন্তু কার্য্যতঃ এমন ছিন্ন ভিন্ন, যে একাংশের সহিত অন্যাংশের বিবাদ বিসম্বাদ চিরকালই চলিয়া আসিয়াছে অথবা একাংশ অন্যাংশের চাপে নিস্তেজ ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও কি আমরা প্রাচীন আদর্শই ধরিয়া থাকিব? এখন ও কি সংসারে থাকিয়া সংসারকে অসার, জীবনকে পদ্মপত্রোপরি জলবিম্ব সদৃশ জ্ঞান করিয়া এবং কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিব? তাহা হইলে যে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

'বাঙ্গালী' যদি প্রকৃতই বড় হইতে চায়, জগৎ মাঝে স্বীয় বিশেষত্ব জ্ঞাপক স্থান করিয়া লইতে চায়, তাহা হইলে প্রাচীন রীতি নীতি আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সে দিন জাপানের ভূত পূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট অকুমা প্রসঙ্গচ্ছলে বলিতেছিলেন, "জাপান স্বীয় শক্তির উন্মেষ ও সমাজের উন্নতির জন্য যখন যাহা ভাল পাইয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে। জাপানের উন্নতির মূল কারণই এই সময়ের সঙ্গে চলিবার চেষ্টা। শ্যাম,

তুরস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ অল্পাধিক পরিমাণে ধর্ম্ম-বিষে আক্রান্ত হইয়া নির্জীব হইয়া আছে। আমার সন্দেহ হয় আমাদের ন্যায় সাহসিক হইয়া হিন্দুগণ জাতি ভেদ দূর করিতে সক্ষম হইবে কি না? ইহার উপরই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।" জগতের যত সজীব জাতি, প্রত্যেকেই অন্যান্য জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণবর্দ্ধক ভাব সমূহ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ জাতীয় চরিত্র ও সমাজের পুষ্টি সাধন করে। সমস্ত ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ব্যাপিয়া এই প্রকারে সকল কাজে আচার ব্যবহারে আহারে বিহারে, পরিচ্ছদে, রীতিনীতিতে ভাবের আদান প্রদান চলিয়াছে। এই জন্যইতো তাহারা এমন শক্তিমান্, বুদ্ধিমান্, প্রবল।

আর আমরা? প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার মোহে এমনি ভুলিয়া আছি যে এখনকার এমন পতিত অবস্থাতেও অন্য জাতির সভ্যতা, শিক্ষাকে নিতান্ত হেয় ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি। মনু যাজ্ঞবল্ক ইত্যাদি ঋষিগণই, আমাদের মতে, জগতের যত সমস্যা চিরকালের জন্য পূরণ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের সে সকল মত অপরিবর্ত্তনীয়, অনলঙ্ঘনীয়।

আর্য্যজাতিরই দুই অংশ—একাংশ ইয়ুরোপ ও অন্যাংশ এশিয়াতে। কিন্তু এশিয়ার অংশ পূর্ব্বাপরই ইয়ুরোপের কাছে পরাস্ত হইয়া আসিতেছে। কেন?—জীবনাদর্শের পার্থক্য।

এশিয়া মৃত্যুর দেশ। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ব্যাঘ্রভীতি, সর্পভীতি, কত প্রকারে কত ভাবে না আকস্মিকরূপে লোকক্ষয় হইতেছে। এমন মৃত্যুর রাজত্বে সংসার অসার, জীবন অনোপভোগ্য এই জীবনাদর্শ যে বিকশিত হইবে, আশ্চর্য্য কি? অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জীবন যে ভোগের সুখের জিনীষ, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে কি ভারতে কি এশিয়ার অন্যত্র, সংসারের অসারত্বের ভাবই প্রচারিত হইয়াছে। ফলে আমরা অসার; সংসার-নির্লিপ্ত হইয়া উঠিয়াছি এবং পরাক্রমশালী ইয়ুরোপীয় জাতিদের সহিত জীবন সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছি। অথচ, এইটা আমরা দেখিতেছি না, সংসারেই আমাদের থাকিতে হইবে, মরিতে হইবে, সংসারকে পরিত্যাগ করা অসম্ভব। আমরাও যে এক্ষণ মনে মনে সংসারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য ইচ্ছুক নহি এমন নহে। তবে কাহারো সঙ্গে না পারিয়া, আধ্যাত্মিকতায় সকল জাতি অপেক্ষা যে আমরা এক সময় শ্রেষ্ঠ ছিলাম, এই বৃথা গর্ব্বে অশান্তিময় মনকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য ভাবে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া শুধু এই আধ্যাত্মিকতার বোঝা মাথায় লইয়া কি করিব?

তাই, মন খুলিয়া বলিতেছি, সর্ব্বপ্রথমে সাহসের প্রয়োজন। সাহসে ভর করিয়া, কাহারো দিকে না চাহিয়া একমাত্র দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের, নিজ মঙ্গলের দিকে চাহিয়া—জীবনাদর্শ পরিবর্ত্তন দরকার। শুধু ত্যাগে নয়, ত্যাগ ও ভোগ উভয়ের ভিতর দিয়া আমরা জীবনের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের চেষ্টা করিব, যেমন পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ করিতেছে। অসার নহে, সংসার সার; সুখ মৃত্যুর পরে নহে,—এ জীবনে, ইহাই আমাদের জীবনাদর্শ হইবে। অসারত্বমূলক বেদান্তও নহে, বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, সংসার-সার-জ্ঞাপক, জীবন-বাঞ্ছনীয়-প্রকাশক পাশ্চাত্যভাবপুষ্ট নবধর্ম্মের আমাদের প্রয়োজন। যে আদর্শে আমরা নানাবিধ বিদ্যায় ভূষিত হইয়া, শিল্প বিজ্ঞানে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া, জ্ঞানে ধনে, শক্তি সামর্থ্যে, বিষয় বুদ্ধি, চরিত্র বলে জগতের অন্যান্য জাতির সমতুল্য বিবেচিত হইতে পারিব, তেমন শিক্ষা ও আদর্শের দরকার।

আমাদের সমাজ দেহের প্রধান ক্ষত—জাতিভেদ। যে সকল শাস্ত্র এই জাতিভেদ প্রথা সমর্থন করিতেছে—সাহস করিয়া তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জন্যই মনুসংহিতা এমন কি গীতা, যাহাকে বর্ত্তমান ভারতে হিন্দুর পক্ষে খ্রীষ্টানের বাইবেলের ন্যায় স্থান দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে কিন্তু যাহা চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কলুষিত, তাহাও স্থানে স্থানে পরিবর্জ্জনীয়। রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থও স্থানে স্থানে এই কারণেই অপঠনীয় বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। এই জাতিভেদ আমাদের মিলনের, উন্নতির, জাতীয় জীবনবিকাশের পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। এখনও ইহার প্রভাবে এই বিজ্ঞানালোকিত দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপক মুসলমান ছাত্রকে বেদ পাঠ করাইতে অনিচ্ছুক। এখন ও ইহার প্রভাবে হিন্দু

বালক বিদেশ গমন করিয়া দেশে ফিরিলে নির্য্যাতিত হইতেছে। আর কত কাল কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিব, ও শাস্ত্রের বোঝা বহন করিয়া মনুষ্যত্বহারা হইয়া রহিব? আমাদের আচার ব্যবহারে বিশ্ববাসী হাসিতেছে এবং আমাদের দুর্ব্বলতা ও অপদার্থতার সুযোগ লইয়া জীবন যুদ্ধে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক, ব্যাস বা বাল্মীকি, সমাজে এ পর্য্যন্ত যাঁহার যতই কেন প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকিয়া থাকে, যাঁহারা জাতিভেদের পক্ষপাতী তাঁহারা যেন সর্ব্ববিষয়ে আর আমাদের হৃদয়ের পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি অর্ঘ্য না পান। যে কৃষ্ণ চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যিনি 'চণ্ডাল' ও 'কুকুরে' বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টি করেন নাই; যে রামচন্দ্র বেদপাঠনিরত শূদ্রের প্রাণ সংহার করিয়া মহা কীর্ত্তিমান্ পুরুষরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছেন; যে পরশুরাম একবিংশ বার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসরূপ মহাকার্য্য সংশাধিত করিয়াছিলেন বলিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে ভগবানের অবতাররূপে বিবৃত হইয়াছেন—তাঁহারা কি এই সাম্য ও ন্যায়ের যুগে ও আমাদের আদর্শ রূপে বিবেচিত হইবেন? শাস্ত্র বুঝি না; 'চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম জ্ঞান কর্ম্ম বিভাগশঃ' ইত্যাদি কুট তর্ক বুঝি না। বুঝি আমি মানুষ, জন্মিবার পর হইতেই দেশের অন্যান্য মানুষের সহিত সমান ভাবে মানুষ রূপে বিবেচিত হইবার আমার অধিকার আছে। প্রত্যেক দেশেই মানবের এই অধিকার আছে, আমাদের দেশেই কেন থাকিবে না? বাঙ্গালী কতকগুলি নামের মোহে ভুলিয়া আছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, যখন সে মানবের সহজ সত্বের উপর আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই দেখিবে, তাহার সমাজকে সে এখনও ঠিক পথে চালাইতে পারিতেছে না। রাজপুরুষদিগকে আমরা আমাদের প্রতি দৃষ্টিকোণ (Angle of vision) পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তারস্বরে অহরহঃ চীৎকার করিতেছি, কিন্তু স্বজাতির তথাকথিত নিম্নাংশের প্রতি নিজেদের দৃষ্টিকোণ একটু ও পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করিতেছি না। যে শাস্ত্র সমূহ আমাদিগকে এমন কুশিক্ষা দিয়াছে—তাহাদিগকে না ভুলিলে, না পরিত্যাগ করিলে—আমাদের উপায় নাই। জাতিভেদরূপ বিষের জ্বালায় যে আমরা জর্জ্জরিত ও বিকলাঙ্গ হইয়া মরিতে বসিয়াছি!

স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত কি হইবে না? এ ক্ষেত্রেও শাস্ত্র মহা অন্তরায়। রমণী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন, কোনও অবস্থাতেই তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই মনুর ব্যবস্থা। এই নীতির ফলে ভারতে রমণী-জীবনের বিকাশ হয় নাই। ভারতের দুর্দ্দশার মূলকারণ দুইটী। দুইটী মিথ্যার উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত—একটী ব্রাহ্মণ দেবতা; আর একটী স্বামী দেবতা। একটীর জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল; অন্যটীর জন্য স্ত্রীলোকের জীবন এখনও দুর্ব্বিষহ হইয়া রহিয়াছে। স্বামীকে ভক্তিকরা, ভালবাসা, সতীত্ব, সকল সমাজেরই নীতি কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকেও তাহার সঙ্গে মরিতে হইবে, এমন ভীষণ প্রথা আর কোন্ সভ্য সমাজে দৃষ্ট হইয়াছে? এই নীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া কত অসহায়া-রমণী-হত্যারূপ পাপে সমাজ কলঙ্কিত হইয়াছে। সহমরণ দূরীভূত হইয়াছে কিন্তু তাহা-অপেক্ষাও-কম-ভয়াবহ-নহে আজীবন-মরণ বৈধব্য প্রথা এখনও বর্ত্তমান। আজ ফিনলেণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, এমন কি রক্ষণশীল ইংলণ্ডেও রমণীগণ পুরুষের সঙ্গে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সভ্য হইবার সমান অধিকার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধব্যাপারে কত রমণী কত ভাবে নিজ নিজ দেশের সাহায্য করিয়া পুরুষের গুরুভার লাঘব করিতেছে ও জীবন স্বার্থক মনে করিতেছে। আমাদের রমণীগণ পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী! জ্ঞান-চর্চ্চাতো দূরের কথা, দেশের কোনও কার্য্যে শক্তির প্রয়োগ করা তো দূরের কথা; সূর্য্যালোক ও প্রকৃতির মুক্ত বায়ু, যাহা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলেরই আয়ত্ব, তাহা হইতেও তাহারা বঞ্চিতা! সমাজের অর্দ্ধাঙ্গকে এই ভাবে বিকলাঙ্গ রাখিয়া কি 'বাঙ্গালী' উন্নতির পথে কখনও অগ্রসর হইতে পারিবে? কোনও সমাজ কখনও পারিয়াছে কি?

বর্ত্তমান কালে সহস্র সহস্র বৎসরের পুঞ্জীভূত নানা কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্ম ও আচার লইয়া আমাদের চলা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত সভ্যদেশেই, পূর্ব্বের পিতৃপিতামহের আচরিত ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর ফরাসীদেশে ধর্ম্ম, রাজশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জাপানে জাতীয় ধর্ম্ম নামে

কোনও বিশেষ ধর্ম্ম আছে কিনা গবেষণা ও বিবেচনার বিষয়। জ্ঞানের প্রসারে, বিজ্ঞানের আক্রমণে, সকলেই প্রাচীন ধর্ম্ম সমূহে আস্থাবিহীন হইয়া পড়িতেছে। এখন দেশ-প্রীতি ও দেশসেবাই ধর্ম্ম। দেশের জন্য কে কি করিয়া গেলেন, তাহাকে কতদূর উন্নত করিয়া গেলেন, তাহা দ্বারাই লোকের মাহাত্ম্য ও মহত্ব এক্ষণে নির্ণীত হইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমাদের কি এক্ষণে পূর্ব্বকার তেত্রিশ কোটী দেবতা লইয়া চলিবার উপায় আছে? আমাদের দেবতা নাই কোথায়? বৃক্ষ, প্রস্তর খণ্ড, পশু, মানুষ, কে আমাদের পূজা পায় না? ইংরাজী শিক্ষার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অনেক দেব দেবীই ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছেন; যাহারা আছেন, তাহাদেরও ভবিষ্যৎ শোচনীয়। যেমন দেখিতেছি আর পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে, এমন যে দুর্গাপূজা তাহার অস্তিত্বও বুঝি বাঙ্গালার লোপ হয়। এত সব দেবদেবীর পূজার সঙ্গে জাতিভেদ ও অন্যান্য কুসংস্কারপূর্ণ কত সূক্ষ্ম রীতি নীতি জড়িত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে এক একেশ্বরবাদ ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই একেশ্বরবাদইবা কতদিন বর্ত্তমান থাকে তাহাও চিন্তার বিষয়। এত সব দেব দেবী পরিত্যাগ করিয়া, একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের পতাকা তলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলে হিন্দুর, মুসলমান প্রভৃতি জাতির সহিত মিলনের অনেক অন্তরায়ও দূরীভূত হইবে।

সর্ব্বোপরি আমাদিগকে যেমন করিয়াই হৌক শিক্ষিত হইতে হইবে, সকলকেই। বাতাস ও আলোর ন্যায়, ছোট বড় ধনী দরিদ্র, পুরুষ রমণী, শিক্ষা সকলের আয়ত্ব হইবে। সর্ব্বত্রই দরিদ্রকে বড় করিয়া দেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। যত দিন ধনী দরিদ্র সকলে সমান ভাবে শিক্ষিত না হইবে ততদিন আমাদেরও মঙ্গল নাই। এ শিক্ষা শুধু জ্ঞান মূলকই হইবেনা, নানাভাবে অর্থকরী ও হইবে।

বাঙ্গালী যে অত্যল্পকাল মধ্যে সকলের পশ্চাৎ হইতে ভারতের সকল জাতির অগ্রে আসিয়া স্থান লইয়াছে তাহার কারণ কি? কারণ, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বাঙ্গালাতে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাব ও সভ্যতা কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে যেমন প্রচারিত হইয়াছিল এমন কুত্রাপি হয় নাই। রাজা রামমোহন এই পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রবিষ্ট যুগাবতার। বস্তুতঃ, এসকল ভাব যে পরিমাণে যত গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, ভারতের সেই অংশই সেই পরিমাণে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল ভাব গ্রহণ করিয়াই বাঙ্গালী আজ ভারতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জাতি। এই পাশ্চাত্য ভাব সমূহ যতদূর আমাদের প্রাচ্য জ্ঞান ও ভাবের সহিত সম্মিলিত করিতে পারিব, ততই আমরা উন্নত হইব। সে ভাব সমূহের মূল সূত্র, এ জীবন সত্য, বাঞ্ছনীয়, উপভোগ্য।

যতই কেন না বলি, প্রাচীন আদর্শ সমূহের প্রভাব এখনও সমাজের উপর প্রবল। ইংরাজের আদর্শ 'To die in harness' মৃত্যু পর্য্যন্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকা, আর আমাদের 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ'। এই কু-আদর্শের ফলে, সত্য সত্যই পঞ্চাশে পা না দিতেই আমরা নিজ নিজকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মনে করি ও সংসারবিতৃষ্ণ হইয়া উঠি। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত হইতে প্রাপ্ত এ সকল প্রাচীন আদর্শে নবগঠিত বাঙ্গালী জাতির প্রয়োজন নাই। ইহাদের উপর এ জাতি গড়িয়া উঠে নাই। শঙ্করাচার্য্য বা রামানুজই হৌন, যে কেহ জীবনের অসারত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন তিনি প্রকারান্তরে আমাদের জাতীয় জীবনের দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন ও জাতীয় শক্তি ক্ষীণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে সংসারে থাকিয়া সংসারের ভিতর বড় হইতে চাই। অন্যান্য জাতির সঙ্গে নিজ স্থান অধিকার করিয়া লইতে চাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন প্রসূত নূতন আদর্শে বাঙ্গালী নিজকে চালিত করিবে; প্রাচ্যের গভীর চিন্তার সঙ্গে প্রতীচ্যের প্রখর কার্য্যবুদ্ধি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, অল্পভাষিতা, কঠোরতা ও স্বদেশ হিতৈষণা তাহাকে সকল সৎকাজে প্রধাবিত করিবে। তাহার চক্ষু সম্মুখে; সে কেন শুধু অতীত লইয়া পড়িয়া থাকিবে? বিশাল মানব জাতি বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাই নূতন ভাব ও আদর্শের সে সকল সমন্বই আকাঙ্ক্ষী। বাঙ্গালী ও নূতন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন যুদ্ধে অগ্রসর হইবে।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক জাতিরই একবারের অধিক যেন অভ্যুদয় হয় না। যেমন মানব শরীরে, তেমন জাতীয়দেহে ও একবারই

যৌবনশ্রী দৃষ্ট হয়। রোম গ্রীস মরিয়াছে, অনন্তকালের জন্য। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে এক্ষণ 'বাঙ্গালীর' অভ্যুদয়ের সময় উপস্থিত। এই মহা সুযোগ যেন আমরা না হারাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমাদের দৃষ্টি আবার যেন অতীতের শিক্ষা দীক্ষার দিকে অত্যধিক ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বকার সন্ন্যাসী জীবন ও প্রাচীন অসারত্ব মূলক আদর্শ সমূহ অনেকের কাছে লোভনীয় চিত্তাকর্ষক বোধ হইতেছে। ফলে, আমরা দুই পদ অগ্রসর হইলে, এই সকল আদর্শের মোহে একপদ সরিয়া পড়িতেছি। হায়! মোহ কি ভাঙ্গিবে না? বাঙ্গালী কি মানুষ হইবে না?

জীবনাদর্শ পরিবর্ত্তন কর, সংসারে মনোনিবেশ কর ও বড় হইতে চেষ্টা কর। জাতিভেদ ভুলিয়া যাও, রমণীদিগকে মানুষ হইতে দেও, শিক্ষা প্রচার কর, দেশকে ভালবাস, দেশবাসীকে ভালবাস, কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানী হও। বাঙ্গালী তাহা হইলেই তোমার ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত হইবে, নচেৎ নয়। সাম্যের পথে, আলোর পথে, মিলনের পথে, অগ্রসর হও; সেই পথই আনন্দের পথ, উন্নতির পথ। তোমার অতীত যাহাই হোক বর্ত্তমান উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ ততোধিক উজ্জ্বল—যদি পথ ভুলিয়া না যাও।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার কাশীতে একদল ত্রিশঙ্গীকে (মান্দ্রাজী) আগুণের উপর নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম। প্রায় ৩০ মণ মোটা মোটা কাঠ জ্বালাইয়া উহাকে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত করা হয়। তাহার উপর নৃত্য আরম্ভ করা হয়। নর্ত্তকেরা সকলেই সুধু পায়ে আগুণের উপর নাচিয়াছিল। অনেকেই উহা দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মুখে শুনিলাম, বেদ শাস্ত্রের জোড়ে ঐ অদ্ভুত কার্য্য উহারা সম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ এই আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের এক ক্ষুদ্র গ্রামে যখন পুনরায় ঐ ব্যাপার দেখিলাম তখন আমি প্রকৃতই অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। ব্যাপারটা বলি।

চতুর্থ দিবসে—(১৭ই ভাদ্র ৪টা সেপটেম্বর) আমরা বরি সাহেবের নিকট বিদায় হইলাম। বেলা প্রায় ৫টার সময় আমরা টেগিয়ে নামক এক বড় গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম খানি হ্রদের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা সে দিবসের জন্য ভ্রমণ ঐ খানেই স্থগিত করিলাম। নৌকা তীরে লাগাইবা মাত্র সাহেব দুই জন, রতি ও আমি গ্রামে প্রবেশ করিলাম। দোভাষীর কাজ করিবার জন্য একজন মাঝিকে সঙ্গে লওয়া হইল। গ্রামের মধ্যে একটা খোলা ময়দানে দেখি প্রায় এক হাজার লোক জমা হইয়া কি একটা ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে শুনিলাম আজ রাত্রি ৮টার পর লোক জ্বলন্ত আগুনের উপর চলা ফেরা করিবে। এই সব কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গ্রামের প্রধান ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং বিশেষ বিনয়ের সহিত সাহেব দুই জন ও আমাদিগকে ঐ ঘটনা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেবেরা সম্মত হইলেন। স্থির হইল যে সন্ধ্যার পর দুইজন লোক নৌকা হইতে আমাদিগকে ঘটনা স্থলে লইয়া আসিবে। ইহার পর আমরা ফিরিয়া আসিলাম ও তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া প্রস্তুত হইলাম। কাপ্তেন সাহেবের পরামর্শে দুই জন শিখ আমাদের সঙ্গে যাইবে স্থির রহিল। আমরা প্রত্যেকে এক একটা ছয় নলা রিভলভার সঙ্গে রাখিলাম। তাহার পর যথা সময়ে প্রধানের দুই জন লোক উপস্থিত হইল। ইহাদের অঙ্গে কৌপীন ভিন্ন আর কোনও বস্ত্র দেখিলাম না। সর্ব্বাঙ্গ উল্কিতে ভরা। গলায় হাড়েরও মাছের দাঁতের মালা। মস্তকে লম্বা লম্বা চুল। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া বরছা। রতি আমাকে অস্ফুটস্বরে বলিল—"কি দুসমন চেহারা! যেন যমদূত।"

যথা সময়ে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলাম। এক প্রকাণ্ড ময়দানকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঐ ঘেরা জমির মধ্যে দর্শকেরা সকলে ভূমির উপর বসিয়াছে। উহার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছে। উহার ঠিক মাঝখানে এক খণ্ড জমিকে বেড়া দিয়া ঘেরিয়াছে। শুনিলাম, উহারই ভিতর অগ্নি-নৃত্য হইবে।

গ্রামের যাঁহারা বড় দরের লোক তাঁহারা ইহার নিকটেই স্থান পাইয়াছেন। এক পাশে চারিটি বাক্সের মত বসিবার আসন ছিল। প্রধান নিজে আমাদিগকে ঐ স্থানে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে নিকটেই এক স্থানে বসিলেন।

আমরা উপস্থিত হইবামাত্র দর্শকদিগের মধ্যে যেন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহারা যে আমাদের আগমনে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম। ২।৪ মিনিট পরে একদল লোক প্রধানকে একদিকে লইয়া গিয়া কোনও বিষয়ের পরামর্শ বা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। আমরা এবারেও সঙ্গে একজন সঙ্গী লইয়া গিয়াছিলাম। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে কি ইঙ্গিত করাতে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল এবং প্রায় ১০ মিনিট পরে কাপ্তেন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনারা আসাতে লোকেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে"।

তাহারা বলে, "ইহা আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রথা। ইহার মধ্যে বিদেশী আসা একেবারে নিষেধ।' প্রধান উহাদিগকে বুঝাইতেছে কিন্তু উহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিতেছে না। এই সময়ে প্রধান, কাপ্তেন সাহেবের নিকট আসিলেন এবং আস্তে আস্তে কহিলেন, "আমাদের নিয়ম, এ সময়ে অন্য ধর্ম্মের বা অন্য দেশের লোককে থাকিতে দেওয়া হয় না। এই জন্য গ্রামের অনেকে আপনারা আসাতে বিরক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমি নিজে যখন আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি তখন আমি কোনও মতে আপনাদিগকে বিদায় দিতে পারি না। তাহা হইলে আমার বদনাম হইবে। আপনারা আমার অতিথি। আমার প্রাণ থাকিতে অতিথির অপমান হইবে না। তবে আপনারা যদি ভয় পাইয়া থাকেন তবে সে স্বতন্ত্র কথা।" প্রধান যদি শেষের কথা গুলি না বলিতেন, তাহা হইলে হয় ত সাহেবরা ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু 'ভয় পাওয়ার' কথা শুনিয়া সাহেব দুই জন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যখন আসিয়াছি, তখন না দেখিয়া ফিরিব না। ইহাতে ফল যাহাই হউক। আপনি যদি আমাদের সহায় থাকেন, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব। আপনি ভাবিবেন না।"

সাহেবদ্বয়ের মনের ভাব অবশ্য বলিতে পারি না। কিন্তু রতি ও আমি যে একটু বিশেষ রকম ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি। যাহা হউক, ইহার পর মাঝখানকার সেই ঘেরা জায়গায় রাশি রাশি কাঠের কয়লা আসিয়া পড়িতে লাগিল। উহার চারিদিকে প্রায় ২ হাত পুরু কয়লা বিছান হইলে কয়লা ফেলা বন্ধ করা হইল। তাহার পর উহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। প্রায় ১৫০ জন লোক মিলিয়া এই কাজে হাত দেওয়াতে এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ বিরাট কয়লার স্তূপ একবারে লাল হইয়া উঠিল। উহার ভিতর একখানা কয়লাও বোধ হয় কাঁচা রহিল না। তাহার পর একদল বাদক ও গায়ক অভিনয় স্থলের এক দিকে আসিয়া বসিল, এবং তাহাদের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। এই দলে আমরা ২৬ জন লোক দেখিলাম—১৪ জন বাদক ও ১২ জন গায়ক। ১৪ জনের হাতে নানা রকমের বাদ্য যন্ত্র লক্ষ্য করিলাম। এক রকম ছোট ঢাক—৭ জন তাহাই বাজাইতে ছিল। তিন জন বাঁশী লইয়া ছিল। দূর হইতে যতটা বুঝিলাম তাহাতে বোধ হইল উহা কোনও প্রকার বাঁশের প্রস্তুত। শব্দ খুব উচ্চ বটে, কিন্তু বড় তীব্র, কর্কশ বলিয়া মনে হইল। অবশিষ্ট ৪ জনে দুই হাতে দুইটা লম্বা কাটি লইয়া বাজাইতেছিল। অনেকটা যেন করতালের নকল।

বাদকেরা ৩।৪ মিনিট বাজাইবার পর নিস্তব্ধ হইলে গায়কেরা গান গাহিতে আরম্ভ করিল। উহারা কয়েক মিনিট পরে নীরব হইলে, বাদকেরা সুরু করিল। এই ভাবে গীত ও বাদ্য চলিতে লাগিল। আমি বাল্যকাল হইতে গীত বাদ্য প্রিয়; কিন্তু ইহাদের গান বাজানা ৫।৭ মিনিট শুনিবার পর আমার মনে হইল যেন শাস্তি ভোগ করিতেছি। অধিকক্ষণ এরূপ চলিল না। ১৫।২০ মিনিট পরে ১৪ জন লোক ঐ আগুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সকলেই সম্পূর্ণ ভাবে উলঙ্গ। সকলের গলায় বড় বড় হাড়ের মালা। প্রত্যেক মালার মাঝখানে ছোট ছেলের একখানা হাত দুলিতেছে। সমস্ত মুখমণ্ডল লাল ও কাল রং এ এমন ভাবে সাজাইয়াছে যে দেখিলে ভয় হয়। প্রত্যেকের দক্ষিণ হস্তে এক খণ্ড বড়

হাড় ও বাম হস্তে একটা মাটীর পাত্র। শুনিলাম উহার মধ্যে মদ আছে।

উহারা আসিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে কোরসে একটা গান গাহিল, তাহার পর সেই অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। প্রথমে উহারা যেন খুব সন্তর্পণের সহিত উহার মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। গায়ক ও বা'কের দল এইবার এক সঙ্গে তাহাদের কাজ আরম্ভ করিল। গানের এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু স্বর শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারা গেল যে কোনও দুঃখের কথা বিবৃত করিতেছে। তাহার পর হঠাৎ সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নৃত্যকারীরা এইবার খুব তাড়াতাড়ি নাচিতে লাগিল। গায়ক ও বাদকেরাও খুব শীঘ্র শীঘ্র গাহিতে বাজাইতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কাল চলিল। তাহার পর একজন লোক চীৎকার করিয়া কি বলিল। প্রধান বলিলেন, "এখন যে ইচ্ছা আগুনের মধ্যে যাইতে পারে। আপনারা যাইবেন কি?" আমরা সম্মত হইলাম না। তখন প্রধান নিজে ও আরও প্রায় ৫০ জন লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া ঐ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও উহার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ইহার পর আমরা চলিয়া আসিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে প্রধান, সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও বলিলেন "আপনারা কাল খুব রক্ষা পাইয়াছেন। অনেকের ইচ্ছা ছিল আপনাদিগকে ধরিয়া ঐ আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তবে আমি খুব সতর্ক ছিলাম বলিয়া কোনও গোলমাল উপস্থিত হয় নাই।" সাহেবরা উহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন এবং তিন বোতল রম তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইল। রম পাইয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ আফ্রিকার অনেক স্থানে উহার অধিবাসীদিগকে বিলাতী মদ বিক্রয় করা হয় না। আমরা উহার পায়ের তলা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু আগুনে পোড়ার বিন্দু মাত্র চিহ্ন কোথাও দেখিলাম না। তখন কাপ্তেন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি উপায়ে জ্বলন্ত আগুনের উপর নাচিতে পারিয়াছিলেন? পায়ে কি কোনও ঔষধ লাগাইয়াছিলেন?" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "না, না। আপনারা যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আপনারাও উহা করিতে পারিতেন। আমাদের দেশে এক সম্প্রদায় আছে যাহারা মন্ত্রের জোড়ে আগুনের পোড়াইবার ক্ষমতাকে একেবারে দূর করিয়া দিতে পারে। আপনারা হয় ত এ সব কথা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে আপনারা অতি সহজে আমার এই কথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে পারেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অবধি আগুনের ক্ষমতা হরণ করা হয়। ঐ সময়ে যে ইচ্ছা উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু এ নিয়ম সুধু মানুষের পক্ষে। অন্য কোনও জন্তু বা দ্রব্য যদি আগুনে দেওয়া হয়। তাহা হইলে উহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। এই প্রথা এদেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কি প্রকারে যে ইহা হয় তাহা আমি জানি না।" তিনি চলিয়া যাইবার পর এ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। দেখিলাম, সাহেবরা ব্যাপারটাকে একটা জুয়াচুরি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

ফলেন পরিচীয়তে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার পত্রিকার জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় উমেশ বাবুর সুচিন্তিত প্রবন্ধ "ফলেনপরিচীয়তে" পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ডিঃ গুপ্ত সাহেবের 'ফলেন পরিচীয়তে' এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গবাসীর যেমন অশেষ উপকার করিয়াছে ও করিতেছে উমেশ বাবুর প্রবন্ধটী যে ততোধিক উপকার দর্শাইবে না, তাহা কে বলিবে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কমিসন্ বসিবার পূর্ব্বাহ্নে এবং ম্যাট্রিকুলেশন ও বি,এ, পরীক্ষার নানা রঙ্গবেরঙ্গের কেলেঙ্কারীর পর এইরূপ প্রবন্ধ মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই! একেই দলাদলিতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, আর উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে ও দিন দিন তাহা শক্তিময়ী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে এমন দিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অগ্নিদেবের ব্যবস্থা করা উমেশ বাবুর পক্ষে যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে

কি না বুঝিতে পারি না। মুদির দোকানের মত আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলে যদি দেখাইবার মত কোনও চিহ্ন না-ই থাকে তা'তেই কি আমরা স্বীকার করিয়া লইব যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টার এক কাণাকড়িও মূল্য নাই? উমেশ বাবু যাহাই বলুন না কেন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টী সাত কড়ির দলের কয়েকটী মাত্র কাণাকড়ির মূল্যে ব্রজেশ্বর ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন কড়াদরে না হাঁকিলে ব্রজেশ্বর পাওয়া যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলেও এই সাত কড়ি ব্রজেশ্বরের দল উহার সম্মান চিহ্নস্বরূপ প্রকটিত থাকিবে।

ভালমন্দ সকল বিষয়েই আমরা আক্ষেপ প্রকাশ করিতে অভ্যস্থ আছি। বড়জোর একটা দরখাস্ত করিয়া সে আক্ষেপগুলি কথঞ্চিত স্থায়ী করা পর্য্যন্ত আমাদের দৌড়। এ ক্ষেত্রে আমরা ভাবিতেই বা শিখিব কেমন করিয়া আর বিশ্বাস অনুযায়ীই বা কার্য্য করিব কেমন করিয়া! পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে সর্ব্বপ্রধান ও অত্যাবশ্যক উপাদান যাহা তাহা কেবলমাত্র ঐ নির্জ্জীব ইটপাথরের গড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আকাঙ্ক্ষা করা উমেশ বাবুর মত চিন্তাশীল লোকের নিকট আশা করি নাই। সাহিত্যে ও জীবনের যাহারা নবীন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন তাহাদের মূলমন্ত্র হইতেছে—

(1) Life to live (2) Life must have a mission কিন্তু ঐ দুইটার কোনটাও যে আমাদের দেশে সম্ভবপর তাহা একবারেই বিশ্বাস হয় না। যে দেশের ছেলে মেয়েরা একটু পরিষ্কার ফিট্‌ ফাট্‌ করিয়া কাপড় চোপর পরিধান করিলে বাবু ও * * মত দেখাচ্ছে বলিয়া উপহাস করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না, সে দেশের ছেলে মেয়েদের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ সভায় গল্প, গান বাজনা কবিতা আশাকরা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আর যে দেশের ছেলেমেয়েরা অর্দ্ধাশনে জীবন অতিবাহিত করে, আর যে ব্যক্তি ও বস্তুকে সম্মুখে দেখিলে প্রাণের মধ্যে রক্তের হিল্লোল খেলিয়া যায় গল্প প্রভৃতি বলিবার উন্মাদনা জাগিয়া উঠে, তাহাদের সহিত নিমন্ত্রণ সভায় সাক্ষাৎ পাওয়া বাঙ্গালীর ভাগ্যে যে ঘটে না, তাহা উমেশ-বাবু বিলক্ষণ জানেন।

কাহারও আমি দাস নই বা নীচে নই একথাটা শুনিতে বড়ই সুন্দর। কিন্তু সকলেই বন্ধু ভাবে সম্ভ্রান্তের (Lord) এর মত জীবন ধারণ করিতে গেলে, নিয়ম যে থাকে না, সমাজ যে থাকে না, শাস্তি দিবার অধিকার যে কাহারও থাকে না তাহা বোধ হয় সত্য। এই Lord ভাবটা যে কোনও সমাজের সঙ্গে মিল খায় না সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে বোধ হয় উমেশবাবু ঝাটার ব্যবস্থা করিবেন না। ততখানি স্বীকার কারলে সমাজের বিষয়ে মতবিশেষের experiment কি করিয়া সম্ভব হয়—আর পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশই বা কি করিয়া সম্ভবপর হয়।

আমরাও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিচারের পক্ষপাতী। কিন্তু এ জগতে কি এমন কোন বিষয় নাই যাহা শিখিতে হয় না আর শেখান যায় না। যদি তেমন কিছু থাকে সেখানে বিচার সম্ভবপর হইবে কি করিয়া? বিচারে যাহা স্বীকার করি অনেক সময় হৃদয় তাহা গ্রাহ্য করে না। সে খানে বিচারের স্থান কোথায়? আর যাহারা মনে করেন মানুষের গড়া ভাল মন্দের কষ্টি পাথর গুলির মূল্য একবারেই নাই—তাহাদের নিকট বিচারের মহিমা যে কত অল্প তার প্রতিকার আমরা কি করিতে পারি। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি ন্যায় শাস্ত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য সমাজের পক্ষ হইতে দুই চারিটা হা হুতাশ হইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু মানুষের তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে বুঝিতে পারি না। পরকীয়ার প্রেমের প্রতি ভগবানের অভিশাপ কিম্বা কটাক্ষ যদি থাকিবে তবে সে প্রেমের এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত সন্তান উৎপন্ন হইবেই বা কেন। সমাজের নিয়ম ভঙ্গ হইলেই যে বিশ্বমানবের ধারার উপর বজ্রাঘাত পড়িবে ইহা ত মনে হয় না। তবে একটা সুবিধা অসুবিধার কথা উঠিতে পারে তাহা স্বতন্ত্র।

ফলেন পরিচীয়তে এই মূল মন্ত্র গ্রহণ করিলে আমাদের দুইটী অসুবিধা হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতে হয়। প্রথমতঃ সমস্ত বৃক্ষই জন্মাবধি সুফল প্রসব করিতে থাকে না। ফল ধরিবার পূর্ব্বেই যদি মনে করিয়া বসি গাছটার মূল্য একেবারেই নাই তখন গাছটার দশা কি হইবে?

দ্বিতীয়তঃ যে বৃক্ষটী ফল দিতেছে না তাহার ফলের আশায় কতকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে সে, কথাটী উমেশ বাবু বলিয়া যদি দিতেন তবে বড়ই ভাল হইত। সমাজ যদি যুবক আর যুবতীতেই কেবল ভরপুর থাকিত তবে সমাজ দেখিতে সুন্দর হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু সমাজ দুদিনের বেশী টিকিত কিনা সন্দেহ। শিশু ও বৃদ্ধের জন্য অগ্নির ব্যবস্থা করা খুব সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গত ও সুবিধা জনক বলিয়া বোধ হয় কেহও মনে করিবেন না।

তবে আমরা যে দুর্ব্বল এ বিশ্বাস আমাদের আছে, লাঠির প্রমাণ সেরা প্রমাণ নয় ইহাও আমরা স্বীকার করি এবং সেই জন্য বিচারের পক্ষপাতি আমরা সকলেই। বিশেষতঃ এখনও যাহারা স্কুল কলেজে পড়ে তাহাদের পক্ষে লাঠির চাইতে বিচার ভাল। কারণ তাহাতে পিঠেও পড়ে না আর পেটেও কিছু ঢোকে না, তবে কাণে যেটুকু ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহাও নাসিকা গর্জ্জন শব্দে বন্ধ হইয়া যায়। যে দেশের ছেলে মেয়েরা খাওয়ার পাঁচ মিনিট পরেই উর্দ্ধশ্বাসে স্কুল কলেজে দৌড়ায় এবং অবিজ্ঞান সম্মত খাদ্যে পাকস্থলী বিশেষরূপে স্ফীত করিয়া দিনের মধ্যে যে সময়টা বেশী গরম সেই সময়টা মস্তিষ্ক পরিচালনা করে, আর পাশ করিয়া কুকুর বিড়ালের মত রাত্রি দিন খাদ্য সংস্থানের জন্য ঘুড়িয়া বেড়ায় তাহাদের শরীরে ও মনে ব্যাধি না দাঁড়াইয়া যাইবে, আর তজ্জন্য মনুষ্যত্বের বিকাশ বন্ধ করিয়া ম্যালেরিয়া জন্মাইবে—সে সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া অকর্ত্তব্য। তবে ফলেন পরিচীয়তে থাকিতে জীবনের আশঙ্কা নাই। ইতি—

শ্রীপঃ।

উত্তর।

জ্যৈষ্ঠের 'সৌরভে' প্রকাশিত আমার 'ফলেন পরিচীয়তে' নামক প্রবন্ধের একটা প্রতিবাদ আসিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।-কারণ আমার মনে হয় আমার উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে— এক জন লোক অন্ততঃ আমার উত্থাপিত বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু 'শ্রীপ'র সঙ্গে আমি এক মত হইতে পারি না, একথা বলা অনাবশ্যক; কারণ, জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্রে আসিয়াই মানুষের মত বদলাইয়া যায় না। আর, শ্রীপ'র মত আমার মত হইতে বাস্তবিকই ভিন্ন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ উনি যে অনেক স্থলেই আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট।

উনি বলেন, আমি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অগ্নিদেবের ব্যবস্থা' করিয়াছি। তাহা আমি মোটেই করি নাই। বেঁচে থাকুক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্তু আর একটু ভাল হইতে দোষ কি? কেহ যদি বলে, ঘর দরজা মেরামত করিতে হইবে, তাহা হইলেই কি পাড়াপরশীরা আসিয়া বলে, "তোমার মত ত বেকুব নাই! এই বাড়ীতে তোমার বাপ দাদা থাকিয়া গেছেন, তুমিও এতকাল রহিলে, এখন উহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে চাও?" বাপ দাদা থাকিয়া গিয়াছেন বলিয়াই যে আর সংস্কারের প্রয়োজন নাই এমন নয়; আর মেরামত অর্থই অগ্নিসংযোগ নয়। যাহা হউক, বড় বড় বুদ্ধিমান্ লোক এই বিষয়ে বিচার করিতে আসিতেছেন, আমাদের এখন সরিয়া পড়াই ভাল। তবে, একটা কথা বলিয়া রাখা যায়; যদি কোন দিন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশী লোকের প্রাধান্য কমে তবে সে জন্য বাঙ্গালী কি একেবারেই দোষী হইবে না? অবশ্যই, ভিতরের খবর না জানিলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। 'শ্রীপ' এক জায়গায় লিখিতেছেন, "যে ব্যক্তি ও বস্তুকে সম্মুখে দেখিলে প্রাণের মধ্যে রক্তের হিল্লোল খেলিয়া যায় * * * তাহাদের সহিত নিমন্ত্রণ সভায় সাক্ষাৎ পাওয়া বাঙ্গালীর ভাগ্যে যে ঘটে না" ইত্যাদি। সেই বস্তুটী কি? নায়িকা? যাহা হউক আলাপ না করার একটা অজুহাত পাওয়া গেল বটে; 'শ্রীপ'র সঙ্গে দেখা হইলে কাজে আসিবে।

'শ্রীপ' প্রশ্ন করিয়াছেন, "ফল ধরিবার পূর্ব্বেই যদি মনে করিয়া বসি গাছটীর মূল্য একেবারেই নাই, তখন গাছটীর দশা কি হইবে?" আমি কি করিয়া বলিব? আমি ত ফল ধরিয়াছে যে গাছ তার বিচার করিতেই বলিয়াছি; কেহ যদি ফল ধরিবার পূর্ব্বেই বিচার করিতে চায়, তাহা হইলে আমি তাহাকে ঠেকাইব কি করিয়া?

"দ্বিতীয়তঃ যে বৃক্ষটী ফল দিতেছে না তাহার ফলের

আশায় কত কাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে ?" যে বৃক্ষ ফল ধরে না তাহা দিয়া হয় কি ? গাছে আম না ধরিলে কত দিন পরে গাছটী কাটীয়া ফেলিতে হয়, বাগান যাদের আছে তারা কি তাহা জানে না ? আচ্ছা, 'শ্রীপ' ত বৈষয়িক পণ্ডিত ; বলিতে পারেন, কয়টী দৃষ্টান্তে একটী ব্যাপ্তি নির্দ্ধারণ করা চলে ?

পরকীয়া প্রেমের কথা 'শ্রীপ' যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি আপাততঃ কিছু বলিব না। আমি শুধু বিচার করিতেই বলিয়াছিলাম। ফলে বিচার করিয়া তিনি যদি উহা ভাল মনে করেন, তাহা হইলে আমি অন্তরায় হইব না।

অনশন বা অর্দ্ধাশনের কথার কি উত্তর দিব জানি না। 'খেতে পাই না, কখন ভাবিব'— না ভাবার পক্ষে ইহা একটা মস্ত যুক্তি কিনা জানি না। সকলেই কি অনাহারে কষ্ট পায় ? তারা কেন ভাবে না ? 'যেহেতু তোমার ইচ্ছা মত পোলাও থাইতে পাও না, সুতরাং তোমরা ভাল মন্দের চিন্তা কখনও করিও না' —— দেশের লোককে এই উপদেশ দিতে আমি সম্মত নই। আর, অন্ন চিন্তাটাও দেশের ভাল মন্দের চিন্তার অন্তর্গত নয় কি ?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মুকুল।

ফোটালে কে গো ঘুমান এই
মুকুলটীরে ?
সবুজ পাতার অন্তরালে
পরশ করে।

কত ঝড়ের কত ঘাতে,
কালো মেঘের বারিপাতে,
এম্‌নি করে ঘুমিয়েছিল
চুপ্‌টী করে,
ফোটালে কেগো ঘুমান এই
মুকুলটীরে।

কোন দেবতার অভিশাপে
অন্ধ ছিল এত কাল,
কেউ খোলতে পারেনিত
অন্ধ জনের আঁখি-জাল।
আজ বুঝি তার পুণ্য লগ্ন,
এলো বুঝি এলো আজ,
তোমার হাওয়ার পরশ পেয়ে
দৃষ্টি পেল বিশ্বমাঝ।

যাত্রাশেষে আঁধার ঘরে,
ধরলে তোমার প্রদীপটীরে,
ধন্য করে অন্ধ জনের দিলে
জীবনটীরে ;
তুমি ফোটালে কেগো ঘুমান এই
মুকুলটীরে।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

সাগর সমাধি।

তিন দিন হইল খোকা আমারি চলিয়া গিয়াছে। আমার খেলার সাথী, জীবনের চির সম্বল, নিদ্রায় শান্তি, সব যেন খোকার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এই সুদূর দেওঘরে আমার যেন আর কেহ নাই, সব শূন্য, আর চারি দিকে একটা বিরাট হাহাকার। কি করি, কিছু ভাবিয়া পাই না ; স্বামী বোঝাতে আসেন, আর নিজেই কাঁদিয়া আকুল হন। ভাগ্যিস পাশের বাসায় দিদি ছিলেন, তাই রক্ষা। নহিলে আজ এমন করিয়া আমাদিগকে কে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিত ? দিদি এই কয়দিন কিছু বলেন নাই, শুধু বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। আর কি-ই বা বলিবেন, বলিবার ত কিছু নাই। কিন্তু আজ আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "শৈল, দিদি আমার কেঁদ না।" তাঁহার স্বরে একটা আকুল বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছিল। মনে বড় দুঃখ হইল, বলিলাম, "দিদি, আজ যে আমার কেউ নাই—আজ

যে আমার বুক শূন্য, কান্নাই ত আমার জীবনের সার করতে হবে; তুমি কাঁদ্‌তে মানা কচ্ছ! কিন্তু আমার বুকের-ভিতর কেমন কচ্ছে তা যদি বুঝ্‌তে দিদি?"

"আর আমার কি দুঃখ তা যদি জন্‌তিস শৈল, তবে কাঁদতিস না। আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ত, আমার কি আছে—একবার চেয়ে দেখত।" তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। দিদিকে ত কোন দিন কাঁদিতে দেখি নাই। দিদির কি তবে আমারই মত শূন্য বুক—আমারই মত দুঃখ? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদি, তুমি কি আমারই মত—"

"হাঁ শৈল, আমি ও তোর মত বুকে একটা হাহাকার চেপে রেখেছি। আজ তোকে সব বলব, এতদিন কাউকে বলিনি; গোপনে নিভৃতে হৃদয় জ্বলে' খাক্ হ'য়ে গেছে।" তাঁহার স্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আকাশের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"সে আজ পাচ বছরের কথা। উনি তখন বরিশালে কাজ করতেন। পূজার চারদিন বাকী। স্থির হল নৌকায় বাড়ী যাব। বরিশাল হ'তে বাড়ী দু'দিনের পথ। সকাল বেলা নৌকায় উঠলুম। সমস্ত দিনটা বেশ ছিল। সন্ধ্যাবেলা সমস্ত আকাশে কে যেন রক্ত ঢেলে দিল। নৌকা মাঝ নদীতে। আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠতে লাগল। সঙ্গে—" বুঝিলাম দিদির স্বর অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। একটা রুদ্ধ বেদনা তাহার বুকের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। বলিলাম, "থাক্‌না দিদি, তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

"না শৈল, তুই শোন—সঙ্গে ছিল আমার ননীর পুতুল শান্তি ও সুধীর। কি সুন্দর ছিল তারা, যদি দেখ্‌তিস্!" তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তাঁকে বল্লুম 'আমার বড় ভয় হচ্ছে; নৌকা পাড়ে লাগাতে বল। তুফান আস্‌বে বলে মনে হচ্ছে।' তিনি মাঝিদের একথা বল্লেন। তারা উত্তর কর্‌ল 'একিছু নয় বাবু; আর দরিয়াও তেমন বড় নয়, কিছু ভয় কর্‌বেন না।' নৌকা চল্‌তে লাগ্‌ল। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বাইরে ভীষণ আঁধার। আমার শান্তি সুধীর ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি রান্না কচ্ছিলুম, উনি বসে তাই দেখ্‌ছিলেন। এম্নি সময়ে একটা মাঝি এসে বল্লে, 'বাবু, এখানে নামতে হবে।' স্বামী বল্লেন, 'সে কিরে?—— কোথায় নাম্‌ব?' সে বল্লে 'এখানে জল বেশী নেই বাবু; এ একটা চরা জায়গা।'

এখানে নাম্‌ব কেন? আমি ভয়ে শিউরে উঠ্‌লুম, বল্লুম 'তোরা কি চাস্?' 'কি চাই এখনও বুঝতে পার নি?' তার কথা শেষ হতে না হতে চার পাঁচটা মাঝি দা' হাতে করে ভিতরে প্রবেশ কর্‌ল। তখন সব বুঝলুম। তাদের পা' জড়িয়ে ধরে' বল্লুম 'যথা সর্ব্বস্ব তোমারা নিয়ে যাও; শুধু আমাদের প্রাণে মের না।' তারা বল্লে 'তবে এই খানে নাম।' অগত্যা সেখানেই নেমে পড়্‌লুম। দেখি হাঁটুর উপরে জল। চার দিকে কেবল আঁধার আর জল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুফান আরম্ভ হল; সঙ্গে সঙ্গে আবার বৃষ্টি। আমার কোলে শান্তি, আর তাঁর কোলে সুধীর।

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দিদি ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "ভেবে দেখ্ শৈল, আমাদের কি দশা! করযোড়ে বল্লুম 'ভগবান, এ বিপদ হতে রক্ষা কর।' দুঃখিনীর সে কাতর প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌছিল না। রাত্রি বাড়্‌তে লাগ্‌ল। ঝর বৃষ্টিও সজোরে চল্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে আমার শান্তির শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল; বুকের মাঝে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এমন জোরে আমার গলা ধরে রইল যে আমার শ্বাস রোধ হবার উপক্রম হল। শেষ রাত্রে দেহের মধ্যে বড় যাতনা হল। উঃ সে কি যাতনা! তিন বছরের শিশু ——কি যাতনা শৈল, তা যদি দেখ্‌তিস্! কাঁদ্‌বার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। ভাব্‌লুম ভোর হলে আমার শান্তি কিছু শান্তি পাবে। কিন্তু আর ভোর হতে হল না। রাত্রি থাক্‌তেই আমার বুকের শান্তি, প্রাণের শান্তি চিরশান্তি লাভ কর্‌ল। ভোরের আলোতে চেয়ে দেখি, বাছা আমার শাদা হয়ে গেছে। স্বামী এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর একটা চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন। বুক হতে মৃত শিশু ফেলে তাঁকে ধর্‌লুম। কোথা হতে যেন মনে বল এল। তখন সব সইলুম কিন্তু এখন আর পারিনে শৈল।"

এবার দিদি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম "আজ থাক দিদি, আর একদিন শুন্‌ব।" তিনি

বলিলেন, "না শৈল, আজই; আর হয়ত সময় হবে না—শোন, দুপুর রাত হয়ে গেল। আমার সুধীর ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। হা ভগবান! তখন আমার বুকের দুধটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। ছয় বছরের বাছা আমার পাগল হয়ে উঠ্‌ল। তারপর ক্ষুধার জ্বালায় কতকগুলি বালি তুলে খেল —— বাধা দিলুম না; থাক্, খেয়ে পেটের জ্বালা জুড়াক্।

সারাদিন একখানা নৌকাও চোকে পড়্‌ল না? আবার কাল রাত্রি এল। তেমনি মুষল ধারে বৃষ্টি। বাছা আমার জলন্ত বুকে হিম হয়ে উঠ্‌ল। তারপর সেই শেষ রাত্রে দেখি—চির শান্তি! শৈল, বাছা আমার ক্ষুধার জ্বালায় বালি খেয়ে মরেছে—আর আমি হতভাগিনী সেই ক্ষুধা নিবারণ করতে পাঁচ ব্যান্ দিয়ে ভাত খাই। দেখ্ শৈল, কি পাষাণ আমি। বুকচেরা দুইদুইটা ছেলেকে সাগর-সমাধি দিয়ে খাটি হয়ে বসেছি। আর কাঁদি না—কেঁদে কোন ফল নেই, তাই কাঁদি না।"

মনে মনে বলিলাম "তাইত, তবে আমি কাঁদি কেন?"

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার (দ্বিতীয় খণ্ড)। কুমার শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—প্রণীত, রামগোপালপুর রাজবাটী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পরগণা ময়মনসিংহের প্রাচীন জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে যে অসাধারণ অধ্যবসায়, বিচারশক্তি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা যে কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। আজ সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাচীন বরেণ্য সুসঙ্গ রাজবংশের বিবরণ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। গ্রন্থকার কমলার বরপুত্র বাঞ্ছিত সুচিকণ কলার কমনীয়তায় মুগ্ধ না হইয়া যে ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন কণ্টকময় পথে বিচরণ করিতেছেন, তাহা অতি গৌরবের বিষয়। পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া তিনি নিষ্ফল হন নাই। তিনি যে রত্নহার রচনা করিয়াছেন তাহা বঙ্গ জননীর কণ্ঠদেশে অভিনব শোভা বর্দ্ধন করিবে। প্রাচীন দলিল, জমিদারী সেরেস্তার কাগজ পত্র ও কিম্বদন্তী সমূহই যে তাঁহার গ্রন্থের প্রধান উপকরণ, এমন নহে; বিচারশক্তি এবং তত্ত্বানুসন্ধানের আভাস গ্রন্থের স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হইবে। কিন্তু সুসঙ্গ রাজবংশের ন্যায় এইরূপ প্রাচীন, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সুশিক্ষিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বংশের ইতিহাস এত ক্ষুদ্রায়তনে দেখিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না।

যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ত্রয়োদশ শতাব্দীর সোমেশ্বর পাঠক, যে বংশে অতুল পরাক্রমশালী রঘুনাথ ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার হইতে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন,—যাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বার ভূঞার কেদার রায়, চাঁদ রায়, ঈশা খাঁ প্রভৃতি, কমলার মণি মাণিক্য খচিত সিংহাসনের পার্শ্বদেশে শ্বেত পদ্মাসিনাদেবী বীণাপাণির আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া যে বংশের রাজা রাজসিংহ, রাজা কমলকৃষ্ণ, মহারাজা কুমুদচন্দ্র তাঁহার সেবা করিয়া গিয়াছেন—সেই বিচিত্র গৌরবমণ্ডিত রাজবংশের ইতিহাস ইহাতেই পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা এই বংশের আরও বিস্তৃত ইতিহাস দেখিতে ইচ্ছা করি। এই কার্য্যের ভার উক্ত রাজবংশের সুশিক্ষিত কুমারদিগকেই লইতে হইবে। কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর এই যজ্ঞ সম্পাদনার্থ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মাত্র করিয়াছেন। এ অনুষ্ঠানও অসাধারণ সন্দেহ নাই।

শ্রীমাধবাচার্য্য।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
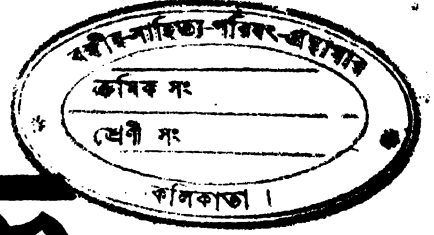
পঞ্চম বর্ষ। ময়মনসিংহ, আশ্বিন ১৩২৪ সন। দ্বাদশ সংখ্যা।

থেরী।

১।

শ্রাবস্তীর ধনাধ্যক্ষ পিতৃদেব মোর।
মাতৃ স্নেহে পরিজন পিতার আদরে,
জীবনের চিন্তাহীন প্রথম প্রভাত
ছিল স্বপনের মত। সখিদের সনে
কাননে কাননে ফিরি চপল চরণে,
ফুল তুলি,' গাঁথি' মালা, হাসিয়া খেলিয়া,
কেটেছে প্রভাত কত। কত দ্বিপ্রহরে
হ্রদ তীরে তরু ছায়ে, স্নিগ্ধ সমীরণে,
পাখীর মধুর গানে, মৃগ শিশু কোলে
রাখিয়া মাথাটি মোর পড়েছি ঘুমায়ে।
শ্যাম শষ্পে বৃক্ষ ছায়া দীর্ঘ—দীর্ঘতর
টানিত মসীর রেখা, গৃহে পিতা মোর
ভাবিতেন কেন তাঁর দুরন্ত মেয়েটি
এখনো আসে না ফিরি। সন্ধ্যারাণী সবে
বিছাইত স্বর্ণাঞ্চল,—প্রতীচীর মেঘে
এলাইত স্বর্ণদেহ—আকুল হৃদয়ে
বাহির হতেন পিতা উদ্দেশে আমার।
তারপর হেথা হোথা খুঁজি অবশেষে
দেখিতেন হ্রদ তীরে আমি ঘুমাইয়া,—
তুলি মোরে করিতেন কতই শাসন
মৃদু মৃদু ভর্ৎসনায়, বুঝিতাম আমি
এ তাঁর শাসন নহে—এ শুধু আদর।
ত্রস্তে উঠি' গৃহপানে যেতাম ছুটিয়া;
বৃদ্ধ পিতা বলিতেন, "পাগলি আমার,
ধীরে চল; আমি কেন পারিব ছুটিতে?"
কে শোনে কাহার কথা! হরিণ শাবক
ছুটে যেত আগে আগে যাইতাম পিছে
চপল চরণ ভঙ্গি অনুকারি তার।
সেই ছিল একদিন! জীবন তখন
প্রভাতের একবিন্দু অমল শিশির;
ঊষার একটুখানি অকলঙ্ক আলো।
ছিনু যেন প্রভাতেরি দুরন্ত বাতাস,
যে বায়ু সরসী হৃদে তুলিয়া স্পন্দন,
ফুলেরে কাঁপায়ে দিয়ে, দুলায়ে লতায়,
কুসুম চয়নরত বালিকায় আসি
সহসা বিব্রত করে—চূর্ণ কেশ গুলি
ছড়াইয়া মুখে চোখে,—কেতকী কণ্টকে
আঁচল জড়ায়ে দিয়ে ছুটিয়া পালায়,—
তারি মত চিন্তাহীন, স্বাধীন, চপল।

* * *

২।

কুসুমিত যৌবনের প্রথম বিকাশে
দেহ মোর পূর্ণতায় উঠিল ছাপিয়া;
সেই সনে হৃদে এল কি যে অপূর্ণতা,
কত আশ', কত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, তিয়াষ।
জ্যোছনা লুটাতে চায় সাগরের বুকে,
ফুল চায় আলোক পরশ; আমি চাই?
কি জানি জানি না। ঊষা—সে চাহিয়া থাকে
প্রভাতের পানে, নিশা—সে বিভোর শুধু

চাঁদেরি স্বপনে ; আর আমি ?—চেয়ে থাকি
শুধু শূন্য পানে।
এইরূপে যায় দিন ;
সহসা সে দিন, ভৃত্যরূপে পিতৃ গৃহে
দেখা দিলা দেবতা আমার ? মুহূর্ত্তেকে
দূরে গেল যত অপূর্ণতা ; আজ আমি
হইনু সার্থক ! একদিন জগতের
প্রথম প্রভাতে, উঠে ছিল নব রবি
আঁধার হৃদয় উজলিয়া ধরণীর ;
ফলে, ফুলে, কিসলয়ে, সলিলে, শোভায়
সে দিন সে হইল সার্থক।

* * *

হ্রদ তীরে
নিরজনে ভজনায় দেখা। সন্ধ্যারাণী
এসেছিলা সাজিয়া তখন জোছনায়,
তারকায়, কুসুমে, সৌরভে। ভাবিলাম
যাই চলি,—হায় মুগ্ধা !—চলে না চরণ।
ভাবিলাম চেয়ে থাকি ও মুখের পানে—
সরমেতে আনত নয়ন। ভবিলাম
যাই কাছে, কহি গিয়ে, 'ভালবাসি তোমা।'
কহি গিয়ে, 'দেবতা আমার, লহ পূজা,
লহ ভক্তি, লহ প্রেম, সর্ব্বস্ব আমার।'
সরমেতে ফুটিল না কথা।
ধীরে ধীরে
কাছে আসি, শুধা'লেন, "কেন, একাকিনী,
কি দেখিছ হেথা ? যাও গৃহে।" সরমেতে
গেলাম মরিয়া। রহিলাম দাঁড়াইয়া
স্থানুর মতন।
ধরি হাত নিয়ে গেলা
হ্রদের কিনারে, বসাইলা শষ্পাসনে
কাছে। কি যে স্পর্শ ! সুখাবেশে শিহরিয়া
উঠিল হৃদয় ! ঘুমন্ত লতায়ে আসি
জলদের শীতল পরশ দেয় যবে
জাগাইয়া, আমারি মতন শিহরি সে
ওঠে বুঝি অসহ্য পুলকে ?

৩।

একদিন শুনিলাম বিবাহ আমার
কোশলের শ্রেষ্ঠী পুত্র সনে। শিরে যেন
হ'ল বজ্রাঘাত।

* * *

তখনও নিভেনিক'
নিশার আননে ম্লান হাসিটুকু নিয়ে
পাণ্ডু চন্দ্রলেখা, সে সময় ছলনায়
বাহিরিনু পথে, গোপনে, চোরের মত।
যেথায় দেখিয়াছিনু প্রথম আলোক
ছাড়িলাম সেই গৃহ। বেদনায় প্রাণ
হয়ে এল ম্রিয়মান, দুনয়ন ভরে
এল জলে। তাঁরে চাহি মুছিলাম আঁখি।
চলিয়াছি বনপথে—পত্র মরমরে
ত্রস্তা হরিণীর মত উঠিনু চমকি ;—
তাঁরে চাহি দূরে গেল ভয়। কণ্টকেতে
বিঁধিল চরণ ;—তাঁরে চাহি' ভুলে গেনু
সকল বেদনা। ছাড়ি বন এনু এক
প্রান্তরের মাঝে ; চারি দিকে জলিতেছে
আলেয়ার আলো, বিস্তারিয়া শত জিহ্বা
মোর পানে আসিছে ছুটিয়া ; ভয়ে প্রাণ
উঠিল শিহরি, বক্ষে তার লুকাইনু
মুখ ; রাখিলা ধিরিয়া মোরে বিশাল সে
বাহু দুটি দিয়া ; গেল ভয়—তাঁরে চাহি
চলিলাম পথ।
নিশাশেষে কুহেলীর
আবরণ মাঝে উষার কনক কান্তি
উঠিল ফুটিয়া,—সদ্য স্নাতা সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যের মত। ক্রমে হ'য়ে এল আলো,
রবির কিরণ প্রখর—প্রখরতর।
শ্রমজলে তিতিল কপোল ; স্নেহে তিনি
মুছাইলা মুখ। শ্রান্ত দেহ, তৃষাতুর,
বসিলাম শৈল নদী তটে, শিলাসনে,
ঘন বনছায়ে। আনি দিলা স্বচ্ছ জল
অঞ্জলি পূরিয়া।

স্তব্ধ বেলা দ্বিপ্রহর
রবির কিরণ ঝলিতেছে সিকতায়
জ্বলিছে আকাশে; বন কপোতের কণ্ঠ
দূরে যায় শোনা। আকাশ অগাধ নীল,
দূরে গিরি দেহ আরো নীল; স্রোতস্বিনী
রজতের রেখা; তপ্তাম্র বালুরাশি;
ঘন শ্যামবন, কোথাও বিচিত্র বর্ণ
নানা ফুলে নবকিসলয়ে। সুন্দর এ
বর্ণচিত্রে ম'জে গেল আঁখি। ঝির ঝির
বহিতেছে বায়ু, স্পর্শে তার সর্ব্ব অঙ্গ
করিয়া শীতল; ঝির ঝির বহিতেছে
ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, কোথাও শিলায় বাধি
উছলিয়া জল তুলিছে মুখর গীতি;
দেহ'পরে ঝরিছে বকুল। কণ্ঠ যাঁর
তুচ্ছ করি অমরার গীতি, কর্ণে মোর
ঢেলে দিত সুধা,—স্পর্শ যার সুখস্নিগ্ধ
সর্ব্ব স্পর্শ হ'তে—সকল সৌন্দর্য্য হ'তে
হেরিতাম যাহারে সুন্দর—তাঁরি কোলে
রাখি মাথা আছিনু শুইয়া। বায়ু আসি
দিতেছিল চূর্ণ কেশগুলি ছড়াইয়া
মুখে চোখে; আদরে সেগুলি সরাইয়া
চুমিলা ললাটে। আবেশে মুদিনু আঁখি
পড়িনু ঘুমায়ে।

স্বপনে হেরিনু এক
দিব্য মূর্ত্তি দেবতা সুন্দর, স্নিগ্ধ নেত্র,
স্বর্ণ কান্তি, উদার ললাট, জ্যোতির্ম্ময়,
করুণায় কোমল আনন! কিছুক্ষণ
নম্র নেত্রে চেয়ে থাকি ধীরে কহিলেন,
"হায় নারি, ক্ষণিক এ সুখ।" তন্দ্রা ঘোরে
চমকিয়া ধরিনু জড়ায়ে প্রিয়কণ্ঠ;
মেলি আঁখি দেখিনু এখনো রহিয়াছি
তাঁরি বক্ষ-লীনা। ভাবিলাম মিথ্যা কথা
শুনিনু স্বপনে। মুহুর্ত্তের স্পর্শটুকু,
একখানি কথা, এতটুকু চাহনীতে
হৃদয় আমার ভরি' ওঠে অফুরন্ত
সুখের প্লাবনে—সে সুখ ক্ষণিক হবে?
—হয় যদি হোক।

তখন নিভিতেছিল
পশ্চিমের তীরে দিবসের শেষ স্মৃতি—
রক্ত আলো রেখা; নদী জলে কালো ছায়া
উঠিছে ফুটিয়া। সেই সনে হৃদি মোর
আসিল ছাইয়া ভাবী বিপদের ছায়া।
কে জানিত একদিন হারাইব হেথা
জীবনের ধন মোর আনন্দ আঁখির।

* * *

৪।

শ্যামায়িত বনরাজি ছায়ায় শীতল
নদী তটে ক্ষুদ্র গ্রাম খানি। গ্রাম প্রান্তে
দুজনায় বেঁধেছি কুটীর। রোপিয়াছি
চারি দিকে চম্পক, অশোক, কুরবক,
কর্ণিকা, যূথী, জাতি, মল্লিকা, শিরীষ।
সহকার সনে, মাধবীর ভুজ পাশ
দিয়েছি জড়ায়ে; রচিয়াছি কুঞ্জ এক
লবঙ্গ লতায়।

* * *

দিবা শেষে কর্ম্মক্লান্ত
ফিরিতেন গৃহে; রহিতাম দাঁড়াইয়া
কুটীর দুয়ারে—ভুজ পাশে বাঁধি তাঁরে
চুমিতাম মুখে,—শ্রান্তি তার দূরে যেত।
কহিতেন স্নেহে, "নারি তুই কি জানিস!"
হাতে হাত বসিতাম লতার বিতানে,
একখানি বাহু পাশ আদরে সোহাগে
ধরিত বেড়িয়া মোরে; নয়নে নয়নে
হ'ত বুঝি কত কথা। যাইতাম ভুলি
কখন আসিত নিশা, ফুটিত তারকা।
সহসা লভিয়া জ্ঞান ত্রস্তে উঠি চলি
যাইতাম গৃহ কাজে।

কখনো প্রভাতে,
যখন হাসিত আলো, হাসিত কুসুম—
কহিতেন, "দাঁড়া দেখি প্রভাত কিরণে,

কাননের মাঝে আসি বনদেবী রূপে।”
দুলাইতা কর্ণিকার শ্রবণ যুগলে,
যূথিকায় গাঁথি মালা পরাইতা গলে,
কেশ পাশে বাঁধিতা শিরীষ।
হিমানীর
শেষে যবে জনপদ বধূ, দিন গণি
যাপিত দিবস, ভাবিত উঠিবে বাজি
মুকুলিত চূত মঞ্জরীরে বেড়ি কবে
বসন্তের চরণ মঞ্জীর —ভ্রমরের
গুঞ্জরণে. তবু যদি না ফোটে অশোক,
নূপুর লাঞ্ছিত মোর চরণ আঘাত
করিতাম রুক্ষদেহে তার; ফুলে ফুলে,
সুষমায়, উঠিত সে হাসি।
বসন্তের
শুক্লা ত্রয়োদশী। মত্ত জনপদবাসী
বসন্ত উৎসবে, ছুটিত কানন পানে
আবীরে কুঙ্কুমে রঞ্জিত বিচিত্র বাস;
জন পদ বধূ, নব চূত মঞ্জরীরে
দুলা'য়ে শ্রবণে, মিলিত সেথা'য় আসি;
অশোকের তল উঠিত মুখর হ'য়ে
নূপুর নিক্কণে, কিঙ্কিণির রিণি রিণি,
কল হাস্যে গীতে। প্রিয়জন কণ্ঠাশ্লেষে
লভিত বিশ্রাম নৃত্য শ্রান্ত কেহ বালা;
দুলিত তরুণ, প্রিয়ভুজ আবেষ্টিত
কণ্ঠে হিন্দোলায়; কেহ নব চূতাঙ্কুরে
প্রদানি অঞ্জলি মাগিত অভীষ্ট বর
মনোভব পাশে—নিজ মনোমত পতি।
মিলিতাম দোহে আসি সেই সুখ স্রোতে;
দুলিতাম হিন্দোলায়, হিল্লোলে হিল্লোলে
লুটিত বসন প্রান্ত, এলাইত কেশ,—
সভয়ে নয়ন মুদি কটি খানি তার
ধরিতাম জড়াইয়া। কভু নৃত্য শ্রমে
আরক্ত কপোলে চাহি কহিতেন হাসি,
“অশোকেরে আজ তুই দিয়েছিস লাজ।”
উড়িছে যে প্রজাপতি কুসুমে কুসুমে
আপনার সুখে রূপে আপনি বিভোর—
শুধু দুদণ্ডের খেলা। কে জানিত সবি
শুধু স্বপ্ন, মরীচিকা, মিথ্যা, মায়া, মোহ।

৫।

এ সুখে অতৃপ্তি আছে, আছে অবসাদ।
কাটায়েছি কত যামী নয়ন মদিরা
পান করি—মিটেনিক' তৃষা! বুঝিলাম
চিরন্তন হাহাকার এ যে মাতৃ স্নেহ
অতৃপ্ত যেথায়।
একদিন গৃহে মোর
অসেছিল চাঁদ! সহসা মেলিয়া আঁখি
দেখিলাম আজি মাতা আমি! স্তনযুগে
বহে ক্ষীরধারা! ত্রিদিব সুন্দরি কোন
গগনের পথে চলে'ছিলা, অসম্বৃত,
কবরী হইতে বিচ্যুত মন্দার এক
পড়িয়াছে খসি বুঝি মোর বক্ষ পরে।
কি সুন্দর মুখখানি! চেয়ে চেয়ে আঁখি
ভুলে গেল! মুখে মাখা বিশ্বজয়ী হাসি!
ঈষৎ আরক্ত দেহ, কুসুম কোমল,
যেন সুষমায় ঘেরা অরবিন্দ এক!
হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ—চম্পক কোরক!
নীল নেত্রে—স্বর্গের স্বপন! চেয়ে থাকি,
বুকে রাখি মিটিল না তৃষা!
যায় দিন,
বর্ষ, মাস। ফুটিল যে দিন শিশু মুখে
অর্দ্ধস্ফুট প্রথম কাকলী, ভাবিলাম
শুনিতেছি স্বর্গের বীণার একখানি
সুর রেশ,—অপ্সরার চরণ মঞ্জীর!
উন্মুক্ত প্রাঙ্গন মাঝে প্রথম যে দিন
শিশু মোর টলি' টলি' লাগিল চলিতে,
ভাবিলাম ক্ষুদ্র দুটী কোমল চরণে
বুঝি বা বাজিছে ব্যথা কঠিন কঙ্করে;
মনে হ'ল হৃদিখানি দিই বিছাইয়া
পদতলে তৃণাস্তীর্ণ বীথিকার মত!
অপরাহ্নে একদিন প্রচ্ছায় নিবিড়

বন মাঝে আছিনু শুইয়া। পল্লবিত
প্রশাখায় রচিয়াছে সান্দ্র চন্দ্রাতপ ;
হরিৎ তৃণের ক্ষেত্র বিস্তৃত অদূরে,—
একখণ্ড রবি রশ্মি পড়িয়াছে আসি
শাখার অন্তরে পশি উপরে তাহার ;
বুঝি কোন বনবালা হেলায় শয়ান
আছিলা আলস ভরে শষ্প শয্যা'পরে,
ত্রস্তে উঠি, পদশব্দ শুনিয়া আমার,
যাইবারকালে ভুলি' গিয়াছেন ফেলি
স্বর্ণময় বক্ষবাসখানি! খেলিতেছে
প্রজাপতি রবির কিরণে, আর এক
প্রজাপতি শিশুটি আমার, ছুটিতেছে
পাছে পাছে কল হাস্য তুলি, একখানি
বন্ধহীন আনন্দের মত

দাঁড়াইলা
হেসে আসি দেবতা আমার। কহিলেন
শিশু পানে চাহি, "আয় ছুটি, দেখ আসি
তোর তরে কি এনেছি আজ।" শিশু আসি
দাঁড়াইল উৎসুক নয়নে! উত্তরীর
প্রান্ত হ'তে দিলা খুলি রক্ত, পীত, নীল,
হরিত উপল খণ্ড। আনন্দে আগ্রহে
শিশুর নলিন নেত্র উঠিল হাসিয়া।
স্নেহে হাসি বালকের রৌদ্র রক্ত মুখ
আরো লাল করি দিলা চুম্বনে চুম্বনে।
সুন্দর এ ছবি হেরি সহসা হৃদয়ে
হ'ল কি যে ভাবান্তর ; মনে পড়ি গেল
শৈশবের খেলা ধূলা, স্নেহময় পিতা,
স্নেহময়ী জননীরে ; একদিন আমি
এমনি যাদের ছিনু সাধের দুলালী।
'প্রভাত হইলে নিশা কালি চল যাব
পিতার আগারে।' কহিলেন, "জান না কি
কত দোষী তাঁর কাছে আমরা দুজনে?"
'জানি তাহা ; ক্ষমাশীল কিন্তু পিতা মোর।
আর আমাদের এই প্রেমের কুসুম—
এই এক মায়া মন্ত্র—এই মুখখানি
ললিত লাবণ্য মাখা, হেরিলে নিশ্চয়
ভুলিবেন সব পিতা, আপনি আদরে
পড়িবেন গলে এই ক্ষুদ্র বাহু পাশ।

*   *   *

৬।

পরদিন বক্ষে করি হৃদয়ের ধন
চলিলাম দুজনায় শ্রাবস্তীর পথে।
শিশুর কোমল দেহে দীপ্ত রৌদ্রকর
সহিবে না বেলা শেষে বাহিরনু তাই।
চলিয়াছি বনপথে, সহসা বাতাস
ছিন্ন করি লতিকার সহস্র বন্ধন,
উড়ায়ে পল্লবদলে, ভাঙ্গি' দ্রুশাখায়,
বহিল অধীর রোষে। ঈশান হইতে
ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি ছাইল মেদিনী
কালের বিশাল বাহু আবেষ্টনে যেন।
পরে থেমে গেল বায়ু ; আইলা রজনী
কণ্ঠে বিদ্যুতের মালা, তিমির বসনা,
সিক্ত কেশে ঝরিছে সলিল।

বর্ষে মেঘ
মুষল ধারায়। বসিলাম বৃক্ষমূলে,
বসন অঞ্চলে যতনে ঢাকিয়া শিশু
রাখিলাম বক্ষ অন্তরালে। কহিলাম
'আজি নাথ বাঁচাও বালকে নির্ম্মম এ
বৃষ্টিধারা হ'তে।' চলি গেলা ভগ্ন শাখা
তৃণ আহরণে রচিবারে অন্তরাল।
নাহি জানি কি অজ্ঞাত আশঙ্কায় প্রাণ
শিহরিল দুরু দুরু, হইল স্পন্দিত
বাম নেত্র।

কেটে গেল কতক্ষণ তবু
ফিরে না আসিলা নাথ। কত শঙ্কা মনে
ওঠে জাগি, ভয়ে প্রাণ হ'ল ম্রিয়মান।
ভয় ত্রস্তা রমণীর পাণ্ডু মুখ প্রায়
দেখা দিল ম্লান চন্দ্র নিঃশেষ বর্ষণ
মেঘ মাঝে। চলিলাম উদ্দেশে তাঁহার।
দেখিলাম কত দূরে লতা গুল্ম মাঝে

পড়ি' আছে প্রাণহীন দেহ খানি তাঁর,—
কাল ফণী করেছে দংশন। বক্ষে করি
পাদপদ্ম পড়িনু লুটায়ে, আঁখি জলে
তিতিল ধরণী।
শিশু আসি বারবার
চুমিতেছে মুখ, মুছাইছে আঁখি জল
কণ্ঠখানি মোর যতনে বেড়িয়া ধরি ;
আবার কখনো, পিতার মুখের পরে
রাখিয়া আনন, কহিতেছে, "চাহ পিতা
কাঁদিছে জননী।" এমন কঠিন পিতা
চাহিল না তবু! আর সহিল না প্রাণে—
হারানু চেতনা।
যখন লভিনু জ্ঞান
হয়েছে প্রভাত ; কাননে গাইছে পাখী,
ফুটেছে কুসুম, গগনে হাসিছে রবি
প্রসন্ন প্রভায়। আমি অভাগিনী পানে
চাহি এতটুকু হ'ল না করুণা কারো।
কুসুম হ'ল না ম্লান, হ'ল না নীরব
বিহগের কল কণ্ঠ, (রবির কিরণে
ফুটিল না এতটুকু ছায়া।)
ভয় ত্রস্ত
ক্ষুধাতুর শিশুটি আমার, পড়িয়াছে
এলাইয়া। হেরি তার পাণ্ডু মুখখানি
সহসা কর্ত্তব্য মোর জাগিল হৃদয়ে—
বাঁচাইতে হইবে শিশুরে। উঠিলাম
দীর্ঘ শ্বাসি,' চলিলাম শ্রাবস্তীর পথে।
কতদূরে পথ মাঝে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী
গত রজনীর সেই অজস্র বর্ষণে
হইয়াছে বেগবতী ; ভাবিলাম মনে
শিলা হ'তে শিলা পরে রাখি পদ হ'য়ে
যাব পার।
গেনু পড়ি শৈবালে পিছলি,
সহসা সলিল মাঝে ; দৃঢ় বাহু পাশে
বক্ষে ধরি বালকেরে চলিনু ভাসিয়া।
তারপর—কিছু মনে নাই।

লভি জ্ঞান
দেখিলাম সিকতায় বালুকার পরে
লুটিতেছি, ছিন্নবাস, কর্দ্দমে মলিন,
ছুটিছে পঙ্কিল জল প্রক্ষালিয়া পদ।
বক্ষে শিশু পাণ্ডু মুখ, নেত্র নিমীলিত,
তুষার শীতল দেহ। উঠিনু ত্বরিতে
চমকিয়া, ডাকিলাম সোহাগে শিশুরে ;
কিন্তু মেলিল না আঁখি! বিদ্যুতের মত
হৃদয়ে জাগিল শঙ্কা, হায় বুঝি আজ
হৃদয়ের ধন মোরে দিয়ে গেছে ফাঁকি?
মিথ্যা কথা ; হ'ল না বিশ্বাস।
তারপর—
বক্ষে করি মৃত শিশু নিদ্রাচারী মত
কেমনে চলিয়া এনু শ্রাবস্তীর পথে।
শুধাইল নাগরিক—"কোথা যাও নারী,
বক্ষে করি মৃত শিশু?" কহিনু সরোষে,
"মৃত শিশু? মিথ্যা কথা।' পরে বালকেরে
চুমিলাম শতবার ; পাণ্ডুর আনন
আরক্ত হ'ল না তবু রক্ত সঞ্চালনে!
আদরে হৃদয়ে চাপি ধরিলাম দেহ,
তবু তার বাহু দুটি তেমনি আদরে
ধরিল না কণ্ঠ মোর বেড়ি' আলিঙ্গনে।
সেই হ'তে পাগলিনী আমি।
ছিন্নবাস,
রুক্ষ কেশ, অর্দ্ধ নগ্ন দেহ, ফিরিতাম
পথে পথে। পথের বালক, করতালি
দিত পিছে, কেহ করুণায় খেতে দিত,
কেহ দিত ধূলি, কেহবা বলিত 'আহা,'
কেহ দিত গালি। কেটে গেল কতদিন
দুঃস্বপ্নের মত।
একদিন হেরিলাম
বোধি তরু তলে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই মূর্ত্তি
করুণা মণ্ডিত। দুঃখময় ধরা মাঝে
এ কি এ সান্ত্বনা! বিশুষ্ক মালঞ্চে
যেন একটি যূথিকা!—পড়িল অসীম জল

তার মাঝে শুধু ফুল্ল অরবিন্দ এক!
হেরি দেবতায় পুনঃ সহসা লভিনু
জ্ঞান, লজ্জা, স্মৃতি আমি। ভাবি আপনার
নগ্নদশা সরমেতে গেলাম মরিয়া।
দুই হাতে বক্ষ ঢাকি বসিনু ভূতলে।
লুটাইয়া পড়িলাম দেবের চরণে,
আঁখি জলে ধোয়াইনু পাদপদ্ম দুটি।
কহিলাম, বন মাঝে মৃত পতি মোর,
নদীস্রোতে মরিয়াছে শিশু,

"হায় নারী,
বৃথা শোক; জান নাকি কত জন্ম ধরি
কাঁদিয়াছ এইরূপ প্রিয়ের বিরহে?
তুমি, আমি, জগতের কোটী নারী নর,
জন্মে জন্মে যত অশ্রু করেছি বর্ষণ
বেশী তাহা সাগরের জল রাশি হ'তে;
হায় বৃথা!—প্রিয় জন নয়ন সলিলে
পুনর্জ্জন্ম লভেছে কি কেহ? শান্ত হও,
শোন নারি,—এক মাত্র পথ নির্ব্বাণের
চির শান্তি।"

সেই হ'তে প্রতিদিন বসি
পাদ মূলে, শুনিতাম দেবতার মুখে
জ্ঞানের গভীর বাণী। শান্ত হ'য়ে এল
হৃদয়ের শোক রাশি, গভীর ক্রন্দন,
আকাঙ্খা, তিয়াষা, মোহ।

হৃদয় আমার
ছিল যেন ফেণোচ্ছল মত্ত পারাবার;
কভু চন্দ্রকরে সুখী—ক্ষুব্ধ ঝটিকায়,
আর আজ?—সে যে শান্ত উদার আকাশ,
শরতের পূর্ণিমার কিরণে উজ্জ্বল!
হে বুদ্ধ, হে অমিতাভ, সিদ্ধার্থ, দেবতা,
নমস্কার!—

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

---

৫ এর প্রভূত্ব।

সৌরভের গত পূর্ব্ব শারদীয় সংখ্যায় ৩ এর তারিফ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিত হয়। বৎসরের তৃতীয় ঋতু শরৎকালে তিন দিবসের জন্য ত্রিনয়না তারার শুভাগমন ও মহাপূজা হয় এইরূপ ভূমিকা সহ উক্ত প্রবন্ধে ক্রমে ত্রিভুবনে "৩ এর রাজত্ব" বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু ৩ হইতে ৫ বড়, এবং এই মায়া প্রপঞ্চময় সংসারে সর্ব্বত্রই ৫ এর প্রভুত্ব প্রতীয়মান। পাঁচ জনে যাহা বলে তাহাই মান্য। প্রমাণ, গ্রামে চৌকিদারী টেক্সের বৈঠকে এবং জেলায় জজ সাহেবের দাওরা এজলাসে। হাইকোর্টে পাঁচ জজ একত্র বসিলে ফুল বেঞ্চ হয়। তাহার উপর আর কথা নাই।

প্রথমতঃ মা দুর্গার কথা। তিনি কি পূজার সময় কৈলাস হইতে একা আসেন? পাঁচ জনে একত্র আসেন। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ এই পঞ্চদেবতা লইয়াই দুর্গা প্রতিমা। ষষ্ঠীর বোধনে সর্ব্বপ্রথমে পূজার ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর পঞ্চ বাদ্য বাজিয়া উঠে। তখনই পূজার আরম্ভ। আর দশমীর ভাসানে চূড়ান্ত আমোদের পর পূজার শেষ। সুতরাং ধরিতে গেলে পূজা পাঁচ দিন। পূজার ব্যাপারে পঞ্চ বর্ণের গুঁড়ি, পঞ্চ পল্লব, পঞ্চ পাত্র, পঞ্চগব্য, পঞ্চ ঘৃত, পঞ্চ প্রদীপ, পঞ্চ শস্য, পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ প্রভৃতি ৫ এর ছড়াছড়ি। পঞ্চোপচারের কমে কোন পূজাই হয় না।

তারপর তৃতীয়—ঋতুর কথা। সে কথা বলিবার নয়! শরৎকালটা ঘোর অকাল; অত্র বিবাহাদি শুভ কার্য্য নাস্তি। শত্রু-নিপাতের জন্য বড় গরজে পড়িয়া শ্রীরামচন্দ্র দেবীকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে কবে কোন্ পুরাকালে, একটিবার মাত্র। কিন্তু তারপর শ্রীরামের দেখা দেখি আমরা যে যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রতি বৎসরই বেলগাছের তলায় ঢাক ঢোল বাজাইয়া নৈবেদ্য খাওয়াইবার জন্য মায়ের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিই, সে কাজটা কি বড় ভাল হইতেছে? একটা ছেলেকে সন্ধ্যার পর ঘুম থেকে জাগাইয়া তুলিয়া চর্ব্ব্য-চোষ্য খাওয়ানও কি কম হাঙ্গামার কথা? মায়ের ও তো ধৈর্য্যের একটা সীমানা

চৌতন্দি আছে। তিনি কতকাল সহিবেন? মা দুর্গা তাই এতদিনে আমাদের আনন্দোৎসব পণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আশ্বিনে আর কোন দিন বৃষ্টি হয় না, আকাশ পরিষ্কার, মাঝে মাঝে শুধু মেঘের নিষ্ফল গর্জ্জন। কিন্তু হায়, যত জল জমিয়া থাকে কেবল ঐ পূজার কয়দিনের জন্য। প্রায় প্রতি বছরই দুর্গোৎসবের সময় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে ভক্তদের আমোদরূপ উৎসাহের জলন্ত বহ্নি একদম নিবিয়া যাইতেছে। গেল বছর বাবুরা কত ব্যয় করিয়া কলিকাতা হইতে থিয়েটার যাত্রা গান আনাইয়াছিলেন, চর্ব্ব্য চোষ্যের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু ঝড় বৃষ্টির গতিকে সবই মাটি হইয়া গেল। ভাসানের সে আমোদ নাই; জলে ভিজিয়া কে বাপু জ্বরে ভুগিবে? আর বঙ্গে তো এই সময় হইতেই জ্বরের ধুম। তাই বলিতেছিলাম, শরৎ ঘোর অকাল। মা, কে অকালে ঘুম হইতে তুলিয়া ভোগের রান্না খাওয়ানর চেষ্টার এই ফল। এবার মা আসিতেছেন কার্ত্তিক মাসে। বোধ হয় ধনুঃশর লইয়া শীকারী কার্ত্তিক তাঁহার অগ্রে, বিঘ্ননাশন গণপতি বুঝি পুরোভাগে নাই; কি হয় বলা যায় না।

হাঁ, ঋতু যদি বলিতে হয়, তবে পঞ্চম ঋতু শীতকাল। যত ইচ্ছা আমোদ প্রমোদ, খাও দাও, মজা কর, বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। বিলাতে রাজার করোনেসন যে মাসেই হোক, এ দেশে আমোদ উৎসব জানুয়ারী কি ডিসেম্বরে। যীশুখ্রীষ্ট ও বাছিয়া বাছিয়া ভাল সময়ে (বড় দিনে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ? সে দুঃখের কথা, দাদা, বলিয়া কাজ নাই। কিষ্ণোজী তো জন্ম লিয়েই খালাস, কিন্তু ভুগিতে ভোগে ভক্তেরা। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিসিলওয়ালাগণ কাতর দৃষ্টিতে যখন আকাশের দিকে অনুক্ষণ তাকাইয়া থাকে। তখন তাঁহাদের দুঃখে আকাশ ও অনর্গল অশ্রুপাত করে। — ভাই সব, শীতের সময় আহারে বিহারে কি আরাম। কমলালেবু, কুল, কপি, কলাইশুঁটি, কই কাঁকড়া প্রভৃতি পঞ্চ ককার খকারে কলিকাতা সহর কল কল টল টল।

ছয় ঋতুর মধ্যে শীত সবার সেরা কেন? ৫এর সম্পর্কে। পঞ্চম ঋতু বলিয়া। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি। এই জ্ঞানের অধিকার হয় পঞ্চম বর্ষ হইতে যখন শিশুর হাতে খড়ি দেওয়া হয়। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীপঞ্চমী দেবী পঞ্চম ঋতুর পঞ্চমী তিথিতে শুভাগমন করিয়া ৫এর প্রাধান্যই প্রচার করিতেছেন। বসন্তকাল কবিগণ এত পছন্দ করেন কেন? পিকের পঞ্চম তান ও অনঙ্গের পঞ্চবাণ আছে বলিয়া। ৫ আছে তাই। নহিলে কেবল Smallpox এর খাতিরে কবি রাজ বা কবি-সম্রাটেরা বসন্তের এত আদর করিতেন না।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ এই পাঁচ রকম সৃষ্টি। ইহারা এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ওসেনিয়া পঞ্চ মহাদেশের সর্ব্বত্র ডাহিনে বামে, সম্মুখে, পেছনে ও মাঝখানে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান মনুষ্য তাহারা পঞ্চজাতি; ককেশীয়, মঙ্গলীয়, নিগ্রো, আমেরিক ও মালয়ান। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ককেশীয়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আর্য্য। এই আর্য্যেরা সব দেশ ছাড়িয়া, বাছিয়া বাছিয়া প্রথমতঃ পঞ্চনদযুক্ত পঞ্জাব দেশটা পছন্দ করেন। ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে প্রধান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। ইঁহারা আদিশূরের নিমন্ত্রণে কনোজ হইতে আগত পঞ্চগ্রাম প্রাপ্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গীয় পঞ্চ কায়স্থও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। আদিশূরের পর বল্লালসেন কৌলিন্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—রাঢ়, বাগড়ি, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা। মহাভারতীয় যুগেও সম্রাট বলির পঞ্চপুত্রের নামানুসারে পঞ্চদেশ ছিল।

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতে ভুবি॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৫০ অধ্যায়)

পাঁচের প্রভাবে এখনকার জোড়া বঙ্গেও পঞ্চবিভাগ। যথা, বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বল আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই বল, ইন্দ্রিয়ের সেট পাঁচ পাঁচটী করিয়া। এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে কর্ম্মযোগই গীতার উপদিষ্ট, মা ফলেষু কদাচন। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মধ্যে হস্ত সর্ব্বপ্রধান। হাত দিয়া অস্ত্র ধরিতে হয়, কলম ও লাঙ্গল চালিতে হয়, এমন কি চিমটি পর্য্যন্ত কাটিতে হয়। চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে কি, এ হেন হাতে পাঁচ

পাঁচটি আঙ্গুল? পঞ্চাঙ্গুলি বিকল হইলে পূজা অর্চ্চনা, জপ তপ নিষ্ফল, কারণ গালিনী ও ভূতনি মুদ্রা হইবে কিরূপে?

তুমি বলিতে পার, উত্তমাঙ্গই প্রধান ও কর্ত্তা, পঞ্চাঙ্গুলি বিশিষ্ট হস্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। তোমার উত্তমাঙ্গেও পঞ্চযোগ, কারণ বিধাতা প্রাণীদের এক মুণ্ডের ভিতরেই চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ঠাঁই দিয়াছেন। আবার তুমি বলিতে পার, প্রাণীদের প্রাণই আসল, মাথাটা থাক্ বা নাই থাক্। প্রাণেও পাঁচের প্রভুত্ব। দেহস্থ পঞ্চ বায়ুর নাম প্রাণ বা প্রাণাং। এই পাঁচে পাঁচ মিশিলেই দফারফা, একেবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি? তখন কবিরাজী পঞ্চতিক্ত পাঁচন বড়ি সম্পূর্ণ বিফল। পঞ্চভূতের উল্লেখটা এখানেই করিয়া রাখি। যে জীবিত সে বর্ত্তমান। যে মৃত সে ভূত। সুতরাং মরিলেই ভূত হয়। আবার বাঁচিয়া থাকিলেও জীবিত ভূতগুলি অহনি অহনি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং। সুতরাং বড়ই সমস্যা।

প্রাণ তো গেল, এখন আত্মা? আত্মা পঞ্চকোষের অন্যতম। এখানেও পাঁচের প্রতাপ। সুষুপ্তিকালে পঞ্চকোষের মধ্যে আনন্দকোষ অবশিষ্ট থাকে এবং তাহার নাম আত্মা। চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার পঞ্চগুণ। সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্তকার প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান কপিল প্রভৃতি ষড়্‌দার্শনিকেরা পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া শেষে অন্যরূপ মীমাংসা করিলেও, বৈষ্ণব দর্শন "পঞ্চরাত্র" গ্রন্থে, পঞ্চ তন্ত্রের উপদেশে এবং পঞ্চানন পণ্ডিত কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে আত্মার পঞ্চগুণেরই বিশেষ আভাষ ও ইঙ্গিত লক্ষিত হয়। ছয় হইতে বোধ হয় পাঁচই (আধ্যাত্মিক ভাবে) বড়। যাঁরা তাস খেলেন তাঁরা জানেন ছক্কা হইতে পাঞ্জার বনিয়াদ বেশী শক্ত। আমরা কথায় কথায় ছয়কে ইচ্ছা করিয়াই বর্জ্জন করি। যথা "পাঁচ সাত দশজন"। "সাত পাঁচ ভাবনা"। বাপ বড়, তাই বাপের নাম পঞ্চানন, ছেলের নাম ষড়ানন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পঞ্চ সম্প্রদায়। ব্রহ্মার ধর্ম্ম ব্রাহ্ম, বিষ্ণুর ধর্ম্ম বৈষ্ণব, আর শিবের পারিবারিক ধর্ম্ম শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য। মোট পাঁচ। ভক্তি পঞ্চবিধ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে :—

> ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
> শান্তরতি দাস্যরতি সখ্য রতি আর॥
> বৎসলা রতি মধুর রতি এ পঞ্চবিভেদ।
> রতি ভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চভেদ॥

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চআত্মা, তৎপ্রতি সমত্ব-বিহীন অনুরাগের নাম শান্তরতি। সনকাদি ভক্তের শান্তরতি। শুক সনাতনের দাস্য, শ্রীদামাদি রাখাল দের সখারতি এবং বৃদ্ধা গোপীদের নাড়ু গোপাল মূর্ত্তির প্রতি বাৎসল্য রতি। লালন, পালন, চিবুক স্পর্শন, মস্তকাঘ্রাণ শুভাশীর্ব্বাদ—এই পঞ্চ বাৎসল্য ভাব। কিন্তু—জয়দেবের সময় হইতে বঙ্গে মাধুর্য্য-রতির মাধুর্য্যই বেশী কীর্ত্তিত। আপনাকে রাধা জ্ঞান করা। ইহাতে ইস্তক স্মরণ কীর্ত্তন লাগাইদ্ ক্রিয়া নিষ্পত্তি অষ্ট সোপান থাকিলেও কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গি, প্রিয়বাণী, মন্দহাস্য এবং অবশেষে সহসা হস্ত ধারণ এই পঞ্চ চেষ্টার অভ্যাস কাব্যে বর্ণিত আছে।

ভক্তির পর মুক্তি। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি সকলেই জানেন। অথ বৈষ্ণব স্বীকৃত পঞ্চতত্ব। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস এই চারি তত্ব; গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মূলতত্ব। মিলিয়া পঞ্চ তত্ব। "তত্বমসির" ভিতরেও পঞ্চ তত্ব আছে। এখনকার দিনে সন্দেশের সঙ্গে জামাইয়ের ধুতি চাদর, কন্যার সাড়িও সেমিজ এই পঞ্চ দ্রব্যই আসল তত্ব।

ধর্ম্মের ন্যায়—পাপের দিকেও পাঁচের প্রতাপ। এই দেখুন, অন্ততঃ পাঁচ জন একত্র না হইলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বা ডাকাইতির মত একটা ছোটখাট পাপকর্ম্মও হইতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়িয়া কাব্যও দেখ। পঞ্চবটীর বনে সীতা হরণ কাণ্ড লইয়া বাল্মীকির মহাকাব্য। পঞ্চ পাণ্ডব ও পাঞ্চালীর বিবরণ লইয়া মহাভারত। প্রথমে পাঁচ খানি গ্রাম চাওয়া হইয়াছিল তাহাতেই উত্তর হইল "সূচ্যগ্রেণ… বিনাযুদ্ধেন কেশব"। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কেশবের পাঞ্চজন্য ভেরীর বিকট আওয়াজ ও ভীষণ লড়াই। কেবল কাব্য কেন, পাঁচ জনে মিলিয়া—গান বাজানা ও ছড়া কাটিলেও পাঁচালি হয়। যথা দাশুরায়ের পাঁচালি।

কাব্যের সঙ্গেই অলঙ্কার। চাণক্য কবি বলিয়াছেন

কবিতা ও বনিতার মধ্যে রস বিরসের নাকি একটা কিরূপ সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালী কবির ভাষায় ইহারা কেহ ক্রোড়ের যোগ্য নহে। আমরাও দেখিতেছি দুই ই অলঙ্কার প্রিয়। সুতরাং অলঙ্কার প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকের গহনার উল্লেখই যথেষ্ট। জুয়েলারী দোকানের পঞ্চরত্ন যথা (১) কণ্ঠে নেকলেস, (২) করে ব্রেসলেট্ বা নূতন ডিজাইনের চুড়ি, (৩) কর্ণে ইয়ার টাপ, (৪) সেফটিপিন (৫) ব্রোচ। হালে এই পঞ্চপদই সকলের পছন্দ, এক্ষেত্রে অধিকন্তু দোষায়। তবে সিল্কের সাড়ি ব্লাউজ, এসেন্স হরেক রকম যত দিতে পার, কথা নাই। একজোড়া জুতা মোজা আনিয়া ট্রাঙ্কের ভিতর রাখিয়া দিলেও—মন্দ হয় না। কারণ পর্দাপাটি যখন-তখন হইতেছে; কলিকাতা হইতে আনার সবুর সহিবে না। পুরীর সাগরতীরে, দেওঘর অঞ্চলে ওগুলির চলন হইয়াছে। কলিকাতায়ও লেডিজ পার্ক হইল।

পঞ্চ অলঙ্কারের কথা বলিলাম। সাবেকী আমলে চিক, সিঁথি, নথ, বাজু, জসম, বাউটি লজ্জাকর, বিছা ও চন্দ্রহার লজ্জায় মুখ ঢাকা দিয়াছে। অনন্তও বিবরে লুকাইবার উদ্যোগে আছে। ইয়ং বেঙ্গলেরও পঞ্চাভরণ; চসমা; চেন, ঘড়ি আংটী ও ছড়ি।

অথ ব্যঞ্জন বর্ণ। বর্ণের মধ্যে পঞ্চবর্গীয় বর্ণ প্রধান। তার মধ্যে—ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচটির উন্নত দেমাকী চাল; চসমা চোখে, নাক উঁচু করিয়া বেড়ায়। স্বর বর্ণ ও হ য ব র ল এই পাঁচটি ব্যঞ্জনের পদসেবা, ছত্র ধারণ, গারু গামছা গ্রহণ অথবা পীঠে বহন করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। উষ্ম বর্ণের কথা বলিলাম না, কারণ উহারা চণ্ডালের ন্যায় গরম ও গোঁয়ার; সুতরাং অস্পৃশ্য। এ জন্য স্পর্শ বর্ণের পর্য্যায়ে ধরা গেল না।

পৃথিবী টাকার বশ। অর্থে সর্ব্বে বশাঃ। যার পয়সা নাই তার মরণ ভাল। এই অর্থ বা টাকার মদার টিন্‌চার হইতেছে পয়সা। বল দেখি ভাই, কালী কলমে এই পয়সার মূর্ত্তিটি আমরা কিরূপ অঙ্কিত করি? সে মূর্ত্তি ৫। পাঁচ এর মাহাত্ম্য কেমন স্পষ্ট।

আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, জাগরণে এই পঞ্চকর্ম্ম কালে আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই তাহা সকলই প্রপঞ্চ ময় পাঁচ। প্রথমতঃ জাগরণের কথাটাই হোক্। প্রভাতে শয্যায় জাগিয়া গা না তুলিতেই "অহল্যা দ্রৌপদী ইত্যাদী পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং।" তারপর আহার। ভোজনে বসিয়াই পঞ্চদেবতায় নমঃ ও পঞ্চগ্রাস বিধি। অথ বিহার। যত্র তত্র বিহার বিচরণ কর, ক্ষতি নাই; কিন্তু রজনীতে ফিরিবার পথে সাবধান, পাঁচ আইনের ভয়, পুলিশ প্রহরী সজাগ। শয়নের শয্যা-দ্রব্য (দানের) প্রধানতঃ পাঁচটী। খাট, তোষক, বালিস, মশারি ও লেপ। অবশেষে স্বপ্ন দর্শন। এই মহাযুদ্ধের অবসানে আমাদের দেশে শাসনে বিচারে এমন কি দলিল রেজেষ্টরীতে ও ডাকঘরে টিকিট কিনিতে গোড়া হইতে আগ পর্য্যন্ত সব স্বায়ত্ব অর্থাৎ পাঁচের প্রভুত্বময় পঞ্চায়তী প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে! ইতি স্বপ্ন দর্শন।

পঞ্চানন্দ। বর্দ্ধমানের পাঁচু ঠাকুর ইহজগতে নাই। তিনি থাকিলে যাহা বোধ হয় বাগতেন তাহা বিলাতী Punch পত্রে এতদিনে প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দ পঞ্চবিধ। প্রথমতঃ কাতুকুতু বা সুরসু র দিলে যে আনন্দ তাহা ক্ষণিক, মাসিক পত্রে প্রকাশিত গল্প পাঠের ন্যায়। দ্বিতীয়তঃ নিমন্ত্রণের গন্ধ পাইলে যে আনন্দ। ইহা এক দিন স্থায়ী। তৃতীয়তঃ গাঁজায় দম দিলে যে নির্ব্বিকার আনন্দ। তিন দিন স্থায়ী! কিন্তু ধূম মগজে উঠিয়া বীরাসনে বসিয়া গেলে, আনন্দ যাবজ্জীবন। চতুর্থঃ নাম বদলাইয়া জটা, বল্কল, কৌপিন চিমঠা কমণ্ডলু এই পঞ্চ দ্রব্যের "স্বামী" হইলে যে আনন্দ। যথা যোগানন্দ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী ইত্যাদি। স্থায়ীকাল বহু বৎসর, কিম্বা ততক্ষণ যতক্ষণ না পড় ধরা। কিন্তু পঞ্চম আনন্দই পরমানন্দ, অর্থাৎ পরনিন্দা কথন ও শ্রবণ। স্থায়ী সাত জন্ম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দেহমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তবু তাঁহার বিরাট বপুর ভিতর খানিকটা জায়গা ফাঁক ছিল। কিন্তু নারদের শ্রীমুখে একদা পরম মধুর পরনিন্দা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার আনন্দ আর দেহে ধরে নাই, একেবারে উথলাইয়া পড়িয়াছিল। শ্রুতি স্মৃতিতে বর্ণিত আছে এই বিগলিত পঞ্চমানন্দ পবিত্র ব্রহ্মপুত্রের জল। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসলিলে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মার পুত্রও আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিলেন, এই জন্য অষ্টমী স্নান প্রশস্ত।

অবশেষে হাতের পাঁচ। বি-এ পাশের পর এম, এ, সঙ্গে সঙ্গে "ল" লেকচারটাও কম্‌প্লিট করিয়া রাখা ভাল। চাকরি বাকরির চেষ্টা চরিত্র করি ত করিতে কন্যার বিবাহের পর বয়স নিতান্তই ২৫ এর নিম্নে থাকিতে না চাহিলে হাতের পাঁচ ওকালতি। ভাই সব, হাতের পাঁচ ছাড়িও না; সময় থাকিতে সাবধান। রাজরাজেশ্বর পঞ্চমজর্জ্জ সম্রাটের মহামহিমান্বিত রাজত্বে পাঁচের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন বাহুল্য। সুতরাং এইখানেই পাথরে পাঁচ কীল।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

প্রতিদান।

মাতার মৃত্যুর পর বৎসর না ঘুরিতেই একদিন সন্ধ্যা বেলা সকলে সতুকে স্নান করাইয়া জানাইল, সে পিতৃহীন হইয়াছে। বেদনায় সতুর ওষ্ঠ যুগল ফুলিয়া উঠিতেছিল। সকলে বলিল ভয় কি সতু, তোমার কাকার কাছে থাক্‌বে।" নয় বৎসরের ছেলেও ভাবিল "তাই ত ভয় কি কাকাবাবু আছেন।

সতু কম্পিত হৃদয়ে আসিয়া কাকার কাছে দাঁড়াইল। কাকা তারিণী বাড়ুয্যের হৃদয়ে তখন প্রণয়ের ঝড় বহিতে ছিল; বালকের অশ্রুসিক্ত আনন তখন তাঁহার আজন্ম মন-মালিন্য চূর্ণ করিয়া দিল। সে ভাবিতেছিল তবু ত ভাই, অপরাধ ত উভয়েরই সমান। তাহার আরও অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল—সেই শৈশবের কথা, যখন মদন বাড়ুয্যে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তারিণীকে কত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। তারিণীর কত অন্যায় নিজ স্কন্ধে নিয়া পিতার বিরাগ ভাজন হইয়াছে। আর তারিণী! সে ইহার প্রতিদানে ঘৃণা ও ঈর্ষার অঞ্জলি দিতে ত্রুটি করে নাই। তারিণীর মাতা বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তারিণীকে উত্তমরূপে শিখাইয়াছিল।

তারপর যৌবনের প্রভাতেও এই ভাব অক্ষুন্ন রহিল। অনেক সময় দেখা যায় সংসারে লোকে যে রকম চায়, সে রকমই পায়। তারিণীর ভাগ্যেও তাহাই হইয়াছিল, তাহার স্ত্রী উমাতারা শুধু তাহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন না। তাহার সহভাগিনী, সহকর্ম্মিণীও ছিলেন। সংসারে মণি কাঞ্চন যোগ হইল। মদনের স্ত্রী মহামায়াও নেহাৎ ভাল মানুষ ছিল না। সেই বা কেন অন্যের কথা শুনিবে, সুতরাং সংসারে নিত্য তুমুল কুরুক্ষেত্র হইতে লাগিল। অবশেষে মদনের অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও তাহাদিগকে পৃথক হইতে হইল। আজ তারিণীর একে একে সব মনে পড়িতে লাগিল। তারপর ওলাউঠা রোগের সময় যখন স্ত্রী পিত্রালয়ে ছিল তখন মদনই তাহাকে সে যাত্রায় বাঁচাইয়া তুলিল।

আরোগ্যান্তে উমাতারা পিত্রালয় হইতে আসিয়া বলিল "তোমার জন্য আমার নিদ্রা ছিল না, খাইতে বসিতাম মাত্র "ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন তারিণীর সব একাকার হইয়া গেল, তবু অভিমানের স্বরে বলিল "হু" মনে ভাবিল 'তাই ত।'

আর সেই দিন যখন মদন স্ত্রীর বিয়োগে শিশু পুত্র নিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তারিণীর বাড়ীতে পূজার ঢাক খুব জোরে বাজিতেছিল।

এইবার মদনের পালা! তারিণী দেশের লোকের কথায় ও মদনের সাগ্রহ অনুনয়ে তাহার মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত হইল। মদন তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল "ভাই, তোমার কাছে শত দোষে দোষী হইতে পারি, কিন্তু সতু ত কোন দোষ করে নি, অনেক হারিয়ে ওকে পেয়েছি, আমি তোমার দাদা, হাত ধরে মিনতি করে বলছি, সতুকে তুমি একটু দেখো; ওর কিন্তু আর কেউ নেই! আমার মৃত্যুতেই সব মালিন্য ধুয়ে যাক্।" মদনের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, সে আর বলিতে পারিল না। তারিণীরও বুকে একটা জ্বালা জ্বলিতেছিল, সে বলিয়া ফেলিল "তাই হোক্ দাদা, মালিন্য সব ধুয়ে যাক্।" একথা যাহার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিতে পাইল কিনা সন্দেহ।

আজ সব গুলি কথা তারিণীর বুকের মাঝে বদ্ধ ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাইতে ছিল। তারিণী বালককে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিল।

(২)

মদনের শ্রাদ্ধের পর আগের মতই দিনরাত্রি সমান ভাবে যাইতে লাগিল। সতুর আগমন যে তাহার কাকীমার মোটেই পছন্দ হয় নাই, তাহা সে দুই দিনের মধ্যেই বুঝিল। একদিন সতু ছবি দেখিতে দেখিতে তারিণীর পুত্র বেণীর পুস্তকের একটা পৃষ্ঠা হঠাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিল। বেণীও সুবুদ্ধি ছেলের মত মাতার নিকট সকল কথা নিবেদন করিল। মাতা গর্জ্জিয়া উঠিল "আঃ মল কোথাকার বানর এসে জুটেছেরে, আমার সর্ব্বনাশ করবে দেখছি। আমার পাছে কেন লেগেছিস বলত! মা খেয়েছিস, বাপ খেয়েছিস, এতে ও হয় নি?"

সতু মুখ কালি করিয়া এক কোণে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আর একদিন সতু একটা দোয়াত ভাঙ্গিয়া বিছানার চাদর একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল, সেদিন উমাতারা আর কিছু বলিল না; পরদিন প্রভাতে তাহার ডাক পড়িল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কাকার নিকট উপস্থিত হইল। তারিণী কহিল সতু তোমার এখানে থাকা হবে না; তুমি এমনি করে আমার সর্ব্বনাশ করবে, আমি কি করে তোমায় রাখি।"

সতু বলিল—"আর কক্ষণো এমন করব না কাকা বাবু, আর কক্ষনো দোয়াত ভাঙ্গব না।"

তারিণী চীৎকার করিয়া বলিল "সেটী হচ্ছে না সতু, তোমার যেতে হবে। তুমি না গেলে এ সংসারে কেউ টিক্‌তে পারবে না, তোমার যাওয়া চাই।" সতু অবাক্ হইয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল তারপর এক পা দুই পা করিয়া ঘরের বাহির হইল। সতুকে বিদায় দিয়া তারিণী বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া সতুকে বারণ করে, বলে "কোথা যাচ্ছিস্ বাবা? কাকার উপর অভিমান করে কোথা যাচ্ছিস্? আমার হৃদয়ের ধন, হৃদয় শূন্য করে যাস্‌নে।" কিন্তু তারিণী তাহা পারিল না। তারিণী ঠিক বুঝিয়াছিল—সতু থাকিলে তারিণীর সংসারে নিত্য অশান্তি বিরাজ করিবে।

(৩)

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মকাল; মাথার উপর সূর্য্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সতু একমনে হাটিতে ছিল। কেন যে এমন হইল সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কেবল তাহার বাবার কথা মনে পড়িতেছিল; এমনি সময় সে পিতার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ সে পিতৃহীন গৃহ বিতাড়িত। ক্ষুধায় তাহার নাড়ী জ্বলিয়া গিয়াছে. সে আর হাটিতে পারিল না। সতু সম্মুখে চাহিয়া দেখিল এক প্রকাণ্ড বাড়ী। আশায় আশঙ্কায় সে সেইদিকে ছুটিয়া চলিল। পা যে আর চলে না; যত ছুটিতে চায়, শরীর ততই অবশ হইয়া আসে। আর পারিলনা, সে পড়িয়া গেল।

যখন সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল তখন দেখিল সে একটা কক্ষে খাটের উপর শুইয়া আছে; আর তাহার মায়ের মত কে এক জন তাহাকে বাতাস করিতেছে। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ডাকিল "মা।"

"এই যে আমি" বলিয়া রমণী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সতু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "আমি কোথায়?"

"কেন তুমি আমার কাছে, আমি যে তোমার মা।"

"সত্যি বলছ তুমি আমার মা? সত্যি! তবে আমায় খেতে দেবে, তাড়িয়ে দেবে না?"

"কেন তাড়িয়ে দেব, আমি যে তোমার মা!"

সতু শান্তিতে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল

(৪)

সতু ভাবিত এত স্নেহ মানুষের আছে! এত সুখেও তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিত, অনেক সময় বিস্মৃতির অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার বাবার কথা মনে পড়িত। ঝড়ের রাতে সে পিতার বাহুবন্ধনে নির্ভয়ে ঘুমাইত, কত বেঙ্গম বেঙ্গমীর কথা শুনিত; একদিন সে একটা শ্লোক মুখস্থ বলিতে পারিয়াছিল বলিয়া পিতা তাহাকে অজস্র চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে কথা তাহার মনে পড়িত। সে আরও কত-কি ভাবিত, আর বুক ফাটাইয়া এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত।

এখন সে 'মা' পাইয়াছে। সুবলপুরের জমিদার গৃহিণী যদিও দুই পুত্রের মা, তথাপি তিনি এই সারল্যের আধার বালকটীর প্রতি অধিক স্নেহ-সুধা সিঞ্চনে তাহার হৃদয়-অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি শুধু ভাবিতেন কি নিষ্ঠুর তা'রা, এমন স্নেহের পুতুলটিকে কি করিয়া তাড়াইয়া দিলে? আবার ভাবিতেন "না এ আমারই জিনিষ ভগবান আমাকেই দিয়াছেন।"

যখন সতুর মুখের উপর বর্ষার মেঘ ঘনাইয়া আসিত, তখনই তিনি আসিয়া তাহাকে সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া নিতেন। সতু ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। অমনি তিনি বলিতেন "ছিঃ বাবা, এমনি করে কি কাঁদতে হয়। আমি যে তোর মা, আমার যে তোর কান্না দেখ্‌লে কষ্ট হয়। মায়ের মনে কি কষ্ট দিতে আছে?" বলিতে বলিতে তাঁহারও চোক ভিজিয়া উঠিত। সতু তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইত।

স্নেহময়ী মাতার স্নেহ অঞ্চলের অন্তরালে থাকিয়া সতু দীর্ঘ ১০ বৎসর কাটাইয়া দিল।

(৫)

প্রায় সকল ধনীর প্রাসাদেই এক একটী অন্তঃসার বিহীন নিষ্কর্ম্মা লোক থাকে। তাহারা প্রায়ই অন্তঃপুরের কুটুম্ব। বিপিন ও এ পরিবারে সেইরূপ ছিল। সে ছিল জমিদার গৃহিনীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মাতুল। সে এখানে সতুর বহু পূর্ব্বে আশ্রয় লইয়াছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে বার বার চারিবার ফেল হইয়া সে ঘোষণা করিল একেতো এই শ্রেণীটাই ভয়ানক, তাহাতে আবার শিক্ষকগণের বিষম পক্ষপাতীত্ব; সুতরাং এমন করিয়া আর পড়া চলে না। এইরূপ ঘোষণার অল্পকাল পরেই সে নিশ্চিন্ত মনে স্থানীয় সখের থিয়েটারে যোগ দিল। বিপিনের কতকগুলি গুণ ছিল—সে রামায়ণ মহাভারত এমন সুন্দর সুর করিয়া পড়িতে পারিত যে অন্তঃপুরস্থ মুগ্ধা প্রৌঢ়াগণের ভক্তিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত। সে আস্ফালন পূর্ব্বক "এখনি বধিব কর্ণে গদার প্রহারে" প্রভৃতি বলিয়া ভীমের পার্ট—অতি সুন্দর অ্যাক্ট করিতে পারিত।

ইহার মধ্যে সতু আসিয়া তাহাকে বিশেষ অসুবিধায় ফেলিল। সতু অনাথ, এই জন্যই হউক, অথবা তাহার বেদনা-ক্লিষ্ট মুখখানির জন্যই হউক, বিপিনের অন্তঃপুরের প্রতিপত্তি একটু কমিল। ইহাতে সে সতুর উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তারপর আবার যখন সতু চতুর্থ শ্রেণীটা একেবারে পাশ করিয়া পরে একেবারে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল, তখন বিপিনের মন রীতি মত সতুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে আর কোন প্রকারে সতুকে ক্ষমা করিতে পারিল না। তখন হইতেই সতুর সম্বন্ধে চারিদিকে নানা কথা উঠিতে লাগিল।

(৬)

একদিন বড় কর্ত্তার নিকট সতুর ডাক পড়িল। কর্ত্তা বলিলেন "তোমার এখানে থাকা হবে না, তুমি তোমার পথ দেখ।"

সতু অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সসঙ্কোচে বলিল "কেন?

"কেন? এসব ন্যাকামী ছেড়ে দাও।" এই বলিয়া কর্ত্তা একটু বেশ গম্ভীর হইয়া বসিলেন। সতু কিছু না বুঝিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুল পুরোহিত হরিদাস চক্রবর্ত্তী তামাক টানিতে ছিলেন। তিনি অবসর বুঝিয়া বলিলেন "যার প্রসাদে রামের মা তাকেই তুমি চেননা, একশ টাকার নোট সোজা কথা নয়। ভাগ্যিস বিপিন দেখেছিল। বাপু হে, ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।" এই বলিয়া তিনি ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। সতু এতক্ষণে বুঝিল ব্যাপার কি? তখন সে একটু দৃঢ়তার সহিত বলিল "আমি শপথ করে বলছি, আমি এ বিষয় কিছুই জানি না। আমি আবাল্য আপনার প্রতিপালিত, আমাকে কখন কোন অন্যায় করতে দেখেছেন কি?"

কর্ত্তা বলিলেন "তোমাকে বলবার আমার কিছুই নেই। তোমার যে উপকার করেছি, তাহার যথেষ্ট প্রতিদান করেছ। তোমায় আমি ভালবাসতাম্ তাই পুলিশে দেব না, তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার গৃহত্যাগ কর।"

সতু তবুও দাঁড়াইয়া রহিল, কর্ত্তা বলিলেন "যাও—এখনি চলে যাও।" সতু বলিল "একবার মার সঙ্গে দেখা করতে পারব কি?" কর্ত্তা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "না।"

সতু আবার আশ্রয় হীন হইল। তাহার অভিশপ্ত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

(৭)

সম্মুখে খরস্রোতা নদী রৌদ্রে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল। সে হাটু জলে নামিল, আবার উপরে উঠিল। কি ভাবিয়া যেন রাস্তায় চলিতে লাগিল।

পথে শুনিল একটা খুনের মোকদ্দমা হইতেছে। সতু সমস্ত শুনিয়া আদালতে যাইয়া উপস্থিত হইল। আদালতে যাইয়া শুনিল সাক্ষী বলিতেছে "ধর্ম্মাবতার আমি আসামীকে জানি। ইহার নাম বেণী বাড়ুয্যে, এ বামুন বড় গোঁয়ার, সেদিন কালাচাঁদের ছেলেকে কি মারই না মারল। খুনের দিন সন্ধ্যার পরে এদের বাড়ী আমি গিয়েছিলুম, দেখ্‌লাম ইহার বাপ তারিণী বাড়ুয্যে আর উনি, একটা গর্ত্ত করছেন, সামনে এদের চাকর রাইচরণ মরা পড়ে আছে। আমি আর কিছু জানি না।"

"সাক্ষীদের সাক্ষ্যতে প্রমাণ হইল যে বেণী বাড়ুয্যে তাহাদের ভৃত্য রাইচরণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এক চড় মারে, ইহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

জজ রায় লিখিতে লাগিলেন। তারিণী বাড়ুয্যের কেশাগ্র খাড়া হইয়া উঠিল। সতুর

মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইল। ভাবিল এইই সুযোগ; অভিশপ্ত জীবন একটা কাজে লাগিয়া যাউক। সে জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল "ধর্ম্মাবতার ইনি নির্দ্দোষী—আমি খুন করেছি। "সকলে চমকিত হইয়া সতুর দিকে চাহিল। তারিণী আরও চমকিত হইল, এ যেন পরিচিত মুখ। জজ বলিলেন "তোমার নাম কি?—কেন খুন করেছ?" "আমার নাম সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ ব্যক্তি আমার নিকট টাকা পাইত; সে জন্য গালাগালি দেয় বলিয়া আমি তাহাকে হত্যা করেছি।"

জজ কি যেন লিখিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার পিতার নাম?"

"স্বর্গীয় মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়"

"ইহাতে তোমার কি শাস্তি হইতে পারে তুমি জান?"

"হাঁ।"

"ফাঁসী অথবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর"। তারিণী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

আসামীর উকীল লাফ দিয়া উঠিয়া বলিল "আমি বলেছিই আমার আসামী নির্দ্দোষ।"

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

ভীষণ প্রতিশোধ।

পাগলা গারদে যাইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে দেখিবার একটা স্পৃহা ছিল। এবার ঘটনা চক্রে সে আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে। কিন্তু সেখানে তিন ঘণ্টা থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়াছি; এখন মনে হয় ঐটুকু সঞ্চয় না করিলেই ছিল ভাল। আজ দুই সপ্তাহ ধরিয়া শয়নে স্বপনে যে লোমহর্ষণ কাহিনী পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতেছে তাহা কবে ভুলিব, ভুলিতে পারিব কিনা—তাহাই ভাবিতেছি। শিক্ষিত ভদ্রলোক যে প্রতিহিংসায় কত খানি অন্ধ হইতে পারে, এই ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

পাগলা গারদের কর্ম্মাধ্যক্ষ আমার বিশেষ বন্ধু। কিছুকাল তাহার বাসায় ছিলাম, তখন একদিন পাগলদিগের কাজ কর্ম্ম, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। দেখিলাম একটী গৌর কান্তি সুন্দর যুবক একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়াছে। যুবকের দৃষ্টিতে একটা তীব্র বিষাদ, তাহার মুখে গাঢ় কালিমা। তাহাকে দেখিলে মনটা কি জানি কেমন হইয়া যায়। আমি বন্ধুকে কহিলাম পাগলদের সঙ্গে আলাপে আপত্তি কি ও তো সংক্রামক ব্যাধি নহে? বিশেষ এ যুবকটা দেখতে বেশ্ শান্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে যেন। বন্ধু আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া আমাকে উঠিতে না দিয়া আকুল ভাবে কহিলেন—"ওর ধারে যাবেন না। ও লোকটা খুনী।" "হউক খুনী। ওর চেয়ে আমার গায়ে জোর কম নয়। আর সে দেখিতেছি, আবদ্ধ।" আমি যুবকের নিকট গেলে বন্ধুবর কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আমি নিকটে যাওয়া মাত্র যুবক নীরবে চক্ষু জল ফেলিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমি ভাবিলাম ইহাই বুঝি তাহার পাগলামির একটা লক্ষণ। আমি একটু মুরব্বিয়ানা সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম। "কি হে তোমার কান্নার কারণ কি?"

যুবক ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর বড় চেষ্টায় সে তাহার রোদন নিবৃত্ত করিয়া অতি ভদ্র ভাষায় কহিল;—মহাশয়, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া শুনিবেন, আমার কাহিনী যে বড় দীর্ঘ।" আমার একটু কৌতূহল জন্মিল, আমি বলিলাম আমার শুনিতে আপত্তি হইবার কি কারণ?" আমি বসিলাম। যুবকটী বলিতে লাগিল—

"আমার নাম বিমলাকান্ত দত্ত। আমার বাড়ী—গ্রামে শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আমি, বড় বিপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় জজ কোর্টের উকীল বিপিন বাবু আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি—স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করি। এই হইতেই আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

"আমাদের স্কুলের নিকট পঞ্চানন্দ ঘোষের বাসা পঞ্চানন্দ বাবু উচ্চ শিক্ষিত। বংশ মর্য্যাদায় তিনি অনেক খানি খাটোছিলেন। পড়ার সাহায্য করিবার প্রলোভন দেখাইয়া পঞ্চানন্দ বাবু তাঁহার ষোড়শী কন্যাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করেন। আমার অভিভাবক বিপিন বাবু তখন পরলোকে। হায় তিনি যদি থাকিতেন"—

চক্ষু মুছিয়া যুবক আবার কহিতে লাগিল। "বিবাহের

দেড় বৎসর পরে আমার একটী পুত্র জন্মিল। বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরের সহিত আমার একটু মনান্তর হইতেছিল। মেয়ে জামাই দুটী প্রাণীই এখন ঘাড়ে পড়িল দেখিয়া কৃপণ শ্বশুর মহাশয় চটিতেছিলেন। অপর দিকে আমার বৃত্তির টাকা প্রতি মাসে মণিঅর্ডার করিয়া মাকে পাঠাইয়া দিতাম, ইহাও শ্বশুর মহাশয়ের বিরক্তির অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি সম্পন্ন লোক, বড় উকীল, উচ্চ শিক্ষিত; কিন্তু তাঁহার হৃদয়—যাক্ সে কথা।

"সন্তানের জন্ম হওয়ার পর দিন আমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে ডাকিয়া কহিলেন "বিমল, তুই (আজ প্রথম তাঁহার নিকট এই সম্বোধন শুনিলাম) ছোট লোকের ছেলে। পথের ভিখারীকে মেয়ে দিয়াছিলাম। লেখা পড়ায় তোর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল না। তুই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শিক্ষা লাভ করবি, এই আমার ধারণা ছিল। তুই ইন্দ্রিয়ের দাস, তোর কিছু হবে না। এখনই তুই আমার বাসা ছাড়িয়া যা। যদি যোগ্য হইতে পারিস্—আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে।"

মহাশয়, অতঃপর আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনও দ্বিধাই রহিল না। আমি রিক্তহস্তে সহরের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্বশুরের তৃণ গাছিতেও আমার আর স্পৃহা ছিল না।

সহরে পড়ার একটা উপায় করিতে পারিতাম। কিন্তু সে খানে তিষ্ঠীতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আমি এক বন্ধুর নিকট হইতে দশটী টাকা ধার লইয়া কলিকাতা উপনীত হইলাম।

অদৃষ্টের শুভাশুভ একই রেলে ও ষ্টীমারে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মেসে উঠিল।"

(২)

"প্রাইভেট পড়াইয়া এফ্, এ, বি, এ, এবং বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। দরিদ্রের বন্ধু, ছাত্র সুহৃৎ * *আমাকে সস্নেহে কহিলেন "বিমল", তুমি হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ কর।" হায় যদি সে মহাত্মার কথা শুনিতাম। আমি কহিলাম, আমার মায়ের আমি একমাত্র সন্তান বাড়ীর নিকটে থাকাই আমার ইচ্ছা।

আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দেশে রওয়ানা হইলাম। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার মা ও নবপরিণীতা পত্নীকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমি বি, এ ক্লাশে যাইয়াই পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলাম। এবং সপরিবারে কলিকাতায় থাকিতাম। প্রথমা পত্নীকে মনে মনে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

বাড়ী যাইয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

মাতা ঠাকুরাণী বাড়ী আসিবার দুইদিন পরেই আমার শ্বশুর মহাশয় একখানা নৌকা দিয়া বাড়ীর প্রাচীন ভৃত্য ও ঝি পাঠাইয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমার পত্নী অপহৃতা হইয়াছে। বহু সন্ধানেও তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না।

মনে একটা দারুণ অশান্তি লইয়া একাকী সহরে গেলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিব, এ মতলবও ছিল।"

(৩)

ষ্টেসন ছাড়িয়া কয়েকপদ যাইতে না যাইতেই একটী লোক বলিয়া উঠিল 'দৌড়—দৌড়— এ একটা পাগল'। এই বলিয়া স্বচ্ছন্দে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। আমি তাহা লক্ষ্য না করিয়া পদচালনা করিতে লাগিলাম। দ্বিতীয় একব্যক্তি আসিয়া হুমড়ি খাইয়া আমার উপর পড়িল এবং চেঁচাইয়া কহিল—ও মা গো এ পাগল আমাকে কামড় দিতে আস্‌ছিল।

তখন চারিদিক্ হইতে আমাকে 'পাগল' 'পাগল' বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। সম্পূর্ণ ভদ্রোচিত সাজসজ্জা সত্ত্বেও আমার উপর এই জুলুম দেখিয়াও কোন পথিক সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। বরং বলিতে লাগিল—পাগলকে পুলিশে দাও।

হরি! হরি! একি ষড়যন্ত্র।

মধ্যাহ্ন রৌদ্রে এই টিটকারী—উদরে প্রবল ক্ষুধা, হৃদয়ে দারুণ অশান্তি,—আমি ক্ষেপিয়া উঠিলাম। হাতের ছড়ি খানা দিয়া একটা লোককে কয়েক ঘা বসাইয়া দিলাম। সুতরাং অন্যান্য সকলে আমাকে সাপুটিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল।

চির দিনের শান্ত সুবোধ বিমলাকান্ত আস্ত পাগলের পরিচয়ে হাজতে প্রবেশ করিল।”

(৪)

‘ডাক্তারখানায় আমার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এইখানে আমি হঠাৎ একবার পঞ্চানন্দ বাবুকে দেখিতে পাইলাম। মুহূর্ত্তে বুঝিলাম, আমার এই দুর্গতির কারণ এই মহাত্মা। ক্রোধে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। রোষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম—

"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে শচীকান্ত বলী
চির কম্পমান তুমি, হত সে রাবণি
তোমার কৌশলে আজি অন্যায় সমরে।"

ডাক্তারখানার ছাত্রগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। অর্থাৎ আমার ঐ উক্তি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল মাত্র।

ডাক্তার পরীক্ষ করিতে আসিলে আমি আমার দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিতে চাহিলাম; তিনি সে দিকে বড় মনোযোগ করিলেন না। বুঝিলাম পঞ্চানন্দ বাবুর সহিত তাহার কাণাকাণি হইয়াছে। বড় দুঃখে কহিলাম—ডাক্তার বাবু, আপনি কি বিবেককে এতই সামান্য মনে করেন? মনুষ্যত্ব, সত্যপ্রিয়তা কি দুনিয়ায় নাই?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন "তোমার শ্বশুর তোমার জন্য দুঃখ করে গেছেন। মা বাপ মরা তোমাকে তিনি পুত্রের মত পালন করেছেন;—আজ তোমাকে গারদে—

"কে আমার শ্বশুর?—ওই পঞ্চানন্দ! ইতর বেটা, নরকের কীট—বলে আমার মা নেই?—আশ্চর্য্য। ডাক্তার বাবু আমার মা আছেন। তাকে একটা সংবাদ দিই—আমার শ্বশুরকে একটা সংবাদ দি—কলেজে"—

"তোমার শ্বশুর স্বয়ংই এখানে আছেন। মনের দুঃখে তোমার নিকট আস্‌তে পাচ্ছেন না। তিনি কাঁদছেন।"

রাগে আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ হইয়াছিল। কহিলাম—"ডাক্তার বাবু, সঞ্জীব বাবুর "জাল প্রতাপ চাঁদ" খানা একবার পড়বেন। আমি ভাবি নাই যে আমার উপর এমন ভীষণ একটা ঘটনা এসে পড়্‌বে যাক্—আমাকে মুক্ত করুন। আমি ঘরের ছেলে ঘরে যাই।"

"তোমাকে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করব, তখনই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।"

"তবে কি আমি সত্যি সত্যিই পাগল।"

"নিঃসন্দেহ।"

"বটে! হায় মহাকবি সেক্সপীয়র হায় মানব-হৃদয় গ্রন্থের অদ্বিতীয় পাঠক! তুমি নির্য্যাতন গ্রস্ত টাইমনের মুখদিয়া যে অভিশাপ স্রোত্ত বহাইয়াছিলে; আজ আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। ডাক্তার ডাক্তার আমায় মুক্ত কর। এই নিকৃষ্ট অভিনয় আমি আর——"

"গণ্ডগোল বড় বাড়াচ্ছ বাপু? উন্মাদের প্রলাপ বৃদ্ধি সুলক্ষণ নয়।"

"তবে কি আমার পক্ষে কারাগার অনিবার্য্য।"

"নিশ্চয়।"

"এখানে কি এমন কেউ নাই।—এই পঞ্চাশ জন দর্শকের মধ্যে এমন একটী প্রাণীও নাই—যে এই নির্দ্দোষ নিরীহ নিপীড়িতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে?"

কেহ শব্দ করিল না।

ডাক্তারের আদেশ হইল—"ইহাকে গারদে লইয়া যাও।"

মহাশয় প্রকৃত পাগলের মত আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। প্রকাশ্য দিবালোকে, ন্যায় পরায়ণ ইংরেজ রাজার রাজত্বে শত চক্ষুর সম্মুখে আজ একটা ভীষণ মিথ্যা কাণ্ড সত্যের আবরণে চলে যাচ্ছে। হায় ভগবান! তুমি আছ? চেয়ে দেখ্‌ছ না কি? ডাক্তার! ডাক্তার,—টাইমনের ভাষায় আমি ও অভিসম্পাত কর্‌ছি;—

* * * *

কিছুতেই কিছু হইল না। ডাক্তার মৃদুস্বরে কহিলেন—‘ছেলেটা লেখা পড়া শিখে পাগল হয়ে গেল’।

"সেই হইতে আমি এখানে আছি। মাকে, শ্বশুরকে, বন্ধু বান্ধবকে সংবাদ দিতেও অক্ষম। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এক আধটু সাহায্য করেন, চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকিব।"

আর মহাশয় আমার অপহৃতা হতভাগিণী পত্নীর একটা সন্ধানের ভারও আপনার উপরই প্রদান কচ্ছি। আপনি আমার বন্ধু কি শত্রু জানি না। কিন্তু—

"মজ্জমান জন,
ধরে তৃণে, যদি কিছু না পায় সম্মুখে।"

আপনি আমার জন্য একটু কিছু করেন, এই প্রার্থনা।’

যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার কাহিনী বিবৃত করিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিষণ্ণ মনে পাগলা গারদ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভোলানাথের পারিবারিক গোলযোগ।

শরৎ কাল শেষ প্রায়; বাবা ভোলানাথ পুত্র কলত্র জন-পরিজন সহ আর দিন কতক পরেই শৈলাবাস পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বার্ষিক পূজা লইতে আসিবেন। পরিবারের অভাব অভিযোগ এই সময় অবগত হওয়া প্রয়োজন বোধে ভোলানাথ প্রিয় পুত্র কার্ত্তিককে ডাকিয়া মর্ত্তে যাইবার জন্য তাহার কি কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতার প্রশ্নের উত্তরে কুমার বলিলেন 'না বাবা এবার আর আমি মর্ত্তধামে পূজা খাইতে যাইব না। আমার বেশ ভূষা ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি আইন বিরুদ্ধ—দেখিয়া নিশ্চয়ই পুলিস আমাকে গ্রেফ্‌তার করিবে; তখন পূজা খাওয়ার পরিবর্ত্তে হাজত ভুগিয়া পঁচিয়া মরিতে হইবে। তোমাদেরও দুর্ভোগের একশেষ হইবে—নিশ্চিন্ত মনে সেবা লইতে পারিবে না—আদালতে ও কাঠামে পথ পড়িয়া যাইবে। অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া যাওয়ায় অবশ্য বিপদ নাই কিন্তু চির প্রচলিত খান্দান রাখিয়া না চলিতে পারিলে সমাজে নিন্দার কথা হইবে। লোভে বিপদ ডাকিয়া আনা অপেক্ষা লোভ সম্বরণই নীতি। পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

কুমারের যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া ভোলানাথ নীরব রহিলেন। তখন তিনি কার্ত্তিককে বিদায় দিয়া গণেশকে আহ্বান করিলেন।

গণেশ কার্ত্তিকের ন্যায় ইয়ারকিবাজ পাতলা মেজাজের লোক নহে। বেশ্ একটু গুরু গম্ভীর প্রকৃতির। তাহার নিকট হইতে একটু সার কথা পাইবেন আশা করিয়া ভোলানাথ এবার মর্ত্তে যাওয়ার সম্বন্ধে তাহার মত জানিতে চাহিলেন।

পিতার কথা শুনিয়া সুবোধ বালকটীর ন্যায় গণপতি মাটির দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গণেশের চিন্তার বিষয় ছিল অনেক। বর্ত্তমান সময় মর্ত্তে আসিতে তাহার ভয়ের অবধিই ছিল না। সে ভয় নিজ অসংযমজাত। গণেশের মৌতাতের পরিমাণ এখন আবকারীর আইনের আমল ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে। পিতার সতর্ক যত্নের অভাবে পুত্রের তরল ও শুষ্ক—পান ও টানের নেশা এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে সে মৌতাত মর্ত্তে আহরণ করিতে গেলে শ্রীঘর দর্শন ব্যতীত উপায় থাকিবে না। সুতরাং তাহাকে এখন যেখানে যাইতে হয়, তাহার এ রসদ সরঞ্জাম নিজকেই সংগ্রহ করিয়া—পুঁজি পাটা বাঁধিয়া লইয়া যাইতে হয়। এ কয়েক বৎসর যাবত এ ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে আর আবকারী বিভাগের চখে ধূলি দিয়া লুকাইয়া চলিবার যো নাই। গণেশের মনে তাই মর্ত্তের প্রতি একটু বিরক্তির ভাব সঞ্চিত ছিল। কিন্তু লজ্জায় তিনি পিতার কথার তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়া উঠিতে পারিলেন না। লজ্জার কথা তো বটেই! কিন্তু লজ্জাই বা এমন কি? উপযুক্ত—পিতার পুত্রতো বটে? বাবা ভোলানাথ পূজার এই তিন দিন একটু সংযম-নিয়মে অতিবাহিত করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছেন—এই তিন দিন তিনি কেবল ধুতুরা খাইয়াই কাটাইতে পারেন; মর্ত্তে ধুতুরার পাশ নাই, তাই তাহার কোন চিন্তার কারণ নাই।

গণেশ অনেক চিন্তার পর এ সকল গোপনীয় কথা গোপন রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"মর্ত্তের অবস্থা শোচনীয়, বিশেষ আমার পক্ষে। আমার মর্ত্তে যাওয়া একরূপ অসম্ভব মনে করিতেছি। মর্ত্তে ব্যবসায় বাণিজ্য পত্তনের বেলায় আমার যেরূপ আদর তাহার পরিণামের বেলায় আমার চতুর্গুণ বিপত্তি। এ স্থূল দেহ লইয়া আমি আর সে বিপত্তি সহ্য করিতে পারিব না। কবে রক্ত উল্টাইয়া মারা যাই তাহার ঠিক নাই। লালবাতি সেখানকার ব্যবসায়ে বরাবর জ্বলিবে, সে আতঙ্কে এখনি আমার রক্ত জল হইবার গতিক হইয়াছে!"

প্রভুর অমত দেখিয়া বাহন ইঁদুর ও বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল—আমিও এবার মর্ত্তে যাইতে পারিব না। কারণ আমাদের যেখানে আবির্ভাব প্লেগেরও নাকি তথায় আধিক্য, তাই চিকিৎসা সম্মিলন হইতে স্থানে স্থানে

"ইঁদুর বিনাশিনী সভা" স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পূজায় গিয়া তণ্ডুল কণা লাভের পরিবর্ত্তে পৈত্রিক প্রাণটা বিলাইয়া আসা কথনই লাভ জনক নহে।"

পুত্রদ্বয়ের কথা শুনিয়া ভোলানাথ নিরুপায় হইলেন। তিনি মহামায়াকে ডাকিয়া কন্যাদ্বয়ের মত লইতে পাঠাইয়া দিলেন।

ভগবতী যাইয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে নিজ কক্ষে পাইলেন না। পেচক তাঁহাকে পথ দেখাইয়া একটী ক্ষুদ্র কক্ষে আনিয়া হাজির করিলেন। তথায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তারহীন তাড়িত বার্ত্তার চোঙ্গা কাণে লাগাইয়া বসিয়া ছিলেন। মাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া যথা বিহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তখন ভগবতী মর্ত্তে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মায়ের কথায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মনের রুদ্ধ চাপ সরিয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন "মা মর্ত্তের কথা কি আর বলিব! সেখানে আমার যাওয়া হইবে না—এবার তো কর্ত্তা বাড়ী নাই—যাইতেই পারিব না—ইহার পরও আর যাইতে ইচ্ছা করি না। লক্ষ্মী ছাড়া দেশে আমার স্থান নাই।" কিছুক্ষণ থাকিয়া লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"মা, ইয়ুরোপের যুদ্ধের প্রাক্কালে কর্ত্তা এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন —লক্ষ্মী, ইয়ুরোপের এই ভীষণ যুদ্ধে জগতের যে লাভ হইবে, তাহার মধ্যে দুইটী লাভই আমাদের পক্ষে ইষ্টজনক। এক আধুনিক বলদৃপ্ত নাস্তিক ইয়ুরোপে আমার প্রভাব বৃদ্ধি, অপর পতিত ভারতের শিল্প বাণিজ্যে তোমার প্রতিষ্ঠা।" ইহার কিছুদিন পরেই ইয়ুরোপে তাঁহার ডাক পড়িয়া গেল। গিরজায় গিরজায় উচ্চকণ্ঠে শত্রু মিত্র সকলেই ভগবানের নাম লইলেন। তখন সাধ্য কি তিনি বৈকুণ্ঠে বসিয়া থাকেন। এই ৩বৎসর তাঁহার আহার নিদ্রা নাই; গরুড়েরও খাটুনী অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। দু'পরে খাইতে বসিয়াছেন টেলিগ্রাফের ঘণ্টা ডং ডং করিয়া বাজিয়া উঠিল, নিশীথে সুস্থ মনে নিদ্রা যাইবার যোটী নাই—ভক্তের ডাক, ভক্তের অধীন ভগবান—এই তিন বৎসর দেশ দেশান্তরে যে কি হইতেছে তাহার খোঁজ নাই—তিনি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন—আমি যাই, মর্ত্তে তোমার অক্ষয় প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু মা, তিনি যাইতে না যাইতেই মর্ত্তের জাতীয় ধনাগারে দিনে ডাকাতি হইয়া গেল, শিল্পশালার অর্থে তুলা ক্রয়ের পরিবর্ত্তে ডিরেক্টারগণের মটরগাড়ী খরিদ হইতে লাগিল, বাণিজ্যের ভরা নৌকা দরিয়ায় ডুবাইয়া নায়কগণ শিল্প বাণিজ্যের সপিণ্ডকরণ করিলেন। এখন বাকী রহিয়াছে—" বলিতে বলিতে লক্ষ্মী কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় সুমধুর স্বরে কলের ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, লক্ষ্মী চোঙ্গা কাণে দিয়া শুনিয়া বলিলেন—"মা এই শুনুন জাপানের শিল্প ও বাণিজ্যশালায় আমার স্তুতি কি উচ্চকণ্ঠে শুনা যাইতেছে। এই বলিয়া সেই বিনাতারের টেলিগ্রাফের চোঙ্গটী ভগবতীর হাতে প্রদান করিয়া বলিলেন—"না মা, যেখানে সম্মান নাই, পরন্তু অপমানের শেষ নাই, সেখানে কে যাইতে চায়। আমি জাপানের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি। নারায়ণ ইয়ুরোপে গিয়াছেন। অতঃপর ঈশ্বর বিশ্বাসে ইয়ুরোপ ও বাণিজ্যে জাপান মর্ত্তে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস।"

ভগবতী সরস্বতীর নিকট আসিলেন। বাগ্বানী তখন বিশ্বের শিক্ষা প্রণালীর সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা প্রণালীর তুলনা করিতেছিলেন। মাতাকে দেখিয়া তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর মায়ের প্রস্তাবের উত্তরে—বলিলেন, "আমি যাইব না, মা, যাইতে হয় তোমরাই যাও। যে দেশের লোক অর্থের জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চায় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রশ্ন পত্র চুরি করে অথবা বাড়ী হইতে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনে, সে দেশে আমার যাওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। যে এরূপ করিতে পারে, সে মায়ের ধনেও লোভ করিতে পারে—আমার এ বীণাটীর এখনও Patent হয় নাই। মূর্খেরা যেরূপ আদর্শে শিক্ষা লাভ করিতেছে, সে আদর্শ ফলাইলে আমার আর উপায় থাকিবে না। তস্কর শিষ্য অপেক্ষা সাধু অভক্তের সহবাস নিরাপদ।"

মা ভগবতী পুত্র কন্যাগণের কথা শুনিয়া অবাক্! কি করেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নিজেরও মনে মনে পূর্ব্ব হইতেই মর্ত্তে যাইতে একটু ভয়ের কারণ ছিল, এখন পুত্র ও কন্যাগণের কথা শুনিয়া সে ভয় আরও ঘনাইয়া উঠিল। সুযোগ পাইয়া তিনি শঙ্করের নিকট যাইয়া বলিলেন। "নাথ! আমার দশটী

হাত, দশটী হা'তে দশটী অস্ত্র লইয়া, রণ শয্যায় সজ্জিতা, সিংহ বাহিনী হইয়া, কেমন করিয়া মর্ত্তধামে যাই? বিশেষ আমার একটী অস্ত্রের ও 'পাশ' নাই। তার উপর লক্ষ্মীছাড়ারা আমার নাম করিয়া যে সকল কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহার বিষয় স্মরণ হইলে, অপমানে ও দুঃখে আমার প্রাণ দগ্ধ হইয়া যায়। হতভাগারা কয়েক সের চাল ও কয়েক কান্দি রম্ভা যবেস্তবে আমাদের বরাবরে ফেলিয়া রাখিয়া নাটমন্দিরে ষোড়শোপচারে নর্ত্তকীর অর্চ্চনা করে ও ব্রাণ্ডি সেরির শ্রাদ্ধ করিয়া অর্থের অপব্যয় করে—"হটাৎ নেশার কথা বলিয়া ফেলিয়া ভগবতী কথা ফিরাইয়া নিলেন। "ছেলে মেয়েরা কেহই যাইবে না। ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাহারা অস্থির—আমি তাহাদিগকে রাখিয়া যাইতে পারিব না। এবার তুমিই যাও। ছেলে পিলে নিয়ে আমি এবার এখানেই থাকি?"

নন্দী ভৃঙ্গী ও শেষ কর্ত্রীর মতে সায় দিল, দেখিয়া ভোলানাথ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পূজা শারদার, তিনিই যদি না যান, তবে শক্তিহীন শিবকে কে পূজা দিবে? বিস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে জামাইর আদর কে করিবে? তখন ভোলানাথ ভগবতীর প্রতি একটু কুপিত হইয়া আড় নয়নে চাহিতে চাহিতে নিজ বাহন বৃষের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলি কিহে বাপু! এখন তোমার মতটা কি বল দেখি—তোমার মতটাই জানিবার বাকী থাকে কেন? তুমিও কি এবার মর্ত্তধামে আমাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়া সেবাটা করাইয়া আনিতে পারনা? না কি গিন্নীর পরামর্শ পেটে পরিয়াছে।" বৃষভ ত প্রভুর কথা শুনিয়া অবাক! সে গো বেচারা পালার আগা গুঁড়া কিছুই জানে না। হতভম্বের স্থায় প্রভুর মুখ পানে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আরও দুই এক কথায় ভর্ৎসনা শুনিয়া আস্তে আস্তে সে গো বেচারি বলিতে লাগিল,—"আমি কি কখনও প্রভুর আদেশ পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছি? এ দাসের প্রতি যখনই যে আদেশ প্রদান করিতেছেন; তৎক্ষণাৎ দাস হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া অবনত মস্তকে আদেশ ফয়সলা করিতেছি; কখনও কুণ্ঠা বা দ্বিরুক্তি বোধ করিব না। চলুন; মর্ত্তে কেন যেখানে খুসি—যাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই।"

বাবা ভোলানাথের সাথী হইলেন কেবল নিজ বাহন বৃষ। তা যাইহোক সঙ্গী পাইয়া ভোলানাথ একবার কার্ত্তিককে খুব ভর্ৎসনা করিয়া লইলেন। কার্ত্তিককে ভর্ৎসনা করিতে শুনিয়া ভগবতী বলিলেন,—আইবুড় ছেলে ঘরে আছে, এই যথেষ্ট, তা'কে কোন প্রকার ব'কো ঝ'কো না, কোন্ দিন রাগ ক'রে ঘর হ'তে চ'লে যায়, কি কোন কুকাণ্ড করে বসে—তখন তোমাকেই ভুগ্‌তে হবে।"

পুরোহিত ঠাকুর শুক্রাচার্য্য (?) এবার বেশ্ সুযোগ পাইয়া যজমানকে আটক দিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"তোমরা অবনত শ্রেণীকে উন্নত করিয়া জল চল করিতে চাও, আবার দেব সমাজে জাত্যাভিমানেরও স্পর্দ্ধা কর; যারতার ঘরে পূজা খাইয়া আস, বাটিতে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর। কিন্তু তাহারও দুই তিন বৎসরের দক্ষিণা বাকী পড়িয়াছে। নেকামি ষোল আনা! এবার দক্ষিণা সুদে আসলে পরিস্কার না করিলে আমি কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত টায়শ্চিত্ত করাইতে পারিব না।"

ভোলানাথ চতুর্দ্দিকে বিপদ দেখিয়া মহা চিন্তায় পড়িলেন। সকলকে রাখিয়া একা কেবল নিজ বাহন সমভিব্যাহারে মর্ত্তে গেলেই বা সে যাত্রায় কি লাভ হইবে, আর একেবারে কেহ না গেলেই বা ভক্তের মন কি প্রকারে রাখা যায়? আবহমান কালের ভক্ত—উন্মার্গগামী সময়; এদিকেও বিপদ, যুদ্ধে সোণা রূপার দাম বৃদ্ধি হইয়া যাওয়ায় স্বর্গেও টাকা পয়সার আমদানী কম, পুরোহিতকে দক্ষিণা সুদে আসলে পরিস্কার না করিলে আটক দিয়া বসিবেন, প্রায়শ্চিত্ত না করাইলে জাতেরই বা উপায় কি? বিষণ্নমনে ও ভগ্নোৎসাহে ভোলানাথ এই সকল চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি আসিয়া সশরীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভোলানাথকে বিষণ্ন ও চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন,—"দেবাদিদেব মহাদেবের চিন্তিত অন্তর দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না; এ বুড়ো বয়সে নূতন সংসারের ফল ফলিল বুঝি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—যেমন শেষকালে বে বে ক'রে স্বর্গে মর্ত্তে হুলুস্থুল, তেমনি ফলভোগ করুন।" মহাদেব, দেবগুরু বৃহস্পতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, বসিবার আসন প্রদানান্তর চিন্তার কারণটী আদ্যোপান্ত সবিশেষ খুলিয়া

বলিলেন। বৃদ্ধকে বিপন্ন দেখিয়া বৃহস্পতি ঠাকুর সে বিভ্রাটের সমাধান করিয়া দিতে কৃত সংকল্প হইয়া, আসনটাতে বেশ চাপিয়া বসিলেন এবং নন্দিকে তামাক সাজিতে আদেশ দিলেন। নন্দী একটা বড় কলিকায় তামাক ভরিয়া তদুপরি গণ্ডা দুই তিন 'টিকা' দিয়া অগ্নি সংযোগ করণান্তর ফোঁ দিতে দিতে আলবোলার নল সংযুক্ত হুঁকায় স্থাপন করিল।

তখন প্রথমেই কার্ত্তিককুমারের ডাক পড়িল; চস্‌মা মুছিতে মুছিতে কার্ত্তিক আসিলে বৃহস্পতি বলিলেন,— "তুমি এবার পূজায় মর্ত্তে যাইতে অস্বীকার করিয়াছ। তোমার কারণগুলি সব শুনিয়াছি, কিন্তু আমার কথা রাখিয়া একটা কাজ কর, এবার তুমি অস্ত্রশস্ত্রাদি ও রণবেশ বাটীতে রাখিয়া বেশ ভদ্রলোকের ছেলের মত মর্ত্তে যাও, তবেই আর কোন গোল বাঁধিবার কারণ থাকিবে না। বিভ্রাটের ভয়টুকুও থাকিবে না।" কুমার গুরুদেবের কথা চারচক্ষে ঠেলিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন।

কার্ত্তিককুমার চলিয়া গেলে গণেশ কুমারের ডাক পড়িল। গণেশ নস্যের ডিবা হইতে হাতের তালুতে নস্য লইয়া তাহা হইতে দুই আঙ্গুলে নাকে গুজিতে গুজিতে আসিয়া বৃহস্পতিকে প্রণাম করিলেন। গুরুদেব বলিলেন—শুনিয়াছি তোমারও এবার মর্ত্তে যাইবার ইচ্ছা নাই। তোমার অবস্থা আমার অবিদিত নহে। কু অভ্যাস করিয়াছ, ছাড়িবার যো নাই। বিশেষ সেটা পৈত্রিক আসক্তি যাই হউক, "পিতরি প্রীতিমা পন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।" পিতার প্রীতিপণে সর্ব্বদেবতার প্রীতি হয়। তবে কি না সীমা ছাড়াইলেই বিপদ। যাই হউক এবার তোমার সিদ্ধিটিদ্ধি সঙ্গে লইতে হইবে না! আমি মর্ত্তে ঢেঁড়েরা পিটিয়া প্রচার করাইয়া দিব—যেন তোমার পূজায় 'এবার গাঁজা ও ভাঙ্গের বরাদ্দ চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ভক্তস্ত মরণং ধ্রুব—মরুগগে সেই বেটারা। তারপর ব্যবসায় ক্ষেত্রের পরিণামের সহিত তোমার যে বিপদ, তাহার জন্য বাপু দোষ যোল আনাই তোমার। সিদ্ধিদাতা তুমি, যদি সিদ্ধি খাইয়াই শিবনেত্র হইয়া থাক, তবে ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় টিকিবে কেন? সুতরাং তাহারা শেষ তোমার উপরই ঝালঝাড়ে। যাই হউক এবার মর্ত্তে সময় ভাল পড়িয়াছে—তেমন কিছু দেখিলে পূর্ব্বাহ্নেই পিঠ টান দিয়া চলিয়া আসিও।" গণেশ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ইন্দুরের ডাক পড়িবা মাত্রই সে হাজির হইল। দেবগুরু বলিলেন,—"যত্র ইঁদুর তত্র প্লেগ।" কথাটা আমিও শুনিতেছি। কিন্তু ভাবিয়া হইবে কি? এবার তোমাকে মর্ত্তে যাইতেই হইবে। যেখানেই চিকিৎসকের সম্মিলন সেইখানেই গর্ত্তে গমন; চলিয়া গেলে, আবার দৌড়! ভোঁ দৌড়! এইরূপে কোন প্রকারে কষ্টেস্বষ্টে তিনটা দিন কাটাইয়া আসিবে বাবা, কোন ভয় নাই।" ইঁদুরের সাধ্য কি সে ব্যবস্থা অস্বীকার করে। এবার বৃহস্পতিঠাকুর আসন পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর কোয়ার্টারে গেলেন এবং লক্ষ্মীদেবীকে অনেক বলিয়া কহিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। মহামান্য হাইকোর্টের নিষ্পত্তির ও কাপড়ের বাজারের মহার্ঘতার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তস্করের লাঞ্ছনা ও মর্ত্ত-লক্ষ্মীর ক্ষতিপূরণের পর প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন 'মা অতীতে যাহা হইয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া আর ফল নাই। অতীত নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে কে ছাড়িয়া দেয়। এবার মর্ত্তে শুভ সময় আসিয়াছে, মর্ত্তকে লক্ষ্মীহীন করিও না।' বৃদ্ধের কথায় লক্ষ্মী স্বীকৃতা হইলেন।

তৎপর বীণাপাণির নিকট উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন,— "বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবার প্রশ্নপত্র ২।৩বার চুরি হইয়াছে বটে, কিন্তু মর্ত্তের শাসনকর্ত্তা সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, এবার হইতে প্রশ্নপত্র ছাপাইবার জন্য ও তাহার সতর্ক রক্ষণ জন্য একজন ইংরেজ নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন হইতে বোধ হয় তোমার গণ্ডমূর্খ সেবকেরা আর সেই ইংরেজ কর্ম্মচারীর চক্ষে ধূলি দিয়া প্রশ্নপত্র চুরি করিতে পারিবে না। দুই তিনবার চুরি হওয়া সত্ত্বেও শেষে তাঁহাদের সুবন্দোবস্তের দরুণ পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবার তুমি যাও মা, ওদের মাথা ওরা নিজেরাই খাইয়াছে। তোমার বীণাটা বরং রাখিয়া যাও; ইডেন, বেথুনে বীণার অভাব হইবে না।" শুনিয়া বীণাপাণি কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না।

ছেলেমেয়েদের সম্মতি জানিয়া ভগবতীর আর অসম্মতি রহিল না। অস্ত্র শস্ত্রাদি বর্জ্জিত হইয়াই মর্ত্তে আসিবেন স্থির করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বহির্ব্বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দী ভৃঙ্গীকে মর্ত্তে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আমতা আমতা করিতে লাগিল। কেহ ২ বলিল—"কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম"। বৃহস্পতি বলিলেন "তথাস্তু"।

সর্ব্বশেষে পুরোহিত ঠাকুরের ডাক পড়িল। পুরোহিত শুক্রাচার্য্য বাড়ীতে নাই। নন্দী জানিয়া আসিয়াছে, তিনি পিতামহ ব্রহ্মার, পিতার 'একোদিষ্ট সপিণ্ডন' করাইতে গিয়াছেন। গিন্নী বলিয়া দিয়াছেন, বৈকাল বেলায় একবার গিয়া দেখা করিয়া আসিবেন। পুরোহিতের জন্য বৃহস্পতি ঠাকুরের অপেক্ষা করিতে হইল।

বৈকালে পুরোহিত ঠাকুর আসিলে বৃহস্পতি বলিলেন,—"এবারের প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বেই তোমার দক্ষিণার বকেয়া পাওনা পরিষ্কার হইবে। পূজায় গিয়া ভোলানাথ শ্বশুর বাড়ী হইতে যাহা কিছু আনিতে পারিবেন, তাহা তোমাকেই দিবেন। আজকাল সিদ্ধির খরচ চালানই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তদুপরি রোজই কিছু কিছু দুগ্ধ সেবন করিতে হয়, নতুবা স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা। পয়সার খুবই অনাটন, সেই জন্যই তোমার দক্ষিণার পয়সা বাকী পড়িয়াছে। তাহা হইলেও কি আর যজমানকে আটক দিতে হয়? "হরে' 'পুরে' করে 'হিত' তাঁর নাম পুরোহিত।" এই মহাজন বাক্যের সার্থকতা রাখিয়া চলিও।"

পুরোহিতকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া গুরুদেব গাত্রোত্থান করিলেন। পুরোহিত প্রবরও যজমানকে আটকের ভয় হইতে অব্যহতি দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্ব সপ্তাহের "কল্পনা"র স্তম্ভে ভোলানাথের পারিবারিক গোলযোগের এইরূপ বিস্তৃত সংবাদ পাঠ করিয়া মর্ত্তবাসী মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিল। এখন সেই পত্রেই "গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে।" এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া মর্ত্তবাসীর আর আনন্দের পরিসীমা নাই। আপত্তির কারণগুলি যে আমাদের দুর্ণিবার কলঙ্ক চিরকাল ঘোষণা করিবে—তাহা প্রক্ষালনের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।

(প্রতিবাদ)

গত ভাদ্র সংখ্যার সৌরভে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার দত্ত গুপ্ত এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের "বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমরা এই প্রবন্ধটীর কয়েকটী প্রতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিবাদ গুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত আক্রমণে কলুষিত। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত যে প্রতিবাদটী পাঠাইয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম। সৌঃ সঃ।

জাতি ভেদ প্রথা তিরোহিত না হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না। তাই লেখক জাতি ভেদ তুলিয়া দিয়া একত্র আহার বিহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাতি ভেদ না থাকাই যদি উন্নতির কারণ হয়, তবে মোগল পাঠান উন্নতির অম্বর চুম্বিত সৌধ-শিখর হইতে অবনতির পঙ্কিল হ্রদে নিপতিত হইল কেন? গ্রীসিয়ান দের শৌর্য্য-বীর্য্য ধ্বংস হইবার কারণ কি? রোমকগণ কোন জাতি ভেদ বিষানলে পরিদগ্ধ হইয়াছিল? লেখক বলেন বহু ঈশ্বরবাদী ও বহু জাতিতে বিভক্ত বলিয়া এবং বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত থাকা নিবন্ধন রমণীগণ উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভে বঞ্চিতা থাকায় হিন্দুগণ পরস্পর একতা লাভে অসমর্থ, তজ্জন্যই তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়া তাহাদের উন্নতির পথ সঙ্কোচিত হইয়া পরিয়াছে। একেশ্বর বাদী, জাতি ভেদ পরিশূন্য জার্ম্মেণ জাতি, সম ধর্ম্মী ও সম গুণান্বিত ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতির প্রতি এরূপ বিজাতীয় বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে কেন? স্বাধীনতা প্রাপ্তা, রমণী গণের ও পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা গণের একেশ্বর বাদী পুত্র গণ পরস্পর কাটা কাটি, মারা মারি করিয়া পৃথিবী নরশোণিতে কর্দ্দমাক্ত করিতেছে কেন? রুসগণ আত্মকলহে উন্মত্ত হইয়া নিজেদের ধ্বংসের পথ মুক্ত ও শত্রুর বিজয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছে কেন? মদদৃপ্ত জার্ম্মেণ জাতি International Law ভঙ্গ করিয়া যে তাণ্ডব লীলার অভিনয় করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতি তাহা সমর্থন করিতে পারিতেছে কি? এই অকাল প্রণয়ের মূলীভূত কারণ জাতি ভেদ নহে,—ভোগ বিলাসের দারুণ স্পৃহা। বীরেন্দ্র বাবু যাঁহাদের অনুকরণ

করিতে বলিতেছেন সেই জাতির ভিতরেও জাতি ভেদ প্রথা নিতান্ত কম প্রবল নহে।

Aristocracy র উজ্জ্বল চিত্রটা বোধ হয় বীরেন্দ্র বাবুর মানস নয়ন হইতে একটুকু দূরে সরিয়া পরিয়াছে। সমধর্ম্মী, সমজাতি ও সম গুণান্বিত হইলেও, এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের উন্নতিতে কাতর হওয়াই বর্ত্তমান সভ্যতার ফল। ভোগ বিলাস রত, স্বার্থপর মানুষ না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই। খৃষ্টান জার্ম্মেণ, খৃষ্টান ফরাসী শোণিতে যীশু খৃষ্টের তর্পণ করিতেছে। জাতি ভেদ প্রথা পরিশূন্য জার্ম্মেণ, রুসিয়ান শবে বীরাসন রচনা করিয়া স্বার্থের মহা সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞান গরীমা দৃপ্ত জার্ম্মেণ, বেলজিয়ামের যুগ যুগান্তর সঞ্চিত লাইব্রেরী ও স্থাপত্য শিল্পাদি ভস্ম স্তূপে পরিণত করিতেছে—দেখিয়াও লেখক, এক ধর্ম্মাবলম্বী ও এক জাতি হইলেই উন্নতির পরাকাষ্টা সংসাধিত হইবে বলিয়া মনে করেন—ইহাই আশ্চর্য্য! বৈদিকযুগ হইতে এই জাতি ভেদ প্রথা ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে; অন্ততঃ মহাভারতের কাল হইতে যে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাভারতের প্রণয়ন কাল খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যদি ধরা যায়, তবু মহম্মদ ঘোরীর ভারত প্রবেশ কাল পর্য্যন্তে অনূন তিন সহস্র বৎসর ভারত এই ব্যাধির দ্বারা ক্লিষ্ট ছিল। কিন্তু সেই ব্যাধি ক্লিষ্ট ভারতে শৌর্য্য বীর্য্য, জ্ঞানগরীমা, শিল্প সম্ভার, ন্যায় দর্শন, চিকিৎসা, রাজনীতি প্রভৃতি মানবোচিত গুণ গ্রামের মধ্যে কিসের অভাব ছিল? বরং এই দুষ্ট দেহ লইয়াই হিন্দুগণ, রাজ চক্রবর্ত্তী মান্ধাতা প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে অগ্রে করিয়া পৃথিবী বিজয় করিয়াছিল, নানা দিগ্ দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল, সাহিত্য ও শিল্পকলায়, ন্যায় দর্শন, গণিত জ্যোতিষাদিতে জগত বিমোহিত করিয়াছিল। তারপর এক শানকিতে খানা খাইয়া মোগল পাঠান এদেশ জয় করিল বটে কিন্তু 'বার রাজপুত তের চুল্লিতে বিভক্ত' থাকিয়াও বহু শতাব্দী তাহাদের সঙ্গে লড়িয়াছিল। পরে গৃহ বিবাদে ভারত উচ্ছিন্ন হইল সত্য, কিন্তু সেই বিবাদ, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় গৃহে প্রবিষ্ট হয় নাই—ক্ষত্রিয় জয়চাঁদই ক্ষত্রিয় পৃথ্বিরাজের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় মানসিংহের দ্বারাই ক্ষত্রিয় প্রতাপ পর্য্যুদস্থ হইয়া ছিলেন!

পৃথিবীর সমস্ত জাতির ভিতরেই জাতি ভেদ প্রথা প্রকারান্তর ভেদে অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং জাতি ভেদ বাঙ্গালীর উন্নতির পরিপন্থী মনে করিবার কোন কারণ নাই। অভাবই লোকের বৈষয়িক জীবনের উন্নতির হেতু। নিত্য অভাব গ্রস্থ জাতি, স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া বৈষয়িক জীবনে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ভোগ স্পৃহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালে তাহাদের মধ্যে দেবত্বের বিলোপ সাধন করে; তখন, স্বার্থের খাতিরে তাহারা না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই। বর্ত্তমান জার্ম্মেণ জাতি তাহার উদাহরণ স্থল। স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল মূলাদিতে যাহারা নিশ্চিন্তমনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া সুখ শান্তিতে সাংসারিক সুখে ও পরমার্থ চিন্তায় সময়াতিবাহিত করিতে পারিত, সেই বাঙ্গালী জাতি দশ এগার টাকা বেতনের সৈনিকের কার্য্যের জন্য লালায়িত হইত না বলিয়া তাহারা ভীরু অপবাদ গ্রস্থ হইলেও ইহা নিশ্চয় যে জাতি ভেদ প্রথা, তাহাদিগকে সমর বিভাগে কার্য্য গ্রহণের বাধা দেয় নাই।

লেখক বলেন গৃহকোণে আবদ্ধ রমণী স্বাধীনতার বিমল আলোক হইতে দূরে রহিয়াছে তাই তাঁহারা আমাদের ও আমাদের দেশের কোন কাজেই আসে না। বিলাতের সফরীগেটী শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রচার করা হয় না বলিয়া সমাজ অর্দ্ধাঙ্গ হীন হইয়া রহিয়াছে। সুশিক্ষিতা ইংরেজ রমণীগণ এই যুদ্ধকালে নানা রকমে সহায়তা করিতেছে। কিন্তু লেখক জানেন কি অশিক্ষিতা (?) ও স্বাধীনতা বিহীনা আর্য্য ললনাগণও একদিন দেশের বিপদ দূর করিতে স্বেচ্ছায় কেশ কর্ত্তন, অলঙ্কার বিমোচন করিয়া ছিল; পরন্তু অত্যাচারপ্রিয় স্বামীর প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে ও সমরাঙ্গণে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই। আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি; তবে যে শিক্ষা রমণীগণকে নারী সুলভ গুণগ্রামে বঞ্চিত করিয়া দেব ভাবের পরিবর্ত্তে পশু ভাবে অনুপ্রাণিত করে, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট না হওয়াই ভাল। হিন্দু পুরুষ ও নারীতে এই

অন্যথা বৈষম্য দেখিয়া লেখকের প্রাণে দুঃখ হইতে পারে কিন্তু জীব জগতের পানে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায়, পুরুষ নারী অপেক্ষা অত্যধিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে। এক জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এককার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয় না, বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং গৃহকর্ম্ম, সন্তান পালন, পারমার্থিক দৈবানুষ্ঠানাদি কতকগুলি কার্য্যে নারিজাতিকে নিযুক্ত রাখিয়া কঠোর জীবন সংগ্রামের ভার যদি পুরুষ গ্রহণ করে সে কি পুরুষের পক্ষে স্বার্থপরতা ও অবিবেচনার কার্য্য হইল মনে করিতে হইবে? স্ত্রীকে উলঙ্গ জনসঙ্ঘের সম্মুখে বিচরণ করিতে দেখিয়া যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন কথা নাই! বিলাতের যে সমস্ত মহিলাকে আমরা ভারতবক্ষে বিচরণ করিতে দেখি তাহারা সাংসারিক কার্য্য কতটুকু করিতেছে? অবশ্য সভা সমিতিতে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু গৃহধর্ম্ম সন্তান পালন ও রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা হয় কি? শুধু জ্ঞান ও কল্পনা ও অন্ধ অনুকরণ দ্বারা উন্নতি হয়না—১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অশিক্ষিত হিন্দু নরনারীগণ, লজ্জা নিবারণের জন্য, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চাহিয়া থাকিতেন না, নিত্য ব্যবহার্য্য সূচি বর্শী প্রভৃতির জন্য মেন্টনের পদে তৈল মর্দ্দন করিত না। তাহারা ভাবুক ও বক্তা ছিল না সত্য, কিন্তু কর্ম্মী ছিল। দেশের যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহারা প্রস্তুত করিয়া দেশের ও দশের অভাব পূরণ করিতে পারিত। আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত তাহারা শিশুর ন্যায় প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী হল না। চড়কা, তাঁপর, হাতুরী প্রভৃতির ধ্বনি সতত তাহাদের মনুষ্যত্বের বার্ত্তা প্রচার করিত।

লেখক বিধবার বিবাহ দিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছেন। যে দেশে অর্থাভাবে কুমারীর বিবাহ হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে, যে দেশের বালিকা বিবাহের বিভ্রাট দেখিয়া আত্মহত্যা করিতেছে, সে দেশে বিধবার বিবাহ দিতে যাওয়া অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক।

হিন্দুধর্ম্মে বহু দেব দেবীর কল্পনা থাকিলেও মূলে হিন্দু মাত্রই একেশ্বরবাদী। একই শক্তি এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালন করিতেছে ইহাই হিন্দুর উপদেশ। উপনিষদ, চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি হিন্দুর নিত্য ব্যবহার্য্য ধর্ম্ম গ্রন্থাদি এই সত্যবাণীর প্রচার করিতেছে, লেখক প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অন্ন ও ভাত পৃথক পৃথক শব্দ হইলেও এক জিনিষকেই বুঝাইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এই উপদেশই দিয়াছেন। * * *

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত।

সেবা।

দেখেছি কোথাও দৃশ্য অপরূপ
পবিত্র মূরতি এক,
মুমূর্ষু জনার শিয়রে বসিয়ে
দিতেছে ঔষধ সেক্‌!
শোকাকুল সেই স্বজন মণ্ডলী
কৃতজ্ঞ ইহার তরে,
সে শুধু সাধিছে কর্ত্তব্য আপন
মৌন আবেগ ভরে!
একে একে কত যামিনী কাটিল
ধৈর্য্য না টুটিল তাঁর,
সে দিয়েছে খুলে পরের কারণ
পরার্থ প্রীতির দ্বার।
যেখানে বিপদ যেখানে মরণ
করে দৃঢ় অভিযান,
স্নেহেতে গলিয়ে সেখানে দাঁড়ায়
অই শীর্ণ মূর্ত্তিখান।
বয়সই গিয়েছে পরের সেবায়
এখন পলিত কেশ,
আজ হেথা, কা'ল অন্যত্র গমন
সহিতে পরের ক্লেশ!
ক্ষীণ বুদ্ধি মোরা যা লইয়ে করি
সন্তোষের আয়োজন,
নব নব বেশে অশুভ আসিয়ে
করিতেছে জ্বালাতন।
দেখিলে এমন পরহিত ব্রত
আসে গো নয়নে জল,
মনে হয় আছে সাধনার পথে
সুসেব্য অমৃত ফল?

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

গ্রন্থ সমালোচনা।

প্রহেলিকা —(উপন্যাস) শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত এম, এ, বি, এল, প্রণীত।

বঙ্গ সাহিত্যে, গার্হস্থ্য আখ্যায়িকা অবলম্বনে অধুনা যে সকল উপন্যাস রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'দিদি' ও 'গোরার' আয়তন বৃহৎ হইলে ও সমালোচ্য গ্রন্থের নিকট ইহাদের ও আকার অনেক ছোট। গ্রন্থকার মূল ঘটনাকে রবারের মত টানিয়া 'প্রহেলিকার' আকার এই প্রকার বৃদ্ধি করেন নাই। মূল আখ্যায়িকাকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য ইহাতে আরও কতিপয় আখ্যায়িকা অঙ্কিত করা হইয়াছে। সেইজন্য মূল আখ্যায়িকার সৌন্দর্য্য সৃজনে আর্টের কোন দোষ ঘটে নাই; বরং ইহার উজ্জ্বল্য আরও প্রতিভাত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের সৃষ্ট চরিত্র গুলি সত্যই নির্ভীক, সরল এবং উৎসাহ পূর্ণ। 'আনন্দ' ও 'বিজয়' অভেদাত্ম বন্ধু হইলেও উভয় চরিত্রই বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। আনন্দ শৈশব হইতে ঈশ্বরে বিশ্বাস পরায়ণ—এই চিত্র হিন্দুর সনাতন আদর্শের খাঁটি চিত্র। বিজয় তাহার ঠিক বিপরীত। বিজয় বিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। সংসারের আনন্দ আহ্লাদ, পোষাক পরিচ্ছদ, সুখ সম্ভোগকে সে ঘৃণা করে না। বরং ইহাদের ভিতর দিয়াই যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাই তাহার বিশ্বাস। বিজয়কে কোমতের শিষ্য বলা যাইতে পারে। মানুষ যে কেবল কতগুলি অন্ধ বিশ্বাসের বোঝা বহিবার জন্যই জন্মে নাই, পরন্তু তাহার ও একটা নিজের সত্বা আছে, স্বাধীন ভাবে তত্ত্ব বিচার ও সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক, ও আধ্যাত্মিক মত গঠন করিবার অধিকার আছে—তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়। বিজয় যেন আধুনিক বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া চরিত্র অভিনয় করিয়াছে। অধুনা বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে ভাব লহরী নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, বিজয়ের চরিত্রে আমরা তাহাদেরই সম্যক্ পরিস্ফুটন দেখিতে পাই।

প্রহেলিকাতে যাহারা কেবল উপন্যাসের মাদকতা চাহিবেন তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। বিজয় ও প্রভাবতীর (তবু'র) দাম্পত্য চিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত ঘরে এই চিত্র কি সুখের? খণ্ড চিত্র মধ্যে নন্দদুলাল ও অন্নপূর্ণার দারিদ্র্য জীবনের শোকাবহ চিত্র দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন। ফুল্লনলিনী ও তাহার পিতার পারিবারিক চিত্র বর্ত্তমান ব্রাহ্ম পরিবারের একখানা উজ্জ্বল চিত্রিত পট। "জমিদার" শিক্ষা ও সঙ্গদোষে কি প্রকার অপদার্থ হয়, তাহা অন্নদাপ্রসাদকে দেখিলে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইবে। আবার আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদার নির্ম্মলচন্দ্রকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

যাহারা উপন্যাসে কেবল আকস্মিক উত্থান পতন, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা, আপাত মধুর রূপ লালসার চিত্র দেখিতে প্রয়াসী তাহাদের নিকট প্রহেলিকার অনেক স্থান প্রহেলিকাময় রহিয়া যাইবে। কিন্তু যাহারা তাহাতে ভাবুকতা, আর্টের বিচক্ষণতা, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে অভিলাষী তাহাদের নিকট প্রহেলিকা অপূর্ব্ব জিনিষ বলিয়া মনে হইবে। ইহাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের আলোক চিত্র অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিকই গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী যশের অধিকারী হইয়াছেন।

গ্রন্থকার আট শত পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতে যাইয়া সম্পূর্ণ ত্রুটি বিচ্যুতির হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। গ্রন্থে প্রাদেশিক শব্দ অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা ইহার পক্ষপাতী না হইলেও এই প্রকার প্রাদেশিকতার দোষ দিতে পারি না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের লেখকগণ যখন স্বচ্ছন্দে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের দুর্ব্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করিতেছেন তখন অন্যে করিবে না কেন? গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত; প্রাঞ্জল ও বিষয় বর্ণনার উপযোগী। গ্রন্থের বাঁধাই ও ছাপা উৎকৃষ্ট। এই দুর্দ্দিনেও গ্রন্থের আকারে ও পরিমাণে মূল্য দুই টাকা বড় বেশী নয়।

শ্রীমাধবাচার্য্য।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত দ্বারা মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।